পুরাতন পরিচয়

নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি এখনও
বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে।

১৩৪৬ সাল : শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র।

১৩৪৭ সাল : শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

১৩৪৮ সাল : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

১৩৪৯ সাল : বৈশাখ হইতে চৈত্র।

১৩৫০ সাল : বৈশাখ হইতে চৈত্র।

১৩৫১ সাল : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

১৩৫২ সাল : বৈশাখ হইতে চৈত্র।

১৩৫৩ সাল : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ।

১৩৪৬, ১৩৪৭, ১৩৪৮, ও ১৩৪৯ সালের প্রতি সংখ্যার
মূল্য—এক টাকা।

১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২ ও ১৩৫৩ সালের প্রতি সংখ্যার
মূল্য—আট আনা।

পরিচয়

মাঘ, ১৩৫৩

—সূচী—

চাঁদের ভাগ্যলিপি

'অদূর ভবিষ্যতে চাঁদ পৃথিবীর বিপদ-গণ্ডিতে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে পড়বে দুটি পৃথক অংশে। তার পর এই টুকরো দুটি আবার ভেঙে পড়বে, সৃষ্টি হতে থাকবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর চাঁদের দল; তখন দিনে রাতে সব সময়ই চাঁদের আলোর একটানা বর্ষণ চলবে পৃথিবীর উপর।' অবিশ্যি এ-ঘটনা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমাদের কারো হবে না; কারণ হিসেব করে দেখা গেছে ঘটনাটা দুঃসম্ভব, পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে এ-অপঘাত ঘটবে বলে মনে হয় না।

রামধনু

পুরাকালে য়িহুদীরা মনে করতো: 'রামধনু আকাশে নিবদ্ধ বাস্তব একটা কিছু, ভগবান ও মানুষের মধ্যে একটা চুক্তির নিদর্শন, চেকের উপর স্বাক্ষরের মতোই এর বাস্তবতার মাত্রা।' আসলে এই রামধনু নিছক ভ্রান্তিমাত্র। বৃষ্টির ফোঁটা সূর্যের আলোকে নানা রঙের রশ্মিতে বিভক্ত করে; যে রঙিন রশ্মি একজনের চোখে এসে পড়ে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে না, তাই দুজনের পক্ষে একই মুহূর্তে একই রামধনু দেখা অসম্ভব।

বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দিতে জিন্‌স্-এর দক্ষতা অপরিসীম। এই তথ্যের পরিচয় মিলবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ 'বিশ্ব-রহস্যে'। আজ আমাদের দেশের বৃহত্তম অংশ যে মূঢ়তার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার চিন্তায় যে এসেছে এক সর্বনেশে জড়তা—তার কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা ও অস্বাভাবিকতা। এই চরম দুর্গতি থেকে তাকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণের উপযোগী করে লেখা জিন্‌সের বইগুলির বাংলায় অনুবাদ করার ভার আমরা গ্রহণ করেছি। আধুনিক

বিজ্ঞানের যে সব সমস্যা স্বভাবতঃই আগ্রহের সঞ্চার করে তাদেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান এই গ্রন্থে। অনুবাদ করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তাঁর দক্ষতা আছে; 'পৃথ্বি-পরিচয়', 'নক্ষত্র-পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থ তার সুস্পষ্ট পরিচয়। দুরূহ বাক্যজালে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, ভাষা প্রয়োগে তাঁর নিপুণতা আছে, নির্মমতা নেই। সচিত্র সুদৃশ্য বাঁধাই দাম ৩৲

প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০।

পরিচয়

ফাল্গুন, ১৩৫৩

—সূচী—

পরিচয়

চৈত্র, ১৩৫৩

—সূচী—

পরিচয়

বৈশাখ, ১৩৫৪

—সূচী—

চাঁদের ভাগ্যালাপ

[illegible] গণ্ডিতে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে পড়বে দুটি পৃথক অংশে। তার পর এই টুকরো দুটি আবার ভেঙে পড়বে, সৃষ্টি হতে থাকবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর চাঁদের দল ; তখন দিনে রাত্তে সব সময়ই চাঁদের আলোর একটানা বর্ষণ চলবে পৃথিবীর উপর।' অবিশ্যি এ-ঘটনা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমাদের কারো হবে না ; কারণ হিসেব করে দেখা গেছে ঘটনাটা দুঃসম্ভব, পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে এ-অপঘাত ঘটবে বলে মনে হয় না।

রামধনু

পুরাকালে য়িহুদীরা মনে করতো : 'রামধনু আকাশে নিবদ্ধ বাস্তব একটা কিছু, ভগবান ও মানুষের মধ্যে একটা চুক্তির নিদর্শন, চেকের উপর স্বাক্ষরের মতোই এর বাস্তবতার মাত্রা।' আসলে এই রামধনু নিছক ভ্রান্তিমাত্র। বৃষ্টির ফোঁটা সূর্যের আলোকে নানা রঙের রশ্মিতে বিভক্ত করে ; যে রঙিন রশ্মি একজনের চোখে এসে পড়ে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে না, তাই দুজনের পক্ষে একই মুহূর্তে একই রামধনু দেখা অসম্ভব।

বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দিতে জিন্‌স্‌-এর দক্ষতা অপরিসীম। এই তথ্যের পরিচয় মিলবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ 'বিশ্ব-রহস্যে'। আজ আমাদের দেশের বৃহত্তম অংশ যে মূঢ়তার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার চিন্তায় যে এসেছে এক সর্বনেশে জড়তা—তার কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা ও অস্বাভাবিকতা। এই চরম দুর্গতি থেকে তাকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণের উপযোগী করে লেখা জিন্‌সের বইগুলির বাংলায় অনুবাদ করার ভার আমরা গ্রহণ করেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের যে সব সমস্যা স্বভাবতঃই আগ্রহের সঞ্চার করে তাদেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান এই গ্রন্থে। অনুবাদ করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তাঁর দক্ষতা আছে ; 'পৃথ্বি-পরিচয়', 'নক্ষত্র-পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থ তার সুস্পষ্ট পরিচয়। দুরূহ বাক্যজালে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, ভাষা প্রয়োগে তাঁর নিপুণতা আছে, নির্মমতা নেই। সচিত্র সুদৃশ্য বাঁধাই দাম ৩৲

প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০।

পরিচয়

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

—সূচী—

"পরিচয়"-এর

গ্রাহকগণের প্রতি

এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে **পরিচয়**-এর ষোড়শ বর্ষ শেষ হল। শ্রাবণ-সংখ্যা থেকে নতুন পরিচালকমণ্ডলীর সহযোগিতায় এবং নতুন ব্যবস্থাপনায় **পরিচয়**-এর সপ্তদশ বর্ষ শুরু হবে। কলকাতার বর্তমান অশান্তিকর অবস্থার জন্যে গত কয়েকমাস ধরে **পরিচয়** নিয়মিত প্রকাশ করার ব্যাপারে অশেষ ত্রুটি ঘটছে—এজন্যে গ্রাহকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সংখ্যার সঙ্গে যে সব গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ শেষ হল, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যতে আর গ্রাহক থাকতে না চান, তাহলে তিনি যেন দয়া করে ৩০শে আগস্টের মধ্যেই সেকথা আমাদের নীচের **নতুন ঠিকানায়** চিঠি লিখে জানান। যাঁদের কাছ থেকে ওরকম কোন নির্দেশ না পাওয়া যাবে, তাঁদের আমরা যথারীতি শ্রাবণ-সংখ্যা ভি. পি. করে পাঠাব। আশা করি, তাঁরা কেউ ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে **পরিচয়**-কে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না।

—**প্রকাশক, পরিচয়,**
ইণ্টারন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, লিঃ,
৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০

পরিচয়

আষাঢ়, ১৩৫৪

—সূচী—

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৫৩

শ্রমশিল্পের দ্রুত প্রসার ?

ভাল জিনিষ কম খরচে তৈরী হোক এবং প্রচুর পরিমাণে হোক, এর জন্য আমরা যন্ত্র শিল্পের প্রসার চাই। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালের অভাবের ভেতর ধুঁকতে ধুঁকতে যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসার হোক, এই ইচ্ছাটা যেন আরও বেড়ে উঠেছে। ইচ্ছা আর বাস্তব এক নয়। তাই দ্রুত প্রসারের পথে কি কি বাঁধা আছে তা' পরিষ্কার করে জেনে রাখা ভাল। বাধাকে সরিয়ে দিতে হলে বাধার রূপটি পরিষ্কার করে জানা দরকার।

আরও খাবার, আরও কাপড়, আরও বাড়ী, আরও গাড়ী তৈয়েরীর কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই ওঠে এই সব জিনিষ তৈয়ারীর উপকরণের কথা; যন্ত্র আর যন্ত্র চালাবার শক্তি, কারখানা আর কাঁচা মালের কথা। ইস্পাত, কয়লা, কেমিকেলস্, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে তাই 'বনিয়াদী' শিল্প (basic industries) বলা হয়। এরা হল ভিত্তি। এদের ওপর গড়ে ওঠে সমগ্র যন্ত্রশিল্পের ইমারত। হৃদযন্ত্রের ওপর ধমনীতে রক্তের ঢেউএর পড়া ওঠা যেমন নির্ভরশীল, আমাদের সামাজিক ঐশ্বর্য তেমন এই বনিয়াদী শিল্পগুলির উপর নির্ভরশীল। আমাদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে হলে বনিয়াদী শিল্পের প্রসারকে রাখতে হবে অব্যাহত। আমাদের দেশে বর্তমানে কাদের হাতে এই শিল্পগুলি আছে তার একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

প্রথম ধরুন ইস্পাত। ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে ১২ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হয়েছিল। ইদানীং পরিমাণ কিছু কমে গেছে। এর শতকরা ৭৫ ভাগ জামসেদপুরে টাটার কারখানায় তৈরী। ১৯৪২ সালে পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লক্ষ টন। তারপর হ'ল মার্টিন ও বার্ণ কোম্পানীর কারখানা স্টিল করপোরেশন অব বেঙ্গল, ২ লক্ষ টনের সামান্য কিছু বেশী। তারপর ভারত সরকারের ইছাপুরের মেটাল এ্যাণ্ড স্টিল ফ্যাক্টরী ৫০ হাজার টনের কিছু বেশী। তারপব মহীশূরের আয়রন এ্যাণ্ড স্টিল ওয়ার্কস্, ২৫ হাজার টন। এই চারটে ফ্যাক্টরীই ১২ ভাগের ১১ ভাগ ইস্পাত তৈরী করে। বাকী ১ লক্ষ টন তৈরী হয় ছোট ছোট কতকগুলি কারখানায়। এর ভেতর আজকাল কানপুরের পদমপত্ সিংহনিয়ার জে. কে. ইন্ডাস্ট্রীজের ইস্পাত তৈরীর কারখানাই বোধ হয় সব চেয়ে বড়। এই গেল বর্তমান ও কিছুকাল আগের কথা। ভবিষ্যতে কি হবে ?

স্যার আর্দেশির দালাল ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার যখন সদস্য ছিলেন,তখন কতকগুলি শিল্পের ভবিষ্যত উন্নতি বিবেচনার জন্য কতকগুলি কমিটি তৈরী হয়। এর একটা ছিল লোহা ও ইস্পাত সংক্রান্ত—নাম ছিল Iron & Steel Panel. এই প্যানেল-কে একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে আগামী ৫ বছরের ভেতর ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত এদেশে তৈরী করতে হলে কি কি করতে হবে তাই যেন বিবেচনা করা হয়। নিজেদের বুদ্ধি মত হিসেব করে এদেশে ৫ বছরের ভেতর কত লক্ষ টনের চাহিদা হতে পারে, বিবেচনার এই স্বাধীনতা প্যানেল-এর ছিল না। সভ্যদের মতে যুদ্ধের আগে এদেশে গড়ে বছরে ১০ লক্ষ টনের মতন ইস্পাত লাগত। বর্তমানে যতগুলি কারখানা আছে সবগুলি একত্রে ১২ লক্ষ টনের মতন ইস্পাত তৈরী করতে পারে। আরও ১৩ থেকে ১৮ লক্ষ টন কি ভাবে তৈরী করা যায় তার অনুসন্ধান এই প্যানেল করেছেন। বর্তমান কারখানাগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়ালেও মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবে এবং সেই ফাঁক ভরাট করার জন্য বছরে ১০ লক্ষ টনের মতন ইস্পাত তৈরী করতে পারবে—এই রকম একটা আধুনিক কারখানা তৈরীর প্রস্তাব এঁরা দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে কারখানাটি হবে এবং ভারত সরকার এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন।

বিড়লার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইস্টার্ণ ইকনমিস্টে' প্যানেল-এর রায়ের প্রতি কটূক্তি করা হয়েছে এই বলে যে, ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টনের যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সে সীমা মেনে নেওয়া প্যানেলের উচিত হয় নি। আমাদের দেশেই যদি এবার থেকে যন্ত্র তৈরী সুরু হয়, রেলগাড়ীর উন্নতি হয়, জাহাজ তৈরীর বন্দোবস্ত হয়, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ঘাঁটি হয়, এছাড়া যদি আরও নানারকম কারখানা, বাড়ী ইত্যাদি তৈরীর কথা মনে করা হয়—তবে ৩০ লক্ষ টন ইস্পাতে কিছুই হবে না। প্রথম ৫ বছরে হতে পারে যে এর চেয়ে পরিমাণে বেশী তৈরী সম্ভব হবে না কিন্তু ভবিষ্যতের পরিমাণ বাড়াবার গোড়াপত্তনের কাজ এই ৫ বছরের ভেতরই আরম্ভ করা উচিত। প্যানেলের সভ্যরা সব জেনেশুনেও বেশীর দিকে না গিয়ে কমের দিকে কেন গেল এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত এমন হতে পারে যে ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নতি হবে এটা এঁরা বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়ত, যদি হয়ও বা, পরিমাণের তুলনায় বেশী চাহিদা থাকলে দামটা থাকবে ভাল, একথাও তাঁদের মনে হতে পারে। ব্যবসায়ে যদি মন্দা আসে আর চাহিদা যদি কমে যায় তবে অনেক অনেক ইস্পাতের বোঝার কথা মনে করে ভীত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, বিশেষ করে সভ্যরা যখন সবাই লোহার ব্যবসায়ী। প্যানেলের-এর সভাপতি ছিলেন স্যার পদমজি জিনুওয়ালা। ইনি স্টিল করপোরেশান অব বেঙ্গলের একজন অংশীদার। সভ্যরা হলেন : স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী, টাটা কোং-এর লোক ; মিঃ বসির, জে, কে, ইনডাস্ট্রিজের লোক ; মিঃ ফ্র্যাঙ্ক পার, ইনি বৃটিশ আয়রন ও স্টিল ফেডারেশনের একজন কর্মচারী, এদেশে এসেছিলেন ভারত সরকারের Steel Commissioner হয়ে ; মিঃ কুপার, ইনি টাটা কোং এর লোক—এবং মিঃ হেইল, ইনি Braithwaite & Co-র লোক।

মধ্যপ্রদেশে ইস্পাত তৈরীর জন্য যে কোম্পানীটি হবে তার অংশিদার নাকি তাঁরাই শুধু হবেন যাঁরা ইস্পাতের ব্যবসায়ে বর্তমানে আছেন, অর্থাৎ টাটা, সিংহানিয়া ইত্যাদি। অন্য কেউ এর ভেতর আসতে পারবে না। এছাড়া এঁরা নাকি একটা ফেডারেশন করবেন যেখানে ইস্পাতের পরিমাণ এবং দাম যুক্তপরামর্শে ঠিক হবে।

কয়লার অবস্থা আবার অন্য রকম। এখনে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের প্রভাব বেশী। ছোট ছোট অনেক খনি ভারতীয়দের হাতে আছে। কিন্তু বড় বড় খনির অধিকাংশই বৃটিশ ব্যবসায়ীদের হাতে। মাটির নীচে কয়লার স্তর থাকে। আমাদের দেশে মোটামুটি বলতে গেলে উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরগুলিতে ভাল কয়লা পাওয়া যায়। যারা গভীর সুড়ঙ্গ করে কয়লা উঠাতে পারে তারা ভাল কয়লা পায়। বড় বড় খনিতে যেখানে যন্ত্রের ব্যবহার হয় ভাল কয়লা সেখান থেকেই ওঠে। ছোট খনির কয়লা সাধারণত তাই খারাপ হয়। লোহা বা ইস্পাত গলাবার কাজে কিংবা কারখানার বয়লার প্রভৃতির জন্য ভাল কয়লা না হলে চলে না এবং এই কয়লা সরবরাহ করে বড় বড় খনিগুলি। সম্প্রতি Indian Coalfields' Committee-র যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে বছরে যত কয়লা ওঠানো হয় তার শতকরা সত্তর ভাগ ওঠে Indian Mining Association-এর মেম্বারদের খনি থেকে। Indian Mining Association-এর আধিপত্য হচ্ছে বার্ড, এ্যাণ্ড্রু ইউল প্রভৃতি বৃটিশ কয়লা ব্যবসায়ীদের হাতে। কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীও এই সমিতিতে আছে। কিন্তু যে শতকরা সত্তর ভাগের কথা বলা হয়েছে তাতে ভাল ও মন্দ দু'রকম কয়লাই আছে। আলাদা করে হিসাব নিলে হয়ত দেখা যাবে যে ভাল কয়লা বিদেশী ব্যবসায়ীদের খনি থেকে সত্তর ভাগেরও বেশী ওঠে।

১৯৪২ সালে কয়লা ওঠানো হয়েছিল ২৬০ লক্ষ টন। ১৯৪৪ সালে পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩৫ লক্ষ টন। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধকে জোরদার করার জন্য কয়লার যখন বেশী দরকার ছিল, তখন কয়লা উঠেছিল মাত্র ২২৫ লক্ষ টন। কেন কয়লা কম উঠছে তার জবাব হিসেবে বিদেশী ব্যবসায়ীরা বলেছিল যে ভাল যন্ত্র কিনতে পারছি না, আর তা ছাড়া শ্রমিকের বড় অভাব ঘটেছে, অন্য জায়গায় ভাল মাইনে পেয়ে এরা চলে যাচ্ছে। আরও একটা কারণের উল্লেখ করা হয়েছিল; অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) নাকি ব্যবসায়ে উৎসাহ কমিয়ে দিচ্ছে। যে যুদ্ধকে তারা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছিল তার জন্যও বেশী কয়লা তোলা তাদের সম্ভব হল না; কারণ মজুরকে তাহলে বেশী মাইনে দিয়ে রাখতে হবে, মুনাফা কমে যাবে।

এই গেল কয়লার কথা। আরও দু' একটা বনিয়াদী শিল্প ধরা যাক। ধরুন কেমিক্যালস্। যুদ্ধের আগে এ দেশে গোটা তিরিশের মতন কারখানা থাকলেও যে সমস্ত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে অন্য কেমিক্যালস্ তৈরী হয়, তার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসত। যুদ্ধের ঠিক আগে ও প্রথম দিকটার sulphuric, nitric, hydrochloric ইত্যাদি এসিড (acids) উৎপাদনের পরিমাণ এদেশে বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সমস্ত চাহিদার তুলনায় পরিমাণ এখনও কম। Alkalies, যেমন caustic soda, soda ash, bleaching powder, ইত্যাদির বেশীর ভাগ এখনও বিদেশ থেকে আমদানী হয়। কস্টিক সোডা বছরে অনুমান প্রায় ৫০ হাজার টন লাগে। টাটা কেমিক্যালস্ বা এই ধরণের ২।৩টি কারখানা সব মিলিয়ে তৈরী করতে পারে মাত্র সাড়ে এগার হাজার টনের মতন। বাকীটা আমদানী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সব ধরনের কেমিক্যালসের আমদানী একচেটিয়া কারবার হ'ল বিলেতের কেমিক্যালসের একচেটিয়া কোম্পানী Imperial Chemical Industries এর

হাতে। Machine tools অর্থাৎ যন্ত্র তৈরী করার যন্ত্রের কারখানা এদেশে মাত্র গোটাকয়েক আছে। তাতে সোজা ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি (tools) তৈরী হয়। বাদবাকী সব আমদানী হয় বিদেশ থেকে। সরকারী কেন্দ্র ছাড়া ব্যবসায়ীদের হাতে বিদ্যুৎ তৈরীর যে কেন্দ্রগুলি আছে টাটার স্থান তাতে বোধহয় দ্বিতীয়। কিন্তু কলকাতা ও শহরতলী, দিল্লী, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি জায়গায় (যেখানে অনেক এবং রকমারি কারখানা আছে) বিদ্যুৎ তৈরী ও সরবরাহ হ'ল বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে। ভারতবর্ষে সিমেন্টের গোটা বাইশ কারখানা আছে। তাব বাবোটাই হ'ল Associated Cement Co. বলে একটা কোম্পানীর হাতে। দেশের শতকরা ৬০ ভাগ সিমেণ্ট এরা তৈরী করে, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হ'ল বোম্বাই-এর এক বৃটিশ কোম্পানী।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে তিনটে ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কতকগুলি বনিয়াদী শিল্পে আমরা প্রধানত আমদানীর ওপর নির্ভর কবি, যেমন, কেমিক্যালস্, মেশিন্ টুলস্। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি শিল্পে দেশে তৈরী হলেও বিদেশী ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা প্রবল, যেমন, কয়লা, সিমেণ্ট, বিদ্যুৎ। তৃতীয়ত, কতকগুলি শিল্পে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষমতাই প্রবল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি কোম্পানীর ভেতব এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, যেমন ইস্পাত।

বলতে পারেন, যার হাতেই থাকুক ক্ষমতা কি এসে গেল তাতে? ব্যবসায়ীরা কারখানা চালাবে নিজেদের গরজেই এবং দেশ যদি আরও চায় ওরা আরও তৈরী করবে। ওরা না পারে নতুন লোক আসবে। কিন্তু বাস্তব জগতে পথ এত সোজা নয় বলেই ত' হাঙ্গাম। যে শিল্পে যারা বিশেষ প্রভাবশালী তারা সর্বদা খেয়াল রাখে সেখানে কেউ তাদের প্রতিপত্তি যেন নষ্ট না করে। কখনও নতুন লোকের এপথে আসা ঠেকিয়ে রেখে, কখনও বা তাদের নিজেদের দলে টেনে নিয়ে নিজেদের প্রভাব এরা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। উৎপাদন কৌশল এমন একটা স্তরে গিয়ে আজ পৌছেছে যে এই বনিয়াদী শিল্পের উৎপাদনের প্রথম পর্বেই কোটী কোটী টাকা ঢালতে হয়। যারা কোটী কোটী টাকা ঢেলে বসে আছে, তারা দেখে তাদের জিনিষের দাম কমে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর যারা নতুন করে টাকা ঢালতে যাবে তাদের একদিকে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভয় অন্যদিকে থাকে ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার ভয়। ফলে পুরনো লোকদের ডিঙিয়ে নতুনের ঢোকা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইস্পাতের কথাই ধরুন। মধ্য প্রদেশে যে আধুনিক কারখানাটি হবার কথা হচ্ছে তার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য লাগবে অন্তত ২৫ কোটী টাকা। আর এই কোম্পানীর যারা অংশীদার হবে তারা সবাই ইস্পাতের ব্যবসায়ী। নতুন লোক ত আসতে পারল না।

তারপর আসে মুনাফার কথা। ব্যবসায়ী খোঁজে মুনাফা তার কিসে বেশী হবে। জোর চাহিদার জন্য ভাল দাম পেলে অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ তৈরী করেও মুনাফা বাড়ানো যায়। মুনাফা বাড়িয়েই সে খুসী। সমাজের দ্রুত উন্নতিব জন্য পরিমাণে বেশী এবং কম দামে জিনিস সরবরাহের দরকার হতে পারে। অপরপক্ষে পরিমাণে কম এবং বেশী দামে জিনিস বিক্রী করলে ব্যবসায়ীর লাভ বেশী হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমতা ব্যবসায়ীর হাতে থাকলে বেশী দামে কম জিনিষ বিক্রির বন্দোবস্ত সে করবে।

নতুন লোকের চট্ করে আসা আজকাল সম্ভব নয় বলে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটা দলের হাতে একটা শিল্পের উৎপাদনের বেশীর ভাগ থাকার ফলে এরকম একচেটিয়া কারবার সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ও তাই। যুদ্ধের সময় কয়লা উৎপাদনের কথাই ধরুন। কয়লার যখন ভয়ানক দরকার, কয়লার উৎপাদন গেল কমে। আবার ভবিষ্যতেও হয়ত দেখব, যখন সামাজিক মঙ্গলের জন্য ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদির বেশী বেশী দরকার, তখন উৎপাদন হয়ত যথেষ্ট বাড়ছে না। কারণ, ব্যবসায়ীদের 'সুবিধে' হচ্ছে না। এরই জন্য কার হাতে উৎপাদনের ক্ষমতাটা রইল তা' নিয়ে সামাজিক লোকের মাথা ঘামাবার দরকার আছে বৈকি।

যে সমস্ত শিল্পে আমরা বিদেশের উপর নির্ভরশীল সেগুলির গোড়াপত্তন দেশে করার অর্থও তাই। ক্ষমতা বিদেশীর হাতে না থেকে দেশে থাকুক যা'তে দেশের দরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। আমাদের দেশ পরাধীন তাই সরকারী তরফ থেকে এই ধরনের গোড়াপত্তনের চেষ্টা হবে তা' আশা করা বৃথা। জনসাধারণ তাই আশা করে যে ভারতীয়দের ভেতর ব্যবসায়ে যারা অগ্রণী তারাই এ ধরনের শিল্পগুলিকে দেশে গড়ে তুলবে। দেশের শাসনকর্তাদের নিরুৎসাহ এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাধা সত্ত্বেও গত ২০।২৫ বছরে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দৃঢ়তায় অনেক কারখানা, বিশেষ করে কাপড়ের কল, এমন কি ইস্পাতের কারখানাও গড়ে উঠেছে। সেই পুরনো দিনের কথা মনে রেখে সবাই আশা করছে দেশী ব্যবসায়ীবা আবার সেই দৃঢ়তা দেখাবে। কিন্তু মনে হচ্ছে এখন হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেশী নামকরা ব্যবসায়ীরা মিতালি পাতাচ্ছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে বড়তে ছোটতে মিতালির শেষ পরিণতি হয় বড়র কাছে ছোটর আত্মসমর্পণ। এখন যে মিতালিগুলি গড়ে উঠছে তাতে হয়ত প্রথম থেকেই হচ্ছে আত্মসমর্পণ। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে বিলাতের Imperial Chemical Industries এর সঙ্গে টাটা কোং-এর এক চুক্তি হয়েছে রঙের মশলা (dye-stuff) তৈরী করা সম্পর্কে। টাকা দেওয়ার অংশ টাটা কোং-এ বেশী থাকবে কিন্তু জিনিষ তৈরীর খবরদারি ও কৌশল আপাতত I. C. I.-এর হাতেই থাকবে। বিলাতের Nuffield Organisation-এর সঙ্গে বিড়লা ব্রাদার্স-এর এক চুক্তি হয়েছে এদেশে মোটর গাড়ী তৈরী করা নিয়ে। প্রথমে কাগজে বেরিয়েছিল যে গাড়ীর প্রায় সমস্ত অংশ এদেশেই তৈরী হবে। এখন স্বীকার করা হয়েছে যে অংশগুলি এদেশে তৈরী হবে না। ওদেশে তৈরী বিভিন্ন অংশ জুড়ে দেওয়ার কাজটা এদেশে হবে। বালচাঁদ হীরাচাঁদের সঙ্গে আমেরিকার Chryslar Corporation-এর—যারা ক্রাইসলার গাড়ী তৈরী করে—চুক্তির কথাও কাগজে বেরিয়েছিল। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন তৈরী অংশ জুড়ে দেওয়ার কাজ এদেশে হবে। 'মাহীন্দ্র এণ্ড মোহাম্মেদ' নামে এক কোম্পানীর সঙ্গে কানাডার এক কোম্পানীর চুক্তি হয়েছে এ দেশে Machine Tools তৈরী করা সম্পর্কে। কে. সি. মাহীন্দ্র আগে Martin & Co-এর একজন ছোট্ট অংশীদার ছিলেন। তারপর American Purchasing Mission-এর দলপতি হয়ে আমেরিকা যান। 'কিরলস্কর সান্স্ এণ্ড কোং নামে একটা ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে বিলেতের British Oil Engines (Export) Ltd

নামে এক কোম্পানীর চুক্তি হয়েছে এদেশে Internal Combustion Engine তৈরী করা সম্পর্কে। বনিয়াদী শিল্প সম্পর্কিত কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। এছাড়া রেডিও, নকল সিল্ক প্রভৃতি তৈরী নিয়েও এধরনের কতকগুলি চুক্তি হয়েছে।

কারখানাগুলি আমাদের দেশে এবং অংশত দেশী ব্যবসায়ীদের টাকায় তৈরী হলেও তৈরীর কৌশল ও খরচাদি বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে থেকে যাবে। দেশী শিল্পপতিরা হয়ত ভাবছেন যে আস্তে আস্তে সমস্তটা নিজেদের হাতে নিয়ে নেব। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা খুবই কম। I. C. I-এর মূলধন আজকাল অনুমান ১৭৫ কোটি টাকার মতন, তা ছাড়া dye-stuff, chemicals, munitions প্রভৃতিতে এই কোম্পানীর সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে একচেটিয়া কারবার। টাটা কোং-এর মূলধন মাত্র ৩০ কোটি টাকার মতন এবং এর কারবারের পরিধি মাত্র ভারতবর্ষ। Nuffield Organisation-এর হাতে এখন ৬৩টা কারখানা আছে। বিড়লা ত এর কাছে বালখিল্য। কাজেই হয়ত দেখবেন বোয়াল মাছের কাছে যেমন পুঁটি মাছ সুবিধা প্রত্যাশা করে সেই ধরনের সুবিধা আমাদের শিল্পপতিরা পাবেন।

সব জেনেশুনেও দেশী শিল্পপতিরা চুক্তি করেছেন এইজন্য যে নতুন শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠা করার কলকব্জা, দক্ষলোক ইত্যাদি আজকাল চট্ করে বাইরে থেকে আনা যাচ্ছে না। এছাড়া আন্তর্জাতিক বড় বড় একচেটিয়া কারবারীদের অসহযোগিতায় কোন শিল্পের নতুন করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে ভুলভ্রান্তি অনেক হবে, ধাক্কা অনেক খেতে হবে। সে সব অনেক টাকার ব্যাপার। তার থেকে চুক্তি করে ফেলাই ভাল। এই আত্মসমর্পণে ক্ষতি কিছু নেই বরং জোগানদারীর জন্য বেশ লাভই হবে। ক্ষতি হচ্ছে সমাজের। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিক থেকে দেখতে গেলে দেশী শিল্পপতিরা আর কি-ই বা করতে পারত। নতুন করে বনিয়াদী শিল্পের গোড়াপত্তনের জন্য যা কিছু আয়োজন দরকার, দক্ষলোকের জোগাড় আর দরকার হলে দেশেই কলকব্জা তৈরী করা—এসমস্ত একমাত্র দেশের সরকার করতে পারে। দক্ষলোকের জোগাড় এখনও অসম্ভব নয়। গত ডিসেম্বরের প্রথমদিকে কাগজে বেরিয়েছিল যে যুগোশ্লাভিয়া দেশের বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য বাইরে থেকে কয়েক শ' দক্ষলোকের আমদানী করেছে। আমাদের দেশী ব্যবসায়ীরা আন্দোলন চালাতে পারত যে, প্রকৃত এক জাতীয় সরকার শাসনভার হাতে নিক—যাতে বিভিন্ন শিল্পের সত্যিকারের গোড়াপত্তন দেশে করা সম্ভব হয়। এই ধরনের আন্দোলন আগে চালানোও হয়েছে। কিন্তু এতদিনে যেন ক্লান্তি এসে গেছে। এরা আর আন্দোলন চায় না। তার থেকে ভাগবাঁটোয়ারা করে যতটুকু পাওয়া যায় তাই ভাল। শুভক্ষণ চলে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের লাভ ঠিকই হবে। কিন্তু আবার এই জিনিসটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ যদি বিপরীতমুখী হয় তা'হলে ব্যষ্টির হাতে উৎপাদনের লাগাম থাকলে গোষ্ঠীর ক্ষতি হয়। দেশের অগ্রণী ব্যবসায়ীদের তাই আজ জনসাধারণের স্থায়ী মঙ্গল দেখার সময় নেই।

মুখে অবশ্য ভাল কথা এরা বলেই চলেছে। বলছে, 'দেখ কেমন নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে। নতুন শিল্প দেশে হোক—চেয়েছিলে না? এই দেখ নতুন শিল্প আমরা গড়ে তুলছি। আর চাকরী, এইবার তোমরা আরও চাকরী পাবে।

দেশের জীবনযাত্রার ত উন্নতি হবেই।' সব ভাল কথা।. উন্নতিও হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন গতি নিয়ে। ইংরেজরা ত আমাদের বলে যে দেড়শ' বছর শাসনের ফলেই ত দেশে রেলগাড়ী হ'ল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন হ'ল, আরও কত কারখানা হ'ল। আমরা ত নতুন সভ্যতায় এসে পড়েছি। আমরা উত্তরে বলি, সব সত্যি কিন্তু জগতটাই এত জোরে এগিয়ে চলেছে যে যদি আমরা পরাধীন না থাকতাম তা' হলে বর্ত্তমান অবস্থাকে অনেক অনেক আগে ছাড়িয়ে যেতাম। দেশী অগ্রণী ব্যবসায়ীদের ভাল কথাও এই রূপ গ্রহণ করেছে। আমরা যখন দ্রুত উন্নতি চাই তখন ওরা পথে বাধা হয়ে সামান্য এগিয়ে বলছে, 'দেখলে কেমন চলছি। চাকরী? বনিয়াদী শিল্পের গোড়াপত্তনের উদ্যোগ একবার ভালভাবে আরম্ভ হলে এর দশগুণ চাকরী হবে।'

দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতির পথে তাই অনেক বাধা। এই বাধা না সরালে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা হবে শুধু কল্পনা। নেতারা বলছেন স্বাধীনতাতে পৌঁছাতে নাকি আর মাত্র তিন পা এগোতে হবে। সে স্বাধীনতার রূপ কি তা' জানিনা। কিন্তু যে স্বাধীনতার আওতায় দ্রুত শিল্পোন্নতির গোড়াপত্তন হবে, সাধারণ লোক ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচার মতন বাঁচতে পারবে—সে স্বাধীনতায় পৌঁছাতে যদি আর তিন পা বাকি থাকে তবে এরই ভেতর তিনটি উঁচু দেয়াল আছে। এক নম্বর, বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর স্বার্থ। দু'নম্বর, দেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর স্বার্থ, আর তিন নম্বর, সাধারণ সদিচ্ছাপূর্ণ অসংখ্য লোকের বাস্তব জগত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা।

রঞ্জন চৌধুরী

ছত্তিশগড়ী গান

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন ?

হিরণ-পাত্রে রুপালি ঢাক্‌না পাতা
এই আসা এই যাওয়া
তবুও তোমার যাওয়া-আসার পথেই
অন্তত এক-আধটা স্বপ্ন দিও।

একটা কুকুর ডাকল কোথায় গাঁয়ে
স্বপ্নে ছিলাম ভেঙে গেল ঘুম—
কিছু নেই কেউ নেই।

তোমার হু'চোখ ওড়ে ছুটি প্রজাপতি
প্রেয়সী তোমার মাথায় কোঁকড়া চুল
হে প্রেয়সী তুমি সুন্দর সুন্দর
চাটুতে যে রুটি পুড়ে গেল হায় হায়
ক্ষুধায় কাতর সাঁঝের পাতের সাথী
তোমার হু'চোখ ওড়ে ছুটি প্রজাপতি
হে প্রেয়সী সুন্দর।

যেন বা বাতাসে
পিয়াল গাছের শাখা
ও তনু শরীর
আমার বাতাসে দোলে।

পুবে মেঘ জমে
দক্ষিণে বারি ঝরে
তোমার সদ্য যৌবন ওগো প্রিয়া
অগ্নিবৃষ্টি করে।

আমার শূন্য হিয়ার অন্ধকারে
সে আনে আঁচল-আড়ালে প্রদীপখানি
তাইতো আমার গৃহটি আলোয় আলো।

(লেজারে লেজা লেজা লেজা রে)
হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই
চন্দ্রনিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

ও রূপসী মেয়ে
ফুল ফোটে রাতারাতি
আমরাই যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

চাঁদ উঠে আসে
অনেক তারার ভিড়ে
যদি না চাও আমায়
যা খুশি তোমার কোরো
আমি তো যাব না যাব নাকো আমি দূরে
তোমাকে যে মন চায়।

দুদিনের চাঁদ
বাড়িতে সবাই খেলায় রয়েছে রত
হে প্রিয় তোমায় স্বপ্নেও পাই নি যে
আর মাঝরাতে জেগে উঠে খুঁজে দেখি
তখনও তো তুমি নেই!

কি করে যে হব পাহাড়ের সার পাব?
তুমি বিনা সিধা মাঠ সে'ও পর্বত
তুমি বিনা যে গো ভরানদী আকালেব
শুকনো ডাঙার ছিরি
তুমি বিনা শ্যাম ফুলন্ত গাছ
কালো পোড়া কাঠ যেন অরণ্যদাহে।

তোমার খেয়াল, তোমার যা কিছু রুচি
তাই নিয়ে থাকো তুমি
নীতিপরায়ণ না'ও যদি হও তবু

যতোদিন মধুমাখা ও জিহ্বা আর
খাওয়া-দাওয়া ঠিক তদ্বির করো, থাকো।

"নদীতে", বল্লে তুমি
গেলে তো কিন্তু পুকুরেই নাইতে
মিথ্যুক গোস্তীন্
আমাকে ঠকালে আবার!

টাকা টাকা ধুতি
আটআনার জুতাজোড়া
চার-আনার টুপি
আর ছ-আনার তেল
সব গাঁয়ে দিয়ে শোনো বলি ওগো ছেলে
পালাও আমাকে নিয়ে।

দারোগা সাহেব
এ কী সুখবর বদ্‌লি হলেন
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিন্‌ত কাপড়?

বিষ্ণু দে

ডক্টর ভেরিয়র এল্‌উইনের Folksongs of Chhattisgarh (Oxford University Press) থেকে।

ভূস্বর্গ চঞ্চল

'শিকারা'য় বসে
দাল হ্রদে শুধু তুমি আর আমি।
দূর পাহাড়ের শীর্ষ চুমি
লক্ষ তারার চুমকি বসানো
সন্ধ্যা বধূর নীলাম্বরী
সহসা কাঁপিয়ে এক ঝাঁক হাঁস দূর বনে গেল উড়ি,
ঊর্ণনাভ কি আমাকে এমন বুনেছিল ধীরে ধীরে,
কী স্বপ্নজাল তোমাকেই ঘিরে
মনে কি গো পড়ে পাহাড়ী মেয়ে, মনে কি পড়ে ?

দাঁড় টানি আমি ঢেউ ভেঙে যায়
ঢেউ-তোলা ওই দেহ-সীমানায়।
ঢেউ খেলে শত নীল পদ্ম
তোমার আমার প্রাণসম
তোমার নিবিড় চোখের তারাব মতো ;
কতোবার কালো বেণী ছুটি গেলো
শত চাঁদ ভাঙা বাঁকা কালোজল চুমি,
পদ্ম বনের হংসমিথুন আমি ও তুমি।
কতযুগ ছিল সঞ্চিত সেই সন্ধ্যার অন্তরে,
নন্দন শ্রীনগরে
মনে কি পড়ে কাশ্মিরী মেয়ে, মনে কি পড়ে ?

ডোগ্‌রার ঐ স্বর্গের ভিৎ ছিলো ত' বুঝি
ক্ষুধিত পাষাণে বাঁধা
বিদেশিনী তুমি বলোনি আমারে তা'।
তাই তো অবাক মানি,
দাল হ্রদে যতো নীল পদ্মরা লাল হয়ে গেছে শুনি।

পাথর গলানো আগ্নেয়গিরি-লাভা
চির তুষারের বক্ষে ধরালো চিড়।

দেবদারু বন বুক দুরু দুরু
শালবন অস্থির
ঘূর্ণি ঝড়ের বেগে ;
নাঙা পর্বত নত মস্তক
উন্নতশির জনতার পদক্ষেপে।
রাজপ্রাসাদের সোনালী কিরীট
আজ বুঝি টলমল ;
ভূস্বর্গ চঞ্চল।

হাজার শিকারা গান গেয়ে যায়
মশাল দু'হাতে জ্বলে
দালহ্রদে আজ স্বর্ণ-গোধূলী
নেমে এলো বুঝি মেয়ে।
আবির গুলাল লাল জলে তার
একবার নিও নেয়ে।
আমাকে ভুলো না
আজ আমি হব অগ্নি-খেলার সাথী।
দূর হতে তাই মেলে আছি হাত
আমারে পাঠিও স্মৃতি-সওগাত—
নীল কমলের লীলা আর নয়
নব অনুরাগে ভরা
আমাকে পাঠিও রক্ত-রঙীন লাল পদ্মের তোড়া।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

যৌবনের গান

যৌবনের গান আমার যৌবনের গান—
কোথায় প্রাণ, প্রাণ কোথায়, জীবন কতদূর,
ধাঁ ধাঁ মাঠের বুক কাঁপায় ফাঁকা হাওয়ার ডাক,
হৃদয় মেঘে জল যে নেই এক ফোঁটাও,
অশ্রু তাও শুকনো আজ,
মন-মরাই দিন গোণে শূন্যতায়
কোথায় প্রাণ, প্রাণ কোথায়, প্রাণ কোথায়।

ভেবেছি এই বাঙ্গলাদেশের মাটির ভালবাসার টান
মেলাবে দেশ,
ভাবীকালের মাঠে মাঠে ফসল বোনার সময় যখন
তখন শুধু অগুণতি হাত নতুন প্রাণের ভরসাতে
মেলাবে দেশ,
চেনা-জানার মহলে তাই লোকালয়ের কানার কোণায়
কলকাতার আশেপাশে পথেঘাটে মোড়েমাথায়
প্রশ্ন জানায় মরা মানুষ, এই কি দেশ—
হাজার হাতের লাঙ্গল লগির গলাগলির গানে মুখর
এই কি দেশ!

এখন বোধহয় রাত দুটো, সময় ভয়ে ক্ষীণ,
কিসের ভয় কাদের ভয় কেমন যেন লাগে,
মরা চাঁদের মিটি মিটি মরা কলকাতায়,
ছেলে বুড়ো সকলে রাত জাগে।
ওরা কি কেউ বোনেনি বীজ তোলেনি ধান গাঁয়ে গাঁয়ে,
ময়দানে মেলেনি কেউ,
সারা দেশের ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে যাবার নিশানাতে
বাঁধেনি বুক;
মায়ার পাহাড় সামনে পথ আগ্‌লে, শুধু আঁধির পর আঁধি,
ধাঁধার পথ ভুলে গিয়ে ওরাই কি আজ ঘরের কড়া নাড়বে?

একী হৃদয় ভাঙানিয়া রে হৃদয় ভাঙানিয়া,
মনের আকাশ কাঁপে ঝড়ে, ছিঁড়ে পড়ে সুখের ভরা পাল,
এল যারা সাতসমুদ্র তেরনদীর পার হতে
লুটেপুটে নিয়ে যেতে
মরণ তাদের হাতেহাতে, জীয়নকাঠি কোথায় নিরুদ্দেশ ;
পাড়ায় পাড়ায় বলাবলি বিদেশ থেকে কুটুম এল :
ঘি-চন্দন ফোঁটা দিও, পিঁড়ি পেতে বসতে দিও,
আরামে ঘর বাঁধতে দিও সবার শেষমেশ।
মনে ভাবি, এদেশে কি ওঠেনি গান বলেনি কেউ বড় কথা,
মানবতার ইতিহাসে এরা কি সব বোবাকালা,
মানুষের এই ক্ষ্যাপামি কি সবচেয়ে বড় পুঁজি
আর সবি দেউলিয়া !

যৌবনের গান আমাব, ব্যথা বিপুল গান আমাব—
কেন খাঁ খাঁ করে এমন প্রাণ আমার,
মাঠ-পাগল হাওয়া কানে তোলে না শীষ, ভোলে না মন,
কেন এমন কেন এমন
যৌবনের গান আমার প্রতিবাদেব প্রতিরোধের
কেন এমন কেন এমন।

অনেক ক্ষয় ক্ষতির পরও দেশের প্রাণ আছে,
বাংলার এই মাটি জলে ফুলে ফলে মাঠের সাবে সারে,
হাজার ছেলের মনে মনে দেশের প্রাণ আছে,
সে-দেশ গড়ে তোলার ভার নেবার অভিযানে
যমকে গান গেয়ে চলার সময় এসে গেছে।
উঁচুতলার অধিবাসীর হাঁকাহাঁকির আগুনে খাক্ আকাশ,
ভালবাসার নদীর জলে বাঁধের বুক ভাসে ;
মিলে যাবার ডাকে সবাই নিচতলার ভিড়ে
অনেক ভুলভাঙার পর দেশের প্রাণ গড়ে।

অসীম রায়

বেকার

স্টিফেন স্পেণ্ডার

নির্বাক জনতাকে ভেদ করে চলি ;
সিগারেটের নির্বোধ ধোঁয়ায় নিজেদের আচ্ছন্ন করে
ওরা দাঁড়িয়ে থাকে, দিন কাটে পথ-পরিক্রমায়।
আমার মনে হয়, সূর্য বুঝি নিভে এলো দিগন্তের গায়।

পথের আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-গুজব করে,
বন্ধুদেব অভ্যর্থনা করে ঈষৎ স্কন্ধ উত্তোলনে—
তারপর টেনে বার করে পকেটের শূন্য জগৎ;
টেনে বার কবে দারিদ্র্যের কঠোর ইঙ্গিত।
ওরা এখন কর্মহীন, বিত্তশালী ধনিকের মত ওদের দিন-যাপনা,
যেন ডেক্‌সোর সমুখে নিয়মিত বসা এবং মাইনে গোনা।
রাতের দীর্ঘ প্রহরগুলি ওরা এখন ঘুমিয়ে কাটায়,
ঘুম ভাঙে বেলা দশটায়, তারপর বসে বসে সময়ের নিঃসরণ দেখা।
প্রহরগুলির ক্রন্দনাবেগ দেখে হিংসা হতে থাকে আমার,
কী ভীষণ ক্ষুধা নিয়েই না ওরা তাকায়!
ওদের মূর্তিগুলি বারংবার ভেসে ওঠে আমার মনের তলে,
বারংবার অনুভব করি ওদের শূন্যতাকে।

অনুবাদ : মৃগাঙ্ক রায়

প্রাকার

কুলু ও কোণে দাঁড়িয়ে এন্তার হাসছিল : কথা বলছিল চারপাশে যারা ছিল সবার সঙ্গেই অফুরন্ত। তবু খুঁজছিল সে কাউকে নিশ্চয়ই ; নইলে অমন অনায়াসে চতুর্দিকে তরতর করে ঘুরে বেড়ান অসম্ভব। অন্তত কোনো জায়গায় আটকে যেত সে মনোমত কথাবার্তা আর সঙ্গী পেয়ে, আড্ডায়-আলাপে ঘন হয়ে যেত কোনো একটা জটলায়।

—আরে, কুলু যে! কে একজন ডাকে।

তরতর করে চলে যাচ্ছিল কুলু, ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ায, বলে—বাঃ, তুমি কবে ফিরলে কলকাতায়?

—এই সবে, কিন্তু তুমি তো রীতিমত বড় হয়ে উঠেছ, আমার চিনতেই কষ্ট হয়েছিল।

—তাই নাকি? ভীষণ অন্যায় কিন্তু; পাঁচ বছর পর বোধহয় আমায় দেখছো, তা তুমি কি ভেবেছিলে এ ক'বছরে তুমিই কেবল বুড়ো হবে আর আমি বড়ো হব না?

—আমি বুড়ো হয়ে গেছি? দুলুদা হাসতে হাসতে কুলুর দিকে অনিমেষ চেয়ে থাকেন।

—সেরেছে রে, তুমি আবার কথাটায় গুরুত্ব দিলে, আমি নেহাৎ ঠাট্টা করে বলেছিলাম। কুলুও সমানে হাসে, চোখমুখ উজ্জ্বলতায় তার কী স্বচ্ছ লাগে!

দুলুদা কয়েক নিমেষ শুধু চেয়ে থাকেন, শুধু দেখেন, তারপর বলেন—তোমরা বুড়ো বল্লে এমন ভয় হয় কী বলব!

—যাঃ, তুমি না এতো বড় চাকুরে!

—হলেও, মনে হয় এবার আর আমার অন্য উপায় নেই, বুড়োদের সঙ্গে মেশা ছাড়া।

—বুড়োদের সঙ্গে তো আমিও মিশি।

—সে তো ইচ্ছে করে, ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গেও তেমনি অনায়াসে মিশে যাও। কিন্তু বুড়ো হয়ে গেলে তো আর তা সম্ভব নয়।

—ভেবো না, বুড়ো হয়ে গেলে আপনা থেকেই ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গ ভালো লাগবে না।

দুলুদা এখুনি কিছু বললেন না, তিনি লক্ষ করলেন কুলু কেমন যেন অন্যমনা হয়ে উঠেছে, বেশ স্পষ্টই কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না এসব আলাপে-আলোচনায়। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে যেন অনেকটা অস্থিরতা জোর করে ঢেকে রেখেছে : যেন ক্রমশ বিরসতা নামছে ওর শরীর আর মন ছেয়ে। চোখ দুটো ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে নীরস মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে।

—তুমি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছো? দুলুদা অন্যমনস্ক কুলুকে অবশেষে প্রশ্ন করেন।

—এ্যাঁ আমি?—কুলু হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে, বলে—না, তা কেন।

—তবে তোমার ভালোলাগছে না।

—না তাও না; ঐ দিকে অনেক জানা লোক দেখ্‌ছি· তাই।

—দেখা করবে? অগত্যা বলেন ছলুদা।

—হ্যাঁ, তুমি ঘোরো, আমি একটু আসছি।

কুলু চলতে থাকে আর ছলুদা দেখতে থাকেন নির্ভীক পায়ে পায়ে ঐ ভীড়ের মধ্যে দিয়ে কী অদ্ভুত সর্পিলভাবে ও চলে যাচ্ছে। কী ভয়ানক চুল হয়েছে মেয়েটার, আর কতো সহজ করে একটা বেণী করে বেঁধে নিয়েছে। কিছুক্ষণ ওকে দেখতে পাওয়ার পর আর দেখতে পান না ছলুদা।

আর কুলু একেবারে অন্যদিকে চলে এসে আবার চারিদিক দেখতে থাকে তন্ন তন্ন করে। চঞ্চলভাবে অজস্র স্রোতের ওপর দিয়ে ওর চোখ ভেসে বেড়ায় কোথাও বেধে না গিয়ে। এ পাশে কাছাকাছিই ক'জন পরিচিতকে দেখে সে তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে চলে আসে। আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে পড়ে' কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে।

ঐ না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প করছে? তাই তো মনে হয়, তেমনি চুল, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, কথা বলা। খুব লোক যা হোক্! তুমি হয়রান হয়ে মর তাতে ওর কী! বেশ, ও ওখানেই গল্প করুক।

হঠাৎ অন্যদিকে ফিরে কুলু চলতে থাকে, কিছুদূর অনায়াসে চলেও আসে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বহুদূরের ভীড় থেকে লক্ষ্য করে মানিক তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালো না লাগলেও কথা বলে চলেছে।

যা লোক, ও নিশ্চয়ই সুবিধে পেলেই কখন কোন তক্কে সরে পড়বে, হঠাৎ কুলুর মনে হয়। বড় বাড়ি কি বিয়ে বাড়ির ভীড় দেখলেই যা জবুথবু হয়ে পড়ে, এমন ভরসা কি যে তবু কুলুকে ও খুঁজবে? তাছাড়া ও কি জানে কুলুও এখানে আসতে পারে, কুলুরও আসা সম্ভব?

এবার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুলু অন্য রকম ভাবতে থাকে: ও আর কি করে জানবে, এসেছে তো নিশ্চয়ই মা-কে সঙ্গে আনতে হয়েছে তাই, নইলে যা লোক—আসত কখনো। আর ভাবতে ভাবতে কুলু ফিরে না গিয়ে ক্রমে এগিয়ে আসে। আর শেষে মানিককে একলা দেখে পাশে এসে দাঁড়ায়।

—কী; তুমি এসেছো! এতক্ষণ পর মানিক যেন প্রাণ পায়।

—তুমি কখন এলে?

—আমি নয়, আমরা।

—হ্যাঁ তাই, তোমরা।

—আমরা বলতে কে-কে জানো, আমি আর মা।

এবার কুলু হেসে ফেলে, বলে—তা জানি।

মানিকও হাসতে থাকে কুলুর পানে চেয়ে চেয়ে, বলে—যা গম্ভীর মুখে এলে তুমি, এতো সহজে আসবে ভাবিনি।

—সেই রকম শপথও করেছিলাম, রাখতে পারলাম না।

—কেন, হঠাৎ?

—হঠাৎ ?

—নয় ?

—তুমি কতোদিন আসনি আমাদের ওখানে ?

—ভীষণ কাজ পড়েছে আপিসে, বিশ্বাস করো। আন্তরিক আবেদন জানায় মানিক। বিশ্বাস কুলু করে, মানিকের কথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই, তাছাড়া অবিশ্বাস করতে কুলু পারেও না।

—তোমাদের এঁরা কেউ হন নাকি ? অবশেষে মানিক বলে।

—না, তোমাদের ?

—আমাদেরও।

—আমাদেরও কি ?

—আমাদেরও না।

কিছুক্ষণ কুলু নির্নিমেষ চেয়ে দেখে মানিককে, তারপর বলে—তুমি একটু রোগা হয়েছ।

—আশ্চর্য কি, ভাবতে ভাবতে সারা হলাম, তুমিও তো একবার যেতে পারতে।

—ইস, উনি ভেবে ভেবে সারা! কী ভাববে শুনি ? কী ভাববার আছে ?

—খুব বোকা পেয়েছ আমায়, সব বলে রাখি !

—পেজোমী করো না, বলো। কুলু নাছোড়বান্দা।

—বলব, তোমার ঘরে গিয়ে বলব'খন।

—যাবে ? কবে যাচ্ছ বল ? কুলুর মানিকের একটা হাত ধরতে এমন ইচ্ছে করে, নেহাৎ এতো লোকজন তাই চেপে চুপে থাকে কোনো ক্রমে।

—শিগ্‌গিরই একদিন। মানিক বলে।

—কবে বল, শিগ্‌গির-ফিগ্‌গির শুনবো না।

—কি করে বলি ?—আবার সেই অসহায়ভাব ফোটে মানিকের মুখময়, বলে—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি প্রায়ই খেটেখুটে, সেদিন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ইতিমধ্যে যে দিন একটু তাড়াতাড়ি পালাতে পারব সে দিন যাব।

—ঠিক ?

একটা আস্ত বজ্জাতের মত মুখের ভাব হয়ে ওঠে মানিকের, ঘাড় নেড়ে জানায় ঠিক, তারপর বলে খুব আস্তে, তোমায় তো ভুলি না কখনো।

ভোলে না সে বাস্তবিকই, মনে যে তার থাকে তা বৃহস্পতিবার কুলু মনে প্রাণে মেনে নেয়। মেনে সে নিয়েছিল অবশ্য বহুদিন আগেই, তবু বারবার এমনভাবে অনুভব করতে এতো আনন্দ হয়! সে দিন মানিক হাজির হল কুলুর কাছে আর কি। কুলু তখন ফুলুদার দেওয়া একরাশ ফুল সামলাচ্ছিল ঘরে। পিছনে শব্দ পেয়ে ফিরে দেখল মানিককে আর তার ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল হাসিতে। কী কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল চোখ দুটো গভীর ভাবে।

—ইস্! একটা কেবল উক্তি হল তার মুখ থেকে।

—ইস্ কিসের? মানিক বলে।

দ্রুত পায়ে কাছে আসে কুলু, তারপর বিছানাটা দেখিয়ে বলে—বস, বলছি পরে।

—নাও: বল। বলে মানিক বসে পড়ে।

—জানিনে কেন যে 'ইস্' করলাম—কুলুর সমস্ত মুখ মিষ্টি হয়ে উঠল, বলল—অবশেষে তুমি এলে বলে, না তোমার এই চেহারা দেখে, বুঝতে পারছি না।

—কেন, চেহারা কেমন দেখলে?

কুলু কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাশে এসে বসে, বলে—তুমি শোবে?

—না, আমায় কিছু খেতে দাও।

—দিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ শুয়ে থাকো।

কুলু উঠে এসে স্টোভ ধরায় আর চায়ের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে। মানিক শুয়ে শুয়ে দেখে তার নড়া-চড়া চলা ফেরা: তার অভ্যস্ত হাতের নির্ভুল কাজের শ্রী। কী ক্ষিপ্র, দক্ষ হাতে ও সব নামালো গোছালো সাজালো ঝটপট। প্লেট সাজালো, কাপ বসালো, চিনি দিল, দুধ ছাঁকলো, জল চড়ালো। স্টোভে পাম্প দিলো কেমন হাতের শিরগুলো ফুলিয়ে ফুলিয়ে। মানিকের অদ্ভুত লাগে ওকে দেখতে দেখতে। কত অজস্র প্রীতি, প্রেম, যত্ন সামান্য টুকিটাকি গোছগাছ করে ব্যবস্থা করায়, কতোটা অক্লেশ নিবেদন।

—কী দেখ্‌ছো অমন করে? স্টোভে পাম্প করতে করতে বলে কুলু।

—তোমার কাজ করা।

—তাতে দেখার কি আছে?

—কিছুই নয় হয় তো, তবু ভালো লাগছে তাই দেখ্‌ছি।

তারপর আরো হাল্কা হয়ে আসে কুলুর পরিপাটি করে পরিবেশন করা, গরম কেট্‌লিতে চা দিয়ে অপেক্ষা করা, গেলাসে জল গড়িয়ে আনা।

সব হলে পর শেষে সে টেনে নিয়ে আসে একটা টেবিল ও-পাশের চেয়ারটার সামনে, তারপর পাশে প্লেট আর কাপটা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—এবার উঠে এসো।

উঠে এসে মানিক খেতে বসলে সে মাথার কাছে চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার রুক্ষ চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলে—কী খাটুনিই খাটায় তোমায় আপিসে।

—শুধু আমায় নয়, আমাদের। নিম্‌কিতে কামড় দিয়ে বলে মানিক।

—অদ্ভুত, কোনো রকম বিচার বিবেচনা নেই এদের।

এবার হেসে ফেলে মানিক আর তার মুখ থেকে কয়েকটা হাল্কা নিম্‌কির স্ফুলিঙ্গ উর্দ্ধে বেরিয়ে আসে।

—হাসলে যে?

—হাসিয়ে দিলে তুমি, আমি কি করব।

—আমি হাসালাম?

—হাসালে না? এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বল কোন আমলে বাস করছ মনে না রেখে।

—তার মানে?

—মানে হাল আমলের প্রধান কথা প্রাণপণ শোষণ, সেটাকে তুমি বিচার বিবেচনা দয়া-মায়া দিয়ে কমাতে বলছ।

কিছুক্ষণ কুলু নীরব থাকে, কেবল মানিকের চুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে ধীরে ধীরে। শক্ত, রুক্ষ রাশখানেক চুল, কী সুন্দর লাগে যে কুলুর! এখন চুলটা বেড়ে গেছে, এবার কাটা দরকার; তবু ওদের প্রথম চুল কাটলে কেমন কেমন লাগে যেন। তার চেয়ে এই ঢের ভালো, ঠিক এমনিটি যদি থাকে, আর না বাড়ে।

—আর কটা নিম্‌কি দোব? অনেকক্ষণ পর বলে কুলু।

—থাকে তো দাও।

কটা নিম্‌কি দিয়ে এবার কুলু মোড়া নিয়ে সামনে এসে বসে কেট্‌লি থেকে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে চিনি দিয়ে গুলোতে থাকে আস্তে আস্তে। আর এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে মানিকের মুখের পানে, পরে বলে—এ সময় ভীষণ খিদে পায়, না?

মানিকের এতো ভালো লাগে, কুলুর সেই সপ্রেম দৃষ্টি, প্রীতিমাখা প্রশ্ন, সে খেতে খেতেই বলে—তা পায়।

একটু থেমে আবার সেই-ই কথা বলে—তুমি চা নাও না।

—না, আমি খেয়েছি, আর বেশি খেতে আমার ভালো লাগে না।

আবার দুজনে চুপ করে যায়, আর অনেকক্ষণ ধরে কথাটা পাড়ব কি পাড়ব না—মনে মনে ভেবে ভেবে মানিক ঠিক করে ফেলে বলবে বলে। বলব বলব করে আর না বলার কোন মানে হয়না। তাছাড়া, কতো কাল কেবল প্রাণ ভরে রাখবে অদম্য আকুতি, শুধু সপ্রেম স্মৃতি হাসি গান? এবার জীবনে জীবনে এক হয়ে যাক।

—আমি একটা কথা ভাব্‌ছি। বলে মানিক চা-এ চুমুক দিতে দিতে।

—কী? কুলু চোখ তুলে চায়।

—ভাবছি, তোমার মাকে জানাব তোমার মত থাকলে।

—মা-র জান্‌তে বাকী নেই। চোখ নামিয়ে টেবিল ক্লথ খুঁটতে খুঁটতে বলে কুলু।

—তুমি কিছু বলেছ?

—হ্যাঁ, এবার সোজাসুজি মানিকের চোখের মধ্যে চায় কুলু, বলে—বলতে হল আমার, তাঁরা অন্য রকম আশা করছিলেন তাই।

মানিক কোনো কথা না বলে নীরবে চেয়ে থাকে আরো শোনার জন্যে, একটা হাত দিয়ে কেবল কুলুর টেবিলে রাখা হাতটার চুড়ী দুটো ঘাঁটতে ঘাঁটতে।

—সম্প্রতি এক মস্ত চাকুরে আমায় বিয়ে করতে চান, আমাদের ছোটোবেলা থেকে চেনা—কুলু কথার মাঝখানে একটু থামে আর নিজের হাতের মধ্যে ধরে নেয় মানিকের ঘুরে বেড়ান হাতটা, খুব ধীরে ধীরে শান্তস্বরে বলে—মা-রাও খুশি হয়েছিলেন আর আমায় বলেছিলেন, কাজেই আমায়ও বলতে হয়েছিল যা বলার।

—কি বলেছিলে?

—বলেছিলাম, আমার বিয়ে ঠিক হযে গেছে, আর বাকীটা মা-রা বুঝে নিয়েছিলেন।

তারপর হঠাৎ দু'জনেই হারিয়ে ফেলে সব কথা, এমন অকস্মাৎ হারিয়ে ফেলে যে,

দুজনেই সলজ্জভাবে আপ্রাণ হাতড়ায় কিছু একটা বলার জন্য, কথার রেশটা টেনে নিয়ে যেতে পারে যাতে করে, যাতে করে কোনো রকমে টালবাহানা করা চলে। সে কি নিরর্থক পরিশ্রম! টিপ্‌টিপ্ ঘাম জমে যায় কুলুর কপালে, কান দুটো লাল হয়ে ওঠে।

এমন সময় পায়ের শব্দ এলো, কেউ আসছে নিশ্চয়ই। কুলুই কথা কয়, বলে—মা আসছেন বোধ হয়। প্রমীলা দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন ততোক্ষণ ঘরের মধ্যে। খুব ফর্সা ওঁর রং, উজ্জ্বল শ্বেত আর মসৃণ গায়ের চামড়া, আর কী শান্ত শ্রীময়ী তিনি! চোখ দুটিও অসম্ভব অতল আর ধীর। তিনি ঢুকলেন কেমন হাল্কা পায়ে, কেমন নম্রতা নিয়ে। একটি শাদা শাড়ি পরনে, তার কুচ্‌কুচে কালো পাড়, আর খুব ফিকে হলুদ রঙের একটা জামা। পা খালি। তিনি মেয়ের চেয়ে যে অনেক দেখতে ভালো ছিলেন তা বোঝা যায় অনায়াসে। ঘরে তিনি ঢোকার সঙ্গেই অনুভূত হয় একটি পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাব, শান্ত সম্প্রীতি।

মানিক খেতে খেতে উঠছিল তাঁকে দেখে, তিনিই বাধা দিলেন—আরে না-না ব্যস্ত হয়ো না—তারপর স্নিগ্ধভাবে হেসে যোগ দিলেন—তোমার কোনো রকম বাধা হলে কুলু আমার উপর চট্‌বে।

—নইলে তুমি বাধা দিতে? কুলু জিজ্ঞেস করল সলজ্জতা প্রাণপণে চেপে গিয়ে।

—না বোধ হয়—প্রমীলা দেবীর চোখ দুটি সুগভীর স্নেহে হাসতে লাগল মানিকের দিকে চেয়ে, আর তিনি বললেন—তাও পারতাম না।

মানিক অনুভব করল সমস্ত প্রাণ দিয়ে সেই স্নেহ, সেই অকৃত্রিম অক্ষমতা স্বীকার করা! আর এতো সহজ হয়ে এলো সমস্ত পরিবেশ যে সেও ভারমুক্ত হয়ে গেল। কোনো রকম ব্রীড়ার বাধা রইল না।

—তোমার আজকাল খুব কাজ পড়েছে বুঝি, তাই আসতে পার না? উনি কথা বললেন তেমনি প্রীত, ধীর স্বরে।

—হ্যাঁ, আমাদের আপিস শুদ্ধ সবার।

—অবশ্য তা তোমার শরীর দেখলেও বোঝা যায়—ওঁর হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, নরম হয়ে গেল চোখ দুটি, বললেন—আর তাই আমি বলেওছি কতোবার কুলুকে, মিছিমিছি ছাই-পাঁস ভাবা।

কেউ কিছু বলল না; কুলু তো একান্ত মন দিয়ে মার উলের বল পাকাচ্ছিল মুখ নীচু করে, কেবল তার গাল একটু একটু উষ্ণ হয়ে উঠছিল, একটু লাল-লাল।

—তবুও ভাবনা হয় বুঝি, আর হয় রাগ, লোকটার কিছু হয়নি তবু যখন আসে না তখন কী রাগটাই না হয়। ওঁর স্বচ্ছ চোখ দুটি হাসতে থাকে অনর্গল, কিছুক্ষণ সেই চোখ নিয়ে উনি চেয়ে থাকেন মানিকের মুখের দিকে, তারপর খোলা জানলা দিয়ে আকাশের পানে ফিরে থাকেন। তাঁকে মনে হতে লাগল আরো সৌম্য, আরো স্থির।

—আমি উঠি—উনি আস্তে আস্তে বলেন উঠতে উঠতে—আমার আবার দেদার কাজ পড়ে রয়েছে।

ঘর থেকে উনি চলে গেলেন, মানিকের খাওয়াও তখন শেষ হয়ে গেছে। কুলু উঠে দাঁড়াল মোড়া থেকে, বলল—উঠবে? জল দোব হাতে?

চল। মানিক উঠে কুলুব পিছন পিছন আসে সরু বারান্দায়। নীরবে মুখ ধুয়ে নীরবেই মুখ মুছল তোয়ালে দিয়ে মানিক, আর কুলুও কথাহারা হয়ে রইল। এমন একটা পরিবেশ তৈরী হয়ে ছেয়ে রয়েছে, সেখানে কোনো কথাই বোকামী ছাড়া যেন আর কিছু নয়।

তবু কথা বলেছিল ওরা পরে অনেকক্ষণ ধরে, অনেক দিন পর বহুক্ষণ কাটিয়ে দিল মানিক কুলুব কাছে কাছে। তারপর যখন সে যাবার জন্যে উঠল তখন সিঁড়ী পর্যন্ত তার সঙ্গে এগিয়ে এলো কুলু আর কিছুটা নেমে গেলে পিছন থেকে ডাকে—শিগ্‌গির আসবে তো?

ঘাড় নেড়ে আসবে জানায় মানিক।

কুলু আরো এক ধাপ নেমে এসে সিঁড়ীর রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মানিক নেমে যায় ক্রমে ক্রমে, তারপর যখন কুলু ঘরে ফিরে আসে তখন ইলেকট্রিকের আলোয় তার চোখ দুটো আরো মধুর মনে হয়।

কয়েকটা দিন কেটে যায়, কয়েকটা হপ্তা, পোষ মাসও যায় যায়। কুলু অধীর হয়ে যায় মনে মনে, মরমর হয়ে আসে প্রাণ। চাপা-চাপা দুশ্চিন্তায় আর বেদনায় সে অস্থির হয়ে ওঠে, আস্তে আস্তে যা বাইবের লোকেরও চোখে পড়তে থাকে।

প্রমীলাদেবীও ছাযার মত থেকে থেকে লক্ষ্য করেন সব কিছু। তিনি জানতে পেরেছেন কুলুর তা জানার বহু আগেই তাঁর চোখে পড়েছে আর মনে লেগেছে। মনে মনে তিনিও কম অস্থির হননি, হাঁপিয়ে ওঠেননি কম, তবু সামলে থেকে ছিলেন। শেষে এক দিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুব শান্ত স্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন—কোনোই খবর পাস্‌নি তুই?

কুলু পূর্ণ চোখ মেলে মার পূর্ণ স্বচ্ছ চোখের পানে চাইল, বলল—কৈ না! এতো আস্তে আস্তে বলল, যেন নিজেকেই বলছে।

—একটা খবর-টবর নিলে হয় তো। মা বললেন।

—না—কুলু এবার একটুখানি যেন হাসে, বলে—ভালো আছে এমনি; সে দিন একটা চিরকুট পেয়েছিলাম—ভয়ানক ব্যস্ত আছি, ভেবো না। কাজেই লোকজন পাঠিয়ে আর খোঁজ-টোজ করো না।—তারপর সে একটু থামে, মাব মুখের দিকে চায়, বলে—নইলে ভাববে আমাদের বেশি বেশি...সমস্ত কথাটা ওর শেষ হল না, মুখটা কেবল মিষ্টি হয়ে উঠল। প্রমীলা দেবী বুঝলেন, মানিক ভাববে আমাদের বেশি বেশি বাড়াবাড়ি, আর সেই কল্পনাতেই কুলু সুন্দর হয়ে উঠল।

তবু প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় কাটতে লাগল কী যন্ত্রণা-জাঁতা-পেষা মুহূর্তগুলো! শরীর মনের সমস্ত অনুভূতিগুলো উগ্র হয়ে থাকল দিবারাত্র।

প্রমীলা দেবী লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন কুলুকে, সে অতি শান্ত, অতি নম্র, চলায় ফেরায় কথায় সবেতেই অতি গভীর হয়ে গেছে।

এমন সময় একদিন এল মানিক। কুলু যে কত অজস্র কিছু বলবে বলে ঠিক করেছিল তাকে দেখে সবই বলার বদলে না বলাই রয়ে গেল। থম্‌কে গেল ওকে দেখে কুলু: প্রথমে কি তুমুলভাবে টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল বুকের মধ্যে কিছুক্ষণ, কথা

বলার শক্তি আর হাত-পা সবই যেন অবশ হয়ে এলো। কেবল তার পা-দুটো কেমন ভীষণ ভাবে দুর্বল হয়ে গেল আর হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল।

অবশেষে মানিকের পাশে অত্যন্ত কাছে এসে কুলু বসে। ওর কিছু একটা হয়েছে মনে হয় কুলুব, প্রমীলা দেবীরও। কিন্তু কী হয়েছে? কী হতে পারে? আবেগে অস্থির হয়ে ওঠে কুলুব মন প্রশ্নে প্রশ্নে।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মানিক কথা বলে। প্রমীলা দেবীর দিকে চেয়ে মাথাটা চেয়ারের পেছনে সম্পূর্ণ হেলিয়ে বিশীর্ণ একটুখানি হেসে বলে—জানেন, আমার চাকরীটা গেছে। একটানা একটা শান্ত কান্নার মত শোনাল কথাগুলো।

প্রমীলা দেবীর বুক মুচড়ে ওঠে সে স্বরে, তিনি কি বলার জন্যে ঠোঁট নাড়েন অসমর্থের মত। কুলুব কেবল মুখটা মলিন হয়ে ওঠে অসম্ভব রকম।

—ওটা পার্মানেণ্ট হবে ভেবেছিলাম, তা আমারটা হল না, হল বড় কর্তার নিজের লোকের। কড়ির দিকে চেয়ে টেনে টেনে বলে মানিক ভীষণ ভার-ভার গলায়।

অনেকক্ষণ ঘরময় ভরে রইল একটা মর্মান্তিক আর্ত্ততার রেশ! প্রাণ ফুরিয়ে আসা শেষ নিশ্বাসের মত।

কুলুব ফ্যাকাশে মৃত মুখটায় অল্পে অল্পে রক্ত ফিরে আসতে লাগল, সাদা ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে গোলাপী হয়ে এলো, তারপর সে তার বড় বড় কালো চোখ দুটো মানিকের চোখের দিকে নিবদ্ধ রেখে বলল—এবার তুমি অন্য কাজের চেষ্টা কর, আর আমিও।

আশীষ বর্মণ

রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়

(১৯৩৮—১৯৪১)

কাব্য সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পর্কে সাম্প্রতিক তুফানের মধ্যেও যে কয়েকটি অচঞ্চল সত্য টি´কে আছে তার একটি হচ্ছে এই যে, শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণধর্ম গতিশীলতা। অর্থাৎ নানা অনুভূতি ও সেই অনুভূতির যোগ্য প্রকাশের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ কবির জীবন-বোধ তথা কাব্য পরিণতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। গতিই প্রাণের প্রকাশ, তাই যে-কাব্যে প্রাণের স্পন্দন আছে তাতে গতিরও আভাস আছে। অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রেই প্রধান অভাব ঘটে এই বিকাশশীলতার (development)। তাঁদের কাব্য দু'একটি খুচরো অনুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশের পরেই স্তিমিত হয়ে আসে। যে অনুভূতিকে অবলম্বন করে এই উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তির প্রয়াস সচরাচর দেখা যায়। অথচ পুনরাবৃত্তিতে পূর্বতন ঔজ্জ্বল্য ধরা দেয় না। কারণ পূর্বে যা ছিল একটি বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ, পরে তা হয়ে দাঁড়ায় একটি প্রতিন্যাস (attitude) মাত্র। এই প্রতিন্যাসের আবদ্ধতারই কাব্যের মৃত্যু ঘটে কারণ অনুভূতির উপরেই কাব্যের নির্ভর। সত্য অনুভূতি (তার বিষয়কেন্দ্র যাই হোক্ না কেন) চিরকালই নূতন ও অনন্ত। তার পুনরাবৃত্তি নেই। শ্রেষ্ঠ কবির মন সংবেদনশীল, তার দৃষ্টি সমগ্র, জীবনের অর্থকে অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে তিনি সর্বদাই জীবনকে নূতন নূতন ভাবে আবিষ্কার করে চলেন। তাই তাঁর কাব্যে একটি নিরন্তর অতৃপ্তি আছে ও নিরন্তর এগিয়ে চলা আছে।

এই অতৃপ্তির তাগিদ কবি বোধ করেন কেন?

কাব্যের মারফৎ কবি প্রকাশ করেন তাঁর জীবনবোধকে, যা কেবল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকে আশ্রয় করেই নয়, আবার কেবল সমাজ ও বহির্জগৎকে নিয়েই নয়। এই দুই-এর ঘাত-সংঘাতের মধ্য থেকেই কাব্যিক অনুভূতির উৎপত্তি ও শেষ পর্যন্ত কাব্যের জন্ম। কবির অনুভূতিক্ষেত্র এই যে জীবন, সে নিরন্তর গতিশীল। চিন্তা, ধারণা ও ঘটনার বিন্যাস প্রতি মুহূর্তে সঞ্চরমান। যেহেতু কবিমন সাধারণের অপেক্ষা অধিক সংবেদনশীল সেহেতু এই সঞ্চরমান জীবনপটের—অন্তত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দৃশ্যমান—পরিবর্তনগুলির ছাপ কবিমনে সহজেই অঙ্কিত হয়। তাই যে-কবির অনুভূতির মূল জীবনের যত গভীরে, তাঁর পরিবর্তনের তাগিদ তত অধিক।

অবশ্য নানা জটিলতার মধ্য দিয়েই এই প্রক্রিয়ার গতি। সাধারণত একটি মৌলিক অনুভূতি প্রকাশের বহুতর চেষ্টার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পূর্বে অপর অনুভূতির প্রকাশের তাগিদ মনের কাছে তেমনভাবে পৌঁছয় না। অপরপক্ষে একটি মৌলিক অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রকাশে উপনীত হলে ক্রমশই (হয়ত এই সার্থক প্রকাশের অল্পকাল ব্যাপী অনুকৃতির পর) মনের ওপর তার দাবীটা হাল্কা হয়ে আসতে থাকে। তখন যদি নতুন অনুভূতি, নতুন জীবনবোধের দাবী না আসে, অর্থাৎ জীবনের সম্পর্কে কবির

সংবেদনশীলতার তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তবে পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর উপায় থাকে না। ক্রমশই সৃষ্টির বীর্য ক্ষীণ হয়ে আসে, কাব্যের ধারা নিস্তেজ যান্ত্রিকতার বালুচরে সমাপ্তি লাভ করে। (এই কারণেই বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক কবিতায় 'বন্দীর বন্দনা' যুগের ধার নেই, অমিয় চক্রবর্তীর নেই 'চেতন স্যাকরা'র জীবন্ত দৃষ্টি এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অবশেষে সমর সেনও কাব্যের প্রতি বিমুখ।)

"যুগের সঙ্গে তাল রাখা", "যুগের দাবী মেনে চলা" ইত্যাদি স্থানে অস্থানে ব্যবহৃত মামুলি বুলির বিকৃতির মধ্যে সত্য যেটুকু আছে সে হচ্ছে এই, যুগধর্মী হওয়া শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে যুগধর্মী বলে এককালে নাম কিনেও বহু সাহিত্য উত্তরকালের বিচারে খাটো হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা যুগধর্মী হবার অপরাধে নয়, যুগের সম্পূর্ণ বাহ্য ও অপেক্ষাকৃত অগভীর লক্ষণগুলিকে নিয়েই ব্যাপৃত থাকার ফলে। যুগের অন্তরের মূল কথাটিকে বৃহৎভাবে প্রকাশ করেছে এমন যুগধর্মী সাহিত্য উত্তরকালিক বিচারে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হয় না। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্যারাডক্স-ই হচ্ছে এই, যে তা যুগের গভীর মূলে যত প্রবেশ করে ততই যুগাতীত হয়ে ওঠে, কারণ তাতে যুগের বিশিষ্ট সত্য ও মানবতার চিরন্তন সত্যের প্রকাশ তত মিলিত ও একীভূত হয়ে কাব্যকে মহৎ বাস্তবতার পর্যায়ে উন্নীত করে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই অর্থে যুগধর্মী।

অগ্রগতির অভাবজনিত পুনরাবৃত্তির উদাহরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অপ্রচুর নয়। সমালোচকেরা তো বটেই, কবি স্বয়ং স্বকীয় আত্মসচেতনার গুণে একথা উপলব্ধি করেছিলেন। 'নিজের লেখা থেকে চুরি'—এই নামে তিনি একে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁর কাব্যের সম্পর্কে এই সাময়িক পুনরাবৃত্তি অপেক্ষা স্বাভাবিক সচলতাই অধিকতর ও উজ্জ্বলতর সত্য। ভানুসিংহের পদাবলী, ব্রাহ্মধর্ম-প্রাণ সংগীত, আধুনিক প্রেমের কবিতা, গদ্য কবিতার সৃষ্টি, সভ্যতার সঙ্কটবোধ, সোভিয়েটের প্রতি অভিনন্দন, ফ্যাশিজমের প্রতি ধিক্কার—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর মনের যে গতি, তাতে এই যুগ-চেতনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই চলিষ্ণু মনের সূত্র সূক্ষ্মভাবে আবিষ্কার করা চলে। কিন্তু বিগত দশকের কবিতায় যে নবপর্যায় তাতে এর পরিচয় আরও প্রত্যক্ষ। তাঁর চেতনার একটি নতুন ধারা ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে এখানে এসে একটি সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে। বাংলার তথা ভারতের তথা পৃথিবীরও বৃহত্তর অংশে যে যুগান্ত ও যুগারম্ভের অধ্যায় চলেছে তার নিগূঢ় পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যের বিবর্তনে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের যে কোনো সমগ্র আলোচনায় একথা বিচার্য যে রবীন্দ্রনাথের জীবিত-কালের মধ্যেই ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভারতীয় রেনেসাঁ আবার সেই সমাজেরই ভাঙন ও পৃথিবীব্যাপী নৈরাশ্যের ঢেউ, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াই, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সাম্যবাদ সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী একটি নতুন চেতনার সঞ্চার—এ সমস্তই ঘটেছে। তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছিল বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসাহিত জয়যাত্রার মধ্যে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, কংগ্রেস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অপ্রতিহত উন্নতি, বিশ্বজগতের দরবারে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, রাজনীতিকের সম্মানিত

অভ্যর্থনা—এ সমস্তের দ্বারা ভারতীয় মানস তখন উদ্দীপিত। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' ও 'প্রভাত উৎসবে' কেবল কবির ব্যক্তিগত জীবনের উন্মেষ নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের মহাজাগরণ রূপায়িত। 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদি কবিতায় এক অদম্য পিপাসা সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করে আপন করে নেবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় মূর্ত হয়েছে প্রেমের নিগূঢ় অভিব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক কবিতায়। স্বদেশী যুগের গান জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের চেতনায় অনুপ্রাণিত। মৃত্যু ও জীবনের চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে 'শ্যামসমান', 'মৃদুগতি-চরণ', 'অভিসারিক', 'ও গো মরণ, হে মোর মরণ' রূপ প্রণয়সম্ভাষণে সম্ভাষিত। নানা ঝঞ্ঝা দুর্বিপাকে প্রাণবন্ত আশা 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে' গানে ধ্বনিত হয়ে বিবাগী পাখায় ভর করে চলেছে।

এই উচ্চ শিখর হতে ভারতীয় মানসসূর্যের ক্রমিক অবনতির ছায়া গভীরভাবে পড়েছে রবীন্দ্র-কাব্যে। 'তপোভঙ্গে'র মহাদেব পানপাত্রের পূর্ণতা ঘুচিয়ে তপস্যায় কঠিনপণ। 'পলাতকা'র কবিতা সামাজিক কারুণ্যের চিত্রে সমৃদ্ধ। পূরবীতে 'ক্ষণিকা'য় আকাশের নীল যবনিকার অন্তরালে 'আনন্দের হারানো কণিকার' ব্যাকুল সন্ধান। 'পরিশেষে' কবি অতি বেদনায় ভগবানের প্রতি প্রশ্নবান নিক্ষেপ করেছেন, 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে।' 'রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যাবেলাগুলো সংসার থেকে চলে গেছে' 'শেষ সপ্তকে'। পঁচিশে বৈশাখ 'শেষ সপ্তকে' এসেছে 'এই দুর্গমে, এই বিরোধ সংক্ষোভের মধ্যে,...প্রৌঢ় প্রহরে'। 'মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ,' 'ভাঙা ঐশ্বর্যের' টুকরো 'পত্রপুটে' ছড়ানো।

এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্তে পাতা ভরানো সম্ভব, কিন্তু তাতে লাভ নেই। কারণ এ বিষয়ে পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। অন্যথায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি পরস্পর-বিযুক্ত পটভূমি-বিচ্যুত কথামালা মাত্র। বস্তুত এই ভাঙনের বোধ প্রতি কবিতার মধ্যে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু আকস্মিকতা সত্ত্বেও এগুলি অন্তশ্চেতনার একটি ধারাকে পরিস্ফুট করে তোলে। যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের বিস্তৃতির অনুগামী হয়ে বেকারত্বের প্রসার, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের মারকাট, রাজনৈতিক দলাদলির বিস্তৃতি, বন্যা, মহামারীর প্রকোপ, জমিদার প্রপীড়িত বাংলার কৃষিজীবনে ভাঙন ইত্যাদির সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত অবনতি যে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদপুষ্ট উঠ্‌তি ভারতের স্বপ্নময়তাকে আঘাত করবে তাতে আর আশ্চর্য কী। বুর্জোয়াবিপ্লবের উন্মাদনার যুগে যে ভারতে এতকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের নৈরাশ্যের মন্ত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বুর্জোয়াবিপ্লবের সাময়িক জয়জয়কারের শেষে সেই ভারতেরই নবীন পুরুষের মনে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় হতাশা গভীর রেখাপাত করতে সুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ে চেতনার দুটি দিকের মধ্যে তিনি মৃত্যুকেই দেখেছেন, বিশ্বসংকটবোধকে তেমন করে দেখেন নি। ক্রমে ধনতন্ত্র-জর্জরিত ইউরোপ ফ্যাশিবাদ-সাম্যবাদ সঙ্কটে শতধা বিভক্ত হতে থাকে, নব্য ধনতন্ত্রী ভারতবর্ষেও তার ঢেউ লাগে, পৃথিবীব্যাপী ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সকলেরই ভিত্তি টলমল করে ওঠে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে এই ভাঙন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কী বেদনার—চতুর্দিকে তাঁর প্রিয়তম আদর্শগুলির পরাজয়, ধ্বংসের ও গ্লানির বিস্তৃতি, জীবনের প্রারম্ভিক স্বপ্নগুলি ধূলিলুণ্ঠিত ও মলিন; উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের বিরাট ভবিষ্যতের আশা চূর্ণবিচূর্ণ।

এই পটভূমিকায় রচিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্পর্কিত কবিতাগুলিতেও একটি নতুন সুর লেগেছে। 'প্রান্তিক'-এর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবির দৃষ্টি শ্যামসমান মৃত্যুর দূরাগত বন্দনা ত্যাগ করে মৃত্যুকে রুদ্ররূপে উপলব্ধি করলো। মৃত্যুর এই নতুনতর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবির দৃষ্টিতে জীবনও নূতনতর রূপে প্রতিভাত হলো। প্রান্তিকোত্তর পর্যায়ে কবির আজীবন আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংঘর্ষবোধ স্পষ্ট, নগ্ন ও সচেতন। এই বিচারে দেখা যায় যে 'নবজাতক'-এ নয়, 'প্রান্তিক'-এই কবির নবপর্যায়ের প্রকৃত সূচনা। মৃত্যুর-সঙ্গে পরিচয়ে এই নবপর্যায়ের আরম্ভ ও সভ্যতার সংকটের বেদনায় এর বিস্তৃতি। নিদারুণ বিসর্পিকা রোগে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন তার অনতিকাল পরেই 'প্রান্তিক' রচিত হয়। কবিতার সংখ্যাক্রম ছাড়া একটি আন্তরিক পরম্পরা 'প্রান্তিক'-এর মধ্যে সুস্পষ্ট। মোটামুটিভাবে একে তিন অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম, মৃত্যুর দিকে গতি, দ্বিতীয়: মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, তৃতীয় প্রত্যাবর্তন। সাত নম্বর কবিতায় কবি বলছেন :

> হে জীবন, অস্তিত্বের সারথী আমার
> বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
> মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়॥

চতুর্থ কবিতায় :

> আদিম সৃষ্টির যুগে
> প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
> আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
> দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
> মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝর তলায়।
> বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্য বীথিপারে,
> পূর্ব ইতিহাসধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে।

তারপর সাক্ষাৎ মৃত্যুর অনুভূতি (৯) :

> অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
> দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি…
> এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে
> স্থলে জলে। ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
> অন্তহীন তমিস্রায়।

প্রথম কবিতায়—

> অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
> স্থূল কারা-প্রাচীর বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
> কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হোলো অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ অভ্যুদয়ে।
> অতীতের সঞ্চয়-পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
> আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
> বিন্ধ্যগিরি ব্যবধানসম, আজ দেখিলাম
> প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, ত্রস্ত হয়ে পড়ে দিগন্তবিচ্যুত।

প্রত্যাবর্তনের গতি আরো স্পষ্ট (১০)

> মৃত্যুদূত এসেছিল, হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ

তব সত্তা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গনে তব ;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার ;...
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি।
তাই ফিরাইয়া দিলে।...

মৃত্যুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি এখানে 'শ্যামসমান' নয়, রুদ্র; কাল্পনিক নয়, বাস্তব। মৃত্যুকে প্রসন্নমুখে বরণ করে নেবার একটি সাধনা এখান থেকে শুরু হয়েছে যার প্রকৃতি পূর্বতন অভি-সারিকারূপ মৃত্যুর বন্দনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু মৃত্যুর সাক্ষাৎ অনুভূতি কেটে যাবার পরমুহূর্তেই পূর্বতন স্বপ্নময় মৃত্যুকামনার শেষ ঝঙ্কার ক্ষণমাত্রের জন্য ফিরে আসছে। তাতে মৌলিক পরিবর্তনের মূল্য বিন্দুমাত্র কমেনি। পাঁচ নম্বর কবিতায় কবির ক্ষোভ :

পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ...
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙীন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।

মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সংকটে তাকে রুদ্ররূপে দেখে কবি আর্তকণ্ঠে তাঁর পূর্বতন মৃত্যুবোধের হারানো মাধুর্যকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল। এই ফিরে চাওয়া, ফিরে-পাওয়ার অসম্ভাব্যতা বোধের ফলে বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের মূলে টান পড়ার যে তীব্র আঘাত, তার মধ্য দিয়ে জীবনের সঙ্গে সহস্র যোগের মূল্য ও গভীরতা চেতনার পর্দায় ধরা দিয়েছে। মৃত্যুর ভীষণতার মধ্য দিয়েই প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে জীবনের মাধুর্য। পনেরো সংখ্যক কবিতায় :

পুরাণোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবী,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে...

কিন্তু সদ্য দুঃস্বপ্নোত্থিত কবির দৃষ্টি জীবনের মাধুর্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছে, বর্তমান জগতের বীভৎসতার রূপ তাঁর নজরে আসেনি'। মৃত্যুর স্পর্শে "অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়" প্রকাশিত (,১৫) :

রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিম দিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

প্রকৃতির মাধুর্যই এখানে কবির দৃষ্টিকে প্রথম আকর্ষণ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যুদ্ধদীর্ণ

পৃথিবীর রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; কারণ (১৫)

উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই।

বোমারু বিমান, হত্যালীলা, ফ্যাশিবাদের নৃশংসতা প্রকট হয়ে ওঠে (১৬) :

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে...
এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধশূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিৎ বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন...

এখানেও আবেদন গিয়ে পৌঁছেছে 'মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের' চরণে। কিন্তু পরবর্তী কবিতায় (১৭ : 'নাগিনীরা চারিদিকে') মৃত্যুস্বপ্ন মুছে গেছে চোখ থেকে, সংকট-চেতনার তীব্রতা চিরন্তন বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিচ্ছে। আবেদন এবার আর দেবতার প্রতি নয়, মানুষেরই প্রতি : আশৈশব ঈশ্বরবিশ্বাসী, সত্যশিবসুন্দর, শান্তিস্বরূপের উপাসক কবির হৃদয়কে দীর্ণ করে এই আর্তনাদ বেজে উঠল—'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবতার সংঘর্ষকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। 'ললিত' কথাটির মধ্যে যে অল্প ব্যঙ্গের আভাস আছে তা হয়ত কবির অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু সরব পাঠে একে অস্বীকার করা যায় না, কারণ 'ললিত' কথাটির উপর অল্পবিস্তর ঝোঁক পড়বেই, যেমন করেই পড়া যাক্ না কেন।

অবশ্য রোগের অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রতি অনুভূতিকে তৎক্ষণাৎ রেকর্ড করে রাখেন নি। কিন্তু আরোগ্যলাভের পর স্মরণের মধ্য দিয়ে তিনি এই অনুভূতিগুলিকে ফিরে পেয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে নয়, এলোমেলো খণ্ড খণ্ড অনুভূতি অচেতন থেকে চেতনের স্তরে যেভাবে ভেসে উঠেছে সেইভাবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো হলেও কবির সচেতন মনের অগোচরেই তাঁর কাব্য নিগূঢ়ভাবে জীবনের সমান্তরাল একটি রেখা এঁকে দিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে 'প্রান্তিক' একটি মোড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কবির সমগ্র কাব্যের সম্পর্কে এর অর্থ অতি গভীর ও বৃহৎ। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 'প্রান্তিকে'র পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত কবির অন্তর্জীবনের কোনো গভীর কাব্যিক প্রকাশ নেই। 'প্রান্তিক'-এর প্রকাশ সাল ১৯৩৮ ; এর পূর্বে 'প্রান্তিকে'র স্তরের অর্থব্যঞ্জক, গভীর অন্তশ্চেতনার প্রকাশ আছে কেবল 'পূরবী'তে, যার প্রকাশ সাল হচ্ছে ১৯২৫ সাল। 'পূরবী' ও 'প্রান্তিক'-এর মধ্যবর্তী কালটি হচ্ছে প্রধানতঃ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের যুগ। গৃহপ্রবেশ, নটীর পূজা, ঋতু-উৎসব, রক্তকরবী, যোগাযোগ, তপতী, শেষের কবিতা, শাপ-মোচন, দুই বোন, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, মালঞ্চ, চার অধ্যায় এই তেরো বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। এই কালের অন্যান্য রচনাও প্রধানতঃ প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি, যেমন

ভানুসিংহের পত্রাবলী, সহজ পাঠ, ইংরেজী সহজ শিক্ষা, রাশিয়ার চিঠি, দেশের কাজ, মহাত্মাজীর শেষ ব্রত, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, মানুষের ধর্ম, ভারতপথিক রামমোহন, শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ, জাপানে-পারস্যে, পত্রপুট, সুর ও সঙ্গতি, সাহিত্যের পথে, কালান্তর, বিশ্বপরিচয়। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীথিকা, পত্রপুট, লেখন, পরিশেষ, পুনশ্চ, শ্যামলী ও বিশেষভাবে মহুয়া (১৯৩০) *। পূরবীর অন্তর্গত 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী', ও 'আহ্বান'-এর একান্ত গভীর আত্মসচেতনতা ও আত্মজিজ্ঞাসা 'প্রান্তিক'-এর পূর্বে পাওয়া যায় না।

'সেঁজুতি' ১৯৩৮ সালে 'প্রান্তিক'-এর অনতিকাল পরেই প্রকাশিত। 'জন্মদিন' যে এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'প্রান্তিক'-এর সুর এতেও স্পষ্ট রয়েছে :

...শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারেবারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে
সজ্জিত রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ লোপ হবে দুষ্ট স্বপনের...
বলে যাব 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রথিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।...
বৃথা বাক্য থাক্।

'প্রান্তিক'-এর 'যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল'-র বক্তব্য এখানে রয়েছে কিন্তু অনুভূতি ও প্রকাশের সে তীব্রতা নেই। 'তারে হাস্য হেনে যাব', ও 'বৃথা বাক্য থাক' অতি অর্থপূর্ণ। 'প্রান্তিক'-এ যা ছিল তীব্র ধিক্কার ও মানুষের প্রতি দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান, এখানে তা হাস্যে পরিণত হয়েছে। আন্তরিকতা, অনুভূতির তীব্রতা, সংবেদনশীলতা অপেক্ষাকৃত নীচু তারে নেমে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের গভীরতর চেতনার আলোচনায় 'আকাশপ্রদীপ' ও 'প্রহাসিনী'-কেও (১৯৩৯) সহজেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে (যদিও প্রহাসিনীতে ব্যঙ্গ কবিতার প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য।) ১৯৪০এ পাওয়া যায় 'নবজাতক'। অধিকাংশ সমালোচকের মতে এখানেই কবির নবপর্যায়ের আরম্ভ। কিন্তু 'প্রান্তিক'-এর পূর্ণ বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'নবজাতক'-এ 'প্রান্তিক'-এর ধারাই বৎসরব্যাপী ফল্গুতার পর পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছে। ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে 'নবজাতক'-এ নূতন সূচনা হলেও কবির বক্তব্য এখানে 'প্রান্তিক'-এর শেষ কবিতাগুলির ধারাকেই বিস্তৃততরভাবে প্রকাশ করেছে। 'প্রান্তিক'-এর শেষ কবিতাটি ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও কবির অন্তিম কবিতাগুলির সঙ্গে একাত্ম। সেই দৃষ্টির দিব্যতা, ভাষার নিরলংকার উজ্জ্বল ঋজুতা, বক্তব্য ও প্রকাশের অবিভাজ্য অখণ্ডতা এই কবিতাটিতেও। 'প্রান্তিক'-এ মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে পরবর্তী কবিতার যোগও

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র-সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৮।

সুস্পষ্ট। মৃত্যুর ভয়ংকর অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি নূতনভাবে আকৃষ্ট হয়ে কবির মন 'প্রান্তিক'-এর অপার্থিবতা থেকে 'নবজাতক'-এ যুদ্ধের হুহুংকৃত বিস্তৃতির পটভূমিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর বায়ুমণ্ডলে নেমে এসেছে। সভ্যতার সংকটে, মানুষের অপমানে, কবির মন আহত, রক্তাক্ত। বারেবারে এই বেদনা কবিতায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বেদনাকে সাধারণলভ্য নৈরাশ্য থেকে মহত্তর স্তরে উন্নীত করেছে মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণশক্তির সম্পর্কে একটি অনির্বাণ আশা। এই আশা ধর্মের অমানবিক ও যান্ত্রিক নিশ্চয়তায় আবদ্ধ সুলভ তত্ত্ববাক্য নয়, বাস্তব, মানবিক ও পার্থিব। মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লাভ বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। নবজাত শিশুর অভ্যর্থনা দানবের সংগে ভবিষ্যৎ সংগ্রামেরই জন্য :

নরদেবতার পূজায় এনেছ
　　কী নব সম্ভাষণ।
অমর লোকের কী গান এসেছ শুনে।
　　তরুণ বীরের তূণে
কোন মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির পরে
　　অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম তরে। (নবজাতক)

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নূতন জীবনের জন্ম :

ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের
　　নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
　　জমেছে লুটের ধন।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
　　ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
　　লাগিল ভীষণ দোল।

'ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের' সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, আর সেই আপাতভীষণ সংঘাতের মধ্য থেকেই সার্থক শান্তির উদ্ভব :

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়। (প্রায়শ্চিত্ত)

সংগ্রামহীন সুলভ শান্তি নেই :

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
　　পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
　　জাগিবে নূতন দেশে (প্রায়শ্চিত্ত)

এই আশা ধর্মবিশ্বাস প্রসূত নয়, সংগ্রামের এই স্বীকৃতি ধর্মসুলভ নয়, এর উৎস ব্যক্তিগত, বাস্তব জীবনবোধ। সহস্র বৎসরব্যাপী মানুষের ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের ভীষণ হতে ভীষণতর

পরিণামের সংগতিসাধন করতে অক্ষম কবির মন। অথচ অসংগতিবোধ অতি তীব্র। আজকের 'ক্ষুধাতুর ও ভূরিভোজীদের' সংঘর্ষকে কেবল 'ভূরিভোজীদের' লোভপ্রসূত বলে কবি সংশয়কে এড়াবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে সংশয় অপনোদিত না হয়ে তীব্রতরই হয়েছে। তাই দার্শনিক চিন্তার প্রতি চেষ্টায় কবির বিশ্বাস প্রতিহত, মন প্রশ্নসঙ্কুল, তীব্র সন্দেহ ও অভ্যস্ত বিশ্বাসের পরস্পর বিজড়িত প্রকাশ নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, কখনো এর প্রাধান্য, কখনো ওর। বাস্তবক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণশক্তির প্রতিই কবির আবেদন, তাঁর নির্ভর; ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত আশ্বাসে মন আর মানে না। তাই সংসারবৈরাগী বৈরাগ্যমুখর কোনো সুলভ শান্তিবাদ কবিকে আচ্ছন্ন করেনি। পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামের ভীষণতাকেও তিনি অবশ্যম্ভাবী বলে গ্রহণ করেছেন সুস্থতর ভবিষ্যতের আশায়। এই সংগ্রামের ভূমিকায় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের অন্ধতাকে তিনি পূর্বেই উপহাস (অন্তত পক্ষে বর্জন) করেছেন—'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। 'নবজাতক'-এ ধিক্কার দিয়েছেন 'ধর্মপরায়ণ' সেই দানবকুলের প্রতি যারা

গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।

ধর্মের সংগে জীবনের অসংগতি বোধ ও বাস্তব সংগ্রাম-চেতনা—এই দুই-এ মিলে কবির আশৈশব ধর্মবিশ্বাসের মূলে এত তীব্র আঘাত দিয়েছে যে অস্তিত্বের যে সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর ধর্মপুস্তকের প্রথম পাতায়, সেগুলির উত্তর কবির নিকট, আজ তেমন সহজলভ্য নয়। নূতন যুগের ভূমিকায় কবির মনে নূতন করে প্রশ্ন জেগেছে, 'কেন' কবিতাটিতে তারই পরিচয়:

কিংবা একি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান করে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন
কিন্তু কেন।

এবং

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু কেন।

'মহাকালের খেলা'-জাতীয় বাঁধা সড়কের উত্তর যা কিছু সে সকলেরই বিরুদ্ধে কবির এই প্রশ্ন বারে বারে উত্থিত হচ্ছে—'কিন্তু কেন'। দার্শনিক প্রশ্ন যেখানেই, সেখানেই যে সংশয়, 'অস্পষ্ট', 'রাতের গাড়ি', 'প্রশ্ন' ইত্যাদি কবিতায় তার অপর্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে:

বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর॥ (প্রশ্ন)

কিন্তু যেখানেই দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেখানেই সংশয় অপনোদিত, আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর। 'নবজাতক'-এই 'কানাডার প্রতি' কবির আহ্বান:

বিশ্ব-জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে

ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত...
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও ধীর রবে
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু...

'ধর্ম আজি সংশয়েতে নত', অতএব নতুন, 'অজেয় বিশ্বাসের কেতু' তোলার প্রয়োজন কবি স্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছেন। 'হিন্দুস্থান', 'রাজপুতানা' ইত্যাদি কবিতায়ও একটি রাজনৈতিক চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে।

আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের। (হিন্দুস্থান)

কাব্যে রাজনৈতিক চেতনাব যে আধুনিক দাবী, তাকেও কবি পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছেন 'নবজাতক'-এ। 'রোমান্টিক'-এ অবশ্য তিনি আধুনিক কবিকুলকে 'শৌখিনবাস্তব' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন, দাবী করেছেন কাব্যে রোমান্টিসিজমের ও বাস্তব জীবনে কঠোর কর্মের। প্রচলিত শিল্প-বিশ্বাসের সাহায্যে বাস্তব জীবন ও কাব্যিক জীবনকে দ্বিধা-বিভক্ত করে কবি সচেতনভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এই আত্মরক্ষার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রথমত, 'নবজাতক'-এর অধিকাংশ কবিতাই রাজনৈতিক চেতনার পটভূমিতে লিখিত বাস্তব জীবন ও কাব্যিক জীবনের মধ্যে সংগতিতে উজ্জ্বল। 'রূপ-বিরূপ' কবিতায় কবির প্রার্থনা :

রৌদ্রী রাগিনীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার
বাণীবিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার ॥

'সুন্দরের ভঙ্গী' এখানে 'অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ' ধারণ করেছে, যুগের অন্তরের কথাটিকে প্রকাশ করেছে।

'প্রান্তিক'-পূর্ব যুগে দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চেতনা ছিল আকস্মিক, উত্তর-'প্রান্তিক' যুগে সেক্ষেত্রে একটি অন্তর্লীন সুর যার প্রাণ নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বসংকট-চেতনায়। প্রতি কবিতায় যে এর প্রকাশ আছে তা নয়, কিন্তু যেখানে নেই সেখানেও এর ছায়াপাতে কাব্যে এসেছে একটি বেদনাহত গাম্ভীর্য। এই বিশ্বসংকটের ছায়ার সঙ্গে আগামী মৃত্যুর ছায়া মিশে একে আরো গাঢ়, থম্‌থমে করে তুলেছে। সমগ্র ভাবে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায় বিশ্বসংকট ও মৃত্যুর এই যুগ্মচেতনার উপরেই অবস্থিত। এই দুটি ধারা কখনো বিচ্ছিন্ন ও একক, কখনো মিলিত। মৃত্যুর প্রেরণা ধর্মের দিকে, সংকটের প্রেরণা মানবিকতার দিকে। এই দুই-এর টানা-পোড়েনে এই পর্যায়ের কবিতার ঠাসবুনানি। দার্শনিক সংশয়ের ছায়ায় ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে এই যুগ্মচেতনার পট মহত্তর, বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। সংকটবোধ আছে, কিন্তু সংকট দূরীকরণের প্রত্যক্ষ তাগিদ নেই, কারণ কবির দৃষ্টি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী উপত্যকার দূরত্বে কর্তব্যবোধ মুক্ত। তাই 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) 'আরোগ্য' (১৯৪০)

'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা'য় (১৯৪১) চেতনা মানবিক হয়েও পুনরায় উচ্চতর (১৯৪১) আকাশে আরোহণ করেছে। 'প্রান্তিক'-এর স্বপ্ন ভঙ্গের পর 'নবজাতকে' বর্তমান শতাব্দীর জীবনের মধ্যে কবির প্রবেশ, তারপর 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য'-তে আবার মৃত্যুর সন্নিকট হয়ে 'প্রান্তিক'-এর প্রথমার্ধের মত কবির দার্শনিক বোধের পাল্লা আবার বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছে, সংশয়ের সে তীব্রতা নেই। মৃত্যুই এখানে সমগ্র চেতনার মূলস্থিত সত্য। 'প্রান্তিক'-এর প্রথমার্ধের মৃত্যু অভিমুখী কবিতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আবার 'রোগশয্যায়'-এ দেখা দিচ্ছে :

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

কিন্তু এ পশ্চাদ্‌গতির পরিচয় নয, কারণ 'প্রান্তিক'-এর সঙ্গে 'রোগশয্যায়'-এর প্রভেদ এইখানে যে, বিশ্বাসের পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়েও কবির নবার্জিত সংগ্রামজ্ঞান অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সংকট বেদনা আপন রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে চেতনার স্তরে স্তরে, রোগ-যন্ত্রণাকে সহ্য করার সাধনার মধ্য দিয়েও কবির দৃষ্টিতে মানুষের সংগ্রামের ছবি দেখা দিচ্ছে :

মানবের দুর্জয় চেতনা...
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি···

'বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা' অনুসারে বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ এই পৃথিবী ও জীবন 'কালের দক্ষিণ হস্তে কবে পাবে পূর্ণ দেহ' তার জন্য কবির অন্তিম প্রতীক্ষা জেগে রয়েছে। 'দারুণ ভাঙন এ যে পূর্বেরি আদেশে' এই তাঁর সিদ্ধান্ত। সুতরাং মৃত্যুর ছায়ায় অপার্থিব হলেও এই উচ্চলোক 'প্রান্তিক'-এর মত স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়, বাস্তব জীবন জ্ঞানে সমৃদ্ধ। দৃষ্টি সুদূর কিন্তু পরম সহানুভূতিশীল। অনুকম্পা বলে একে ভুল বোঝা সম্ভব, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এ ক্ষেত্রে দূরত্ব অবশ্যম্ভাবী বলেই সহানুভূতির অভাব সূচিত করে না। বিদায়ের পূর্বক্ষণে কবির কাছে এই পৃথিবীর ধূলি—তা যত যুদ্ধবিধ্বস্তই হোক না কেন মধুময় হয়ে উঠেছে, পলাশের প্রগল্‌ভতা, আসনের কাছে স্তব্ধ কুকুর, দিদিমণি, বিশুদাদা, সকলেই পরম প্রিয় হয়ে উঠেছে তখনও, ব্যক্তি জীবনের এই চূড়ান্ত বেদনাকে ভেদ করে ভেসে উঠেছে মূক জনসাধারণের 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে' ভারবাহী সবেদন দৃশ্য। 'আরোগ্য' 'জন্মদিন'-এ 'প্রাণের রহস্য-ঢাকা'র অন্তরালে আপনার অন্তিম, সংশয়সঙ্কুল সন্ধান পিপাসার মধ্য

দিয়ে ও আগামী যুগের কবির প্রতি, 'কৃষাণের জীবনের শরিক'-এর প্রতি কবির অকুণ্ঠ, মহৎ অভিনন্দন, 'দিন বদলের দামামা'র প্রতি এত উৎকীর্ণতা। দিন বদলের পালা তো কবির নয়, সে তো তাঁর পশ্চাতে পড়ে থাকা জনসমাজের, তবু :

পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

নতুন 'সৃষ্টির আহ্বান'-কবি শুনতে পান কামানের প্রচণ্ড ধ্বনিরই মধ্যে। অন্তিম সময়েও তাঁর এত বাস্তব দৃষ্টি, চূড়ান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাকে ছাপিয়ে মানবসমাজের সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টির প্রসার। ('জন্মদিনে' ও 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রকাশ তারিখ একই, ১লা বৈশাখ ১৩৪৮, ১৯৪১ ; একথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।)

'শেষ লেখা'য় 'প্রান্তিক' উত্তর কবিতার দ্বৈত ধারার একটি আশ্চর্য একীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। 'রোগশয্যায়'-এর পাঁচ নম্বর কবিতার চেয়ে আরো সহজ ভাবে বিশ্বের বেদনা ও ব্যক্তিগত বেদনা মিলে যায়, ব্যাধির বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আপন সংগ্রাম বিশ্বের সংগ্রাম হয়ে ওঠে। বাস্তব দৃষ্টিতে মৃত্যু আবার দুঃখের আঁধার রাত্রি হয়ে আসে, রামধনু রঙে সজ্জিত হয়ে মন ভোলাতে আসে না। ছলনা নিয়ে আসে, বিচিত্র ফাঁদ পাতে। সেই আঁধার রাত্রিকে, ছলনাকে, কবির গভীর অস্বীকার। অন্তিম মুহূর্তেও সংগ্রামই সত্য, সেই নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয় নেই যাতে দুঃখের ছায়াকেই অপসারিত করতে পারে, ছলনাকেই দূর করে কেবল শুভ্র জ্যোতিতে স্নাত করতে পারে। মৃত্যু শুধু ভয়াবহ ছায়ামাত্র—জীবনগ্রাসী নয়, তবু সে বাস্তব তাই তাকে এড়িয়ে যাওয়া নেই, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা চাই, মৌন নয়, সক্রিয় অস্বীকার চাই। দার্শনিক প্রশ্নের সমাধান অন্তিম মুহূর্তেও নেই :

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥ (শেষ লেখা)

কিন্তু :

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়। (শেষ লেখা)

তাই সংগ্রামই জীবনের সত্য। প্রবঞ্চনাকে ভেদ করে মহত্ত্বের বীর্যে যে সত্যকে পাওয়া, সে মোক্ষ নয়, ঈশ্বর নয়, দার্শনিক প্রতীতি নয়, সে মানুষের জীবনের সত্য। মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার নির্ভীক পথ অন্তরের সহজ বিশ্বাসে চিরস্বচ্ছ। এই পথ সংগ্রামের পথ। এর পাথেয় ধর্ম নয়, ঈশ্বর নয়, অপার্থিব, অলৌকিক কোন গুণ নয়, এর একমাত্র পাথেয় মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব। এই পথের অন্তে যে অক্ষয় ভবিষ্যৎ, সে-ও ভগবদ্দত্ত বা আকস্মিক ভাগ্যপ্রসূত নয়, সে মানুষের স্বোপার্জিত ভবিষ্যৎ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে প্রায়-সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন এমন সিদ্ধান্ত সাম্যবাদী মহলে কখনো কখনো শোনা যায়। যুক্তি হিসাবে 'আরোগ্যে'র 'ওরা কাজ করে' কবিতাটিতে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি কবির অভিনন্দন, 'জন্মদিনে' 'কৃষাণের জীবনের শরিক' যে কবি তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও সাধারণভাবে কবির ফ্যাসীবিরোধিতা উপস্থিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শেষ পর্যায়ের কবিতায় এ জাতীয় কোনো সিদ্ধান্তের ভিত্তি নেই।* বাস্তব সংকটের ধাক্কায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি টলে উঠেছিল। দার্শনিক সংশয় তাঁর মনকে দোলা দিয়েছিল, মানবিকতার দিকে তাঁর মনের পাল্লা ঝুঁকে আসছিল—একথা সত্য। কিন্তু তবু, বিশেষ দু'একটি কবিতার বক্তব্য যাই হোক না কেন, সাধারণভাবে তাঁর মানসিকতার মূল ধর্মের জমি থেকে উৎপাটিত হয়ে বস্তুতান্ত্রিকতার ভূমিতে পুনর্জন্ম নেয়নি। নদীর কূলে যদি বা ভাঙন ধরেছে, প্লাবন কখনও সম্ভব হয়নি। ধর্মবিশ্বাস যেতে বসেছে, কিন্তু ধর্ম চেতনা, ধর্মভাব শেষ পর্যন্ত অটুটই ছিল। শেষ কবিতায়ও 'ছলনাময়ী'র কল্পনায় তার এমন পরিচয় পাওয়া যায় যাকে কেবল অভ্যস্ত প্রকাশমাধ্যম বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। নিজের কাঠামো থেকেই প্রসারিত হতে হতে রবীন্দ্রনাথের চেতনা শেষ কবিতাগুলিতে তাঁর সম্ভাব্য প্রগতির কম্পমান শেষ সীমান্তে গিয়ে ঠেকেছে।

রলাঁর পরিণতির কথা এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। জানতে ইচ্ছা হয়—যেমন অমিত সেন তাঁর প্রবন্ধে জানতে চেয়েছিলেন—যে নাৎসি-অভ্যুত্থানের পর রলাঁর মতন— "Working men, here are our hands. We are yours. Humanity is in danger"—বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত নির্ভুল রাখতে হলে একথা বিস্মৃত হওয়া চলে না যে নাৎসি নৃশংসতার প্রত্যক্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়েই রলাঁ স্বীয় যুগকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রগতি অনেকটা আত্মচালিত, 'ইচ্ছাশক্তি' প্রসূত, বহির্জগতের সাহায্য রলাঁর মত প্রত্যক্ষভাবে পায়নি। তাই প্রগতির বাস্তব সীমান্ত বিচারে রবীন্দ্রনাথ পশ্চাতে পড়লেও মূল্যবিচারে তাঁকে খাটো করা চলে না। সন্দেহ ও নৈরাশ্যের বিশ্বব্যাপী দোলার পটভূমিতে তাঁর অন্তিম বিশ্বাসবাণীর মূল্য অপরিসীম, কারণ তার ভিত্তি মানুষের মহত্ত্ববোধ ও মানুষের বাস্তব সংগ্রাম। এইখানেই রবীন্দ্রচেতনায় প্রগতির অন্ত, রাবীন্দ্রিক ও উত্তর-রাবীন্দ্রিকের প্রকৃত সীমারেখা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রায়-সাম্যবাদী হয়েছিলেন—এই সিদ্ধান্ত কামচারী সমালোচনারই প্রকাশ। বস্তুত এ প্রশ্নই নিরর্থক, কারণ এর চেয়ে বড়ো কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রগতির যে সীমারেখা সে কেবল রাবীন্দ্রিক ও উত্তর-রাবীন্দ্রিককে বিভক্ত করেছে তা নয়, মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ মানুষের প্রতি এই বাস্তব বিশ্বাসই সাম্যবাদের অর্থাৎ আধুনিক কালের একমাত্র 'পজিটিভ্' জীবনদর্শনের ভিত্তি। ফ্যাসিবাদের চরম আদর্শ কতিপয় 'শ্রেষ্ঠ মানব'-এর নেতৃত্বে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে মানুষের নৈরাশ্যকে সংগঠিতভাবে চালনা করা (স্পেঙ্লার ও নাৎসী জাতিতত্ত্ব); 'ডেমোক্রাসি' (পশ্চিমী)-র একমাত্র আদর্শ মানুষের মৃত্যু, অথবা জীবন অথবা জীবন্মৃত অবস্থা, অথবা অন্য যে-কোনো সম্ভাব্য

* 'পরিচয়' রবীন্দ্রসংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮-এ শ্রীযুত অমিত সেন এ-বিষয়ে বিশেষ উপযুক্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

ভবিষ্যতের দিকে নির্বিবাদে গড়িয়ে যাবার 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' (laisséz-faire-জাত Freedom of the Individul : অবশ্য এই ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষকে মৃত্যুর দিকে না, জীবনের দিকে নিয়ে যায়, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ঘুচে গেছে)। একমাত্র সাম্যবাদেরই সাধনা সমগ্র মানবসমাজকে বাস্তব দর্শন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে অবশ্যম্ভাবী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চালিত করা। একমাত্র সাম্যবাদেই মানুষের কল্যাণশক্তির প্রতি বিশ্বাস একটি মৌলিক, স্পষ্টস্বীকৃত সত্য।

যেমন রলাঁর তেমনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সাম্যবাদীর মিলনভূমি এই ফ্যাসিবিরোধী, মৃত্যুবিরোধী মানববিশ্বাসে। যে সময়ে সাহিত্যিকেরা সংকটের প্রবলতায় হয় নৈরাজ্যবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতার গহ্বরে নিমজ্জিত, রাজনীতিকেরা ফ্যাসিবাদের সহায়তা নিয়ে অথবা তার বিপদ বিস্মৃত হয়ে কূপমণ্ডূক—স্বাধীনতার অসম্ভব কল্পনায় চালিত, প্রায় সেই সময়ে (১৯৩৮—৪১) রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে বিশ্বসংকট সম্পর্কে সজাগ হয়ে মানবের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন, জনসাধারণের অমর শক্তিকে দেখতে পেয়েছেন, ফ্যাসিবাদকে শুধু মান বাঁচানো বাক্‌চাতুর্যে নয়, বাস্তবভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন। অন্তিম রোগশয্যায় ব্যাকুল উৎকণ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েটের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন প্রতিদিন, এবং দুঃসংবাদে ব্যথিত হয়েছেন, সুসংবাদে বলেছেন, ওদের কখনো পরাজয় হতে পারে না। মানব ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্যবাদের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর সঙ্গে এই মিলনের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাম্যবাদ কোনো উদ্ভট, ভুঁইফোড় কল্পনা নয়, সে ঐতিহ্যকেই সার্থকতার বাস্তব পথে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ মানবতার সঙ্গে সংযোগ তার নিবিড়, কারণ এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানবতার প্রকাশ তার মধ্য দিয়েই।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা

রবীন্দ্রনাথ একবার এক চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—'জানি না আমার সাহিত্যের ভবিষ্যত মার্ক্‌সিস্‌মের কোন অতলে!'

কথাটা ভেবে দেখবার—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বলেই। ঐ চিঠিতে ও আরো সবিস্তারে 'রাশিয়ার চিঠিতে' তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্যষ্টি-সমষ্টি সমস্যার। সোভিয়েটের অকৃত্রিম বন্ধু হলেও এ বিষয়ে তাঁর খট্‌কা ছিল মনে—বিশেষ করে এমন সন্দেহ ছিল যে পরিকল্পনার নামে হয়ত মানুষের মানসিক সৃষ্টির উপর রাষ্ট্রের বেশ খানিকটা জুলুম চলতে পাবে সমাজতন্ত্রের আমলে।

অথচ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট পরিকল্পনার আশ্চর্য সাফল্যের কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন মুক্তকণ্ঠে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এই রকম দ্বিধান্বিত দৃষ্টি কিন্তু শুধু তাঁর একারই নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা planning-এর গুরুত্ব আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কংগ্রেসের উদ্যোগে 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও বহু দায়িত্বশীল নেতাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্র নেতাদেরও এদিকে নজর পড়েছে।

কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের রাজ্যে laissez faire নীতির গৌরব আজও অম্লান। সেখানে পরিকল্পনার উল্লেখ হলেই কথা ওঠে জবরদস্তির, ফরমাইসী সাহিত্য বা শিল্পের অসারতার আর regimentation-এর। বলা হয় মানুষের বৈষয়িক জীবনে শৃঙ্খলা আনবার জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকলেও মননশীলতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মাত্রই ফলের দিক থেকে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেখানে তাই পরিকল্পনার মূল্য—হয় যৎসামান্য, নয়ত একেবারেই নেই, কিম্বা আরো সোজাসুজি—পরিকল্পনা মাত্রই ক্ষতিকর।

মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন সম্পর্কে কেন এই দু'রকম বিচার?

এর পিছনে অনেকটাই হল ভুল বোঝার ফল। 'পরিকল্পনা' শব্দটার মধ্যে কোন যাদু নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেটা যেমন মানুষেব কল্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি আবার অমঙ্গলেরও হেতু হতে পারে। আসল কথা হল, পরিকল্পনা হচ্ছে কার স্বার্থে আর নিয়ন্ত্রণ করছে কে? দেশের মুষ্টিমেয় জনকয়েক মুনাফা-শিকারীর স্বার্থই যদি বড় হয় তবে হাজার পরিকল্পনাতেও সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ এক তিল ঘুচবে না—বরঞ্চ বাড়বে। যুদ্ধের মাতলামিতে দেশকে মাতিয়ে ফাশিস্টরাও ত চরম সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছিল জাতীয় পরিকল্পনার নামে—মজুর আন্দোলন, তথা দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখাও হয়েছিল ঐ পরিকল্পনার দোহাই দিয়েই। আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতির অজুহাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলে একদিকে—আর

সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীতির নামের আড়ালেই আণবিক শক্তি রহস্যের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার ব্যবস্থা হয় তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনকয়েক টাকাওয়ালা লোকের স্বার্থে নয় সমগ্র জনসাধারণের,কল্যাণের জন্য দেশের সমৃদ্ধি সাধন ঘটানো হয়। অন্তত এই দিকে সমাজতন্ত্রের সাফল্য কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ হয়েছে—এ কথা এ-দেশের বুদ্ধিজীবী মহল মোটামুটি মেনে নিয়েছে।

কিন্তু তখনই আবার প্রশ্ন ওঠে সোভিয়েট সাহিত্য নিয়ে। সেখানকার পরিকল্পনার পরিসর যদি মানুষের বৈষয়িক জীবন থেকে শুরু করে তার মানসজীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে সোভিয়েট সাহিত্যের সার্থকতার মাত্রা দিয়েই কি যাচাই হবে না রবীন্দ্রনাথের সংশয়ের যাথার্থ্য অথবা ভ্রান্তি? সত্যই কি সেখানকার সাহিত্যিক ফসল অতটাই চোখ-ঝলসানো?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গোড়াতেই একটা সাবধানতা অবলম্বন করা দ' কার। আমরা সোভিয়েট সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ মাত্র পাই—তাও ইংরাজী মারফৎ। এর ভিত্তিতে সুবিচার প্রায় অসম্ভব। তবু যা মেলে তার মূল্য কম নয়—বিশেষ করে সংস্কৃতির নানা বিভাগে সোভিয়েটের প্রাণোচ্ছলতা সত্যই আশ্চর্য।

এ ছাড়া আরো একটা কথা আছে—একেবারে গোড়ার কথা। নূতন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন হলে **সঙ্গে সঙ্গেই** তার ভিত্তিতে নূতন ও উন্নততর সংস্কৃতি স্বতোৎসারিত হবে—এ যুক্তি মার্ক্সবাদের নয়। এত সরাসরি ছক-মাফিক সিদ্ধান্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণেরই পরিচায়ক। এরই ফলে বামপন্থী আতিশয্যে অনেক সময় সমস্ত অতীত সাহিত্যকে 'ফিউডাল' বা 'বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে 'সর্বহারা সাহিত্যের' তুলনায় তাকে হেয় বলে ঢালা রায় দেওয়া হয়ে থাকে। এর ভ্রান্তি এইখানেই যে, এই যুক্তিতে সমাজ-মানসের উপর সমাজ-ব্যবস্থার প্রচণ্ড প্রভাবের 'পরেই জোর দেওয়া হয়—সমাজ-মানসও যে সমাজ-ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করে সে-কথা প্রায় উপেক্ষিতই থাকে। তাই এ আশঙ্কা অস্বাভাবিক নয় যে, পরিকল্পনার নামে বুঝি জবরদস্তি চলবে সমাজ-মানসকে সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উদ্দেশ্যে।

আসলে কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ-মানস হাতে ধরাধরি করে একত্রে পা মিলিয়ে চলে না। তাদের গতিহার অসমান। কখনও মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা কল্পনার দৌড় সমসাময়িক সমাজের সমস্ত সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে বহুদূর এগিয়ে যায়—যেমন ঘটেছিল ইউটোপিয় সমাজতান্ত্রিক বা পারী কম্যুনার্ডদের বেলায় বা এদেশে রামমোহনের ক্ষেত্রে। (অবশ্য সেই ছাপিয়ে যাওয়ার দৌড়েরও সীমা আছে কারণ মার্ক্সের ভাষায়—উত্তর যোগাবার সরঞ্জাম বাস্তবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তবেই প্রশ্ন উঠতে পারে।) তারপর আসে সমাজবিপ্লব—গড়ে ওঠে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা যার প্রশস্ততর পরিসর সাময়িকভাবে সমাজ-মানসকে পিছনে ফেলে যায়। মানুষ তখন নতুনের সব কিছু সম্ভাবনাকে পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করার জন্য মাথা খাটাতে ও গা ঘামাতে উঠে পড়ে লাগে—ঠিক যে ব্যাপার এখন চলছে সোভিয়েটে। অর্থাৎ সমাজ-মানস কখনো পশ্চাৎপদ সমাজ-ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রতীক্ষায় থাকে—কখনো আবার সমাজ-ব্যবস্থা তুলনায় অনগ্রসর সমাজ-মানসের প্রগতির মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে।

সোভিয়েট সাহিত্যের মূল্য বিচার করার সময় এ কথাটি মনে রাখা দরকার। উন্নততর সমাজের সাহিত্যিক প্রতিফলন এখনো আশানুরূপ না হলেই অসহিষ্ণু হলে চলবে না। বরঞ্চ

ইতিমধ্যেই সেখানে যে পরিবর্তন এসেছে তাই লক্ষ্যণীয়। বিপ্লবের ঠিক পরে সোভিয়েট সাহিত্যে মিলত বাস্তব ঘটনার যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। নিরক্ষরতার দেশে প্রথম অক্ষর জ্ঞান এলে হটাৎ আত্ম-সচেতন মানুষের পক্ষে এ রকমটাই স্বাভাবিক। লেখকদের পক্ষেও নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম উত্তেজনায় এইভাবে মানুষের বাইরের দিকটার প্রতি একান্ত দৃষ্টিপাতও মোটেই আশ্চর্যের নয়। কিন্তু ক্রমে যখন সোভিয়েটের মানুষ বিপ্লবের তাৎপর্য আত্মস্থ করতে লাগল তখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের জায়গায় এলো ইতিহাসবোধ সমৃদ্ধ সাহিত্য। এ স্তরে মানুষ নিজেকে নূতন অবস্থায় আবিষ্কার করার প্রাথমিক চমক কাটিয়ে পূর্বতন ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চায় আর তারই মধ্যে দিয়ে তার আত্মোপলব্ধিকে আরো গভীর ও ব্যাপক করার চেষ্টা করে। সোভিয়েট সাহিত্যে এখন এই ধারা চলছে। শুধু সর্বগ্রাসী বর্তমান নয়—অতীতের নানা পর্যায় এ যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের এক অব্যাহত যোগসূত্র তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে এক আশ্চর্য সঙ্গতি। আবার বিশ্বমানবের ভবিষ্য ইতিহাসে সোভিয়েট মানবের স্থান সম্পর্কে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও এ-সাহিত্যের অন্ততম লক্ষণ। প্রাণ চঞ্চল সোভিয়েট কথা সাহিত্যে তাই কখনো দেখি কসাক জীবনে বিপ্লবের প্রসার নিয়ে লেখা শোলোকভের উপন্যাসগুচ্ছ, কখনো আলেক্সাই টলস্টয়ের বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত মহৎ উপন্যাস, কখনো এরেনবুর্গের রচনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব-পীড়িত ফ্রান্সের পতনের মর্মান্তিক ছবি কখনও বা জেঙ্গিস খাঁর জীবন অবলম্বনে ইয়ানের ঐতিহাসিক উপন্যাস। আগের যুগের মত এ-যুগে স্থান কাল নিয়ে পক্ষপাত নেই কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে একটা সমগ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টি।

কিন্তু এই দুইএর কোনো যুগেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে লেখক বা শিল্পীর উপর কোনো সাহিত্যিক বা শিল্প সম্পর্কিত মত জোর করে চাপানো হয়নি। অবশ্য বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোড়নে Rapp প্রভৃতি অনেক রকম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলি কিন্তু ছিল বেসরকারী। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এদের উপর বিশেষ কোনো খবরদারী করা হয়নি—বরঞ্চ cubism, futurism প্রভৃতি নিয়ে অবাধে পরীক্ষা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারপর সদ্য জাগ্রত জনসাধারণের বিপুল সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা দূর করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে অনেক ভুয়ো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। অনেক আতিশয্য, গোঁড়ামী ও প্রাথমিক ছেলেমানুষীর পর ক্রমে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নিজেরাই আবার ঠিক পথের দিশা পেলেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে নানাভাবে—চেষ্টা চলেছে সমাজের অন্যান্য মানুষের মত তাঁদেরও জীবনদর্শন আয়ত্ত করার পথে সাহায্য করতে। সাহিত্যে বা শিল্পে সমাজবিরোধী বা জনগণের স্বার্থ-বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পেলে রাষ্ট্র হয়ত জোর গলায় আপত্তি জানিয়েছে—অবশ্য যুক্তি দেখিয়ে। কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বা শিল্প সম্পর্কিত মত জোর করে চালানোর জন্য সোভিয়েট সরকার কোমর বাঁধেনি—সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে দেশের লেখক বা শিল্পী সঙ্ঘের হাতেই। বিষয়বস্তুর খাতিরে আঙ্গিককে ছোট করার চেষ্টাও হয়নি। কবি বোরিস্ প্যাস্টারন্যাক্‌কে বরাবরই ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণ নিয়ে অবাধে পরীক্ষা চালাতে দেওয়া হয়েছিল। আজ সোভিয়েটের সর্বপ্রধান কবি হিসাবে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্যাভ্‌লভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতার কথাও স্মরণীয়।

হয়ত এর পরে আসবে তৃতীয় যুগ। পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী সমাজের মুখোমুখি পৌঁছে সাহিত্য তখন আবার হয়ত ব্যক্তিত্বের মূল্য-নিরূপণের কাজে লাগবে—উন্নততর সামাজিক স্তরে ব্যক্তিমানবের নানা সমস্তা নিয়ে আবার মাথা ঘামাবে।

কিন্তু সে কথা থাক। আমাদের বাংলা কথা-সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিছুদিন হল এখানেও লেখকেরা বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। এর সঙ্গে ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক New Writing., Documentary Film ও Mass Observation ধারার তুলনা খানিকটা চলতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা বহু খ্যাত, অখ্যাত সাহিত্যিকের দুর্ভিক্ষ বা অন্তান্ত সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখবার চেষ্টার মধ্যে পরিস্ফুট। এর মূল্য কম নয়। দৃষ্টির সজীব আন্তরিকতা, কথোপকথনের স্বাভাবিকতা ও আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে একাগ্র উৎসাহ—এ সবই হল এ ধবনের রচনার মস্ত গুণ।

কিন্তু তবু এ হল জীবনেব বহিরাবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ। এ ধরনের সমস্ত রচনাই ছোট গল্প, উপন্তাস, এমন কি, কবিতা সবই হল আসলে reportage ধর্মী। এর রচয়িতাদের সাধনা হচ্ছে নির্লিপ্ত থাকাব। তাই তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেন সব রকম নাটকীয়তা বর্জনের। কেউ কেউ আবার চেষ্টা করেন যথাসম্ভব সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রচাব চালানোর 'অপবাদ' থেকে মুক্ত থাকতে। অধিকাংশ সময়েই তাই এই ধারা হয়ে ওঠে মানুষের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যের সাহিত্যিক প্রকাশ। ফলে মোটের উপর অনেক সময়ই সৃষ্টি হয় বেশ খানিকটা হতাশার। তা' ছাড়া কল্পনাপ্রবন পাঠক ও সাহিত্যিকদেব তরফ থেকে অভিযোগ আসে সাহিত্যের রাজ্য থেকে কল্পনা শক্তির নির্বাসনের। রবীন্দ্রনাথের মত আরো অনেকেই আশঙ্কা করেন যে এর ফলে সাহিত্য রচনা হবে না—হবে ঘটনার photography কিম্বা পরিকল্পনার নামে—'প্রকৃতির' নামে চলবে ছক-মাফিক সাহিত্য সৃষ্টি।

কিন্তু এই 'অতি-স্বাভাবিকতার' স্তর পেরিয়ে যে সামাজিক বাস্তবতাবোধ—ঘটনার বহিরাবয়ব নয়, তার অন্তর্নিহিত সামাজিক সত্য উদ্ঘাটনের স্তর আসন্নতার লক্ষণও ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। তারাশঙ্করের 'regional novel' বা 'আঞ্চলিক উপন্তাস', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধরনের ছোট গল্প, সতীনাথ ভাদুড়ীর সাম্প্রতিক উপন্তাসিক উদ্যম, বিজন ভট্টাচার্যের গণনাট্য সৃষ্টিই এখন পর্যন্ত এই ধারার সার্থকতম প্রয়াস। সাহিত্যের দরবারে নবাগত সুভাষ মুখোপাধ্যায় (আমি কবি সুভাষের কথা বলছি না) প্রভৃতি কয়েকজন সাম্যবাদী সাহিত্যিক সাংবাদিকের নতুন ধরনের দক্ষ reportage রচনার মধ্যেও এই দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছবার প্রতিশ্রুতি আছে। অবশ্য অখণ্ড সাহিত্যিক সার্থকতা এখনও পাওয়া যায়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাঙাগড়াই চলছে। সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাব মধ্যে দিয়ে আর সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হবাব পবে হয়ত মহত্তর সাফল্যের সন্ধান মিলবে।

কিন্তু সমাজব্যবস্থার যেই পরিবর্তন ঘটবে মানুষের খাওয়া পরার ভাবনা যেই ঘুচবে—অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে যা ভাববে বা করবে সবই হবে অভ্রান্ত—এ দাবী মার্কসবাদীর নয়। তাঁদের বক্তব্য শুধু এই যে ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্য সবকিছুর মত সত্যানুসন্ধান বা রূপসাধনাব যে সুযোগ জনকয়েক অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানের কপালে জোটে সমাজতন্ত্রে তা'সবারই মিলবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিধি হবে ব্যপকতর। ধনী নির্ধনের

সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগীর মনে—অবশ্য তাঁর মন যদি যথেষ্ট সংবেদনশীল হয়—যে আত্মধিক্কার বা অপরাধবোধ থাকা স্বাভাবিক—তার হাত থেকেও তখন সাহিত্যিক হবে মুক্ত।

সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিরোধের অবসান অবশ্য তখনও ঘটবে না। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে যা তখনও থাকবে ('দ্বন্দ্ব' শব্দটি অবশ্য dialectical অর্থে ব্যবহার করছি)—সমাজের কণা হিসাবের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। ঠিক তেমনই প্রগতি ও পরিকল্পনার মধ্যেও থাকবে দ্বন্দ্ব কারণ মানুষের হাতে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ ঘটলেই তার সঙ্গে সব থেকে নিখুঁত পরিকল্পনার ছকেরও একটা লড়াই বাধবেই। তৃতীয়ত মানুষের চেতন মন ও তার অজ্ঞানিত অভিজ্ঞতাজাত অবচেতনের অবরুদ্ধ বাসনা-কামনার মধ্যেও বিরোধ আছে। এর ভিতর দিয়েই বিকশিত হয় মানুষের ব্যাক্তিত্ব। আর্টের কাজ বিশেষ করে এই বিরোধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনা—বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়, এর জন্য শিল্পীকে করতে হয় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের সাফল্যের জন্যই প্রয়োজন বৈষয়িক দিক দিয়ে তাঁকে সমস্ত বিরোধ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া। একটি ব্যক্তিত্ব অর্জনের ও অন্যটি ব্যক্তিত্ব নাশের সহায়ক—এই রকম দুই ধরনের বিরোধ একসঙ্গে চলতে থাকলে অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য।

সমাজতন্ত্রে সাহিত্যিক বা শিল্পী অন্য মানুষের মত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশৃঙ্খলা থেকেই শুধু রেহাই পাবেন না তিনি অংশ গ্রহণ করবেন পরিকল্পনার কাজে।—এমনকি পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাবেনও তিনিই। সামাজিক জীবন যতই মানুষের করায়ত্ত হবে ততই তার অন্তরের গভীরের যে সব বাসনা কামনার বিক্ষোভ রয়েছে তার সঙ্গে বোঝাপড়া সহজ হয়ে উঠবে। সেই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই ক্রমে দেখা দেবে নূতন, উন্নততর সমাজচিন্তা।

চিন্মোহন সেহানবীশ

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম কাটা গেছে ? দু'চোখ জলে ওঠে পাকার, কেন ?

তোমার মত ছেলেকে আমরা চাই না পাকা।

কি করেছি আমি ?

বদ ছেলেদের এখানে স্থান হয় না ভাই।

অন্য যে কোন মানুষকে যা-তা বলা যায় রাগের মাথায়, কালীনাথকে গাল দেওয়া যায় না। পাকা অনুযোগের সুরে বলে, এ আপনার অন্যায় কালীদা। আমি বদ, আমার নাম কেটে দিলেন, আমায় বলবেন না আমি কি করেছি ?

তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছ।

এখনো সতেজে কথা বলছে ছেলেটা। এই বয়সে চরম অধঃপাতে গেছে অথচ সোজাসুজি মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে সহজ ও স্পষ্ট। পোকায় না ধরলে কী যে তৈরী করা যেত একে ! মনের মত একটা আগুনের গোলা।

সিগ্রেট খাই, আড্ডা মেরে বেড়াই বলে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায় কালীনাথ।—তুমি চাল মারছ না সত্যি সরল ভাবেই কথা বলছ বুঝতে পারছি না। তুমি কি শুধু সিগ্রেট খাও, আড্ডা মেরে বেড়াও ? ওসব দোষ আছে জেনেই তোমায় ক্লাবে নিয়েছিলাম। ও দোষগুলি ধরিনি। যে সব ছেলের এনার্জি বেশি থাকে, ঠিক মত ট্রেনিং না পেলে তাবা একটু ওরকম বিগড়ে যায়— এনার্জির আউট লেট চাই তো। আবার দুদিনে শুধরেও নেওয়া যায় ওদের। গোবেচারী ভাল ছেলের চেয়ে এরকম ছেলেদের দিয়েই বরং কাজ হয়, মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছ, তোমাকে দিয়ে আর কোন আশা নেই।

পাকা চেয়েই থাকে জিজ্ঞাসু চোখে।

কালীনাথ আবার বলে, আজ তোমায় বলতে বাধা নেই, তোমার কাছে অনেক আশা করেছিলাম পাকা। অদ্ভুত প্রাণশক্তি দেখেছিলাম তোমার মধ্যে, তেজ আর সাহস। ময়দানে যেদিন চারজন গুণ্ডার সামনে একা রুখে দাঁড়িয়েছিলে, শঙ্করের কাছে শুনেই পরদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তোমায় ডিসিপ্লিন মানানো কঠিন হবে জানতাম, কিন্তু সেজন্য ভাবিনি। আমার সত্যি বিশ্বাস ছিল, অল্পে অল্পে তোমাকে ক্লাবের সেরা ছেলে করে তুলতে পারব। তোমার তুলনা থাকবে না। সারা দেশ একদিন তোমায় নিয়ে গর্ব করবে।

নিন্দা নয়, সমালোচনা নয়, আন্তরিক আপশোষ। কালীনাথের আবেগ ও দরদে ফাঁকি নেই। বুকটা তোলপাড় করে পাকার। ক্লাবের ছেলেরা ব্যায়াম করে চলেছে, ডন বৈঠক

কুস্তি, মুগুর ভাঁজা লাঠি ছোরা খেলা, মুষ্টি যুদ্ধ, যুযুৎসু। সুন্দর সুগঠিত শরীরগুলি, নতুন কয়েকটি ছেলের শরীর গড়ে উঠছে। শঙ্করও আছে ওদের মধ্যে। ময়দানে দুটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল চারজন গুণ্ডা গোছের যোয়ান ছোকরা একদিন সন্ধ্যাবেলা। পাকা একাই এগিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু দেহটা আস্ত থাকবে এ ভরসা রাখেনি। তবে মেয়ে দুটি সরে পড়তে পারবে সে কাবু হতে হতে এটুকু জানত। কিন্তু মারামারি বাধতে না বাধতে চার জনেই আচমকা দৌড় দিয়েছিল পাশের নালা ডিঙিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে।

সাইকেল থেকে নেমে শঙ্কর আপশোষ করে বলেছিল, পালিয়ে গেল!

সেই দিন থেকে পাকার মনে গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ জেগেছে কালীনাথের ক্লাবের প্রতি। যে ক্লাবের একটি ছেলেকে আসতে দেখেই চার জন গুণ্ডা মরি কি বাঁচি ভাবে পালায় সে ক্লাব তো সামান্য নয়।

আমার স্বভাব খারাপ জেনেই ক্লাবে নিয়েছিলেন বলেছেন, তবে কেন তাড়াচ্ছেন কালীদা?

আগে জানতাম না তুমি বেশ্যা বাড়ি যাও, বস্তিতে গিয়ে তাড়ি খেয়ে হৈ চৈ কর।

ও! এবার বুঝতে পেরে পাকা মাথা হেঁট করে। এই দোষ দুটি এতক্ষণ তার মনে আড্ডা মারা হৈ চৈ করে বেড়ানোর অন্তর্গত হয়েই ছিল।

কালীনাথ বলে, যদি পার নিজেকে শুধরে নিও ভাই। এ ভাবে নষ্ট করার জন্য মানুষের জীবন নয়। কত মহান আদর্শ আছে সাধনা আছে, কাজ আছে জীবনে, সমস্ত ভবিষ্যতটা তোমার সামনে...

মাথা হেঁট করে শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু হতে থাকে পাকার। উপদেশ তার সয় না, কোন অবস্থাতে কারো কাছ থেকেই না।

...নিজেকে যদি বদলে নিয়ে মানুষ করে তুলতে পার ভাই, সবার চেয়ে আমি বেশি খুশি হব।

একটা কথা বিশ্বাস করবেন কালীদা? আমি বেশ্যাবাড়ি যাই না, তাড়ি খাই না। দুদিন শুধু গিয়েছিলাম ওরা কিরকম দেখবার জন্যে, একটুক্ষণ থেকেই চলে এসেছি। আর ওই গরীব দুঃখী ছোটলোকদের সঙ্গে মিশতে আমার ভাল লাগে তাই মাঝে মাঝে যাই, তাড়ি খেতে নয়।

কালীনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। সরল হলেও বোকা নয় পাকা। সে জানে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালীনাথ ভাবছে, এ তার চালাকি। বিশ্বাস করলেও তাতে দোষ কাটানো যায় না। বেশ্যা বাড়ি যাওয়াটাই কম গুরুতর অপরাধ নয়, তাড়ির ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকানো। কিন্তু হৃদয় যে এদিকে তার প্রচণ্ড আবেগে ঠেলে উঠছে, কোন মতে মানতে চাইছে না আজ থেকে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। মাঝখানে কয়েকদিন একটু উদাসীন ভাব এসেছিল খানিক আগে, পাকা নিজেও জানত না ক্লাবের জন্য তার এত মায়া, ক্লাব ছাড়তে গিয়ে মনে হবে সব ফুরিয়ে গেল, সর্বনাশ হল তার। দুহাতে ক্লাবের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে।

সত্যি বলছি কালীদা, আমার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়নি। কোনদিন এক ফোঁটা তাড়ি আমি গিলিনি। আমায় আরেকটা চান্স দিন!

আর্ত আবেদন জানায় পাকা।

তা হয় না পাকা।

আমি আজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে ক্লাবের নিয়ম মেনে চলব প্রতিজ্ঞা করছি। সিগারেট ছোঁব না, আড্ডা দেব না—

তা হয় না ভাই। আমাকে ক্লাবের ডিসিপ্লিন বজায় রাখতেই হবে। তোমায় আরেকটা চান্স দিলে অন্য ছেলেদের নিয়মনিষ্ঠা দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রলোভনে পড়লে মনে হবে, একবার ভুল করলেও চান্স পাওয়া যায়। ক্লাবে নাই বা রইলে, নিজেকে বদলে ফেল। ইচ্ছে হলেই এসো আমার কাছে।

অমিতাভের সঙ্গে কানাই আসে আখড়ায়। পাকার রাত-জাগা শুকনো মুখ দেখে অমিতাভ বলে, অসুখ করেছে ?

না। তুই ক্লাবে ঢুকেছিস নাকি কানাই ?

কানাই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না।

পাকা বেরিয়ে যায়। ব্যায়ামরত ছেলেদের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে পারে না। দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করে অপমানে, অভিমানে। তাড়িয়ে দিয়েছে! কানাইকে বরণ করে নিয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব থেকে! চলতে চলতে বাড়তে থাকে জ্বালা আর আক্রোশ। আজ থেকে সে শত্রু কালীদার, কালীদার ক্লাবের। মহান আদর্শের জন্য ক্লাব করেছে না কচু! মারপিট করার জন্য তৈরী করছে কতগুলি গুণ্ডা। সেও একটা ক্লাব করবে। কালীদার ক্লাবে আর কটা ছেলে, তার ক্লাবে মেম্বার হবে একশো।

সুধা বলে, তুমি সত্যি অধঃপাতে গেছ পাকা।

বেশ করেছি। একশোবার অধঃপাতে যাব। তোমাদের কি ?

পড়ার টেবিলে দু'হাতে মাথা গুঁজে দেয় পাকা।

সুধা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাকা কাঁদছে! তাকে কখনো কাঁদতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না সুধা।

পাকাও তবে কাঁদে ? ওর কাঁদুনে মুখখানা দেখতে বড় সাধ হয় সুধার।

কি হল ? চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে সে তুলবার চেষ্টা করে পাকার মুখ।

যাও, যাও, চাই না তোমাদের। আমায় কেউ ভালবাসে না, দেখতে পারে না। কাউকে চাই না আমি।

যাঃ, ও কথা বলতে নেই।

এবার জোর করে পাকার মাথা তুলে সুধা বুকে চেপে ধরে। চোখের জলে ভেসে গেছে পাকার মুখ। রাতজাগা দু'চোখের গভীর দুরন্ত ব্যথা প্রায় অভিভূত করে দেয় সুধাকে।

ছি, একটু বকেছি বলে এমন করে? রাত জেগে বুঝি বিগড়ে গেছে মাথা? যে ভালবাসে সেই বকুনি দেয়, বোকা ছেলে। চলো, এখুনি চান করে একবাটি গরম দুধ গিলে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানা নেবে। নইলে শুধু বকুনি নয়, মেরে আস্ত রাখব না।

নতুনমামী, আমি খুব খারাপ, না ?

না, তুমি খুউব ভালো। ওঠো দিকি এবার।

তিন

শহর তোলপাড় কদিন থেকে। ঘটনাটাই একটা চমক, শান্ত অহিংস ভদ্র শহরের ঘাড় ধরা ঝাঁকুনি। তার উপর পুলিসের আকস্মিক কর্মতৎপরতা, খোঁজ খবর জিজ্ঞাসাবাদ খানাতল্লাসের হিড়িক—গ্রেপ্তার। অন্দরে বাইরে রাস্তায় বাজারে স্কুলে কাছারিতে লোকের মুখে অন্য কথা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে নিচু গলায় কানাকানি ফিসফাস কথা, সতর্ক হওয়া ভাল, কে চর, কে শত্রু, কে জানে! মুখোশপরা স্বদেশী ডাকাত কেড়ে নিয়েছে নলিনী দারোগার বৌয়ের গায়ের গয়না—বিয়ের গয়না বাদ দিয়ে! বলেছে, মাগো, পাপের বোঝা খানিক হালকা করে দিলাম, এবার একদিন পাপটার কবল থেকে মুক্তি দেব তোমায়! কতকাল এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি এ শহরে, অহিংস অসহযোগের আগে তখনকার পুলিস সায়েব ডেভিসকে স্টেসনে মারবার সেই চেষ্টার পর থেকে। বছর গুনে হয়তো খুব পুরানো নয়, অহিংসার বন্যাই যেন স্মৃতিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে দূর অতীতে। নগেন বোসের ছেলে পনের যোল বছর বয়সের বাচ্চা, নারায়ণ গিয়েছিল পিস্তল নিয়ে, একা। গুলিটা বেরিয়েছিল ঘোড়া টেপার দশ পনের সেকেণ্ড পরে পিস্তলটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার সময়, ডেভিসের বুকের বদলে ভেদ করেছিল শেষ বেলার নীল আকাশ। এবার পিস্তল ছিল চারজনের হাতেই। দেখেই কেঁউ কেঁউ করে উঠেছিল মেয়েদের সঙ্গে চাকর আর্দালি আর নলিনীর শালা। পিস্তল নিয়ে ডাকাতিটুকুই যথেষ্ট ছিল শহরকে নাড়া দেবার পক্ষে, ওদের শাসানিটা চরমে তুলে দিয়েছে উত্তেজনা। এই শেষ নয়, এ শুধু ভূমিকা, আরও আছে ভবিষ্যতে!

রাত আড়াইটে তিনটের সময় জনহীন পথের ঘটনা, কিন্তু তার খুঁটিনাটি বিবরণও জানাজানি হয়ে গেছে। নলিনী অবশ্য ভয়ঙ্কর হুমকির সঙ্গে হুকুম দিয়েছিল সকলকে বাইরের লোকের কাছে মুখ বুজে থাকতে। শ্যামলী কি পারে সে হুকুম মানতে, পাড়ার মেয়েদের কাছে কি কি গয়না গেছে তার ফর্দ আর কি ভাবে গেছে তার রঙদার বর্ণনা দাখিল না করে বাঁচতে। ইয়ার বন্ধু আছে নলিনীর শালা সুখেন্দুর। চাকরটা আর্দালিটা গাড়োয়ানটারও কি নেই।

ভদ্রলোকেরা সন্ত্রস্ত, ব্যক্তিগতভাবে যেন বিপন্নও। শঙ্কা ও উত্তেজনা চাপতে আরও বেশি ধীর স্থির। গভীর বিরক্তি আর আপশোষ যে, কি কাণ্ড করে গুণ্ডাগুলি! বয়াটে বখাটে ছোঁড়াকটা গা ঢাকা দেবে, টানা হেঁচরা চলবে নির্দোষী ছেলেদের নিয়ে। তবে, নলিনীরও বড় বাড়াবাড়ি, ইয়ংম্যান সব, এমনিতেই রক্ত গরম...। দেশের নামে মেয়েছেলের গয়না কেড়ে নেওয়া, গয়না পরা মেয়েরা বলে, উচিত নয়, ছি। তবে, মাগীরও বড্ড গুমোর বেড়েছিল, সোণাদানা যেন কারো নেই আর, উনি একাই গয়না পরেন! যুবকদের অনেকটা থমথমে ভাব, অসীম কৌতূহল জিজ্ঞাসা আর সংশয়, এলোপাথারি তর্ক কিন্তু হাতাহাতি নয়। ব্যাপারটা নলিনী-ঘটিত, তর্কের সময়ও দু'পক্ষের মাঝখানে তার অদৃশ্য উপস্থিতি ভোলা যায় না, ঘোচানো যায় না কিছুতেই, মুখের বদলে হাতাহাতি তর্ক চলাবার মত গরম হয়ে উঠতে পারে না তার্কিকেরা। ছেলেদের বিস্ফারিত চোখ, আবেগে গলায় আটকে আটকে যাওয়া কথা, যার মতে এটা অন্যায় কাজ, তারও। নিন্দা করা যায় কাজটার, কাপুরুষ বলা যায় আর

ভাবা যায় ডাকাতদের, কিন্তু কোন তরুণ বা কিশোরের সাধ্য কি যে অখুশি হয় নলিনী দারোগার বৌয়ের গয়না লুট হয়েছে বলে।

গরীব সাধারণ মানুষের মধ্যে অতটা উত্তেজনা নেই, যা আছে তাও অন্য ধরনের। রূপকথার মত তাদের মুগ্ধ করে ডাকাতির গল্প, স্বদেশী বাবুদের দুঃসাহসে তারা অবাক, নলিনীর ক্ষতি ও লাঞ্ছনায় উল্লসিত। হাতুড়ি চালাতে, চাক ঘুরোতে, তাঁত বুনতে, ঘর বানাতে সারাতে, সাইকেল বাসন আসবাব মেরামতে, মাছ ধরতে, কাট চিরতে, রাস্তা সারাতে, গাড়ি হাঁকাতে, মোট বইতে, চামড়া পাকাতে, বেসাতি নিয়ে এসে বাজারে বসতে জোরদার বলাবলির সময় বা সুযোগ কম, কাজ শেষের ক্লান্ত অবসরেও পেট-বুকের ভালমন্দের কথায় বার বার চাপা পড়ে যায় ও আলোচনা। তবু ঘুরে ফিরে বার বার কথাটা ওঠে, স্বদেশী বাবুরা বৌয়ের গয়না নিয়েছে, খুনেটাকে খুনও করবে!

ডেভিসের চেয়ে কার্লটন চালাক বেশি, একটু পিছনে, আড়ালেই থাকে নিজে, যা কিছু করার করায় নলিনীকে দিয়ে। নলিনীকেই লোকে ভয় করে, ঘৃণা করে বেশি। সাদা হাতের চেয়ে হাতের কালো চাবুকটাকে।

সার্চ চলে চারিদিকে, সকলের আগে কালীনাথের অগ্রণী ক্লাব, সাধনা সঙ্ঘ, ক্লাব ও সঙ্ঘের সভ্য ও পুরানো দিনের ছাপ মারা কয়েকজন বিপ্লবপন্থীর বাড়িতে। সাধনা সঙ্ঘ একটি ছোটখাট লাইব্রেরী, জেল ফেরত প্রৌঢ় বয়সী আগের যুগের স্বদেশী ডাকাত বিপিন দত্তের বাড়িতে একটি আলমারি ও একটি বুক শেলফ নিয়ে। তাতে সাজানো থাকে শুধু দর্শন ও যোগ-সাধনের বই। সঙ্গে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভূমার বিচার বিশ্লেষণ, যোগসাধনার লাভালাভ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তা অধিকাংশ দিন বিপিন, মাঝে মাঝে তার সহযোগী দীনেশ দাস। নারায়ণ মাঝে মাঝে এখানে আসে। বছর খানেক আগে ছাড়া পেয়ে সে বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে আছে। রসিকের সাইকেল সারাই-এর কারখানা আর বাড়ি তাল্লাস করা হল তন্ন তন্ন করে, কানাইকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, মুখ চোখ ফুলিয়ে কানাই ফিরে এল। রাত্রে জ্বর এল হু হু করে। থিয়েটার দেখতে দেখতে উঠে গিয়ে সে বাড়ি ফেরেনি, রাত্রে শুয়েছিল সমরের বাড়িতে। সার্চ করা হল সমরের বাড়ি। তার বাবা দুর্গাপদ আদালতের পেস্কার। যাকে তাকে বাড়িতে আনার জন্য ছেলেকে সে একটা চাপড় মেরে বসল পুলিস বাড়ি ছেড়ে যাবার পর। সমর এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে, দশবারদিন পরে খোঁজ পেয়ে দুর্গাপদকেই কলকাতা গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হল যাকে তাকে বাড়িতে আনাব তার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিয়ে। অমিতাভ একবার গ্রেপ্তার হল ঘটনার পরদিন দুপুরে, রাত দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল জান বাজারের রাস্তা ধরে, সে পথ সোজা গিয়েছে ঘটনাস্থলের দিকে। ডাক্তার এন. রায় চৌধুরী স্বীকার করল যে মাঝ রাতে অমিতাভ এসেছিল মার কলিকের ব্যথার জন্য তাকে ডাকতে, সে যায়নি, তবে ওষুধ দিয়েছিল আর ব্যবস্থা। দুদিন পরে ছাড়া পেল অমিতাভ, আবার গ্রেপ্তার হল তিনদিন পরে কলকাতা ফিরবার সময় স্টেসনে। হাজত থেকে আবার ছাড়া পেল কিন্তু বঞ্চিত হল ম্যাজিষ্ট্রের লিখিত হুকুম ছাড়া শহর ছেড়ে যাবার বা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে আসার অধিকার থেকে। নারায়ণ বোসের বাড়ি সার্চ করা হল দু'বার, চার পাঁচ বার থানায় গিয়ে তাকে প্রমাণ দিতে হল সে বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি ঘটনার রাত্রে, দশটার হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল,

রাত তিনটের হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল। সিদ্দিকের দর্জির দোকানেও একদিন হানা দিল পুলিস, এগার জন সাসপেক্ট এত দর্জি থাকতে শুধু সিদ্দিককে জামা বানাবার অর্ডার দেয়। দোকান ও পিছনেব বসবাসের ঘর দু'খানা চাব ঘণ্টা ধবে তাল্লাস করা হল! রমেশ আর কান্তি প্রায়ই যায় দীপ্তির বাড়ি, দীপ্তি প্রায়ই যায় কালীনাথের কাছে, থার্ড ক্লাশের অতটুকু মেয়ে স্কুলের মেবেদের সভায় জোরালো বক্তৃতা দেয় স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হবাব আহ্বান জানিয়ে (হেড মিস্ট্রেস মিসেস তরফদাবের কড়া চিঠির জবাবে অবশ্য দীপ্তিব বাবা রজনী সিকদার জানিয়েছেন মেযে তার ভবিষ্যতে কখনো ওরকম পাগলামী করবে না) তাকেও জেরা কবা হল। শহর থেকে বাইরে যাবার পথের মোড়ে মোতাযেন পুলিস তাল্লাস কবতে লাগল পথিকেব মোটঘাট, গাড়ির মালপত্র। স্টেসনে তছনছ করা হতে লাগল যাত্রীব বাক্স পেঁটরা শ্যামলীর গয়নাব সন্ধানে।

বেশ একটু দিশেহারা ভাব পুলিসের, যাকে তাকে সন্দেহ করছে, যেখানে সেখানে ঢুঁ মারছে।

তখন কলকাতা থেকে এল স্পেসালিস্ট রায় বাহাদুব এন. এন. ঘোষাল। ঘোলাটে ফর্সা মুখে বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিকেব শান্ত সমাহিত ভাব, চোখে ভাবুক কবির অন্যমনা উদার দৃষ্টি। একটা দিন থেকেই সে ফিরে গেল, বেলা তিনটের গাড়িতে। পরদিন অদৃশ্য হয়ে গেল পথেব মোড়ে, স্টেসনে বাজারে মোতায়েন বাড়তি পুলিস. খানাতল্লাস ও যখন তখন যাকে তাকে টানাটানি ও গ্রেপ্তাব প্রায় বন্ধ হযে গেল। শ্যামলীর গয়না ডাকাতি হবার মত তুচ্ছ বিষয় যেন হঠাৎ তুচ্ছই হয়ে গেল পুলিশের কাছে। শুধু বোঝা গেল, নজর কড়া হয়েছে। সাদা চোখ কানেব সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, কয়েকজনের চলাফেরা গতিবিধি চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে চোখগুলি, সবার সাথে মিশে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কে কি বলে কানগুলি শুনছে।

কলকাতা ফিরবাব দিন সকালে এন. এন. ঘোষাল দেখা করতে এল ভৈরবের সঙ্গে। পিসীর জা-এর মেয়ের জামায়ের মত কোন একটা সম্পর্কে সে ভৈরবের ভগ্নীপতি হয়।

কেমন আছেন রায় বাহাদুর?

আসুন রায় বাহাদুর।

আত্মীয়তামূলক ভদ্র আলাপ চলে, নিকট ও দূর আত্মীয়কুটুম্বেব সংসারে বিবাহ মৃত্যু পাস ফেল চাকবি বাকরিব সংবাদ আদান প্রদান।

এই ব্যাপারে এসেছেন? ভৈরব জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণ পরে।

হ্যাঁ, তা ছাড়া কি।

কি যে দাঁড়াচ্ছে ছেলেগুলো আজকাল, ভৈরব আপশোষ কবে, ধর্ম নেই, নীতিজ্ঞান নেই, অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল, যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। গান্ধীজীর প্রভাবে আর কিছু না হোক, এসব চাপা পড়ে যাবে ভেবেছিলাম, একটু সংযত হবে। এইজন্য চরকায় এত জোর দেন গান্ধীজী, আমার যা মনে হয়। এমনি নিয়মনিষ্ঠা তো মানবে না কিছু, তবু নিয়মমত চরকা কাটলে মনটা শান্ত থাকবে। তা, চরকাও ছোঁয় না ছোঁড়াগুলি। আচ্ছা রায় বাহাদুর, একটা কথা মনে হয়। স্বদেশী ছেলের নামে সাধারণ চোর গুণ্ডার কাজ হতে পারে না?

রিভলবার পাবে কোথা ?

ও, হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা, খেয়াল ছিল না। তা, কদিন চলবে এরকম ?

আর চলবে না। নলিনী একটা গোমুখ্যু। তেমনি মুখ্যু কার্লটন আর আপনাদের নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলি। সবে বিলেত থেকে এসেছে, কিছু জানেও না, বোঝেও না।

ওই সাদা মুখ্যুরাই তো চালাচ্ছে !

তা নয় রায়বাহাদুর, তা নয়। চালাচ্ছি আমরাই, কালা আদমিরা। আমাদেরি ব্রেন, আমাদেরি ওয়ার্ক, ওরা সেটা শুধু কাজে লাগায়। ওরা স্রেফ ঠুলো জগন্নাথ, আমরাই দড়ি টেনে রথ চালাই। একটু থেমে ঘোষাল বলে, পাকা নাকি আপনার কাছে থেকে পড়ে ? ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শরীর খুব খারাপ দেখলাম। বহুকাল পরে দেখা, কি রকম বদলে গেছে মানুষটা। পাকা কোন ক্লাসে পড়ে ?

সেকেণ্ড ক্লাসে। বড় দুরন্ত ছেলে, বড় অবাধ্য। ওরে কাঞ্চা পাকা বাবু আছে নাকি ডাক তো।

চা মিষ্টির সঙ্গেই প্রায় পাকা আসে। ঘোষাল সস্নেহে বলে, তুমি পাকা ? কত বড় হয়ে গেছ ! আমি তোমার মেসোমশাই হই। তোমায় আগে দেখেছিলাম, দাঁড়াও দেখি হিসেব করে। তের না চোদ্দসালে, দুমকায়। তুমি তখন এইটুকু বাচ্চা। আমায় দেখলেই বলতে, মুমু, মুমু, লজেন ? রোজ পকেটে করে তোমার জন্যে চকোলেট লজেন্স নিয়ে যেতে হত। তোমার মা বলতেন—

মা তো বেঁচে নেই।

চুরমার হয়ে যায় আত্মীয়তা অমায়িকতা স্নেহপ্রীতির সংগঠন, বুঝি বা রবারধর্মী ভদ্রতাও। একি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে, এসময় এমন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে এভাবে বলে তার মা তো বেঁচে নেই ! তিন বছর আগে তার মা মরেছে এ খবরটা যেন কেউ রাখে না।

বিব্রত ভৈরব বলে, মেসোমশায়কে প্রণাম করলে না পাকা ?

একটু থতমত খাওয়া ঘোষাল বলে, থাক, থাক। তোমার মার কথা জানি ভাই। পাকাকে ভাই বলে ঘোষাল, বলে খেয়ালও হয় না। অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রকমই এই কয়েকটা ফলা চকচকে ধারালো হয়, কয়েকটা মেরে যায় ভোঁতা।

—শুভাদি আমায় আচার খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। কি সখ ছিল আচার করার। দিনাজপুরে একবার আমাকে সাতরকম আচার খাইয়েছিলেন, তুমি তখনো হওনি।

মা তো বলেনি আপনার কথা ?

বলেছে, তুমি ভুলে গেছ।

এতক্ষণে পাকাকে একটু নরম, একটু উৎসাহী মনে হয়।

মার এগারটা আচারের জার ছিল। শ্মশান থেকে ফিরে আমি সব কটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলাম। বলুন না মেসোমশাই, আচারের জার দেখে, কার্পেট দেখে, ফটো দেখে মাকে মনে রাখতে হবে ? ওরকম মনে নাই বা রাখলাম !

বোসো পাকা, দাঁড়িয়ে কেন ? ঘোষাল তার সঙ্গে সস্নেহ আলাপ করে—এবার গুরুজনের বদলে খানিকটা বন্ধুর মত সস্নেহে।

সুধার কাছে সগর্বে বলে পাকা, জানো নতুন মামী আমি ইচ্ছে করলেই কালীদাকে

আচ্ছা জব্দ করতে পারতাম। মেসোমশায়কে বলে দিলেই হত। নাম কাটার মজা টের পেত কালীদা। ইচ্ছে করে বললাম না।

সুধা চমকে ওঠে, কি বললে না পাকা ?

তা শুনে কি করবে তুমি ? শোধ নিতে পারতাম, নিলাম না, বাস্।

সুধা হাত চেপে ধরে পাকার, আমায় বলো।

দারুণ বিব্রত হয়ে পড়ে পাকা। একি মুস্কিল হল! বলবে নতুন মামীকে ? না বললে ভয়ানক রাগ করবে নতুন মামী। বললে যদি জানাজানি হয়ে যায় ? যে গল্প করার স্বভাব নতুন মামীর!

তামাসা করছিলাম নতুন মামী। আমি জানি না কিছু।

আমায় চুপি চুপি বলো পাকা। আমি কাউকে বলব না।

আমি সত্যি কিছু জানি না।

তোমার এসব ইয়ার্কি বিশ্রী লাগে পাকা। আমি তোমার গুরুজন।

সুধা দুপ্‌দাপ্ পা ফেলে চলে যায়। মুখখানা বিপন্ন করে পাকা চেয়ে থাকে। নরেশের কাছে শুনেছে সে কথাটা। নির্বিবাদে সোজাসুজি তাকে কানাই-এর দলে যাবার অনুমতি দেওয়ায় আহত ক্ষুব্ধ অভিমানী নরেশ একা বাড়ি চলে গিয়েছিল আর থিয়েটার না দেখে। যেখানে ডাকাতি হয় তার কাছে রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'জন কথা বলছিল! সে কাছে আসতে আসতে রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে আরম্ভ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল কালীনাথ, অন্যজন সরে গিয়েছিল আড়ালে। তাকে ঠিক চিনতে পারেনি নরেশ, মনে হয়েছিল নারায়ণ হবে! বাড়ি বয়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে নরেশ পাকাকে জানিয়েছে সব। পাকা তাকে বারণ করে দিয়েছে কারো কাছে একথা বলতে, বললে জীবনে কখনো সে তার সঙ্গে কথা কইবে না। নরেশ মুখ বুজে থাকবে, পাকা জানে। বোকার মত সে যে কেন বাহাদুরী করতে গেল নতুন মামীর কাছে!

সত্যই কি আর সে পুলিসের লোকটাকে বলত, না, ইচ্ছাও তার হয়েছিল বলতে। ঘোষাল মেসোমশায়ের সঙ্গে কথায় কথায় কি ভাবে যেন ক্লাবের কথা উঠেছিল, তখন শুধু একবার তার মনে হয়েছিল, সে ইচ্ছা করলে কালীদাকে বিপদে ফেলতে পাবে।

খবর পেয়ে শেষ মুহূর্তে কালীনাথ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে গিয়েছিল। ভরসা খুব বেশি ছিল না, নারাণ বোসের যেমন প্রাণের মায়া নেই এতটুকু, তেমনি আবার ঠিক করে ফেলা কর্তব্যে তার মমতা অটল। সে নিষ্ঠায় তখন যুক্তি তর্ক মিছে, অচল।

নারাণ, আমি কালীনাথ। কথা আছে।

বিরক্ত হয়েছিল নারায়ণ। শ্যামলীর গাড়ি কখন এসে পড়ে ঠিক নেই। রাত আড়াইটে বেজে গেছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল শ্যামলীর। এমনিই সে কখনো রাত জাগতে পারে না অথবা জাগে না, এখন আবার আছে কচি ছেলেটা। থিয়েটার থেকে তাকে রওনা হতে দেখলে কিশোর জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে বেলে

সঙ্কেত বাজিয়ে চলে যাবে সামনের রাস্তা দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে সে কিশোরকে প্রত্যাশা করছে। এই কি তর্কবিতর্কের সময়! তবু, আড়াল থেকে নারায়ণ উঠে আসে।

তোমায় আমি আবার অনুরোধ করছি নারায়ণ, এটা ক্যান্‌সেল করে দাও। তোমায় আগে বলিনি, এখন জানাচ্ছি, তোমায় এত করে বারণ করার আরেকটা কারণ আছে, আমরা একটা বড় প্ল্যান করেছি। কারো গয়না বা টাকা নয়, গবর্নমেণ্টের টাকা, পঞ্চাশ ষাট হাজার হবে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তাতে ব্যাঘাত ঘটিও না ভাই। আমাদের বিপ্লবীদের মধ্যে যদি এটুকু ঐক্য না থাকে, আমরা কোনদিন কিছুই করতে পারব না।

তুমি যদি খুলে বললে, আমিও বলি। আমারও বড় প্ল্যান আছে, শুধু এই গয়না ডাকাতি করা নয়। নলিনীকে শেষ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে নলিনী খুব বাড়াবাড়ি করলে, আজকের এটা দরকার হত না, সোজাসুজি ওকেই ঘা দিতাম। কিন্তু চারিদিক ঝিমিয়ে আছে, নলিনীরও লাফালাফি নেই, হঠাৎ ওকে মারলে তেমন এফেক্ট হবে না, সাড়া জাগবে না। আজকের ব্যাপারে ও ক্ষেপে যাবে, খুব দাপট চালাবে। তখন ওকে শেষ করব।

একজন দু'জন অফিসারকে মেরে কি বিশেষ লাভ আছে? সেদিন বোধ হয় চলে গেছে। আজ দরকার বড় দল করে সোজাসুজি গবর্নমেণ্টকে বড় ঘা মারা।

এসব কাজে বড় দল হয় না। অত ছেলে পাবে কোথায়? একজন দুর্বল থাকলে তার জন্য দল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তুমি ভুল বকছ কালীনাথ।

আমাদের দলে এমন একটি ছেলেও নেই, একটু একটু করে যার গায়ের চামড়া খুলে নিলেও যে মুখ খুলবে।

কি জানি।

এক কাজ কর। তোমরাও এসো আমাদের সঙ্গে, নলিনীকে খ্যাপাতে চাও, বড় ঘা খেয়ে ওরা সব কটাই ক্ষেপে যাবে। তখন তোমরা যাকে খুশি মেরো।

তোমাদের মধ্যে অনেক কাঁচা ছেলে। তুমি এত ঘাবড়েই বা যাচ্ছ কেন কালীনাথ? আজকের ব্যাপারে বড় জোর ওদের কড়াকড়িটা বাড়বে। সেজন্য ভয় পেলে চলে আমাদের? ওরা তো সতর্ক হবেই, কড়া ব্যবস্থা করবেই, আমরা আজ কিছু না করি, তোমার অপারেসনটার সঙ্গে সঙ্গে করবে। দু'দিন আগে আব পরে। ওটাই তো তোমার শেষ কাজ নয়? আবও তো প্ল্যান আছে—

শুধু তাই নয়, মেয়েদের গয়না লুট করা লোকে পছন্দ করে না। আমাদের যারা সমর্থন করে তাদের কথাই বলছি।

নলিনী দারোগার বৌ মেয়ে নয়।

রাতের শেষভাগে গাছের ফিকে চাঁদের আলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তারা মৃদুস্বরে তার কথা বলেছিল, দু'জনেই শান্ত, নিরুত্তেজ।

আরেকদিন আলোচনা করতে হবে। শেষ কথা বলেছিল কালীনাথ।

বেশ তো।

মুন্সেফ সুরেনবাবুর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে তাদের দেখা হল। ঘোষাল

এসে ফিরে যাবার কয়েকদিন পরেই। যার যার চলাফেরা ওঠা-বসা নিয়ন্ত্রণ করে নতুন নিষেধ জারি করা হয়েছিল সব তখন তুলে নেওয়া হয়েছে। এমন কি, নারায়ণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে বাড়ি থাকবার পুরানো হুকুমটাও বদলে হয়েছে মাঝরাত্রি থেকে বাড়ি থাকাব হুকুম। ঘোষাল নিজে থেকে তাকে হেসে বলেছিল, এদিকে রিভলবার নিয়ে সায়েব মারতে যান, সাধারণ বিষয়ে একেবারে উদাসীন আপনারা। সন্ধ্যা থেকে কোটরে ঢোকার হুকুম একটা দেওয়া হয়েছে, আপনিও তা মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ওসব হল ফর্মাল অর্ডার, একটা দিতে হয় তাই দেওয়া। একবছর তো হয়ে গেল, এবার একটা দরখাস্ত করুন? আপনি চুপ করে থাকলে কার গরজ পড়েছে মাথা ঘামাবার!

নারায়ণ উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, ঠিক কথা, খেয়াল হয়নি তো!

এতদিন দেয়নি, এখন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের হুকুম রদের প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত দেওয়া, শহরে এমন একটা ঘটনার পরেই! ভেবে চিন্তে তাই করেছিল নারায়ণ। ওরা যদি চায় সে একটু স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করুক, তার আপত্তি কিসের!

দেশে কে রাজা কে প্রজা, কে কেন ডাকাতি করে, পুলিস কেন তোলপাড় করে শহর এসব বিষয়ে স্নরেন একান্ত উদাসীন। মেয়ের বিয়েতে সে আয়োজন করে বিরাট ভোজের, সমস্ত শহরকে প্রায় নেমন্তন্ন করে।

ক্রমশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

India Struggles For Freedom : A History *By Hirendranath Mukerjee, M. A. (Cal. & Oxon), B. Litt (Oxon). Kutub. Bombay. Price : Standard Edition, Rs 4/- ; Library Edition, Rs 6/8/-*

হীরেনবাবু তাঁর বইটিকে ইতিহাস আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণত ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি এই বইটি তার চাইতে অনেক আলাদা। অধ্যাপক সিলি-র প্রখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে, "ইতিহাস বাদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূল্যহীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বর্জিত ইতিহাসের চর্চা নিষ্ফল।" ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার এই প্রচেষ্টা যে সার্থক হয়েছে তার কারণ লেখক শুধু সন তারিখের পরম্পরায় ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক লেখেননি—এই ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে ও তাদের তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ সাহিত্যিকের কলমে। বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও ইতিহাসের এ রকম নিখুঁৎ সমাবেশ অধ্যাপক সিলিরও সাধ্যায়ত্ত ছিলনা।

অবশ্য তাই বলে হীরেনবাবু যে এ বিষয়ে একেবারে পথিকৃৎ তা নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় জনস্বার্থের বিরোধ যে-বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে তার অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত আরো দুটি বইতে: রজনী পাম দত্তের 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' ও সেলভাংকারের 'দি প্রব্লেম্ অফ্ ইণ্ডিয়া'। এই বইদুটির মধ্যে প্রথমটির প্রভাব যে হীরেনবাবুর উপর বিশেষ ভাবে পড়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বইয়ের বহু উদ্ধৃতিতে ও মন্তব্যে। এতে তাঁর বইর কদর কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে। 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' বিরাট বই, সকলের পক্ষে তা পড়া সম্ভব নয়। এর পেছনে রয়েছে যে অপরিসীম গবেষণা, হীরেনবাবু অকুণ্ঠ ভাবে তার সাহায্য নিয়ে সাধারণ পাঠকদের কৃতজ্ঞ করেছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে, হীরেনবাবুর নিজের গবেষণাও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর বইতে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা ইতিপূর্বে আমাদের জানা ছিলনা। তা ছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আধুনিকতম বই বলে এতে ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আধুনিকতম পরিণতির (একেবারে ক্যাবিনেট মিশন পর্যন্ত) যে-বিবরণ পাওয়া যায় তা একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস। গত কয়েক বৎসরের অনেক ঘটনারই ছাপ আমাদের মনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিকের অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে সেগুলিকে বিচার করার ক্ষমতা আমাদের কজনের আছে?

পাম দত্ত ও সেলভাংকারের মতন হীরেনবাবুও এই অখণ্ড দৃষ্টি লাভ করেছেন মার্কসীয় দর্শনে জারিত হওয়ার ফলে। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় যাঁরা মার্ক্স-এর নামে নাক সিঁটকান, তাঁদের অবগতির জন্য বলা যেতে পারে, ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রকৃতি ও প্রভাব সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করে দেখান কার্ল মার্কস। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস্ এই কথা লেখেন:

গৃহবিবাদ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অন্তর্বিপ্লব, পরাধীনতা এবং দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ—

এই সকল বিচিত্র দুর্ঘটনার সমবেত ফলে দেশের যা ক্ষতি হয়েছে তা শুধু ওপর ওপর। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো একেবারে চুরমার করে ভেঙে দিয়েছে : এই ধ্বংসস্তূপে পুনর্গঠনের লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ভারতবাসীরা তাদের পুরানো জগৎকে হারিয়েছে, তার বদলে তারা নতুন কোনো জগতেরও সন্ধান পায়নি—এরই অপরিসীম বেদনার ছাপ পড়েছে তাদের উপস্থিত দুর্গতির ওপর, এরই ফলে বর্তমান ভারতবর্ষ তার আবহমান ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে হয়েছে সমূলে বিচ্ছিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ মার্ক্‌স্‌-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু বহুদিন পরে তাঁর বিখ্যাত 'ন্যাশন্যালিজম' বিষয়ক বক্তৃতাগুলিতে ভারতে ইংরেজ-শাসনের যে নিদারুণ ছবি তিনি এঁকেছিলেন তার সঙ্গে মার্ক্‌স্‌-এর উক্ত বর্ণনার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌', রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিকতম পরিভাষায় তা 'ইম্পিরিয়্যালিজম্‌' ছাড়া আর কিছু না।

মার্ক্‌স্‌ বৃটিশ-শাসনের ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন দূর থেকে—বৈজ্ঞানিকের চোখে। রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। শাসক ও শোষক ইংরেজেরই প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে যে-জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করল, সাহিত্যে তার দীপ্ত বিকাশ হ'ল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনায়। এই জাতীয়তাবোধেরই ফলে হ'ল ক্রমশ কংগ্রেসের উদ্ভব।

কংগ্রেসের জন্মকাহিনীর ভিতরে আরো একটু রহস্য আছে। হীরেনবাবু তার উল্লেখ করে বলেছেন :

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হিউম (অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান) ও ভিতরে ভিতরে (বড়লাট) লর্ড ডাফরিনেরও এতে বেশ একটু হাত ছিল।...ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তির প্রবাহকে প্রতিরোধ করা ও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা। তাই, ধূর্ত গবর্নমেণ্ট এই ভান করলেন যে ভারতব্যাপী জাগরণের তাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী পৃষ্ঠপোষক, নতুবা যে এই প্রবাহ একেবারে নাগালের বাইরে যায়।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট খুব হিসেব করেই চাল চেলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কপালদোষে বাজি মাৎ হোলো না। ক্রমশ কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াল সাম্রাজ্য-বিরোধী প্ল্যাটফর্‌ম্‌। সুতরাং সরকারী দপ্তরে কংগ্রেস 'রাজদ্রোহিতার কারখানা' আখ্যা পাবে তা আর বিচিত্র কি ?

যেহেতু হীরেনবাবু লিখেছেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এবং যেহেতু এই সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—সুতরাং কংগ্রেসের কাহিনী এই বইর প্রধান উপজীব্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাক্‌-কংগ্রেস যুগে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তার কথাও অবশ্য হীরেনবাবু লিখতে ভোলেন নি : যথা, ঠগী ও ডাকাতের কথা, ওয়াহাবিদের কথা, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কথা ও সিপাহী-বিদ্রোহের কথা। সেই যুগে প্রধানত মুসলিমদের মধ্যেই নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র ও ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশী শাসক ও এই শোষকদের আওতায় যে-নতুন মধ্যবিত্ত জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাথা তুলে উঠেছে তাদের সমবেত শোষণের বিরুদ্ধে প্রায়-সর্বস্বান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও চাষীদের চরম দুরবস্থার ফলেই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ব্রিটিশ-বিরোধী

আন্দোলন সারা দেশকে বারবার ক্ষুব্ধ করেছে ও এই বিক্ষোভে সম্প্রতি যোগ দিয়েছে নবজাগ্রত বিরাট মজদুর-শ্রেণী। এই ভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বৈতধারা পরিণত হয়েছে ভারতব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামে। গান্ধীজির আহ্বানে কংগ্রেস, আবেদন নিবেদনের পুরোণো পথ ত্যাগ করে, ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিয়ানে তৈরি পার্লামেণ্টারি পাকের রাঙতা-মোড়া মণ্ডার লোভ কাটিয়ে উঠে, দেশব্যাপী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। জাতীয় জীবনের এই গৌরবময় অধ্যায়ের বিবরণ হীরেনবাবু লিখেছেন তাঁর লেখনী-সুলভ উজ্জ্বল ভাষায়। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বের ত্রুটি কোথায় ও কেন জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ ও প্রচণ্ড ত্যাগ পরাজয়ের গ্লানিতে বারবার নিষ্ফল হয়েছে।

গান্ধিজি সম্বন্ধে হীরেনবাবু বলেছেন :

> গান্ধিজির কাছে ভারতবর্ষের ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন বিজেতাদের ভয় না করতে। আমাদের ঝিমিয়ে-পড়া মনকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের আত্ম-মর্যাদাকে করেছেন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্তা মূর্ত হয়েছে গান্ধিজির অবিচলিত স্থৈর্যে। তাই, তাঁর নেতৃত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রয়েছে যে-অসংগতি সে সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও আমাদের এত গ্লানি বোধ হয়। সম্ভবত, এইটুকু অসন্তোষ প্রকাশ করার অধিকার দেশের আছে। গান্ধিজি ভারতবর্ষকে এত বেশি দিয়েছেন বলেই স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষা হয় আরো বেশি পাবার।

গান্ধিজির অসংগতির যে-দৃষ্টান্ত হীরেনবাবু দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে আইন না-মানার অগ্নিময় প্রতিজ্ঞা সমগ্র দেশকে যখন এক করেছিল, সেই সময়ে পেশোয়ারে কয়েকটি গাড়োয়ালি হিন্দু সেপাই নিরস্ত্র মুসলমান জনতার উপর গুলি চালানোর হুকুম তামিল না করার অপরাধে সুকঠোর কারাদণ্ড লাভ করে। অতঃপর গান্ধি-আরউইন চুক্তিপত্র অনুসারে ঐ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে যাদের কারাদণ্ড হয়েছিল তারা সবাই পেল মুক্তি—ঐ গাড়োয়ালি সেপাইরা ছাড়া, কেন না তাদের খালাসের কোনো সর্ত গান্ধিজি করেননি। তাঁর মতে, "যে-সেপাই গুলি করবার হুকুম অগ্রাহ্য করে সে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।" অহিংসা-দর্শনের এই ব্যাখ্যা মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া সম্ভব বোধ হয় শুধু পট্টভি সীতারামইয়ার মতন গান্ধিজির শিষ্যদের পক্ষেই যিনি কংগ্রেসের 'অফিশিয়্যাল' ইতিহাসে এই গৌরবময় ঘটনাটিকে বেমালুম চেপে গিয়েছেন!

এই রকম আরো একাধিক অসংগতির উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলিকে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। গান্ধিজির চরিত্র ও তাঁর সমগ্র দর্শনের মধ্যে রয়েছে যে-বিরোধ ও যা স্পর্শ করেছে কংগ্রেসের কর্ম-নীতিকে এই জাতীয় অসংগতি তারই প্রতীক। তা ছাড়া অবশ্য আছে কংগ্রেসের মধ্যেই বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ যার ফলে কংগ্রেসের কর্ম-পরিকল্পনা সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে ও যুগ হতে যুগান্তরে পরিণতির সংকট-মুহূর্তে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রচণ্ড আবেগ বন্দী হয়েছে সহস্র জটিল পাকে। এর জন্যে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম-লীগও যে দায়ী হীরেনবাবু তা পরিষ্কার করে বলতে কসুর করেন নি : কোয়োদাই আজাম-এর উগ্রতার একাধিক দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে হীরেনবাবু ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার 'এ্যাকিলিস হীল' বলে বর্ণনা করেছেন। এতে অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অলংকার-প্রয়োগ-পটুতার

পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য যে অলংকার ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে তার প্রমাণ ইতিহাসের প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আলোচনা, এর পেছনে কুট ব্রিটিশ রাজনৈতিক চালের বিশ্লেষণ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক সংগ্রামের ভিত্তিতে এই সমস্যা-সমাধানের উপায় নির্দেশ।

এই সংগ্রামের উদ্বোধন হয় প্রধানত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে। ইংরেজি শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁদের করেছিল ইংরেজ-বিরোধী। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শে তাঁরা মর্মে মর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কিন্তু অর্থনীতিব দুর্নিবার তাগিদে (হীরেনবাবুর ভাষায় 'ইকনমিক ইম্পাবেটিভ্স্') তাঁরা কবডেন-ব্রাইট-গ্ল্যাডস্টোন-কীর্তিত অবাধ বাণিজ্য-নীতির পরিবর্তে গ্রহণ করলেন অষ্ট্রীয় ইকনমিষ্ট লিষ্ট-প্রচারিত সংরক্ষণ-নীতি। পরাধীন ভারতবর্ষে শোষক ইংবেজের অর্থনীতিকে বাতিল করে রাণাডে প্রতিষ্ঠা করলেন নব্য ভারতীয় অর্থনীতি। ভারতবর্ষে ক্রমশ হ'ল ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব—অবশ্য শাসকের পক্ষপুটে। এই নতুন শোষক-শ্রেণীব সমর্থক ও তাঁবেদার হয়ে উঠলেন ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁরা এক সময়ে ছিলেন মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূত, ইকনমিক ইম্পারেটিভ্স্-এর বাহক। এই 'ইম্পারেটিভ্স্'-এর প্রভাবে ক্রমশ মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে কৃষক ও মজুর। কিন্তু শিক্ষা-নায়করা আজো স্বপ্ন দেখছেন পার্লামেণ্টারি ডিমোক্রেসির। তাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার মতন আমরাও বিজ্ঞানের প্রয়োগে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি—কিন্তু গণতান্ত্রিক পথে। ধূর্ত ইংরেজ যে শাসন-ব্যবস্থার রকম-ফের করে এঁদের চোখে ধুলো দেবেন তা আর আশ্চর্য কি ?

এঁদের মধ্যে যাঁরা এখনো একেবারে অন্ধ হন নি, হীরেনবাবুর বইখানি দয়া ক'রে পড়লে তাঁদের চৈতন্য হতে পারে। আর যাঁরা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অর্ধপক্ক অধ্যাপকের মতন, মার্ক্স্‌বাদের স্বকৃত ব্যাখা ক'রে বলেন যে তা সোনার পাথর বাটি, কেননা 'স্বাধীনতা' ও 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' একসূত্রে গ্রথিত করা অসম্ভব, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের এই ইতিহাস পড়লে তাঁদেরও এই জ্ঞান হতে পারে যে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় সংগ্রাম ও এই সংগ্রামের জন্ম শাসক ও শোষকের সঙ্গে শাসিতের ও শোষিতের বিরোধে। যেহেতু এই বিরোধ একেবারে মৌলিক, সুতরাং কোনো না কোনোদিন এই সংগ্রাম অনিবার্য, যদিও তার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের সমর্থন ও ব্যাপক জাগরণের ওপর। ব্রিটিশ-ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় কী ভাবে এই মার্কসীয় তত্ত্ব স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা' মন-গড়া সোনার পাথর বাটির ছিদ্রান্বেষণের নৈয়ায়িক বিলাস ছেড়ে হীরেনবাবুর বই পড়লে সহজেই উপলব্ধি হবে।

যদিও এই বইটি অমূল্য তথ্যের ভাণ্ডার, কিন্তু নির্ঘণ্ট নাই বলে তথ্যানুসন্ধানী ছাত্রকে এই ভাণ্ডাবে কানা মাছিব মতন হাতড়ে হাতড়ে অস্থির হ'তে হয়। বইটির আর একটি ত্রুটি এই যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলিব বিষয়বস্তুর পরিচায়ক শিবোনামা না দিয়ে লেখক দিয়েছেন বাইবেল, সেক্সপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি। এগুলি উপযোগী সন্দেহ নাই এবং অত্যন্ত উপভোগ্য, কিন্তু অলংকরণ ও নামকরণ যে ঠিক এক জিনিস নয় এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান, কবি বা ঔপন্যাসিকের না হোক, ঐতিহাসিকের না থাকা অমার্জনীয় অপরাধ। হিরণকুমার সান্যাল

প্রান্তরের গান—নবেন্দু ঘোষ। মডার্ন পাবলিশার্স। চার টাকা।

হাওয়ার নিশানা—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়। চিত্রিতা প্রকাশিকা। তিন টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে রীতিমত রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা সুরু হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের জীবন আজ আর রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন নয়; সাম্প্রতিক রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক মানুষের জীবনকাহিনী রচনা আজ প্রায় অসম্ভব। সেদিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু যৌক্তিকতা ও সার্থকতা যতখানি, বিপদের আশঙ্কাও ঠিক ততখানি। রাজনৈতিক উপন্যাস নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উপন্যাস—সাম্প্রতিক ইতিহাস যে উপন্যাসের উপজীব্য। সামাজিক বাস্তববোধের অভাবে উপন্যাসের চাইতে ইতিহাস যদি প্রধান হয়ে ওঠে, উপন্যাসের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি প্রধান উপজীব্য না হয়ে শুধুমাত্র ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলার কাজে গৌণভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে সে উপন্যাস ঐতিহাসিক মর্যাদা কতখানি পাবে তা বিচারসাপেক্ষ হলেও কিন্তু উপন্যাস হিসাবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপন্যাসে সব চাইতে বড় কথা যেটা, তা হল লেখকের সামাজিক বাস্তব বোধ, জীবনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গতি, জীবন সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। রাজনীতিতে দল আজ প্রধান; লেখকের ওপর বিভিন্ন দলের পার্থক্য ও মতের প্রভাব কমবেশী কিছু পড়া স্বাভাবিক। তাঁর উপন্যাসে যে কোন মত সম্বন্ধে পক্ষপাত প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে এবং সাধারণত তা হয়েও থাকে। কিন্তু এই পক্ষপাত প্রকাশ সত্ত্বেও যদি সে উপন্যাস বিষয়মুখ ও বাস্তব হয়ে ওঠে, যদি জীবনের সঙ্গে লেখকের চিন্তাধারার সঙ্গতি থেকে থাকে, তা হলে উপন্যাস হিসাবে তা নিশ্চয়ই সার্থক হবার দাবী রাখে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্' রাজনৈতিক উপন্যাস, এই উপন্যাসের প্রচারের অংশটুকুর সঙ্গে প্রগতিশীল মতের বিরোধের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েটে এবং সর্বত্র 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্' মহৎ উপন্যাস বলে সমাদৃত। এর কারণ নিঃসন্দেহে লিও টলস্টয়ের বিষয়মুখ ও বাস্তব চিন্তাধারা।

শ্রীযুক্ত নবেন্দু ঘোষের 'প্রান্তরের গান' রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯৩৯ সাল থেকে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এর পটভূমি। "ধলেশ্বরী আর বুড়ীগঙ্গার তীরবর্তী সুন্দর গ্রাম কলাতিয়ায়, আম জাম নারকেল আর সুপারী গাছের নিবিড় ছায়ায় যেখানে মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, ভাঁট ফুল সন্টে ফুলের সমারোহের মধ্যে যেখানকার বেতবন আর বাঁশঝাড় শালিক ময়নাদের কাকলিতে সকাল সন্ধ্যে সর গরম হয়ে ওঠে" সেই গাঁয়ে ফিরে এল প্রবীর; গাঁয়েরই ছেলে, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সে। কলাতিয়ার মায়াময় পরিবেশে পাটকলের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করল। তারপর তাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য কিশোরী মাধবী আর জমিদার ও মিল-মালিকের বিদুষী তরুণী কন্যা শিখার সেই চিরন্তন প্রেমের ত্রিভুজ রচনা। নবেন্দুবাবুর নিরপেক্ষ ও সাধু উদ্দেশ্য সত্ত্বেও উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। তার জন্য দায়ী নবেন্দুবাবুর অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও অনেকাংশে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। কলাতিয়ার মায়াময়ী পরিবেশের ভেতর শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা, তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলন ফুটিয়ে তুলতে নবেন্দুবাবু যে কোন বাংলা সিনেমা পরিচালকের

চাইতে বেশী ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেই অশ্লীল ঝগড়া আর তাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কারের দু-একটি উদাহরণ পেরিয়ে শ্রমিকদের-জীবনের আরও গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি। নবেন্দুবাবুর শ্রমিকনেতা প্রবীর উদার হৃদয় 'দা-ঠাকুর'দের সেই চিরাচরিত সংস্করণ। নবেন্দুবাবুর লেখায় আগেও লক্ষ্য করেছি, শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বাস্তব জ্ঞানের যেন রীতিমত অভাব রয়ে গিয়েছে। সেই অভাবের ফলে শ্রমিকদের জীবন ও আন্দোলনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা একেবারেই পুঁথিগত ও নিষ্প্রাণ। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র সম্বন্ধেই কমবেশী এ কথা খাটে। মস্ত বড় একটা পটভূমিতে কতকগুলো প্রাণহীন পুতুল নিয়ে ইচ্ছামত খেলাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, জীবনের স্বাভাবিকতায় কোন চরিত্রই বেড়ে উঠতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে নবেন্দুবাবু প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রীতিমত আশ্চর্য লাগে, শিখার মত এরকম একটি দুর্বল ও অক্ষম চরিত্র তিনি সৃষ্টি করলেন কেমন করে? কোন পরিণতি নেই, কোন ঘাত-প্রতিঘাত নেই শিখার চরিত্রে। ত্রিভুজ প্রেমে ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নবেন্দুবাবু একরকম জোর করেই শিখাকে আমদানী করেছেন, পরে শিখার আত্মহত্যা ঘটিয়ে রেহাই পেতে চেয়েছেন। আগাগোড়া শিখা-চরিত্রের একটি মাত্র দিকই শুধু দেখান হয়েছে—প্রবীরের প্রতি শিখার আসক্তি। সেদিকটাও সুষ্ঠু ও পরিণত হয়ে ওঠেনি। শিখা-চরিত্রের অন্যান্য দিক নিতান্ত নির্মমভাবেই পঙ্গু করা হয়েছে। ব্যর্থ-প্রেম শিখার আত্মহত্যার জন্য নবেন্দুবাবুর অক্ষমতাই একমাত্র দায়ী। শুধুমাত্র নন্দর জীবনে পরিবর্তন দেখাবার জন্য গণিকা ললিতার মত একটি পঙ্গু চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল কি? পাটকলের কারখানার বিষাক্ত আবহাওয়া অন্য রকমে আরও সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে নবেন্দুবাবু ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। একটিমাত্র চরিত্র উল্লেখ যোগ্য, আন্তরিকতা ও স্বাভাবিকতায় যা উজ্জ্বল—কাজললতা। কাজললতা বাস্তবিকই সার্থক হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নবেন্দুবাবু কমিউনিস্ট চরিত্র ও কমিউনিস্টদের নীতি যথাযথ আঁকবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট প্রবীরের মুখে পার্টির জনযুদ্ধ নীতির যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তাতে আপত্তির অবকাশ আছে। "ইংরেজ বিতাড়ন আর জাপানী প্রতিরোধ একসঙ্গেই হতে পারে না। চল্লিশ কোটিকে সম্মিলিত করে নূতন শত্রুকে হটিয়ে দেব এবং তারপরে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করব"—এ নীতি কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের নীতি নয়। নবেন্দুবাবুর এ ভ্রান্তি মারাত্মক বলেই এর উল্লেখ করলাম।

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়ের 'হাওয়ার নিশানা'র ঘটনাকাল আগস্ট-আন্দোলনের অব্যবহিত আগে পর্যন্ত বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। "যে পারিপার্শ্ব, অবচেতনার যে সব খুঁটিনাটি ও ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের মানসকে অভিব্যঞ্জনা দেয়" পাঠককে আগে-ভাগে তা জানিয়ে রাখবার জন্য লেখক উপন্যাসের আগে ভূমিকা-স্বরূপ একটি দশপৃষ্ঠা ব্যাপী 'মেড-ইজি' জুড়ে দিয়েছেন। সেই সুদীর্ঘ 'মেড-ইজি'তে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, উপন্যাসের আবহ-প্রকৃতির দিক থেকে তিনি ধূর্জটি-পন্থী ও অন্নদাশঙ্কর-পন্থী, প্যাশনের দিক থেকে তিনি লরেন্স-পন্থী এবং বানান সম্বন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ-পন্থী অর্থাৎ "বানান জিনিষটা বানানো।" লেখক জানিয়েছেন, এই উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের ছাপ আছে।

বাংলা ভাষার ছাপ যে বইটিতে একেবারেই নেই তাতে দ্বিরুক্তির অবকাশ নেই। একটি লাইনের উদ্ধৃতি—"চুলগুলোর ওপর অজ্ঞাতে একবার হাতটা বুলিয়ে নেয়—আমি ভালবাসি প্রত্যহ সকালবেলা আমার ঘুমভরা চোখের পাতার ওপর চায়ের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করতে কিম্বা আমি ভালবাসিনা রাত্রিবেলা খানিকটা শারীরিক আদর সোহাগ দেখিয়ে আমার স্ত্রী সকালবেলা খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া দিতে দিতে কোন পড়শীর পরা শাড়ী কি অলঙ্কারের জন্য মাৎসর্যময় আবদার করুক।" উপন্যাসের নায়ক "ডিমোক্রাটিক গড়ণ কিন্তু হাড়ে হাড়ে এ্যারিস্টোক্রাট বুদ্ধিপ্রধান চরিত্র" বিকাশের কাছে তার মা "যে কোন জীবের মতই ক্লেদাক্ত;...পিতার বহু উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিবান নিঃশ্বাস অপহৃত হয়েছে তার মায়ের অনুদ্বেল যৌন-চাতুরির মধ্যে।" বইটির ছত্রে ছত্রে যৌন-নিউরোসিসের দুর্গন্ধ। উপন্যাসকারের স্বার্থে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে বিকৃত যৌন-সাহিত্যের যুগ বহুকাল হল গত হয়েছে।

একটা কথা। ভূমিকায় পড়লাম লেখক সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত গোপাল হালদার মহাশয়ের প্রশংসা-উক্তি, "আপনি লিখতে জানেন। কলম শক্ত। বুদ্ধির দিকটায় আপনার আসল আকর্ষণ। ঐ-খানটাতেই আপনার জোর" ইত্যাদি। পড়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি।

নীহার দাশগুপ্ত

পরমায়ু—পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি, টি, এস্। ডি, এম, লাইব্রেরী। সাড়ে তিন টাকা।

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের বই আমাদের ভালো লেগেছে। তার কারণ, আয়ুর্বিজ্ঞানের গুরুতর কথাগুলো ডাঃ ভট্টাচার্য লঘুপাক করে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন, এবং এ চেষ্টা বিশেষ ভাবেই সফল হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বিশেষণটা অতি ভাষণ নয়।

মজ্‌লীসি ভাষায় বিজ্ঞান পরিবেশন করার বিপদ এই যে, তাতে বিজ্ঞানের জাত যায়, মজ্‌লিস্‌ও মাটি হয়। আর এটাও প্রায় অবধারিত যে, তত্ত্ব ও তথ্যকে গল্পের জারক রসে ডুবিয়ে দিলে স্বাদ তাদের বিচিত্রতর হয়ে উঠলেও সত্যিকার রূপটা বেশ-খানিক বদলে যাবে। বিজ্ঞানের বৈষয়িক মর্যাদা আর তার প্রকাশ-ভঙ্গীর সাবলীলতার মধ্যে একটা আপোষনিষ্পত্তি করা সহজসাধ্য নয়; নয় বলেই, অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের জন কয়েক দিক্‌পাল ছাড়া এ কাজে অভিনিবেশ নিয়ে কেউ হাত দেননি। অতি-আধুনায় যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের নাম করবো না। তাঁদের অভিনিবেশ বিজ্ঞানমুখী নয় তহবিলমুখী; লক্ষ্য, পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রসাদদৃষ্টি; উপলক্ষ্য, "সুকুমারমতি বালক-বালিকার শিক্ষা-সৌকর্য।" চিকিৎসা ও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বহু-আলোচিত একটি বিশেষ বিজ্ঞানের কথা তো সবাই জানেন, কেননা এর নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণেই পাঠকচিত্তকে এ আকৃষ্ট করে, লেখকের কৌলীন্যবিচারটা গৌণ থেকে যায়। আমি অবশ্য যৌনবিজ্ঞানের কথাই বলছি।

ডাঃ ভট্টাচার্যের বইয়ের একটা বড়ো গুণ হচ্ছে এই যে, এটা text-book'ও নয়, hand book'ও নয়, পরমায়ুতত্ত্ব সম্বন্ধে জরুরী কয়েকটি নিবন্ধের সমষ্টি; জরুরী অর্থে—এমন সব বিষয়ের উল্লেখ বা আলোচনা যা আধুনিককালে মান ও প্রাণধারণ করতে গেলে আমার

আপনার মতো সাধারণভাবে শিক্ষিত লোকের জেনে রাখা দরকার, যেমন—ভিটামিন, বীজাণু, অন্তঃস্রাবী গণ্ড, সাল্‌ফা, পেনিসিলিন, প্যালুড্রিন, ফ্রয়েড, আড্‌লের, প্যাভ্‌লভ্‌। হুনজা উপত্যকায় ম্যাক্‌ক্যাবিসনের গবেষণা, ভিনিসে লুইগি কর্ণারের আত্মসংযমন প্রভৃতি আসর জমানোর উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় আড়াইশো পাতার বই বিনা ক্লান্তিতে পড়ে ফেলা যায়। কম্বুলেটোলার কালীকৃষ্ণ বাবুর আলেখ্যটা পাঠকের মনে রেখাপাত করবে সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় লেখনী চালনা করতে যাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আজ পর্যন্ত দেখেননি তাঁরা তাঁকে এ বইয়ের ভূমিকা-লেখকের ভূমিকায় দেখে আমোদ পাবেন।

বইয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কেননা ডাঃ ভট্টাচার্য মৌলিক গবেষণা বা চিন্তা কিছুমাত্র প্রক্ষিপ্ত করেননি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাগুলোই এতে সংকলিত হয়েছে। ডাঃ রায়েব ভাষার অনুসরণ করে বলা যেতে পারে—অজ্ঞান-জগতের উপযোগী ভাষায় এটা বিজ্ঞানজগতেব আত্ম-উন্মোচন। এ বইয়ের সার্থকতাবিচারের সময় এ দুই জগতের মধ্যে কতোটুকু যোগাযোগ ঘট্‌লো সেইটেই একমাত্র অথবা প্রধান দ্রষ্টব্য।

নরেন্দ্রনাথ সরকার

ডাক—ইলিয়া এরেনবুর্গ ও অন্যান্য। ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশিং হাউস। দু'টাকা আট আনা।

ছেলেবেলায় পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখে শুনতুম, জীবনে যাদের আর কিছুই হলো না সাহিত্যচর্চা নাকি শুধু সেইসব হতভাগ্যদেরই একচেটে পেশা। আজকাল আমাদের সাহিত্য-সংসারের শুভাকাঙ্ক্ষীদেব মুখেও সেই অভিযোগেরই একটা রকমফের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: ব্যর্থ সাহিত্যযশোলিপ্সুদের ভিড়ে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের বাজার নাকি আজকাল ভয়ানক গরম—অর্থাৎ নরম।

এ-অভিযোগে অবশ্য আমাব বিশ্বাস নেই, যদিও অনুবাদ-সাহিত্যের খুঁটিনাটি হাল-চালের খবব কিছু আমার নখদর্পণে নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে যদি আর কারো বদ্ধমূল সংস্কার কিছু থেকে থাকে তো তাঁকে আমি অন্তত আধুনিক সোভিয়েট ছোটগল্পের এই অনুবাদগ্রন্থটি পড়ে দেখতে বলি। বইটির অনুবাদকদের কারো আজ পর্যন্ত অনুবাদকবৃত্তির বাঁধা বাজারদর নির্ণীত হয়নি, কিন্তু তবু যখন দেখি ননী ভৌমিক—যিনি এর আগে আর কখনো অনুবাদের কাজে হাত লাগিয়েছেন কিনা সন্দেহ—অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে এ. দলখির 'আনাড়ী'র মত দুরূহ গল্প, কিংবা রবীন্দ্র মজুমদার জোস্‌চেঙ্কোর 'খুঁতখুঁতে ভূত'এর মত কুশলী রচনার সমস্ত মৌলিকতা বজায় রেখে সহজেই অনুবাদ করেন, তখন শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহস্র অনুযোগের মুখেও একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই বাংলা-অনুবাদের একটি বিশিষ্ট মান ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

এই গল্পগুলির কোনোটিই সাম্প্রতিক যুদ্ধের গল্প নয়—যুদ্ধপূর্ব সোভিয়েটের সমাজ-সংগঠনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে লেখা কয়েকটি গল্পের সংকলন এই বইটি। তাই গল্পগুলি মামুলী মনে হবার কোনো কারণ তো নেই-ই, বরং দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এগুলি অন্যান্য দেশের গল্পের থেকে

একেবারে স্বতন্ত্র। এর কারণ অবশ্য নিহিত আছে এগুলি যে-দেশের গল্প—সেই দেশেরই বিশেষ অবস্থার মধ্যে। আর সে অবস্থাটা হলো এই যে, সে-দেশেব বৃহত্তম জনসমষ্টি নিজেদের হাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ভার নিয়েছে। তাই সেখানকার লেখক একটি সমাজবিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিসত্তামাত্র নন, তিনি সেখানে তাঁর সমাজের পরিপূরক অংশ এবং তিনি ও তাঁর সমাজ আবার সমগ্র দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থারও পরিপূরক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাই সে-দেশের দায়িত্বশীল লেখকের একাত্মতাবোধও স্পষ্ট, আর সেই বোধই অন্যান্য দেশের প্রচলিত গল্পের থেকে এই গল্পগুলির মেজাজের মৌল পার্থক্য ঘটিয়েছে।

নিছক কলাকৌশলের দিকটা অবশ্য দু'একটি ছাড়া প্রায় সব গল্পেই কিছুটা অবহেলিত; গল্প বলার দিকে বেশি ঝোঁক মাঝে মাঝে উন্নাসিক পাঠকের চোখে পড়বেই। কিন্তু তবু অন্য দেশের যে-কোনো কৌশল-সর্বস্ব গল্পের চেয়ে এ-সব গল্প বেশি রসোত্তীর্ণ বলে আমার ধারণা—বিশেষ করে অনুবাদকদের অকৃত্রিম সততার ফলে মূল গল্পের আস্বাদে রুচিবাগীশ পাঠকও শেষ পর্যন্ত ভুলতে বাধ্য।

সাম্প্রতিক অন্যান্য ভালো অনুবাদের কথা বাদ দিয়েও শুধু এই একটি বই হাতে নিয়েই নির্ভয়ে বলতে পারা যায় যে, বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সংবাদ

শ্রীরঙ্গমে "দুঃখীর ইমান"

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও শস্তা সামাজিক বিষয়বস্তুর পুঁজি ভাঙিয়ে কলকাতার যে-সব পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দর্শকদের কাছে এতদিন পানসে রস পরিবেশন করে এসেছে, এবার হয়ত তারা একটা নতুন দিকে মোড় নেবার জন্যে উৎসুক—এমনি একটা বড় রকমের সম্ভাবনা শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান" বইখানিতে আমরা পেয়েছি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে দেশপ্রেম-উদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখিয়ে দর্শক সাধারণের প্রশংসা কুড়িয়েছেন—একথা স্বীকার করে নিলেও আরেকটা কথা অস্বীকার করা যায় না যে এটা বাংলা নাট্যশালার ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ। কলকাতার প্রত্যেকটি রঙ্গমঞ্চের শ্রীহীন চেহারার দিকে নজর দিলেই একথার যাথার্থ্য ধরা পড়ে। সিনেমার মোহে পড়ে বাংলাদেশের দর্শকরা তাদের অত্যন্ত প্রাচীন সাংস্কৃতিক বাহন রঙ্গমঞ্চকে ভুলে যেতে বসেছে এ কথা ঠিক নয়; আসলে রঙ্গমঞ্চই দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে পারে নি; তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেনি বর্তমান সমাজের গ্লানি-দীর্ণ রূপকে, যা রঙ্গমঞ্চের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধর্মও বটে। তাই সাধারণের চোখে রঙ্গমঞ্চের জৌলুস ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বাংলার এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক বাহনকে নতুন দিকে মোড় নিতে হবে এবং অল্পকাল হল সেই পথের নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।

সম্প্রতি শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী-পরিচালিত নাটক 'দুঃখীর ইমান' দর্শক মহলে একটা সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমান পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে বাংলার নির্যাতিত কৃষি সমাজের চরিত্রকে একটা বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা এই প্রথম। রঙ্গমঞ্চে বাংলার মন্বন্তর-পীড়িত চাষী তার সমাজের সহস্র লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মধ্যে এই প্রথম তার নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতে কথা বলেছে; তার শতচ্ছিন্ন বেশবাস ও ভেঙে-পড়া কুঁড়ে ঘরের মধ্যে নতুন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে বাংলার শোষিত চাষীর মর্মবেদনা। তাই প্রেক্ষাগৃহের ছারপোকা-শাসিত চেয়ারে বসে পান খেতে খেতে এই নাটক দেখা চলে না, শিরদাঁড়া খাড়া করে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয় তার প্রতিটি শব্দের জন্যে—বাংলার লক্ষ লক্ষ চালা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনাহারক্লিষ্ট সরল প্রাণ ধর্মদাস আর জামালউদ্দীনের জন্যে, যারা এই নাটকের সবচেয়ে বড় দুটি স্তম্ভ। গত মন্বন্তর তার সহস্র সংকট নিয়ে যে ভাবে বাংলার কৃষক সমাজকে আক্রমণ করেছিল তার একটা বাস্তব চিত্র 'দুঃখীর ইমান'-এ মেলে। অন্নসংকট, বস্ত্রসমস্যা, জোতদার-মহাজনের অত্যাচার, জমিদারের চরিত্রহীনতা, কনট্রোলের দোকানের ট্রাজিডি, সামাজিক দুষ্কৃত সিভিক গার্ডদের দাপট ও দুর্নীতি, কৃষকদের সংগ্রাম ও ইমান নিষ্ঠা—এ সবের মধ্যে দিয়ে নাটকটি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত জোরালো সংলাপ, নাটকীয় মুহূর্ত ও হাস্যরস নাটকটিকে বেশ উঁচু পর্দায়ও তুলে দিয়েছে। কিন্তু নাটকের

আর একটি দিক যা সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য—তা হল অভিনয়। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের এমনি সজীব আন্তরিকতা ও অভিনয়-সততা দর্শককে অভিভূত না করে পারে না। বিশেষ করে ধর্মদাস, জামালউদ্দীন ও বিলাতীর আশ্চর্য অভিনয় সবাইকে চমৎকৃত করবেই। নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড় চোপড় পড়ে কাদা-মাটি মেখে পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে অভিনয় করেছেন তা থেকে অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের অনেক কিছু শিখবার আছে।

'দুঃখীর ইমানে' কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ত্রুটিও থেকে গেছে যা কাটিয়ে উঠতে পারলে নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত। প্রথমত পুলিশকে যে ভাবে নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা শুধু নাটকের পক্ষে অঙ্গহানিকরই নয়, একেবারে অবাস্তব। জমিদার-বিরোধী ও জনসাধারণ-দরদী পুলিশ-দারোগা নাটকে যে ভূমিকায় নেমেছে তাতে একটা খট্‌কা লাগে। যে তুলসীবাবু কৃষকদের চরিত্রকে এমনি প্রাণবন্ত করে আঁকলেন, তিনিই আবার পুলিশকে এত ন্যায়পরায়ণ করে আঁকলেন কি করে? গত মন্বন্তরে সরকারী পুলিশরা যে স্বৈরাচার ও দুর্নীতির বন্যায় সমস্ত কৃষকসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা কি আমরা ভুলে গেছি? ফসলের মাঠে মাঠে যে চুল্লী জ্বলেছিল, কৃষকদের ভুখ-মিছিলের ওপর যে লাঠির আঘাত এসে স্পর্শ করেছিল সেই পুলিশ নির্যাতনের কথা কি ভুলে গেছে বাংলার চাষীরা? সেই বাস্তব অবস্থার সামনে 'দুঃখীর ইমানের' দারোগাদের ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত কাল্পনিক মনে হয়। তারপর জমিদারের ভূমিকা। নাটকে চরিত্রহীন ভালমানুষ জমিদারকে দেখে করুণা হয়, কিন্তু ঘৃণা হয় না। অথচ কৃষকদের অশেষ লাঞ্ছনার সামনে জমিদারের ঐ রকম চরিত্রহীনতা ও ভালমানুষি কেমন অর্থহীন মনে হয়। নাটকের সমস্ত তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে গেছে এই অসঙ্গতির ফলে। আরও কতকগুলি ছোটখাটো ত্রুটি আছে—যেমন, প্রসাদকে দিয়ে জমিদারের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মেলোড্রামা সৃষ্টি করা, শেষ দৃশ্যে ক্ষীরোদা বোষ্টমীকে নিয়ে অশ্লীল গান, ইত্যাদি। এই গানে কেবলমাত্র সুরুচির পরিচয় মেলে না তাই নয়, নাটকের সমস্ত পরিণতিই কেমন ঘোলাটে হয়ে আসে। আরেকটি কথা, নাটকের গোড়ার দিকে পনের কুড়ি মিনিট সমস্ত দৃশ্য ও কথোপকথন কেমন প্রাণহীন মনে হয়, বিশেষ করে মাস্টারবাবুর কথাগুলো শোনায় নিছক হিতোপদেশের মত।

এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও "দুঃখীর ইমান"-এর নাট্যকার, প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শক সাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবার দাবী রাখেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয় একটা বৃহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

অনিলকুমার সিংহ

কলকাতা যাদুঘরের চিত্রশালা

প্রায় ছ'বছর বাদে কলকাতা যাদুঘরের আর্ট্-গ্যালারী আবার জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হয়েছে। যুদ্ধের অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে সমস্ত মিউজিয়ম গৃহটিই সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। মিলিটারী কর্তৃত্বের মেয়াদ শেষ হবার অনেকদিন পরেও একমাত্র এই চিত্রশালাটি ছাড়া যাদুঘরের অন্যান্য সমস্ত বিভাগই এখনও জনসাধারণের কাছে রুদ্ধদ্বার। ইতিমধ্যে, মিলিটারীর তত্ত্বাবধানে থাকাকালে যাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগে—বিশেষত প্রত্নতত্ত্ব ভূতত্ত্ব ও প্রাণীবিদ্যার বিভাগে রক্ষিত বহু মূল্যবান দ্রষ্টব্যগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা আমরা শুনেছি। মৌর্য যুগের ভাস্কর্যগুলি নাকি মাফ্‌লার আর কিট্‌স্ ঝোলাবার কাজে এবং পাখীর নমুনাগুলি পিস্তল-ছোঁড়া অভ্যাসের 'টার্গেট্' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে—এমন খবর কিছুকাল আগে অমৃতবাজার পত্রিকা জানিয়েছিলেন। এই ক্ষতির পরিমাণ কত এবং ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা—সে সম্বন্ধে মিউজিয়মের ট্রাস্টি এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার দেশের লোকের আছে, কারণ যাদুঘর আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

প্রত্নবিভাগ বা নৃতত্ত্ব বিভাগের মতই যাদুঘরের এই চিত্রশালাটি ভারত-সংস্কৃতির ছাত্র ও শিল্পশিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারত-শিল্পের ইতিহাসে মুঘল, রাজপুত, কাংড়া, গুর্খা প্রভৃতি চিত্রকলার যুগ অতি গৌরবময়। এই চিত্রশালায় মধ্যযুগের পরবর্তী কালের বহু মূল্যবান চিত্র-নিদর্শণ সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ পরবর্তী কালে ভারতের মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় যে সাধারণভাবে একটা ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়, ষোড়শ শতক থেকে তার নতুন অনুপ্রেরণায় অভ্যুত্থান ঘটে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তৎপূর্বে গুপ্তযুগে ভারতীয় শিল্পকলার চরম উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী মধ্য-হিন্দুযুগে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর "মহৎ শৈলী"র (Grand Style) জায়গায় এল কতকগুলি বিধিনির্দিষ্ট অলঙ্করণ পদ্ধতি; পূর্ববর্তীদের সরল বলিষ্ঠতা ও ভাবুকতার বদলে জটিল কলাকুশলতা ও চাতুর্যের প্রচলন হল। ফলে, চিত্রশিল্পের চর্চাও ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়ে আসে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে। কিন্তু উত্তর ভারতে একটি ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মপুস্তক-চিত্রাঙ্কণের মধ্যে দিয়ে—পরবর্তী কালে যা পারসিক চিত্রকলার ঐতিহ্য থেকে পরিপুষ্টি লাভ করে। এর থেকেই ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল এবং রাজসিক হিন্দু ঐতিহ্যের অভ্যুত্থান ঘটে রাজপুতানায় এবং পাঞ্জাবের পাহাড়ী চিত্রকলার মধ্যস্থতায়। তিন শতাব্দীব্যাপী অত্যন্ত সতেজ সৃষ্টিশীল জীবন যাপনের পর অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে মোগল, রাজপুত ও কাংড়া শিল্পের ভাণ্ডার একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের এই পুনরভ্যুত্থান, চরম উন্নতি ও ক্ষয়প্রাপ্তির পেছনে যে সব ঐতিহাসিক ও সামাজিক কার্যকারণ সূত্রের যোগাযোগ ঘটেছে, সে সম্বন্ধে রীতিমত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মোগল বা রাজপুত কলার ঐশ্বর্যময় চিত্র-পদ্ধতির যে দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে, তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই এই-যে, এই শিল্পগুলি ছিল একান্ত ভাবে দরবারী শিল্প। বাদশা বা সামন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ভরশীল এই সব শিল্পীরা ক্রমশ জনতার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং ছোট ছোট সীমাবদ্ধ গোষ্ঠিতে পরিণত হন। তাঁদের রচনায় ক্রমশ গোষ্ঠি-সংশ্লিষ্ট টেকনিকের কসরৎ প্রশ্রয় পেতে থাকে। রেখার চারুতা ও রঙ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা অত্যন্ত উন্নত স্তরের হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যের

অভাব ঘটে। 'পোর্ট্রেচার' বা প্রতিকৃতি-অঙ্কনে এই সময়কার শিল্পীদের আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজের আবির্ভাবে ও বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে এই সব রাজা-বাদশাদের জীবনে দুর্দিন এল, এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পীদেরকেও ক্রমশ শিল্পচর্চা ছেড়ে দিতে হয়। যাদুঘরের চিত্রশালায় সংরক্ষিত ছবিগুলি ভারতশিল্পের ইতিহাসের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা অধ্যয়নের দিক থেকে বিশেষভাবে মূল্যবান। সংগ্রহের দিক থেকে, তিব্বতী পতাকা অলঙ্করণ, বর্মী কলাগা, ফার্সী ক্যালিগ্রাফি, জাহাঙ্গীরের সভা-শিল্পী মনসুর ও বিজহাদ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য চিত্রগুলি, শাপুর-অঙ্কিত মহম্মদ তোগলকের রাজসভার দৃশ্যচিত্র, ইত্যাদি যে কোন শিল্প-শিক্ষার্থীর কাছে অমূল্য সম্পদ।

ছবিগুলি সাজানোর ব্যাপারে বেশ খানিকটা যত্নের অভাব লক্ষ্য করা গেল। এমন এলোমেলো ভাবে না রেখে ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে চিত্রপদ্ধতিগুলির বিবর্তন অনুসারে সাজালে ছাত্রদের পক্ষে অনেক সুবিধার হয়। তাছাড়া, এই সব ছবির ফাঁকে ফাঁকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির চিত্রাবলী থাকার ফলে সাধারণ দর্শকের কাছে ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে পড়ে, কারণ কোন ছবির পরিচয়ই এমন কি "গাইড্ বুক'-এও দেওয়া নেই। অবনীন্দ্রনাথের "যক্ষ-দম্পতি," নন্দলালের "সীতার অগ্নিপরীক্ষা" বা আবদুর রহমান চাঘ্তাইয়ের বিখ্যাত ও অতি মূল্যবান ছবিগুলি নিশ্চয়ই আলাদা ভাবে সংরক্ষিত হবার দাবী রাখে।

রবীন্দ্র মজুমদার

পল্লীকবি নিবারণ পণ্ডিত

গত শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়ে' পল্লীকবি নিবারণ পণ্ডিতের সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। 'পরিচয়ের' তরফ থেকে বোম্বাই-এর 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের' কেন্দ্রীয় সমিতির কাছেও আবেদন জানানো হয়েছিল দুঃস্থ কবির আর্থিক নিরাপত্তার দায় গ্রহণ করতে। এ পর্যন্ত যা সাড়া পাওয়া গেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বোম্বাই 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের' দান। এঁরা একটি সাহিত্য বৈঠক আহ্বান করে সেখান থেকে ১২১৲ টাকা তুলে পাঠিয়েছেন। সুদূর বাংলার পল্লীকবির জন্য এইভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন বিখ্যাত উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী ও সাগর নিজামী, খ্যাত নামা সাহিত্যিক মুলক্ রাজ আনন্দ, উপেন্দ্রনাথ আস্তিক, ফিরোজ মিস্ত্রী, কইফি আজমী, রমেশ সিংহ ও আরো অনেকে। পাটনায় শ্রীগোপাল হালদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভা থেকেও অনুরূপ আবেদনের ফলে ৫০৲ টাকা পাওয়া গেছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

বর্ণার্ড শ'-এর 'সীজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা'

'মেজর বার্বারা,' ও 'পিগ্ম্যালিয়ন' এর অপূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনেমা রসিকেরা শ'-এর নতুন ছবি 'সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা'র জন্য বহুদিন থেকেই সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ছিলেন

এবং সেটা আশ্চর্যও কিছু নয়। আশ্চর্য এই যে, পরিচালনা ও অভিনয়ের সমস্ত নৈপুণ্য সত্ত্বেও পূর্ববর্তী ছবি দুটির তুলনায় সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রাকে একান্ত নিষ্প্রভ ঠেকে। বর্ণের দিক থেকে এ ছবি নিষ্প্রভ নয়, কারণ রোমক জাঁকজমক ও মিশরীয় রোমান্স টেক্‌নিকালারের বর্ণচ্ছটায় অতি মনোহর হয়ে উঠেছে। অভিনয়ে ক্লড্‌ রেন্‌স্‌ ও ভিভিয়ান লী উভয়েই আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। নেপথ্যসংগীত, পার্শ্বচরিত্র, ইত্যাদিতেও এ জাতীয় ছবির প্রচলিত উৎকর্ষের অভাব এখানে নেই। বস্তুত এর নিষ্প্রভতা ধরা পড়ে প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে পা বাড়াবার পরেই, পূর্বে নয়। বর্ণচ্ছটার মনোহারিত্বে, সংলাপের ঔজ্জ্বল্যে আর ঘটনার সংঘাতে মনকে ব্যাপৃত রাখে, কেবল শেষ হবার পরেই আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে এর পশ্চাতে এমন কিছু নেই যা মনের ওপর কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে সক্ষম।

কেন এমন ঘট্‌ল এই প্রশ্ন স্বাভাবিক, কিন্তু এর উত্তর গেব্রিয়েল প্যাস্কালের পরিচালনায় নেই, আছে শ'-এর আখ্যানভাগেরই দুর্বলতায়। শ'-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এখানে শেক্‌স্‌পীয়রের ক্লিওপেট্রাকে তার সম্ভ্রান্ত মর্যাদার ও ইতিহাসখ্যাত নারীত্বের সিংহাসন থেকে অতিসাধারণ মেয়ের পর্যায়ে টেনে আনা। শেক্‌সপীয়রের সীজারের মতন শ'-এর সীজার ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করেনি, স্থির মস্তিষ্ক থেকে নারীর ছলচাতুরীকেই তুচ্ছ প্রমাণ করেছে। শ'-এর সীজার বিদায় মুহূর্তে ক্লিওপেট্রার জন্য চমৎকার এক তরুণ বরকে প য়ে দেবে, তার নাম—মার্ক অ্যান্টনি। শ'-এর এই ব্যঙ্গ যেমন তাঁর নাটকে তেমনি ছ তও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিজারীয় গাম্ভীর্য লাভের জন্য ক্লিওপেট্রার চেষ্টা প্রতিপদে হাস্যকর ও তুচ্ছ। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের ক্লিওপেট্রার মধ্যে সমস্ত শঠতা নির্দয়তাকে অতিক্র করেও যে নারীত্বের মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে তাতে নাটকীয়তা আছে, রসবস্তু আছে। শ'-এর ক্লিওপেট্রা তার স্রষ্টার মতবাদের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কেবল নিমিত্তমাত্র। রক্ত মাংসের কোনো ছোঁয়াচ এখানে নেই, দর্শক নির্লিপ্তভাবে অভিনেতাদের নৈপুণ্যকে বাহবা দিয়ে যেতে পারে, হাসির কথায় হাসতে পারে, রংএর খেলা দেখে মুগ্ধ হতে পারে। ছবির অন্তে ক্লিওপেট্রা বা সীজার যদি ছুরিকাঘাতে নিহত হতো তাহলেও দর্শকের চিত্তবিক্ষেপ ঘট্‌তো না, অনায়াসে বলা চল্‌তো যে গল্পে এমন ঘটেই থাকে

এই মৌলিক অভাববোধ সত্ত্বেও ছবিটির আকর্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। শেক্‌সপীয়রের অ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপেট্রার কথা ছেড়ে দিয়ে যদি হলিউডের 'ক্লিওপেট্রা' ছবির কথা মনে করা যায় তাহলেই এই ছবির প্রশংসায় যে কেউ পঞ্চমুখ হয়ে উঠ্‌তে পারে। ফিল্ম-এর আখ্যানবস্তু প্রায়ই সাহিত্য থেকে আহরিত না হয়ে আজগুবী কল্পনায় ভরাট করা হয়ে থাকে, সেদিক থেকেও শ'-এর ছবি হাতে নেওয়ার জন্য 'ঈগ্‌ল-লায়ন' আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

ছায়াভিনয় 'শহীদের ডাক'

কিছুদিন আগে শ্রীরঙ্গম-মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার ছায়াভিনয় 'শহীদদের ডাক' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিনয় ও মঞ্চশিল্পের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে গণনাট্য সংঘ যে কতখানি অগ্রণী এই ছায়াভিনয় তার প্রমাণ। ছায়াভিনয় বা 'শ্যাডো-প্লে'র যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে সেটা এদেশে বোধ হয় প্রথম কাজে লাগান উদয়শঙ্কর। কিন্তু উদয়শঙ্করের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক, গণনাট্য সংঘের বিষয়বস্তু একেবারে সাম্প্রতিক—যুদ্ধোত্তর নানা দুর্বিপাক, আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক-মজুরের সংগ্রামের অংশীদার ছাঁটাই-বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত, নৌ-বিদ্রোহের সহযোগী ছাত্র-অভিযান, কাশ্মীর-ত্রিবাঙ্কুরের গণ-অভ্যুত্থান, দিশেহারা সাম্রাজ্যবাদীর সাংঘাতিক ফাঁদে আপোসপন্থী নেতাদের পদস্খলন, ফলে উন্মত্ত গৃহযুদ্ধ, মহাক্ষতিময় পরিণামের শেষে আবার আত্মোপলব্ধি—গত দু' বছরের এই ইতিহাস 'শহীদের ডাক'এর বিষয়বস্তু। এই দিক থেকে গণনাট্য সংঘের নতুন প্রয়াস অবশ্যই অগ্রগামিতার দাবী রাখে, যদিও প্রযোজনার ব্যাপারে নানা ছোট খাটো ত্রুটীও চোখে পড়তে বাধ্য।

ছায়াভিনয়ের কতকগুলি সুবিধা আছে; অত্যন্ত অল্প উপকরণের সাহায্যে দৃশ্য-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় এবং কয়েকটি সহজ কৌশল ব্যবহারের ফলে চমৎকার কম্পোজিসন ও আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়, যার শিল্প-সার্থকতা প্রায় সিনেমার পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়—যেমন, আলোর দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে 'লং শট্' থেকে 'ক্লোজ্ আপ্', দৃশ্য-পরিকল্পনায় 'ডানিং প্রোসেস্'-এর ব্যবহার, 'সিল্যুয়েট্'-এর আড়ালে দৃশ্যান্তরের 'সিকোয়েন্স'গুলিকে আশ্চর্য রকম নাটকীয় করে তোলা, ইত্যাদি। 'শহীদের ডাকে' এই সব কৌশল কমবেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও, সম্পূর্ণ সুযোগটুকু নেওয়া হয়নি বলেই মনে হল। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অবশ্য এই সব করণ-কৌশলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হওয়া সত্ত্বেও 'শহীদের ডাক' উৎরে গেছে, কারণ সর্বাঙ্গীন ভাবে দেখতে গেলে নিছক আর্টের আবেদনকে ছাড়িয়ে যায় এর মর্মকথা, যার অবলম্বন জাতির গত কয়েক বছরের তীব্রতর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয় আর আত্মঘাতী ভ্রাতৃযুদ্ধের দুর্বিসহ গ্লানি। প্রযোজনার টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি বিষয়ে আরও একটু যত্নশীল হতে পারা যেত বলেই মনে করি, কিন্তু তা না হবার ফলে কোন কোন জায়গায় বক্তব্যটা একটু স্থূল হয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত ডোগ্‌রা-রাজের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের শৃঙ্খলিত জনতার অভ্যুত্থানের সিকোয়েন্স্‌টি অতি সুন্দর, কিন্তু হাসপাতালে রামেশ্বরের বিলম্বিত মৃত্যুদৃশ্যটি তেমনি মেলোড্রামাটিক; নৌ-বিদ্রোহীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের দৃশ্যটি পরিকল্পনার দিক থেকে একেবারে কাঁচা; পক্ষান্তরে, জন বুলের চরিত্র-চিত্রণ অভিনেতা ও কথকের যোগাযোগে আশ্চর্যরকম বিদ্রূপাত্মক হয়েছে। সমগ্রভাবে যে এই ছায়াভিনয় অত্যন্ত সার্থক হয়েছে, তার প্রমাণ, প্রায় প্রত্যেক দৃশ্যেরই পরিণতি দর্শকদেরকে অভিভূত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্গ্রীব করে রেখেছে।

কিন্তু ছায়াভিনয়ের আসল সার্থকতা হচ্ছে বিরাট, দর্শক-সমাবেশের সামনে প্রদর্শিত হওয়ায়। বছর দু'তিন আগে বোম্বায়ের উন্মুক্ত স্ট্যাডিয়ামে উদয়শঙ্কর 'রামের রাজ্যাভিষেক'

ছায়াভিনয়ে প্রায় বিশ হাজার দর্শককে কয়েক ঘণ্টার জন্তে বিমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। গণনাট্য সংঘও 'শহীদের ডাক'-এর এই রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কলকাতার বিভিন্ন পার্কে করতে পারেন (অবশ্য ১৪৪ ধারা উঠে যাবার পরে), কারণ অভিনয়-শিল্পের মারফৎ গণজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাই এই সংঘের কাজ।

রবীন্দ্র মজুমদার

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ সংখ্যা পরিচয়, 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে 'রাজীবলোচন রায়ে'র স্থানে 'রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়' হইবে ও প্রবন্ধের শেষ-পৃষ্ঠার ৫ লাইনে 'অক্ষয়চন্দ্র দত্তের' স্থানে 'অক্ষয়কুমার দত্ত' হইবে।

—লেখক

সম্পাদক
হিরণকুমার সান্যাল
গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং
৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৫৩

সাহিত্য ও বিপ্লব

১

কোনো মানুষের অন্তর্জীবনের যত কিছু সুখ-দুঃখ আশা-আশঙ্কা ভাবনা-বেদনা সঙ্কল্প-বিকল্প সবই তার জীবনযাপনের বহিরঙ্গের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট হতে পারে এমন কথা বলা চলে না। অন্ততপক্ষে মানব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আজও এতই সামান্য যে-ওরকম কথা যদি কেউ বলেনও তাতে মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া আপাতত সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা সমাজজীবনের দিক থেকে বিষয়টির বিচার করি তা হলে আংশিক ভাবে হলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, কোনো একটি মানব গোষ্ঠীর সাধারণ জীবনযাপন প্রণালী সেই সমাজের চিন্তা ভাবনা কল্পনাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এবং কোনো সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, নৈতিক বা অর্থনৈতিক যে-কারণেই হোক, যে-শ্রেণী প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব লাভ করে, সেই শ্রেণী বিশেষের জীবনাদর্শ, তার দৃষ্টিভঙ্গী, তার নৈতিক আদর্শ সেই সমাজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, একথাও সত্য।

কিন্তু সমাজ স্থাণু নয়, তার পরিবর্তনশীলতা তাকে বিবর্তিত করছে। কোনো অদৃশ্য বিধাতার অমোঘ নির্দেশে সমাজের নানা পরিবর্তন হয়ে চলেছে এরকম মনে করবার কোনো হেতু আছে বলে তো মনে হয় না। যদি বা সমাজের অন্তর্দেবতা কেউ থাকেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় মানবসমাজে পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলেও সেই অন্তর্দেবতা নিতান্তই খামখেয়ালী ভঙ্গীতে এইসব পরিবর্তন সাধন করেন না, তা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায়। বরং একটুখানি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে পরে আমরা সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই তার ভাবী পরিবর্তনের সূচনা এবং প্রেরণা দেখতে পাই। বহু মানবের মানসসত্তাকে যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেই সব মানস-সত্তার সে-সব রাগ-বিরাগ ভাবনা-বেদনার উত্থান পতন ঘটছে তার সামূহিক একটা ফল আমরা স্বতঃই আশা করতে পারি। সুতরাং সমাজের সামূহিক পরিবর্তন বোঝার জন্য আপাতত আমাদের কোনো অজ্ঞেয় সমাজ-বিধাতার গূঢ় ইচ্ছার অনুসন্ধান না করলেও চলতে

পারে। অবশ্য এ থেকে একথা কিছুতেই আভাসিত হচ্ছে না যে, যে-সব কার্য কারণে সমাজসত্তায় পরিবর্তন হচ্ছে সে-সবগুলিই একেবারে সুস্পষ্ট। ব্যক্তিসত্তার অন্তর্নিহিত যে-রহস্য তাকে আজও কোনো বৈজ্ঞানিক দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করতে পারেননি, কোনো কালে পারবেন সে-কথাও আজ জোর করে বলবার মতো জোর কারো আছে কি না জানি নে।

২

সুতরাং সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে আর সেই পরিবর্তন সমাজেরই বহু মানবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং নানাবিচিত্র কর্মপরম্পরার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, একথা স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই। অবশ্য একথা সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণীয় যে, সমাজের সকল মানবের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাবনা এবং কর্মের প্রভাব সমাজসত্তায় সমভাবে প্রতিফলিত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কোনো দুটি ব্যক্তির ভোটের তুল্য মূল্য হলেও সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে-কোনো দুটি ব্যক্তির সামাজিক প্রভাব সমান নয়। অঙ্কশাস্ত্রে যেমন সংখ্যার স্থানীয় মান একটা মস্ত কথা, তেমনি সমাজজীবনেও; সেখানে কোথাও কোথাও স্থান কালভেদে একই ব্যক্তির মানে আকাশ পাতাল তারতম্য ঘটে। সুতরাং সমাজে পাঁচের বিপক্ষে পাঁচ দাঁড়ালে তার প্রভাবফল (৫ — ৫ = ০) শূন্য হয় না। সমাজের তাৎকালিক পরিবেশে কোনো পাঁচের মূল্য পাঁচশ'ও হতে পারে, পাঁচ হাজারও হতে পারে।

নানা কার্যকারণের সমবায়ে সমাজে যখন কোনো একটি বিশেষ রকমের জীবনাদর্শ গৃহীত হয়, তখন সব মানুষই যে সচেতনভাবে তাকে গ্রহণ করে বা অনুসরণ করে তা নয়, কিন্তু তথাপি তার একটা অদৃশ্য চাপ অল্পাধিক পরিমাণে সব মানুষের চেতনায় বর্তমান থাকে। তারই ফলে সেই আদর্শ, কিছুকালের জন্য একটা স্থায়িত্ব অর্জন করে বসে, এবং সেই সমাজকে নব নব পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে বাধাও দিতে থাকে। প্রত্যেক সচলতার মধ্যেও এই জড়িমা আংশিকভাবে বর্তমান। তবু পরিবর্তন হবেই, এই পরিবর্তন-শীলতাকে রোধ করা অসম্ভব। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আপেক্ষিক সম্বন্ধের পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাবে প্রচলিত জীবনাদর্শ থেকে সমাজ স্খলিত হয়ে অন্যতর জীবনাদর্শকে গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়, আর সেটা যে সব সময়ই কোনো একটা বৃহত্তর সমন্বয়ের দিকে হয়ে থাকে তাও নয়।

৩

অথচ একথাও বলতে শোনা যায় মানবসমাজ যুগে যুগে একটা বৃহত্তর কল্যাণের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে চলা যতই শম্বুকগতি হোক না। সেই কথা শুনে প্রতিপক্ষ মানবসমাজের অগ্রগতির-জাজ্বল্য প্রমাণ হিসাবে যখন মহাসমর, লুব্লিন, নোয়াখালি বিহার এবং আরো বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন, তখন মানবসমাজের কল্যাণাভিমুখী অগ্রাভিসারের যাথার্থ সম্বন্ধে একটু সন্দিহান এবং শঙ্কিত না হয়েও পারা যায় না।

তবু will to live-এর অবচেতন ক্রিয়ার ফলেই হোক আব যে-কাবণেই হোক আমরা

মানবের পাশবিক বৃত্তি এবং তার অকল্যাণমুখী অধোগতিটাকেই প্রধান সত্য বলে মনে করি না। অকল্যাণমূলক কর্মে মানুষের প্রবৃত্তির প্রবলতা আজো হয়ত কণামাত্রও হ্রাস না হয়ে থাকতে পারে। এমন কি মানুষের হাতে বিজ্ঞানের বল আসার ফলে তার সেই প্রবৃত্তির ক্রিয়াত্মক প্রভাবটা হয়ত পূর্ব পূর্ব যুগের চেয়ে সহস্রগুণিত হয়ে দেখা দিতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে যে মানবচেতনায় এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে একটি লজ্জাবোধ জন্ম নিয়েছে সে কথা অস্বীকার্য নয়।

মানবসভ্যতার আকাশ যত ঘনঘটাচ্ছন্নই হোক না কেন, ওই একটি আশার স্বর্ণ রশ্মি সেই মেঘাবরণকে ভেদ করে মানুষের চিত্তলোকে এসে পৌছেচে এবং তা থেকেই মানুষ আজও এ আশা করতে বিরত হচ্ছে না যে, একদিন সমগ্র মানবসমাজে শুভ বুদ্ধির স্বর্ণালোক দিবালোকের উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করবে।

৪

ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এক একটি নৈতিক আদর্শ প্রচারিত এবং অনুসৃত হয়েছে। শ্রেণীবিশেষের দৈহিক অথবা অর্থনৈতিক যে-কারণেই প্রাধান্য ঘটুক না কেন, সেই প্রাধান্যের জোরেই সেই শ্রেণীর নৈতিক আদর্শকে সমাজের অন্য শ্রেণীরাও মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং কালে অভ্যাসের নিয়মে সেই আদর্শকে তারাও হয়ত নিজেদের আদর্শ বলে মনেও করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু শ্রেণীবিশেষের স্বার্থানুগত আদর্শ বলেই সে আদর্শ আপন অন্যায়ের দ্বারাই পরাভূত হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলবেন যে শ্রেণীগত সেই আদর্শ পরাভূত হয়েছে বটে, কিন্তু সেটাও অপর শ্রেণীর প্রাধান্য লাভের ফলে, সে নিজে অন্যায় এবং অসঙ্গত বলে নয়। কারণ একশ্রেণীর আদর্শ যখন সিংহাসন চ্যুত হয়, তখন সেই সিংহাসনে ন্যায়ের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ তো প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেখানে অন্য কোনো শ্রেণীর আরেকটি অন্যায় স্বার্থানুগত আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা হয়। ফলে আদর্শের পর আদর্শের এই যে রাজ্যলাভ একে কল্যাণ আদর্শের ক্রমভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করাটা সমীচীন নয়।

কথাটি চিন্তনীয়।

৫

একথা যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে মানবসমাজের নৈতিক আদর্শ বিকাশের ইতিহাসটা শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীগত আদর্শের উত্থান পতনের ইতিহাস তাহলেও এর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

মার্কসীয় পদ্ধতিতে সমাজবিকাশের আলোচনার ফলে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটি সর্বজন স্বীকৃত হোক বা না হোক, তাকে যদি সত্য বলেও স্বীকার করা যায়, তাহলেও একটি কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীপ্রাধান্য এটা এ-পর্যন্ত বেশ আত্ম-সচেতনভাবে সংঘটিত হয়নি।

প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের এবং আরো নানাশক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে একই

জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নানারকমের শক্তি সামর্থ্যের তারতম্য ঘটেছে তা বোধ হয় সত্য নয়। অর্থাৎ এই যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য এর মূলে আছে শুধুই বাহ্যিক পরিবেষ্টন এবং অন্যান্য শক্তিরই ক্রিয়া, একথা আজও প্রমাণিত সত্য নয়। অন্তত একথা স্বীকার করতেই হবে যে ব্যক্তিগত তারতম্য যে-সব কারণে ঘটে চলেছে সে-সব কারণ বহুলাংশেই আমাদের অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় কি না জোর করে সে কথা বলা না গেলেও। সেই কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা প্রায় ঐশ্বরিক ক্রিয়ার মতোই অবোধ্যপ্রায়।

তেমনি সামাজিক শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে এপর্যন্ত সমাজে শ্রেণীর পর শ্রেণীর যে আধিপত্য লাভ ঘটেছে তাও কোনো শ্রেণীরই আত্মসচেতনতার ফলে হয়নি। সামাজিক শক্তিগুলোও প্রাকৃতিক শক্তির মতোই অচেতনভাবে কাজ করে চলেছে বলে মনে হয়, এবং তারই ফলে শ্রেণীবিশেষের আদর্শের প্রাধান্য লাভও ঘটে থাকে।

এই সব শ্রেণীগত আদর্শ যতই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থানুকূল হোক না কেন, এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণী সেই আদর্শকে আপন অজ্ঞাতসারে শ্রেণীপ্রাধান্যের চাপে গ্রহণ করুক না কেন, তবু শ্রেণীগত আদর্শ কখনো জোর গলায় একথা ঘোষণা করতে পারেনি যে, এটা তারই বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে কায়েম করবার জন্য সৃষ্ট। তাকে অন্তত এ ভানও করতে হয়েছে যে তার আদর্শ শুধু তারই কল্যাণে প্রবর্তিত নয়, পরন্তু এ আদর্শ সমগ্র সমাজের কল্যাণেই নিয়োজিত।

সাময়িকভাবে হয়ত প্রবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু যখনি কোনো আদর্শ স্থায়ীভাবে সমাজে প্রবর্তিত হয়েছে তখন প্রবলকে এই কথাই বলতে হয়েছে যে সেটা দুর্বলেরও পক্ষে কল্যাণকর। এটা জ্ঞাতসারে প্রতারণা না হলেও, অজ্ঞাতসারে একশ্রেণীর আরেকশ্রেণীকে প্রতারণা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রতারণাই একথাও প্রমাণিত করে যে, সকল মানুষের মনেই সার্বজনীন কল্যাণাদর্শের প্রতি একটি শ্রদ্ধা আছে, স্বার্থগত মোহে সে আদর্শের যত বড় অবমাননাই হোক।

৬

বলতে পারা যায় হয়ত যে এই শ্রদ্ধার বাস্তব সার্থকতা কীই বা! মানুষের স্বার্থবুদ্ধি যদি অবচেতন ভাবেও মানুষকে প্রতারণা করতে সক্ষমই হল, যদি এক শ্রেণীর স্বার্থবাহক আদর্শ অন্য শ্রেণীকে স্বীকার করতেই হল, তাতে আর ওই বাহ্যিক আদর্শের সার্বজনীন কল্যাণাভিমুখিতা প্রচারে লাভ কি হল!

আপাতত লাভ কিছু হোক আর নাই হোক, এ থেকে একটি কথা বোঝা যাচ্ছে মানুষে মানুষে স্বার্থগত বিভেদ যতই থাকুক, এক জায়গায় মানুষ মনে মনে আর সব মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তাকে অস্বীকার করতে পারছে না। এই আত্মীয়তাবোধ যত খণ্ডিত বিকৃত আকারেই প্রকাশ পাক, একে মানুষের অন্তশ্চেতনা থেকে বিলুপ্ত করা চলবে না। অবচেতনভাবে যে-স্বার্থবোধ এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছে, সচেতন ভাবে সেই স্বার্থবোধ কোথাও সমর্থিত হতে পারে না। সুতরাং মানুষের চেতনাকে যদি জাগ্রত করা সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত সকল মানুষের কল্যাণকারী আদর্শের আবির্ভাব এবং আধিপত্য নাও হতে পারে।

মানবসমাজের প্রকৃত সচেতনতার অভাবেই মানুষ সামষিকভাবে অসহায়ের মতো প্রবল শ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। প্রতি যুগের সামাজিক ইতিহাসে তাই আমরা এই অত্যাচারের নিদর্শন পাই। যথার্থ চেতনার অভাবে অত্যাচারিত শ্রেণী প্রবলের অত্যাচারকে অত্যাচার বলেও গ্রহণ করতে পারেনি, তাকে তাদের অদৃষ্টলিপি বলেই নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিককালে নানাকারণে মানুষের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হতে চলেছে; পূর্বকালের সম্পর্কবিহীন অসংখ্য মানবগোষ্ঠী আজ এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বদ্ধ। রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধনের দ্বারা বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আজ সম্বদ্ধিত: এই সম্পর্কের ফলে নানা সমাজের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানও অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ফলে নানা অন্ধবিশ্বাস এবং সংস্কার ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে চলেছে; যতই দিন যাবে ততই বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ফলে বহু মনগড়া গণ্ডী মিলিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। এবং শ্রেণীগত বৈষম্যের যে উৎকট অস্বাভাবিকতা তাও বিপুল হয়ে দেখা দেবার ফলে তার দুর্বিসহ লজ্জাও মানুষের চেতনায় প্রবলভাবে আঘাত করবে।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ শ্রেণীগত বৈষম্য সম্বন্ধে যে মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে এটা তাই একটা প্রকাণ্ড সুলক্ষণ। বৈষম্যের মূলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থপরতার প্রভাব রয়েছে। তাই শ্রেণীগত বৈষম্যকে চিরতরে বিদূরিত করতে হলে মানুষকে আবার একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে প্রবল করে তুললে সমস্যার কোনো মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না।

মার্কস্‌পন্থীরা কি একটি শ্রেণীকে পরাস্ত করে আরেকটি শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রভুত্ব স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন? তা হলে এই শ্রেণীসংগ্রাম কি অপর অর্থাৎ বিজিত শ্রেণীকে পদানত করে তাদের অকল্যাণে প্রবৃত্ত হবে না?

৭

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দ্বারা মার্কস্‌পন্থী এই তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করেছেন যে, মানব-সমাজের আপাতদৃশ্যমান বহুশ্রেণীর পশ্চাতে মূলত দুটি মাত্র শ্রেণী বর্তমান: শোষক এবং শোষিত। বিভিন্ন যুগে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক উৎপাদন প্রণালীকে করায়ত্ত করে নিয়ে সমাজের নেতৃপদ অধিকার করেছে এবং শোষকের বেশে সে সমাজের অপরাংশকে শোষণ করেছে। সুতরাং শোষকের বিনাশ সাধন করতে না পারলে শোষিতের পরিত্রাণ নেই। শোষণপ্রথার দ্বারা কেবল যে শোষিতেরই সর্বনাশ ঘটছে তা নয়, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে শোষকেরও সর্বনাশ ঘটছে। এই শোষণের পরিসমাপ্তি না হলে তাই মানব-সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। আপাতত এই শোষণের সমাপ্তি ঘটাতে হলে উৎপাদন প্রণালীটিকে শোষিতের আয়ত্তাধীনে আনা প্রয়োজন। কিন্তু তার ফলে শোষিত আবার শোষকের বেশ ধরে অন্য কোনো মানব শ্রেণীকে শোষণ করতে পারবে না, এইটেই হল আসল কথা। তা যদি সম্ভব হয়, অর্থাৎ কোটি কোটি শোষিত মানব যদি মিলিতভাবে উৎপাদন প্রণালী করায়ত্ত করে, তা হলে

উৎপাদন প্রণালী তখন সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে নিযুক্ত হবে। তখন শোষক শোষিতের চরম অবসানে শ্রেণী-বিহীন সমাজের আবির্ভাব হবে, এইটেই হল মার্কস্‌পন্থীর স্বপ্ন, আদর্শ।

শোষণ-নিবৃত্ত মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দ্বিমত হতেই পারেন না, সেই সমাজ-প্রতিষ্ঠার পথ নিয়ে যত মতভেদই থাকুক। এমন সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হোক যাতে কোনো একটি বিশেষ মানবসমূহ আপন স্বার্থসাধনের জন্য অন্য সকল মানুষের কল্যাণকে দলিত করবার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে না, এ কোন্ মানুষের অবাঞ্ছিত ?

৮

যুগে যুগে সমাজে শ্রেণীবিশেষের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর এই যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব তা একরকম ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাতসারেই চলে এসেছে। বৈষম্যকে নানা ছলনায় চাপা দেবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে; যেখানেই বৈষম্য প্রবল হয়ে উঠেছে, কোনো না কোনো ভাবে সেই বৈষম্য আংশিকভাবে দূর হয়েছে কিংবা নির্যাতন নিপীড়ন সমাজের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে সাময়িকভাবে হয়ত দ্বন্দ্ব এবং অশান্তির কতকটা প্রশমন হয়েছে, কিংবা নবতর শ্রেণীর অভ্যুত্থানে প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চাপা পড়েছে, কিন্তু তাতে সংঘর্ষের অবসান ঘটেনি।

বরং বিজ্ঞানের সহায়তায় উৎপাদন প্রণালীর নিরতিশয় পরিবর্তনে মানব সমাজে শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ তা অত্যন্ত উৎকট হয়ে উঠেছে এবং তার ব্যাপকতাও বিপুল হয়ে দেখা দিয়েছে। শোষণের এই নিদারুণ পরিব্যাপ্তির বিপুলতা আজ শোষিত মানব-সমাজকে এমনি শোচনীয় দুর্দশায় অধোনীত করেছে যে, আজ ধীরে সুস্থে এই দুর্গতি থেকে মানব-সমাজকে নিষ্ক্রান্ত করার কল্পনা না করে, বিপ্লবের দ্বারা এই দূষিত মানব সমাজকে দ্রুত আমূল পরিবর্তনের পথে চালিত করবার অধীরতাই সর্বত্র এক আলোড়ন জাগিয়ে তুলছে।

তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একটা বিপ্লবের সাড়া অনুভূত হচ্ছে।

৯

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে যখন বিপর্যয় দেখা দিতে আরম্ভ করে সেই সঙ্গে পূর্বতন প্রভুত্বশীল শ্রেণীর আদর্শ, ভাব ও ভাবনারও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে: কারণ বাহ্য জীবন-যাপনের ধরন-ধারণের পরিবর্তন মানুষের চিন্তা-ধারাকেও স্বতই আলোড়িত করে তোলে। কিন্তু বাইরের জীবন যাত্রার মধ্যে পরিবর্তন যত দ্রুত সংঘটিত হয়ে থাকে, চিন্তাধারার পরিবর্তন তারই সমতালে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এইজন্যই যখনি মানব সমাজের বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে কখনো কোনো রকম গুরুতর অদলবদল ঘটে, তখন সমাজ-মানসের কাঠামোটি তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না; তখন বাইরের জীবন যাত্রার সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত বিচার ধারার মধ্যে একটা উৎকট অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাস, সাহিত্য-

শিল্প-সংগীতে প্রবহমান সংস্কৃতিধারা সমাজের আসন্ন নূতন শ্রেণীসমাবেশকে শুধু যে সমর্থন করে না তাই নয়, আসন্ন সমাজজীবনের নবমানসকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা উৎপন্ন করতে থাকে। ফলে নূতন জীবন প্রণালীর অনুকূল জীবনাদর্শ সমাজ-মানসে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রভূত বিলম্ব ঘটতে থাকে। অথচ সমাজের বহিরঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার উপযোগী সমাজ-মানস গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। যতক্ষণ তা না ঘটে ততক্ষণ সমাজ আত্মস্থভাবে আপনাকে সমন্বিতভাবে প্রকাশ করতে পারে না, বিরোধ সঙ্ঘাতটাই প্রবলভাবে দেখা দেয়।

সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেইছে, সুতরাং সমাজের জীবন প্রণালীর পরিবর্তনের ফলে সমাজ-মানসেও যত ধীরেই হোক, একটা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কিন্তু সাধারণত সমাজ-মানসের সঙ্গে তাৎকালিক জীবনধারার কিছু না কিছু অসঙ্গতি বর্তমান থাকলেও তা তেমন উৎকট বলে মনে হয় না। কিন্তু যখন বিপ্লব যুগ আসন্ন হয় তখন সমাজজীবনে একটা আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয় এবং তখন বর্তমান সমাজমানসের ও ভাবী সমাজমানসের বিরোধটাও অত্যন্ত উৎকট হয়েই দেখা দেয়।

১০

সমাজজীবন ও সমাজমানসের মধ্যে সম্বন্ধটাকে এতক্ষণ কতকটা এক মুখো করেই দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, অর্থাৎ যেন শুধু সমাজ-জীবনের প্রভাবে সমাজমানস পরিবর্তিত হচ্ছে অথচ তার বিপরীত ক্রিয়াটা হচ্ছে না—এমনতর ভাবেই কথাটা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা তা নয়; উভয়ের মধ্যে দুমুখো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াটাই সত্য। জীবনধারার পরিবর্তনটাই সমাজ-মানসের পরিবর্তনে মুখ্য হলেও, সমাজমানসের প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজ-জীবনেও আবার নবতর পরিবর্তন সূচনা হয়ে থাকে।

সুতরাং সমাজ-জীবনের বিপ্লব সম্ভাবনাকে সমাজমানসে বৈপ্লবিক প্রেরণার দ্বারা ত্বরান্বিত করা অসম্ভব নয়। তাই বৈপ্লবিক যুগে সংস্কৃতিসেবকদের বিপ্লবকে সহায়তা করার একটি স্বাভাবিক দায় আছে। সমাজ বিপ্লবের ফলে সমাজ-জীবনের ধারা বদল হয়, এবং তখন স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে সেই জীবনধারার অনুকূল চিন্তা ভাবনা স্বপ্ন ও কল্পনা সমাজ-মানসকে আন্দোলিত আলোড়িত করে এবং সাহিত্যেও তার ছায়াপাত হয় অনিবার্য ভাবেই। কিন্তু যখন সমাজ বিপ্লব আসন্ন হয়ে আসতে থাকে, প্রাচীন সমাজের অন্তর্বিরোধ যখন বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে তখন সমাজমানসে সেই বৈপ্লবিক ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করে তুলে সমাজকে আসন্ন বিপ্লবের দিকে সচেতনভাবে পরিচালনা করবার বাসনাও সংস্কৃতি সেবকদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু পূর্বে অন্যত্র † একথা বলা হয়েছে যে সাহিত্য শিল্প ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ। ফুল যেমন প্রকৃতির আপন নিয়মে সহজেই বিকশিত হয়ে ওঠে, তার পাপড়িগুলোকে যেমন জোর করে ফুটিয়ে তোলা যায় না, তেমনি ব্যক্তিত্বের সহজ, অনায়াস আত্মপ্রকাশই সাহিত্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা শুধু আমাদেব মনের ওপরতলাকার চেতন

† উত্তরা শারদীয়া ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

সত্তাটাকেই লক্ষ্য করি না, আমাদের সমগ্র চেতন এবং অবচেতন সত্তার ওপরই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিস্তার। সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে যখন আমাদের এই ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তা আমাদের অগভীর চেতনার ওপরকার অংশটিকেই শুধু প্রকাশ করে না। সুতরাং কর্তব্য এবং দায় হিসাবে গ্রহণ করে যদি কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পী তার যুগের প্রেরণাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেন তাহলে সে চেষ্টা প্রায়শই প্রপাগাণ্ডায় দাঁড়ায়, সাহিত্যের প্রাণময়তা তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

১১

সমাজ সত্তার মধ্যে যে সব ভাবনা এবং অনুভূতি বহুকাল ধরে বহু মনের মধ্যে পুষ্টি লাভ করে এসেছে সেই সব ভাব এবং অনুভূতি যেন সেই সমাজজীবনের সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গেই সকলের মধ্যে হিল্লোলিত সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। এইজন্য কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এইসব পুরানো ভাবনা কামনার ভিত্তির ওপর সাহিত্যরচনা সহজেই সম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু যেসব ভাবনা এবং প্রেরণা সমাজমানসে ভাবীকালের ইঙ্গিত বহন করে মাত্র, যা বহু মনে এখনো স্পষ্ট কোনো প্রেরণা হয়ে ওঠেনি, এক কথায় যা এখনো সমাজমনের মধ্যে বাস্তব হয়ে ওঠেনি, সেই ভাবীকালের স্বপ্নকামনাকে আপন চেতনায় সত্য করে অনুভব করা সাধারণ মনের কাজ নয়। যে-সব অসাধারণ মন এই অপূর্ব শক্তির অধিকারী, তারাই স্বপ্নকে সত্য করে তোলে, সুদূর কালকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করে। যে-সব সাহিত্যিক বা শিল্পী বর্তমানের অন্তর্বিরোধকে আপন চেতনায় অনুভব করে তারই মাঝ দিয়ে সম্ভাবিত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তাঁদের আমরা বলি যুগস্রষ্টা, তাঁরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করেন তার মধ্যে শুধু প্রাচীন এবং অভ্যস্ত জীবনের ভঙ্গিমাই প্রকাশ পায় না, তাঁরা আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন নতুন দৃষ্টি; সেই দৃষ্টি দিয়ে আমরা ভাবীকালকে প্রত্যক্ষ করি। সেই যুগস্রষ্টা সাহিত্যিকের সৃষ্টি তখন আগামী কালের জীবনকে রচনা করবার জন্য আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে এক আশ্চর্য উন্মাদনা। এই ধরনের সাহিত্যিকেরাই বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে তোলেন। এই বিপ্লব সব সময়ই কোলাহল করে আসে না, অন্ধকার রাত্রির পর উষাগমের মতো এই বিপ্লব আমাদের অজ্ঞাতসারেই সমাজচেতনাকে উদ্‌ভাসিত করে তোলে; প্রচণ্ড দিবালোকে সমগ্র জীবন মুখর চঞ্চল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অনেক সময়ই আমরা সেই নিঃশব্দ বিপ্লবের আবির্ভাবকে লক্ষ্যও করি না।

যথার্থ বিপ্লব প্রায়ই তার ভূমিকা রচনা করে অতি নিঃশব্দে, তাই একদিন যখন সেই বিপ্লব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তখন তাকে অত্যন্ত আকস্মিক বলেই মনে হয় বটে। তেমনি কোনো সাহিত্যিকের বৈপ্লবিক চেতনা যখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে তখন প্রায়ই তাকে আমরা পরিচিতির মাল্যদান করে অভ্যর্থিত করতে পারি না। পরে যখন তার স্বপ্ন সমাজজীবনে দেখা দিতে আরম্ভ করে তখনই আমরা সেই সাহিত্যিককে আমাদের প্রতিনিধি এবং পরিচায়ক বলে বুঝতে পারি। উষাগমে কাকের কোলাহল শোনা যায়, এবং তারা হয়ত বলতেও চায় যে তারাই উষার স্বর্ণরথটিকে বর্তমানের তোরণদ্বারে নিয়ে আসার

পরম গৌরবের অধিকারী, কিন্তু যথার্থ সূর্যোদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ওই ভ্রান্তির নিরসন ঘটে, এবং কাকের কর্কশ কোলাহলেরও অবসান ঘটে।

তাই মনে হয় আমাদের সাহিত্যের বিগত যুগেও যেভাবে যথার্থ যুগস্রষ্টার আবির্ভাবে সমাজমানসের বিপ্লব সাধিত হয়েছে, আগামী যুগের কিম্বা আসন্ন যুগের সাহিত্যে বিপ্লবও তেমনি কোনো শক্তিধরের সৃষ্টির দ্বারাই সংঘটিত হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য সাহিত্যে আমরা একটা বৈপ্লবিক কোলাহল শুনতে পাচ্ছি, সেটা একটা শুভলক্ষণ বলে ধরে নিলেও তাকে সাহিত্যের যথার্থ বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশ বলে মনে করা কিছুতেই চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের সাহিত্যে নবীন বিপ্লব-চারণের জন্য হয়ত আরো কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে হবে।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথ

উনিশ শতকের প্রথম থেকে মৃতপ্রায় বাঙলীর জীবনে নতুন এক কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। এই কর্মচাঞ্চল্যকে সৃষ্টিশীল পথে চালিত করে নিয়ে গিয়েছিল এক নতুন ভঙ্গীর জীবন-বোধ। কোম্পানীর শাসনের আওতায় যে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হোলো,—তাদের স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গ'ড়ে উঠল এই কর্মচাঞ্চল্য, এই জীবনদৃষ্টি। ইংরেজী শিক্ষার দয়ায় এঁরা ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'র মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন, প্রগতিশীল ইংরেজ মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে 'এক পতাকা, এক জাতি, এক দেশ'—এই স্লোগান তাঁদের মনে এক নতুন বাণী-নিক্কণ জাগিয়ে তুলল, ইউরোপের বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধের গৌরবময় ঐতিহ্যই তাঁদের প্রলুব্ধ করে তুলল এক নতুন জীবনের দিকে। ঔপনিবেশিক সমাজের সীমাবদ্ধ আবহাওয়ায়, ঔপনিবেশিক কর্তাদের কড়া শাসনে মানুষ হয়েও এঁরা ঐ বিরাট ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছুতেই উদাসীন হতে পারেননি। বাঙালী কেরানীর ধূলি-মলিন টেবিল থেকে, সরকারী চাকুরের পরাধীন দপ্তর থেকে, খুঁড়িযে চলা বাঙালী ব্যবসায়ী-জমিদার-মধ্যবিত্তের চাপা অসন্তুষ্টি থেকে—আস্তে আস্তে ধ্বনিত হয়ে উঠল স্বাতন্ত্র্যবোধ. দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধের সাড়া। সারা উনিশ শতক ধরে বাঙালীর মনে যে রেনেশাঁস আন্দোলনের তুফান ছুটেছিল, তা হোলো এই বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্ম-স্বার্থের সন্ধানে, আত্মবিশ্বাসের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় জয়যাত্রা।

অবশ্য, বাঙালীর মধ্যবিত্ত মনের এই অভিব্যক্তি কোনো এক সহজ সরল রাস্তায় হয়নি, নানা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হয়েছে। 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, হিন্দু মেলা ইত্যাদি কয়েকটা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এই মধ্যবিত্ত মনের অভিব্যক্তি। এর মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দান সব চেয়ে বেশি। রামমোহনের পৌরহিত্যে এই আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ছিল, তাই তিনি এত আগে জন্মেও এই আন্দোলনের সঠিকভাবে দিক্ নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের পরে এই

আন্দোলন এক দেশজোড়া আন্দোলনে পরিণত হয়, আর বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ হতে থাকে। এমন কি, ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্যত ধর্মগত আন্দোলনেও বাঙালী মধ্যবিত্তের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ক্রমিক বিবর্তনের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। রামমোহন থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—কেবল ব্রাহ্ম-আন্দোলনের দলগত বৈষম্যের লক্ষণ নয়, প্রত্যেক দলাদলির পিছনে ছিল নতুনতর প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টির তাগিদ, গোঁড়ামীর নতুন নতুন রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

রামমোহন থেকে ইয়ংবেঙ্গল এক লম্বা ধাপ। ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ংবেঙ্গল বুদ্ধিকে, বিচারশক্তিকে দিলেন প্রাধান্য, রামমোহনের মত শাস্ত্রের কথা তুলে তাঁরা জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করলেন না। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা, তখন বাঙালীর মনে ইয়ং বেঙ্গলের যুক্তিবাদ পেয়ে বসেছিল। কাজেই দেবেন্দ্রনাথও এই যুক্তিবাদকে অস্বীকার করতে পারলেন না। বরং তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনকে এই যুক্তিবাদের ভিত্তিতে আরও আধুনিক ও আরও সজীব করে তুললেন। তাই বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে শেষ পর্যন্ত বিচার জয়ী হোলো। অক্ষয়কুমার দত্তের বিচারে বেদের অভ্রান্ততা বরবাদ হোলো। আবার বাস্তব পরিবেশে যুক্তির বিচারে ইয়ং বেঙ্গলের বিজাতীয় মনোভাব ধোপে টিক্‌ল না। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রথম জাতীয় নৈরাশ্যের কথা স্মরণ করে জাতীয় সভা' (১৮৫১) প্রতিষ্ঠা করলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসাবে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং সেই মর্মে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। তাছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ সরকারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে ভালবাসতেন। (দ্রষ্টব্য : Bepinchandra Pal—The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj, পৃ:, ১৮)। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে বড় রকমের দুর্বলতাও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ অ-ব্রাহ্মণকে আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হতে দিতেন না, তাছাড়া সমাজের পরিচালনায় তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা সেদিনের গণতন্ত্রধর্মী অনেক যুবকের মনে এনেছিল বিদ্রোহস্পৃহা। কাজেই কেশব সেনের (কেশব সেন নিজে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন) নেতৃত্বে যুবক মনের গণতান্ত্রিকতা সাড়া পেয়েছিল। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তাই দাবী উঠল—মেজরিটির মত অনুসারে সমাজের পরিচালনা করতে হবে, জাতি-ভেদ মানব না, ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র নিজে এই আন্দোলনের নাম দেন 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'। তিনি ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভার আহ্বান দাবী করে গণতান্ত্রিক মতের প্রতি সম্মান দেখান (ঐ বহি, পৃ:, ৩০)। তাঁর নেতৃত্বে ইউরোপের জাতীয় শ্লোগান—'One Flag, One Nation, One Country' রূপান্তরিত হয়ে "One God, One Church, One Law, One Humanity' এই শ্লোগানে পর্যবসিত হয়। মোট কথা, কেশবের নেতৃত্বে যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠা হোলো তার মূলে ছিল আগে থেকে আরও পরিপুষ্ট গণতন্ত্রবোধ ও বুর্জোয়া-মনের সর্বমানবিকতাবাদ (universalism), ইউরোপ প্রবাসের ফলে কেশবের মনে ইউরোপের বুর্জোয়া সভ্যতার নেশা আরও শক্ত হয়ে বসেছিল। তাই তিনি এদেশে ফেরার পর প্রায়ই বলতেন,—পৃথিবীর সব চেয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠান—"Middle-class English Home" (শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত পৃ: ১৭৯)।

বলা বাহুল্য, কলকাতায় শিক্ষিত বাঙালীদের জীবনে যখন এই রকম এক প্রকাণ্ড আন্দোলন চলছিল, তখন শহরতলীর লোকদের মধ্যেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়ার, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ছেলেরা ভালো চাকরীর আশায় কলকাতায় এসে লেখাপড়া শিখতে শিখতে হয়ে উঠতো এই আন্দোলনের গোঁড়া ভক্ত। দেশের সেরা ছেলেদের তখন এই আন্দোলনে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। শিবনাথের গ্রাম মজিলপুর কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। মজিলপুরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে শিবনাথের ছেলে বয়সে। তাছাড়া, তাঁর মাতামহ সেদিনের এক প্রসিদ্ধ কাগজ 'সংবাদ-প্রভাকরের' সঙ্গে ছিলেন যুক্ত, তাঁর বড়মামা ছিলেন আর একটা প্রসিদ্ধ কাগজ 'সোমপ্রকাশের' সম্পাদক, কাজেই শিবনাথ অতি সহজে এই আন্দোলনের ভিতর এসে পড়লেন। তাঁর বিদ্রোহী যুবক-মন সব চেয়ে সাড়া পেল সে-দিনের সব চেয়ে প্রগতিশীল আন্দোলন কেশব সেনের নেতৃত্বে। প্রাণ-মন দিয়ে শিবনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই আন্দোলনে।

কিন্তু কেশবের 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বেশিদূর এগুল না, মাঝ পথে এসে থেমে গেল। এই স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলার ভার পড়ল কেশবের যুবক শিষ্যদের উপর। যুবকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠলেন—আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি। কেশবের গোঁড়ামী যুবকদলের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কেশব স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাছাড়া, তিনি 'অবতারবাদ', 'ঈশ্বরের আদেশবাদ' প্রভৃতি যুক্তি-নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের অবতারণা করে নিজের স্বেচ্ছাচারের পথ প্রশস্ত করতে লাগলেন। যুবকদল উপাসকমণ্ডীর কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কেশব এদিকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যুবকদল কেশবকে গণতন্ত্রের শত্রু বলে মনে করলেন এবং তাঁকে স্বেচ্ছাচারী নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করলেন! তাঁদের মতে—"কেশববাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধারণতন্ত্রের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সাধারণতন্ত্রের নিশান লইয়া কার্য করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নিজ মস্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশববাবু ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়া আদি সমাজের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, পরিশেষে যথেচ্ছচারী রাজা হইয়া বসিয়াছেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী—'আত্মচরিত'—পৃঃ ২১১-২১২)। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যুবকদলের মতভেদের আরও কারণ ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ব্রাহ্মসমাজের একটি মূল নীতি, কেশবচন্দ্র এই সময় এই প্রচার চালাতে থাকেন। এতে যুবকদলের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে চলে। শিবনাথ অভিযোগ করেছেন পুলিসের সাহায্য নিয়ে ব্রাহ্মমন্দির থেকে যুবকদের তাড়াতে কেশব পিছপা হননি ('আত্মচরিত'—পৃঃ ২৫২-৫৩)।

অন্যদিকে, আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি যুবকের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠল তার প্রধান কথাই হোলো স্বাদেশিকতা। যুবকদল কেবল সবরকম সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকেও আর দূরে থাকতে চাইলেন না। যুবকদলের জাতি-গর্বী মন জাতির পরাধীনতায় ব্যথিত হোলো। সামাজিক অবিচার, রাজনৈতিক অবিচার—সব কিছুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে আন্দোলন উঠল। সহজ কথা, উনিশ

শতকের মধ্যবিত্ত আন্দোলন পূর্ণাঙ্গতার প্রথম ধাপে পা দিল। 'ইণ্ডিয়ান লীগ' মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে প্রথম রাজনীতিক সভা। এই সভা স্থায়ী না হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে আর একটি সভার জন্ম হোলো। এই সভার নাম 'ভারত-সভা বা Indian Association (১৮৭৬)। কি উদ্দেশ্যে এই সভার জন্ম হয় তার উল্লেখ করেছেন শিবনাথ নিজেই—"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক" ("আত্মচরিত"—পৃঃ ২২৫)। শিবনাথ এই সভার চাঁদা আদায়কারী সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও 'ভারত-সভার সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"বলিতে কি, ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক দুদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য চলিয়াছিল" ("আত্মচরিত"—পৃঃ ২২৬)।

শিবনাথের ধারণা ছিল জাতিকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে যারা মুক্ত করতে চাইবে তাদের সব কিছু সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে হবে। তাই তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন—"ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস, স্বদেশ উদ্ধার তার কর্ম নয়"। ১৮৭৭ সালের আশ্বিন মাসে তিনি বাঙলার ভবিষ্যৎ নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতিকে "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" দান করেন।*

---

* "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়, ভক্ত কালীনাথ দত্ত এবং সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথ দত্ত-মহাশয় এক-গ্রামবাসী ছিলেন,—সকলেই প্রায় একই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বিধানের অধীন হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনেই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তারিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরে গভীর ধর্ম-বন্ধুত্বসূত্রে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আমি বহুদিন হইতেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সুপরিচিত ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতেই আমি "অগ্নিমন্ত্রে" দীক্ষা গ্রহণ করি। সে এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, শরচ্চন্দ্র রায়, তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার নিকট পূর্বেই এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে, গভীর রাত্রে, তাঁহারা সকলে দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইল। আমার বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা; ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমাপূজা; সমাজে জাতিভেদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম। তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম:

"(১) প্রতিমাপূজা করিব না, প্রতিমাপূজার সহিত কোনরূপ যোগ রাখিব না।

"(২) জাতিভেদ মানিব না, কোন প্রকারেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিব না।

"(৩) বাল্য-বিবাহ অশেষ অকল্যাণের আকর জানিয়া নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইব না, ষোড়শ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালিকার পাণিগ্রহণ করিব না;

এই উপলক্ষে শিবনাথ পরাধীন আর্যবর্তের সুদিন কামনা করে এক উদ্দীপনাময়ী জাতীয় সংগীত রচনা করেন। শিবনাথের পৌরহিত্যে হোমাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে বাঙলার প্রথম স্বদেশপ্রেমিকরা শপথ নেন (১) পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, (২) সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পরিপন্থী জাতিভেদের বিরুদ্ধে, (৩) ভগবানের অবস্থিত পরাধীনতার বিরুদ্ধে, (৪) দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও সরকারী চাকুরী নেওয়ার বিরুদ্ধে, (৫) ব্যক্তিগত স্বার্থে ধন-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে, (৬) বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে, (৭) বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, লোক-শিক্ষার প্রচারে, (৮) উপরোক্ত কাজের উপযুক্ত হওয়াব জন্য এবং অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিজের ঘরবাড়ির নিরাপত্তাব জন্য শারীরিক চর্চা, অস্ত্র-ব্যবহার। বন্দুক বা তরবারি রাখা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি) প্রভৃতির পক্ষে। এই শপথ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্তির আশা উপেক্ষা করে সরকারী চাকরী থেকে ইস্তফা দিলেন। বিপিনচন্দ্র আইন-পড়ার জন্য বিলাত যাওয়া স্থগিত রাখলেন, সুন্দরীমোহন I. M. S-এর লোভ চিরতরে সংবরণ করলেন (দ্রষ্টব্য ;—"Pandit Shivanath Sastri—as I knew" —by Sundarimohan Das—"Indian Messenger" "Maghotsav Number, 1947)।

উপরোক্ত প্রবন্ধে সুন্দরীমোহন দাস আরও বলেছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যেমন রাজানুগত্য ছিল একটা প্রধান কথা, তেমনি শিবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে একটি দিন জাতীয় ভাবের জন্য নির্দিষ্ট হোলো। তা ছাড়া শিবনাথের বাড়ির ভাবোৎসাহী কবিতা ও সংগীত 'হিন্দু মেলার' স্বাদেশিকতাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। ১৮৭৯ সালে আনন্দমোহন ও শিবনাথের নেতৃত্বে আরও একটি বড় কাজ শুরু হয়। এই কাজ—'ছাত্র-সমাজ' প্রতিষ্ঠা। এই ছাত্র-সমাজ সম্বন্ধে শিবনাথ লিখেছেন—"হিন্দু ধর্মের

এবং যে বিবাহে পাত্রের বয়স একুশের এবং পাত্রীর বয়স ষোল বৎসরের কম, তেমন বিবাহে যোগদান হইতে বিরত থাকিব।

"(৪) স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব।

"(৫) নিজেদের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা ও তাঁহার প্রচার করিব ; নিজেরা অশ্বারোহণ ও আগ্নেয়াস্ত্র-চালনা অভ্যাস করিব ; এবং সমস্ত দেশে যাহাতে অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছুঁড়িবার অভ্যাস প্রচলিত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব।

"(৬) একমাত্র স্বায়ত্তশাসনই বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা ; কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীর শাসনকে স্বীকার করিব ; কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য-দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কদাপি এই গভর্নমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।

"আরও দুই একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, সব এখন ভাল করিয়া মনে নাই, প্রতিজ্ঞাপত্রের কাগজটিও হারাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই আত্মপ্রসাদ আছে,—ভগবানের নাম লইয়া, ৪৫ বৎসর পূর্বে, যে-ব্রত লইয়াছিলাম, যে-সমুদয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই; বিধাতার আশীর্বাদে, জীবনে পালন করিতে পারিয়াছি। আর শুধু আমি নয় ;—জীবিতদের মধ্যে বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন, উমাপদ বাবু এবং পরলোকগতদের মধ্যে 'দাদামহাশয়' শরচ্চন্দ্র রায়, কবি আনন্দচন্দ্র, কালীশঙ্কর সুকুল—সকলেই মোটের উপরে প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন।" জীবন স্মৃতি : গগনচন্দ্র হোম।

নামে পশ্চাদ্‌গতিশীলতার পুনরুত্থানের তরঙ্গ উঠিলে তাহাকে বাধা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।" তাছাড়া, এই ছাত্র-সমাজের রাজনীতিক মূল্য কম নয়। সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিবনাথ কোনোদিন ভয় করেননি। মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় ভারত-সরকারের ব্যয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: "The poor man's salt is not free from duty"। এই নিয়ে মাদ্রাজের ইংরেজী কাগজগুলোয় খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। এছাড়া, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ভারত-সভার সহ-সম্পাদক দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী আসামের কুলি-আইন নিয়ে যে আন্দোলন তোলেন শিবনাথের তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানের সময় ঐ সম্পর্কে ঐ দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই কুলি আইনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকায় আসামে গিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে পুলিসের কুনজরে পড়তে হয়। শিবনাথের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত মন বিলাত প্রবাসের সময় সব চেয়ে আকৃষ্ট হয় ইংরেজ মধ্যবিত্তের জীবন-দৃষ্টির প্রতি। বিলাতের মেয়েদের স্বাধীনতা, পুরুষদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ তাঁর মনে সব চেয়ে আলোড়ন আনে। ইউরোপের বুর্জোয়া জীবনের প্রগতিশীলতা, বলিষ্ঠতা ও পূর্ণাঙ্গতায় ঔপনিবেশিক সমাজের পিঞ্জরে আড়ষ্ট উন্নতি-প্রয়াসী ভারতীয় মধ্যবিত্ত মন যে আকৃষ্ট হবে, এতে আশ্চর্য কি?

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিবনাথের জলন্ত দেশপ্রেমে একটুও মরচে ধরেনি। ১৯০৭ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার প্রভৃতির নির্বাসন নিগ্রহের প্রতিবাদে যখন সভা ডাকা হয়, তখন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য লোক পাওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করে যুবকদলের অদম্য সংগ্রামস্পৃহাকে সম্মান জানাতে ভোলেননি। তাঁর শিষ্য ও সহযোগী সুন্দরীমোহন দাসের ভাষায় তিনি সত্যিই ছিলেন—"a connecting link between the old and the new, at the same time a challenge to autcratie conservatism which try to suppress progressive humanity by repression ("Pandit Shivanath Sastri—as I knew him"—Maghotsav Number, "Indian Messenger," 1947)।

নরহরি কবিরাজ

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষায় আছি, কবে যেন বলেছিলে আগে
ফের দেখা হবে, তাই যুগসন্ধিক্ষণে
জ্বরতপ্ত মনে
ধ্যানে জ্ঞানে তোমাকেই রাখি পুরোভাগে।
চারিদিকে অবিরাম যুগান্তের ঢেউ
রাত্রি দিন আবেগ-গম্ভীর,
অসম্ভব তীব্রতা বারিধির ;
মেরু থেকে অন্য মেরু, সুমেরু শিখরে
ঘরে-ঘরে হাটে ও প্রান্তরে
সর্বত্রই জীবনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার বাণী,
তোমার আশায় তাই আছি বজ্রপাণি।

শেষ কবে হয়েছিল দেখা
মনে পড়ে না তো।
সে কি পলাশীর মাঠে ?   পাণিপথে ?
সিপাহী যুদ্ধের দিনে ?   বেয়াল্লিশ সালে ?
বর্গী হানা দিয়েছিল কবে ?   ক্লাইভের পঙ্গপালে
ভরেছিল আম্রবন, কেঁপেছিল শান্ত ভাগীরথী ;
শুষ্কপত্র পড়ে ঝরে'
বনে-বনে অন্ধকার, বায়ু কেঁদে উঠেছিল জোরে ?

যে বাঁচায় তারে নিয়ে আছি।
দরিদ্র কুটিরে, মৃত্তিকার কাছাকাছি
শুষ্ক মাঠে তৃষ্ণা জেগে রয় ;
ঘুরেছি তো রিক্তহস্ত দীর্ঘ দিন পথে-পথে,
অনেক মরমী ব্যথা সুগভীর ক্ষতে।
তারপর ধীরে ধীরে
আলস্যমন্থর দেহ নড়ে' ওঠে ;
জীবনের একান্ত গভীরে
যতো ক্ষোভ পুঞ্জিভূত, সারা হিন্দুস্থানে
বোম্বাই দিল্লীর পথে দোলা লাগে
যতো ভাঙা নীড়ে।

আসমুদ্র হিমাচল সুপ্তোত্থিত কুম্ভের মতন
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে বিশাল বাহিনী,
এখনো কি হয়নি সময় ?
নির্দেশের অপেক্ষায়
দিন চলে' যায় ;
নিত্য নব ঘটনার রক্ত লাগে সময়ের
　　　　　　রথের চাকায়,
প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সাংবাদিক

রাত্রি এখন সবে ছুটো বেজে পনর মিনিট.
টেবিলে কনুই, চেয়ারে ঠেকেছে নীলদাঁড়া-পিঠ,
নিষ্প্রাণ মন, গতানুগতিক সাংবাদিকতা
কালো মৃত্যুর কিনার-ঘেঁষা এ ঝুটা জীবনটা।
সম্পাদককে পারো তো শুধাও
চাকুরী লীলায় তেইশ বছর হয়েছে উধাও,
এই অফিসের কড়িকাঠ-সিঁড়ি-রেলিং-বেয়ারা যতো
নখের ডগায় গুণে দিতে পারি নামতার মতো।
এই হাড়ভাঙা আয়ু-খোয়ানোর চাকুরি হেন—
পোহানো কেন ?

শহরে যখন স্বপ্নের রোদ ঢালে উত্তাপ
আমার টেবিলে ঘনায় তখন কালো অভিশাপ ;
আসন্ন উষা—তারি সমারোহ সভয়ে সাজানো ;
চায়ের প্রহরে পাঁপরের মতো পত্রিকাখান্-ও
যাতে শোভা পায় রাত জেগে করি তাই প্রত্যহ
এ-দুর্বিষহ।

তেইশ বছর কতো রাত জেগে বেছেছি খবর—
খুঁজেছি খবর,
খুঁটেছি খবর,
সম্বৎসর।

অনেক ঘটনা, রটনা করেছে উঁচু শিরোনামা ;
রোটারি প্রেসের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠা আর নামা
অনেক করেছি এ জীবন ধ'রে
সারারাত শেষে কাগজ ছেড়েছি ট্রামছাড়া ভোরে।
তবু—
এই হাঁটুভাঙা জীবনটা ভ'রে ছিল এক খুশি
ঘেঁটে রাতদিন ঘটনার ভূষি
দিনে দিনে আমি লিখেছি কালের ইতিহাসখানি
তবু কি তা জানি
অষ্টপ্রহর এত যে খবর আসে আর আসে
টেবিলের পাশে,
এত যে জীবন পৃথিবীর 'পর কুঁড়ি হয়ে ফোটে
এত আধুনিক হাওয়াই জাহাজ ধুলো হয়ে লোটে
এত মানুষের-খুলি-উড়ে-যাওয়া, ভিটে-পুড়ে-যাওয়া
হাহাকার-রাত
এত ভালোবাসা এত সংঘাত
আমি কি শুধুই সেই জীবনের সংবাদবহ
এই দুঃসহ ?

এত সংবাদ গ্রীসের পাহাড়ে মিশরে জাভায়,
ইন্দোনেশিয়া ইরানের হাওয়া দুনিয়া কাঁপায়।
বহু জনতার শ্লোগান-মুখর টেলিপ্রিণ্টার !
আমি এ-জীবনে অসংখ্যবার
তোমার সঙ্গে রাত্রি জেগেছি টেলিপ্রিণ্টার !
আর,
আশা ছিল মনে
একদিন কোনো আচম্‌কা-ক্ষণে
আমার খবর পরী হয়ে উড়ে আসবে এখানে।
তেইশ বছর রক্তের দাগে তিল তিল লেখা
সেই যে খবর তার সঙ্গে কি হবে নাকো দেখা ?
সীসের গুলিতে প্রাণ দেওয়া যদি সংবাদ হয়
আমার জীবন তবে কেন নয় ?
সীসের ধোঁয়ায় অকালে শুকানো আমার জীবন বলো কম কিসে
তেইশ বছর রুখেছি মৃত্যু, মরিনি বিষে।

যারা দেশে দস্যুতা করে বোমা ফেলে গুঁড়ো করেছে শহর
লাল ইয়েনানে পাঠিয়েছে পীত বিমানবহর
বেঅনেট দিয়ে গড়েছে খবর
রয়টার শুধু তাদেরি কথায় মুখর কেন ?

অনেক ফানুস কালের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে
অনেক কিস্তি মাৎ হয়ে গেল, আমি আছি বেঁচে
রাত জেগে জেগে চলেছি সমানে সংবাদ বেছে।
বোমার বছর দাঙ্গার রাত জেগে কাটালাম
ঘুঘু-মালিকের লাভের অঙ্ক খেটে বাড়ালাম
বিনিময়ে আমি শিরে টাক ছাড়া কীইবা পেলাম ?
টেলিপ্রিণ্টার ! শোনো

দুঃখ সয়েছি, তবুও তোমার
মুখ চেয়ে শুধু বুকে আশা বেঁধে রেখেছি এখনো,
ভেবেছি মনে
সেই শুভরাত আসন্ন বুঝি এখনি হ'ল !
পরমায়ু যায়, গিয়েছে, গেল
ভেবেছি তবুও, সেই খবরের লগ্ন কখন্ হবে
আমার জীবন-সংগ্রাম যবে
তোমার যন্ত্র-জিহ্বায় বেজে উঠ্‌বে, উঠ্‌বে
রাত্রি শেষের চাঁদের মতন উর্ধ্বে ফুটবে
এ জীবন-নভে ?
কখন ? কবে ?

আজ এতকাল পর
কী আশ্চর্য ! এল বাঞ্ছিত সেই খবর।
খট্-খট্-খট্ খট্-খট্-খট্
সারা কলকাতা নগরীর প্রেসে কাল থেকে শুরু ধর্মঘট—
টেলিপ্রিণ্টার কথা ক'য়ে যাবে মধ্যরাতে
বসবে পাহারা অফিসের নিচে রাইফেল হাতে,
সাংবাদিকরা জাগবো না আর সংবাদ সাথে,
খট্-খট্-খট্
কলকাতা রবে নিঃসংবাদ—নয়া সংকট !

বিগত তেইশ বছরে যা কিছু
ছেপেছি খবর শিরদাঁড়া বেঁকে মাথা করে নিচু
আজকে সে সব অসার ঠেকছে

জীবনকে আজ নতুন আলোকে
সার্থক করে পেলাম
এক মিনিটেই তেইশ বছর ডিঙ্গিয়ে এলাম।
ইন্দোনেশিয়া, বোম্বাই, চীন, সার্থক তবু
আমার জীবনে সবচেয়ে সার্থক,—
একটি খবর : আমার লড়াই—
আমার ধর্মঘট !

সে-খবর আজ টেলিপ্রিণ্টারে দিল এ-পি-আই,
কালকে অফিসে তালা নির্ঘাৎ—
কোনো কাজ নাই।

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

দু'টি কবিতা

স্বপ্নশেষ

কালো মেঘ, নীল ছায়া আকাশের, সমুদ্রের ঢেউ
আত্মার ক্রন্দন !
সে পৃথিবী মুছে গেল কখন ? কোথায় ?
শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙা চোখে খুঁজি নিজেকে যখন
পারিনা চিনিতে।

ক্ষমা কোরো মোর দীনতাকে,
আমার হৃদয়ে যদি চেতনার বহ্নি নাহি থাকে,
কোন শুভ্র তারা যদি ফুটে নাহি ওঠে মোর চিন্তার ঝলকে
তবে ক্ষমা কোরো।

এ আকাশ বিষাক্ত আমার
সর্পিল প্রশ্বাসে,
এই মন রুদ্ধ, গতিহারা
পৃথিবীর চাপে ;
স্বপ্নের পাথেয় মোর নিঃশেষিত রুক্ষ মরুতটে॥

কবন্ধ রাত্রি

দিনের সমুদ্র থেকে এবার আসেনি আমন্ত্রণ,
এবার এসেছে ডাক কবন্ধরাত্রির এক
অন্ধ-ম্লান মৃত্যুগুহা থেকে,

নির্বোধ এ জনতার রুগ্ন মনে সঞ্চারিয়া বিষ
এবার এসেছে ডাক জড়বুদ্ধি এ অপমৃত্যুর।
দেখেছি নখরে তার সদ্যোজাত শিশুর শোণিত,
শুনেছি নারীর কান্না হিংস্র তার বদ্ধমুষ্টি মাঝে;
অসহায় পথিকের বিপর্যয় দেখেছি সম্মুখে।
এই প্রজ্ঞাহীন রাত্রি এনেছে চরম বিভীষিকা,
তিক্ত হাভিয়ার জ্বালা এনেছে সে খর ঘূর্ণাস্রোতে,
মুক্তিহীন অবরোধ এনেছে সে রুদ্ধ বাতায়নে;
রুধিয়া নিঃশ্বাস বায়ু এনেছে সে মৃত্যুর পাথেয়।

তবুও দেখেছি আমি অনির্বাণ সাধনা মুক্তির
জগদ্দল শিলা ফেলে নিতে চায় আলো, বায়ু, প্রাণ
মানুষের হাতে হাতে রেখে
ফিরে পেতে চায় তার প্রাচীন বিশ্বাস;
নিরন্ধ্র রাত্রির শেষে পেতে চায় প্রভাতের সোনালি স্বাক্ষর।
এ প্রাণবন্যার বহ্নি বার বার চাপা পড়ে পাথরে শিকলে;
সাপের ফণার নিচে সুর তুলে জীবনের গীতি বিহঙ্গম
মৃত্যুর বিষাক্ত শ্বাসে বারবার পড়ে সে ঝিমায়ে।

তবুও নূতন করি জেগে ওঠে বাঁচার সাধনা,
তবুও দুর্গম পথে ভিড় করে যাত্রী সাহসিক,
মধ্য রাত্রে প্রভাতের পাখী
স্বপ্ন দেখে :
শেষ এই কবন্ধ রাত্রির॥

ফররুখ আহ্‌মেদ

১৯৪৭ সন

হে অচেনা বন্ধুরা আমার,
নমস্কার।
বহু ক্ষতি, বহু অপচয়ে
বিপত্তি ও বিপর্যয়ে
জর্জরিত তোমাদের বুক,
তার মাঝে আমি আগন্তুক।
তোমরা অনেকে মিলে জানি,
লিখেছ আমার তরে ঘরে ঘরে সুস্বাগত-বাণী,
করেছ আলয়
পূর্ণঘট, রম্ভাতরুময়।
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি দীন হতে দীন,
মর্যাদার প্রতিদানে শক্তিলেশহীন।
তবু মনে মনে আশা,
মোর ভালোবাসা
ফুটাইতে পারে যদি একটিও ম্লানমুখে হাসি,
দুর্দিনের অন্ধকার নাশি'
মুছাইতে পারে যদি একটি দুঃস্থের আঁখিজল—
জীবন সফল।
হোক জন্ম পঙ্ককুণ্ডে তবু সদা ঊর্ধ্বে থাকি' তার
প্রফুল্ল পঙ্কজ সম সৌরভ বিলাব আপনার।
সে সৌরভ, সে সুগন্ধধন
করিবে মালিন্যমুক্ত মানুষের মন।
হবে না বারণাবত্ত পুনরভিনয়,
রহিবেনা দ্যুতরণ, কুরুক্ষেত্র ভয়
অন্তরমাধুরী দিয়া রাঙানো সে কেতু
হস্তিনায়, হরিপ্রস্থে বেঁধে দেবে মিলনের সেতু।
আপন অন্তরমাঝে পদধ্বনি করি' অনুভব,
সমস্বার্থে অভিযাত্রী দুই ভাই কৌরব পাণ্ডব!
তাই আজি প্রাথমিক পরিচয় ক্ষণে
হৃদয়ের ভালোবাসা সনে
করি' জোড়হাত,
সবারে জানাই সুপ্রভাত।

উমারঞ্জন চক্রবর্তী

ট্রুম্যান ও ওয়ালেস

পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকটতম সহকর্মী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সভাপতি ও পদত্যাগকালীন বাণিজ্যসচিব হেনরী ওয়ালেস বিগত ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এই দীর্ঘ পত্রটি লিখেন। এই পত্রটির রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্র প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মতদ্বৈধতার দরুন ওয়ালেস পদচ্যুত হন। ওয়ালেসের এই পত্র ও তাঁহার পদত্যাগ পৃথিবীর সকল দেশে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত ধনকুবেরদের কুক্ষিগত ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার কোনো বড় সংবাদ পত্রেই এই চিঠি আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হয় নাই, আমাদের দেশে তো দূরের কথা। ভারতীয় সংবাদপত্রে রয়টারের মারফৎ ওয়ালেসের চিঠির ভগ্নাংশ মাত্র ছাপা হইয়াছিল বিকৃত টীকাটিপ্পনী সহ। তাহা হইতে মনে হয়, ওয়ালেস সম্ভবত মার্কিন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের (Isolationist) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি গঠনের বিরোধী, নয়ত তিনি প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদী। এই সকল ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল এবং ওয়ালেসের চিঠি বিশ্বরাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করার কারণ আদ্যোপান্ত পড়িলে জানা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরে থাকিয়া ওয়ালেস বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আমেরিকা নিশ্চিতভাবে ইচ্ছা করিয়া রাশিয়ার সহিত এক চূড়ান্ত সংঘর্ষের পথে আগাইয়া যাইতেছে। তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন—আমেরিকার বিপুল রণসজ্জা, আণবিক যুদ্ধ ও জীবাণুঘটিত যুদ্ধের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি। ওয়ালেস দেখিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে নৌ ও বিমান ঘাঁটী তৈয়ার করা হইতেছে, এবং তাহা একমাত্র রুশ-বিরোধী যুদ্ধেই ব্যবহৃত হইতে পারে। সরকারী মহলের খবর হইতে তিনি জানিতে পারিলেন যে মার্কিন নৌ ও সেনাবাহিনীর কর্তাদের মধ্যে অনেকে "যুদ্ধ নিরোধকারী" যুদ্ধের নামে এখনই রাশিয়ার উপর আণবিক আক্রমণ চালাইতে ইচ্ছুক। বাণিজ্যসচিব হিসাবে ওয়ালেস মধ্যপ্রাচ্যে তৈল-স্বার্থ লইয়া রুশ-মার্কিন প্রতিযোগিতার কথাও বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সর্বোপরি ওয়ালেস জানিতেন যে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব বার্নসের বিশ্বাস হইল, রুশ-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে পরস্পর বোঝাপড়ার দরকার নাই, শক্তিপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই রাশিয়া আমেরিকার পোঁ ধরিতে বাধ্য হইবে।

এই শক্তি-গর্বিত পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, শান্তিকামী ও প্রগতিবাদী হিসাবে ওয়ালেস আপনার কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্রসচিব বার্নসের মতে বলদৃপ্ত আমেরিকার দৃঢ় মনোভাবই শান্তি রক্ষা করিবে। অন্যদিকে ওয়ালেস মনে করেন, এই পশুবলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে নিশ্চিত করিয়া তুলিবে।

ওয়ালেস শুধু এই শক্তিমদমত্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদ জানাইয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এই নীতির সংশোধনে পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই চিঠিতে তিনি

বলেন, বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লওয়া দরকার, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে। কারণ বিগত শত বৎসর ধরিয়া 'মোন্‌রো' নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র আমেরিকা মহাদেশকে আপনার প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসাবে গণ্য করিয়াছে। কিন্তু কার্যত যুক্তরাষ্ট্র নিজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিয়া, অন্যদিকে রাশিয়াকে তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রভাব বিস্তারে বাধা দিতেছে। ইহার কূটনৈতিক অর্থ হইল, যুক্তরাষ্ট্র আজ সমগ্র জগতে 'মোন্‌রো' নীতি চালু করিয়া বিশ্বপ্রভুত্ব স্থাপন করিতে চায়। এই চিঠিতে ওয়ালেস আণবিক অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও রুশ-মার্কিন আর্থিক সম্বন্ধের উন্নতিকল্পে কয়েকটি কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, এই সকল প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টা হউক, এই দুই বৃহত্তম রাষ্ট্রের মধ্যে একটা কূটনৈতিক মীমাংসা হউক পরস্পর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া, বল পরীক্ষার দ্বারা নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রুশ-নায়ক স্টালিনও ওয়ালেসের প্রস্তাবের ভিত্তিতে রুশ-মার্কিন বোঝাপড়া অগ্রসর হইতে পারে, এইরূপ বিবৃতি দিয়াছিলেন এক বিশিষ্ট সাংবাদিকের নিকট।

ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, হেনরী ওয়ালেসের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির এই সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। বার্ন্‌সের নীতির উপর তাঁহার সংশোধনী প্রস্তাবও সংস্কারপন্থী। তাহা হইলেও মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের শক্তিমদমত্ত যুদ্ধবাদী নীতির সহিত ইহা খাপ খায় না। তাই ওয়ালেসকে শুধু মন্ত্রীসভা হইতে বিতাড়িত করা হয় নাই, ডেমোক্রাটিক দলের সভামঞ্চ হইতে তাঁহার বক্তৃতাদানও নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ওয়ালেসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করায় নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইল, মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বার্ন্‌সের পশুবলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নীতিই অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি বার্ন্‌স স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, সেস্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন জেনারেল মার্শাল। ইহাতে সূচিত হইতেছে, বার্নসের বলদৃপ্ত নীতি আরো জোরালো ভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হইতেছে যুদ্ধবাদী সামরিক মহলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়া, এই পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হইল পৃথিবীর সকল প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র নির্দেশ অনুযায়ী 'শান্তি ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা। নিশ্চিতভাবে এই পররাষ্ট্র নীতির চরম পরিণতি হইল বিশ্বযুদ্ধের বিপদ ঘনাইয়া আনা। কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার এই শক্তিগর্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মুখে রাশিয়া কখনও মাথা নত করিবে না। বিশ্ব-শান্তি ব্যবস্থায় রাশিয়া নিজের মতামতও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

মার্কিন রাষ্ট্রনায়কেরা জানেন, তাঁহাদের এই বিশ্ব-প্রভুত্বকামী পররাষ্ট্রনীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা ভিন্ন সফল হইতে পারে না। তাই আমেরিকার ভূতপূর্ব স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist) নেতারা আজ ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার কথা তুলিতেছেন, স্বভাবতই ওয়ালেস এই স্বার্থবাদী নীতির বিরোধী। ওয়ালেসের নীতি হইল রুশ-ইঙ্গ-মার্কিন ত্রয়ী শক্তির সহযোগিতা, কারণ ইহাতেই বিশ্বশান্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যদিকে বার্ন্‌স ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা চান বৃটিশ সহযোগিতা দ্বারা কূটনীতি বা বলপ্রয়োগে রাশিয়াকে পরাভূত ও ধ্বংস করিতে।

আমেরিকার এই বিশ্বগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে মার্কিন

জনমতের উপর ও আংশিকভাবে বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির উপর। মন্ত্রীসভা হইতে বিতাড়িত ওয়ালেস আজ আমেরিকার তৃতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন শান্তিবাদী ও প্রগতিবাদী জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া। ওয়ালেস সাম্যবাদী নহেন। গণতন্ত্রের মুখোশধারী মার্কিনী ধনতন্ত্রের উপর তাঁহার অটুট বিশ্বাস, সকল প্রকার শোষণমুক্ত সোভিয়েট জনসাধারণ সে তুলনায় অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ—এই ভুল ধারণা তিনি পোষণ করেন। তাহা হইলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার শান্তিবাদী আন্দোলন বিশ্ব-প্রগতিকে সাহায্য করিবে।

অন্যদিকে তথাকথিত "সমাজতন্ত্রী" বেভিনের নেতৃত্বে, মার্কিনের অধমর্ণ বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতি "মহাজন যেন গত সঃ পন্থা" অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায়, সর্বত্রই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঐক্য আজও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন গোপন সামরিক চুক্তি হইয়াছে, মারণাস্ত্র বিনিময়ের পরিকল্পনা হইয়াছে। অবশ্য আজ বিশ্বগ্রাসী মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বাধা বেভিনমার্কা পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে বিরাট জনমত গঠিত হইতেছে। শ্রমিকদলের 'বিদ্রোহী' পার্লামেণ্ট-সদস্যবৃন্দ তাহার প্রতিভূস্বরূপ।

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে আজ বিশ্ব-প্রগতি ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ভবিষ্যতে কি লেখা আছে কেহ জানে না। একদিকে বিশ্বশান্তি ও মানবতার মুক্তির পথ, অন্যদিকে আণবিক যুদ্ধ ও সভ্যতার বিনাশ। হেনরী ওয়ালেসের এই পত্র প্রকাশ সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ ইহাতেই প্রথম বিশ্বপ্রগতিকে ধ্বংস করিবার জন্য বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * *

প্রিয় সভাপতি মহাশয়,

আশাকরি এই দীর্ঘ পত্রের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। দীর্ঘ পত্র লেখা আমি নিজে পছন্দ করি না এবং আমার কাছে কেহ দীর্ঘ পত্র লিখিলেও আমি বিরক্ত হই।

এই দীর্ঘ পত্রের স্বপক্ষে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে, তাহা হইতেছে—এই পত্রের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত আজকের জগতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা যায় এই বিষয়টির উপর। গত বৃহস্পতিবার এই বিষয়টি লইয়া আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং শুক্রবারের মন্ত্রী সভার অধিবেশনের পর আপনি বলিয়াছিলেন আমার মতামত জানিতে পারিলে আপনি খুশি হইবেন।

যুদ্ধ অবসানের পর হইতে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করিয়া আমি ক্রমশই বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিতেছি। আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে যে আর একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং এই যুদ্ধকে এড়াইতে হইলে প্রাণপণে সমরায়োজন করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনো পথ নাই। জনসাধারণের এই চিন্তাধারা আমাকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অতীতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সমর সজ্জার প্রতিযোগিতায় শান্তি আসে না, তাহাতে যুদ্ধের পথই পরিষ্কার হয়।

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত ইতিহাসের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবে। পাঁচ দশ বছরের মধ্যে যখন আণবিক বোমা উৎপাদনের কৌশল বিভিন্ন জাতির আয়ত্তাধীন হইবে, তখন তাহারা আণবিক যুদ্ধে সভ্যতার অবসান ঘটাইবে কিনা—এই সময়ের মধ্যেই হয়ত সেই প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। সেই জন্যই, আসন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধের গতিধারা কি ভাবে পরিবর্তিত করা যায় সে সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাকে জানাইতে চাই। কিছুদিন পূর্বে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের এবং ইটালীর শান্তি শর্ত সম্বন্ধে আমরা সত্যই খানিকটা অগ্রসর হইয়াছি। এই অবস্থায় বিশেষ করিয়া এই বিষয়টির উপর আমি জোর দিতেছি দেখিয়া আপনি হয়ত আরও আশ্চর্য হইতেছেন। অনেকেই আজ ক্রমশ আশাবাদী হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদের মতে পূর্বেকার ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া মীমাংসার পথে আরও খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, যদিও ইউরোপের বাকী সমস্যাগুলির সমাধান পূর্ব মীমাংসিত সমস্যাগুলির তুলনায় অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিনিধি গত কয়েক বছর ধরিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রচেষ্টার সুখ্যাতি করি।

আমাদের প্রতিনিধিদের যে সব উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং রুশ প্রতিনিধিদের ব্যবহারে আপাত দৃষ্টিতে যে সব অসামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে আমি তাহা জানি।

অপর পক্ষে, আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বাহির হইতে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করিতেছেন, এই সমস্ত অসুবিধাগুলির জন্যই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন।

রণসজ্জার গুরুভার

বাণিজ্য-সচিব হিসাবে আমাকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহলের সান্নিধ্যে আসিতে হয়। আমি দেখিয়াছি যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের বিপুল আয়তন এবং জাতীয় ঋণের গুরুভার সম্বন্ধে তাঁহারা খুব চিন্তিত। পরবর্তী বৎসর এবং তার-পরের বৎসরের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে দেশরক্ষার খাতে।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৭ সালের সরকারী বাজেটে মোট ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৩৬০০ কোটী ডলার। ইহার মধ্যে শুধু যুদ্ধ বিভাগ ও নৌ বিভাগের বরাদ্দ হইল ১৩০০ কোটী ডলার। আরও ৫০০ কোটী ডলার বরাদ্দ হইয়াছে যুদ্ধকালীন কাজকর্ম গুটাইবার ব্যয় হিসাবে। ১০০০ কোটী ডলার ব্যয় হইবে জাতীয় ঋণের সুদ ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের ভাতা হিসাবে। এইগুলি বিগত যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের হিসাব নিকাশের জের। সুতরাং দেখা গেল সর্বশুদ্ধ ২৮০০ কোটী ডলার অর্থাৎ বাজেটে মোট খরচের শতকরা ৮০ ভাগই যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে।

স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যয়ের হিসাব হইতে একটা বড় অংশ বাদ দিতে গেলে, সামরিক ব্যয়েরই সঙ্কোচ সাধন করিতে হয়। ১৯৩০-৩৯ দশকে এই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যত ছিল, এখন তাহা দশ গুণেরও বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৮

সালের বাজেটে দেশরক্ষার জন্য খরচ ধরা হইয়াছিল ১০০ কোটী ডলারের কিছু কম। আর বর্তমান বাজেটে এই খরচ ধরা হইয়াছে ১৩০০ কোটী ডলার। এইভাবে দেখা যায়, শুধু আর্থিক দিক দিয়া চিন্তা করিলেও, আমেরিকার জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ হইল এক শান্তিপূর্ণ জগৎ গড়িয়া তোলা, যাহাতে দেশরক্ষার খাতে এই অনাবশ্যক গুরুভার কমানো যায়।

অবশ্যই, শুধু আর্থিক লাভালাভই এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যে, শুধু ইহার জন্যই আমরা জগতে শান্তি চাহিব। মূল কারণ হইতেছে এই যে, আমরা আর একটি যুদ্ধ চাহি না, বিশেষ করিয়া আণবিক যুদ্ধ একেবারেই চাহি না। নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে যে আণবিক যুদ্ধ প্রধানত বেসামরিক জনসাধারণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইবে এবং ইহার দ্বারা বর্তমান সভ্যতার ধ্বংস হওয়াও সম্ভব।

এই অবস্থা সত্ত্বেও কি আমরা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিবার জন্য উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণে আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করিতেছি!

নিঃসন্দেহভাবে আমেরিকার জনসাধারণ চাহে এবং আশা করে আমাদের নেতারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু অবশ্যই এই লক্ষ্য সাধনের উপযোগী পথ নির্ধারণের জন্য জনসাধারণকে নেতাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, এখন সাধারণের ধারণা এই যে—যুদ্ধ-নিরোধের আশা বৃথা; চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আমেরিকাকে অন্যান্য জাতিগুলি বাধা দিতেছে।

বিদেশীদের দৃষ্টিতে আমেরিকা

প্রাচ্যে বিজয় দিবসের পর হইতে অপর জাতিগুলি আমেরিকাব কার্যাবলী কি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে?

কার্যাবলী অর্থে আমি কয়েকটি বাস্তব সত্যের কথাই উল্লেখ করিতে চাহিতেছি—যেমন, যুদ্ধ ও নৌ-বিভাগের জন্য ১০০০ কোটী ডলারের বরাদ্দ, বিকিনি দ্বীপে আণবিক বোমার পরীক্ষা, আণবিক বোমার উৎপাদন চালু রাখা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা, দূর প্রান্তে বোমা বর্ষণের উপযোগী বি-২৯ বোমারু বিমান উৎপাদন ও বি ৩৬ বিমান উৎপাদনের পরিকল্পনা, এবং পৃথিবীর অপর গোলার্ধে বোমা বর্ষণের ঘাঁটী হিসাবে এক গোলার্ধ জুড়িয়া বিমান কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই সমস্ত কার্যাবলীতে জগতের লোক ইহাই মনে করিতেছে যে, শান্তি সম্মেলনের মৌখিক বুলি আওড়ান ছাড়া আমরা আর কিছুই করিতে চাহি না।

এই সমস্ত কাজের দ্বারা ইহাই মনে হইতে পারে, (১) হয় আমরা আর একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করি ও সেই যুদ্ধ জয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি (২) নয়ত আমরা পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির উপর ভয় দেখাইয়া আধিপত্য করিবার জন্য সবচেয়ে বিরাট সমরশক্তি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

যদি আণবিক বোমা আমাদের হাতে না থাকিয়া রাশিয়ার হাতে থাকিত, যদি আমাদের উপকূলের ১০০০ মাইলের মধ্যে রাশিয়ার বিমান-ঘাঁটী, ও ১০ হাজার দূর পাল্লার

রুশ বোমারু বিমান থাকিত, অন্যদিকে আমাদের অনুরূপ কিছুই না থাকিত তাহা হইলে আমাদের কি মনে হইত ?

কয়েকজন সমরবিভাগের লোক ও আত্মগর্বিত বাস্তববাদী বলিতেছেন—"আমরা যদি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমরশক্তি গঠনের চেষ্টা করি তাহাতে দোষ কি ? কোনো জাতি আমাদের আক্রমণ করিতে না পারে এমন ভাবে যদি আমরা নিজেদের সজ্জিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলেই শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হইবে। আমরা জানি আমেরিকা কখনও যুদ্ধ বাধাইতে যাইবে না।"

সহজ ভাষায় এই নীতির গলদ হইল এই যে, ইহা কার্যকরী হইতে পারে না। আজিকার জগতে আণবিক বোমা এবং বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন বিষাক্ত বাষ্প ও রোগ-জীবাণু প্রয়োগের মত নূতন নূতন বিপ্লবাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। বর্তমান যুগে শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তি-প্রাধান্যের দ্বারা শান্তি-বজায় রাখা আর সম্ভব নয়।

গায়ের জোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না

কেন ? কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট :

প্রথমত, পুরাতন পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়ের তুলনায় আণবিক যুদ্ধের খরচ অনেক কম। এবং ইহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যও বটে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি জাতি আণবিক বোমা ও অন্যান্য আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিবে। বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করা ও পুরাতন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করার খরচের তুলনায় আণবিক বোমা উৎপাদনের খরচ অনেক কম। ইহার উৎপাদনের জন্য জাতীয় শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতির অপেক্ষাকৃত অল্প অংশই প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে কোনো জাতিকে যুদ্ধে জয় করিতে হইলে শত্রুপক্ষের চেয়ে বেশি বা অনেক বেশি বোমা সংগ্রহ করা আর নিশ্চিতভাবে সুবিধাজনক নয়। যদি অপর একটি জাতির হাতে এত বোমা থাকে যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত বড় বড় শহর ও কলকারখানা ধ্বংস করা যায়, তাহা হইলে উহার চেয়ে দশগুণ বেশি বোমা উৎপাদন করিতে পারিলেও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল এই যে কয়েকটি জাতির হাতে আণবিক বোমা থাকার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে একই সাথে স্নায়ুবিকার, ভীতিবিহ্বলতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। আমাদের ঐশ্বর্য ও প্রতিরোধের অক্ষমতার দরুন এই দিক দিয়া সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইব আমরাই। আণবিক যুদ্ধের জন্য বিরাটভাবে সময়সাপেক্ষ আয়োজনের প্রয়োজন নাই। বিরাট সৈন্যবাহিনী সমাবেশ বা অধিকাংশ জাতীয় শিল্পকেন্দ্রকে অস্ত্র নির্মাণের কারখানাতে রূপান্তরিত করা—এ সমস্ত কিছুই আণবিক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয় না। সমস্ত জাতিগুলিই যখন আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার শিখিবে, তখন কোনো না কোনো ঘটনাচক্রে এই সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ হইবেই।

কোনো কোনো সামরিক মহলে এই সমস্ত সত্য স্বীকার করা হয়। তাঁহারা স্বীকার করেন যে যখন বিভিন্ন জাতিগুলি আণবিক বোমা ব্যবহার করিতে শিখিবে তখন সভ্যতা-ধ্বংসী এক সর্বনাশা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে এবং এককভাবে কোনো জাতির পক্ষেই কিংবা কোনো

জাতিসমষ্টির পক্ষেই এইরূপ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করা তখন সম্ভব হইবে না। এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা তাই এক 'যুদ্ধ নিরোধকারী যুদ্ধের' কথা প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন রাশিয়া আণবিক বোমা আবিষ্কার করাব পূর্বেই তাহার উপর আক্রমণ চালানো হউক। এই পরিকল্পনা শুধু যে অনুচিত তাহাই নহে, ইহা নির্বুদ্ধিতাব পরিচায়কও বটে। আমরা যদি রাশিয়ার বড় বড় শহর ও কারখানা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধন করিতে আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে রাশিয়া তখনই ইউরোপের সমস্ত দেশ লালফৌজ দ্বারা দখল করিবা লইবে। আমাদের আরব্ধ কাজ শেষ করিতে কি তখন আমরা সমস্ত ইউরোপের সমস্ত শহর উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিব? আমেরিকাবাসীর সহজাত সংস্কার ও মূলনীতির সাথে এই পরিকল্পনা এতই সামঞ্জস্যহীন যে এই ব্যাপার সম্ভব করিতে হইলে দেশে এক গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সুতরাং, দেখা গেল 'শক্তিপ্রাধান্য' বজায় রাখা এবং 'আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ' এই দুই মতবাদের কোনটাই কার্যকরী হইতে পারে না। আপনি নিজে এই বিষয়ে বিজ্ঞোচিত ভাবে যে-পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং মস্কো-ঘোষণাতে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহাই হইতেছে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মৈত্রী স্থাপন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ-করণ, এবং এই নিরস্ত্রীকরণকে বাধ্যতামূলক করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারাই এই সমাধান সম্ভব হইবে।

আণবিক শক্তির উপর একচেটিয়া অধিকার

কিন্তু মস্কো-ঘোষণার মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার সদস্য মিঃ এচিসনের রিপোর্টে, এবং সম্মিলিত জাতিপরিষদের আণবিক শক্তি কমিশনের কাছে সম্প্রতি আমেরিকা যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে তাহার মধ্যেও একটি মারাত্মক ক্রটী রহিয়া গিয়াছে। সে ক্রটী হইল এই যে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের পরিবল্পনায় স্থির হইয়াছে, যে ধীর পর্যায়ে কতকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হইবে—যাহাতে অন্যান্য জাতিগুলি আণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো গবেষণা নিষিদ্ধ করিবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ থাকিবে ও আণবিক বোমার মূল উপাদান ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম সংগ্রহের দেশীয় উৎস সম্বন্ধে সকল তথ্য প্রকাশ করিবে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের মনোমত না হওয়া পর্যন্ত আণবিক শক্তি সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপন রাখিতে পারিবে।

অর্থাৎ আমরা রুশদের বলিতেছি যে তাহারা যদি 'ভাল ছেলে'র মত ব্যবহার করে তাহা হইলে আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আমাদেব লব্ধ জ্ঞান তাহাদের কাছে ও অপর জাতিগুলির কাছে আমরা প্রকাশ করিলেও করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের 'ভাল' হইবার জন্য কোন গুণের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে, অথবা কোন সময়ের মধ্যে তাহারা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নয় যে রাশিয়া আমাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নাই। অপর পক্ষে, রাশিয়ার যদি আণবিক শক্তির উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকিত, এবং 'আমরা আণবিক বোমা প্রস্তুত করিব না ও আমাদেব সঞ্চিত ইউরেনিয়ম ও থোরিয়মের গোপন

তথ্য তাহাকে দিব,' এই শর্তে যদি সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে সে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইতে রাজী হইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা কি খুব বেশি উৎসাহিত বোধ করিতাম ?

আমার মনে হয় এই ব্যাপারে রাশিয়া যেমন করিয়াছে সেই অবস্থায় আমরাও ঠিক তাহাই করিতাম।' লিখিত ভাবে আমরা পাল্টা-প্রস্তাব উত্থাপন করিতাম বটে, কিন্তু আমাদের সত্যকার প্রচেষ্টা থাকিত বোমা উৎপাদন করার দিকে যাহাতে কূট-নৈতিক দর কষাকষিতে আমরা তাহার সমকক্ষ হইতে পারি।

রাশিয়ার এই হইল মোটামুটি অবস্থা। ১৯৪৬ সালের ২৪শে জুনের 'প্রাভ্দা' পত্রিকার এক প্রবন্ধে এই কথাই পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে এই রকম এক তরফা ধরনের 'ধাপে-ধাপে-কার্যকরী' পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত শর্তগুলি একটি মাত্র বড় চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া কার্যকরী করিতে হইবে। ইহার জন্য কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই বিভিন্ন পর্যায়ের সময় নির্ধারণ পূর্বোল্লিখিত চুক্তির মধ্যেই স্থির করিয়া লইতে হইবে।

রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া

বাস্তব ক্ষেত্রে, আমাদের সঙ্গে চুক্তি আলোচনার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাশিয়া দুইটি বিষয় কাজে লাগাইতে পারে :—

(১) আণবিক-শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, (২) রাশিয়ার ইউরেনিয়ম্ ও থোরিয়ম্ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা।

এই বিষয়গুলি আমাদের আয়ত্তাধীন অস্ত্রগুলির মত জোরালো নয়—আমাদের অস্ত্র হইল একরাশি আণবিক বোমা, দূর পাল্লার (বি-২৯ ও বি-৩৬) বোমারু বিমানের কারখানা এবং অর্ধজগৎব্যাপী আমাদের বিমান ঘাঁটী। তবুও কাজের ক্ষেত্রে, এখনই আমরা রাশিয়াকে এই দুইটি বিষয়ই প্রকাশ করিতে বলিতেছি। আমরা আরও বলিতেছি যে এইগুলি জানিবার পর তবে আমরা ঠিক করিব তাহাদের সহিত সহযোগিতা করা সম্ভব হইবে কিনা।

আমরা জিদ ধরিতেছি—সমস্ত ব্যাপারেই তাহাদেরকে আমাদের মনোগত কাজ করিতে হইবে। এই অন্যায় জিদ্ একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিবে। বোমা উৎপাদন করিবার জন্য রাশিয়া দ্বিগুণ শক্তি নিয়োজিত করিবে এবং তাহাদের "নিরাপত্তা রক্ষার উপযোগী" এলাকাকে বিস্তৃত করিবার জন্যও তাহারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রবল বিরুদ্ধ রব সত্ত্বেও রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যে নিরাপত্তা এলাকা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা করিয়াছে, সামরিক শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা সামান্য পরিবর্তন মাত্র। অন্যদিকে গ্রীনল্যাণ্ড, ওকিনওয়া এবং আমাদের সীমানা হইতে হাজার হাজার মাইল দূরের অন্যান্য বহু স্থানে আমাদের বিমান ঘাঁটীগুলির সামরিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের পাল্টা পরিকল্পনা

আমরা যদি আমাদের আণবিক পরিকল্পনার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধনে অস্বীকার করি এবং রাশিয়া যদি ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, আমরা হয়ত নিজেদের যথেষ্ট ন্যায়বান মনে করিব—কিন্তু তাহাব অর্থ এই যে, আণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত মারাত্মকরূপে শুরু হইবে।

সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যদি প্রকৃত আন্তর্জাতিক আণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদনের আশা রাখিতে চাহি, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আণবিক শক্তি কমিশনের কাছে যে 'ধাপে-ধাপে কার্যকরী' অসম্ভব পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছিল, উহা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য জাতিগুলি আমাদের আণবিক শক্তি সম্বন্ধে তথ্য জানিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা অন্য জাতিগুলি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করিলেই আমরা সমস্ত আণবিক বোমা নষ্ট করিয়া দিব,—এইভাবে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত হইতে হইবে। এই ভিত্তিতে আমরা যদি আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক থাকি, আমার মনে হয় তাহা হইলে একটা মীমাংসায় পৌঁছাইবার আগ্রহ লইয়া রাশিয়াও আলাপ আলোচনা চালাইবে। অবশ্য আমরা এই মত গ্রহণ করিলেই রাশিয়া যে সেই কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। বিভিন্ন জাতি আণবিক বোমা ব্যবহার করিতে শিখিলে তাহার নিজের ও সমস্ত জগতের যে বিপদ ঘনাইয়া আসিবে তাহা হয়ত রাশিয়া নাও বুঝিতে পারে এবং এই জন্যই হয়ত তাহার নিজের দেশে আণবিক বোমার উৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত সে আলোচনা চালাইতে বিলম্ব করিতে পারে।

কিন্তু আণবিক বোমা উৎপাদনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতেই হইবে। এই কাজে আমাদের লাভই হইবে, এবং এই নীতির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইলে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আণবিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বে আনয়নের মধ্যবর্তী কালে আণবিক অস্ত্র নির্মাণের তথ্য আমরা গোপন রাখিতে পারিব এবং পরমাণু বিদারণের ও আণবিক বোমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি আমাদের দেশেই থাকিতে পারিবে।

রাশিয়ার পাল্টা প্রস্তাবটি হইতেই বোঝা যায় যে আমরা যদি সত্যই আলোচনা চালাইতে রাজি থাকি, তাহা হইলে তাহারাও তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করিবে। তাহাদের পাল্টা প্রস্তাবটী কতকক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনাটির চেয়েও সুদূরপ্রসারী, এবং আমাদের পরিকল্পনাটির মূলগত নীতির সঙ্গে এই প্রস্তাবটির সামঞ্জস্য রহিয়াছে—যথা, প্রস্তাবিত চুক্তি লঙ্ঘনকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলিয়া দুই প্রস্তাবেই গণ্য করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা দুই প্রস্তাবেই রহিয়াছে।

'ভেটো' বা নাকচকারী ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্যা

আপনি বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে আগের আলোচনাতে তথাকথিত 'নাকচকারী ক্ষমতা' সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করি নাই। এখানে 'ভেটো' সমস্যা উত্থাপন সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক। 'ভেটো তুলিয়া দেওয়া'র প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকলাপের সহিত জড়িত। আণবিক বোমা সম্পর্কিত চুক্তির সঙ্গে ইহাকে জড়িত করা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন।

এই জন্তই আমি ইহার কোনো উল্লেখ করি নাই। অপর জাতিগুলির সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যদি আমরা স্বাক্ষর করি, তাহার অর্থ হইবে কতকগুলি বিষয়ে একত্রে আমরা একমত হইয়াছি। এইভাবে কোনো চুক্তি না করিতে পারিলে অপর বৃহৎ জাতিগুলির মতো আমাদেরও 'ভেটো' অধিকার থাকিবে। কিন্তু একবার চুক্তিটি পাশ হইয়া গেলে 'ভেটো' অধিকারের অবশুই আর কোনো অর্থ থাকিবে না। যদি কোনো জাতি বে-আইনীভাবে আণবিক বোমার উৎপাদন করিতেছে এইরূপ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে বাধা দিয়া চুক্তি লঙ্ঘন করে, আমরা কি ভাবে তাহার কার্যকলাপে নাকচের ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারি? অন্ত যে-কোনো চুক্তি লঙ্ঘনের মতই, এই ক্ষেত্রেও চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অবশিষ্ট জাতিগুলি প্রয়োজনবোধে সমস্ত কিছুই করিতে পারে। এমন কি যুদ্ধ ঘোষণার মত চরম পন্থাও তাহারা অবলম্বন করিতে পারে।

আমার মনে হয় আজিকার জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীস্থাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা। সম্প্রতি প্যারিসে যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার ফলাফল অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ ভালোভাবে অগ্রসর হইতেছে। আমার মনে হয়, স্থায়ী শান্তি অপেক্ষা সাময়িক মৈত্রী ঘটাইতে পারে আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

মোটের উপর ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে আমাদের ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কার্যকলাপ তলাইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে আমরা সমবেত ভাবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছি। এইবারের বিশ্বযুদ্ধ হইবে আণবিক বোমার যুদ্ধ। আজ আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। রাশিয়া ও তাহার প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দুর্বল জাতি ভিন্ন বিশ্বের সকল জাতিই আজ আমেরিকার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। আমার বিশ্বাস, জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতি হিসাবে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নেতৃত্ব করিবার সুযোগ আমাদের রহিয়াছে।

সাধারণভাবে, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে, সে বিষয়ে দুইটি স্বতন্ত্র বিচারভঙ্গী দেখা যায়।

প্রথম মত হইতেছে রাশিয়ার সঙ্গে বনিবনা সম্ভব নয়, সুতরাং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় মত হইতেছে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অর্থ সমস্ত মানব জাতির বিপদ ডাকিয়া আনা, সুতরাং শান্তিতে বসবাস করিবার জন্ত আমাদের একটা উপায় নির্ধারণ করিতেই হইবে।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে আমাদের এবং সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্ত আমাদের শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন।

আমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি যে আপনারও ইহাই মত। স্বরাষ্ট্র সচিবের ১৫ই জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতা হইতেও ইহাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই ভিত্তিতে সমস্তা সমাধানের জন্ত তিনি যতদিন প্রয়োজন হয়, ততদিন আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত। কোন কোন ব্যাপারের জন্ত রাশিয়া আমাদের সন্দেহ করে এবং কোন কোন ব্যাপারের

জন্য আমরাই বা রাশিয়াকে সন্দেহ করি—ইহার একটা সদুত্তর পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। জাতি হিসাবে অথবা রাষ্ট্র হিসাবে এই দুইটি প্রশ্নের কোনোটারই যথোচিত উত্তর আমরা পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না, যদিও আমরা স্বীকার করি যে উভয় প্রশ্নই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রাশিয়াকে আমেরিকা কেন সন্দেহ করে?

রাশিয়া সম্বন্ধে আমাদের মূল অবিশ্বাসের কারণ আমাদের উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের পার্থক্য। সম্প্রতি এই সন্দেহ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে, বিশেষ ভাবে কয়েকটি সংবাদপত্রে কয়েক মাস ধরিয়া এই লইয়া একটা আলোড়ন সৃষ্টি করার ফলে। আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা রাশিয়ার সঙ্গে আদর্শগত দ্বন্দ্বে পরাজয়ের মনোভাব পোষণ করেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রথম এই সমস্ত ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা—'অন্যান্য দেশগুলিতে এবং হয়ত আমাদের দেশেও গণতন্ত্র ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অন্য এক কার্যকরী সমাজ ব্যবস্থার (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদ) উদ্ভব হইতে পারে'—এই আতঙ্ক ছড়াইয়াছেন। আমার বিশ্বাস অতীতের মতো এবারেও আমরা সাফল্যের সহিত এই নূতন সমাজ আদর্শের সম্মুখীন হইতে পারিব। আমরা দেখাইয়া দিতে পারি যে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্মগত স্বাধীনতাকে বলি না দিয়াও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করা যায়। হিটলারের মত কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি করিয়া এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যায় না। আমাদের সংস্কৃতিগত গভীর ব্যবধান ও বিগত পঁচিশ বছরের তীব্র রুশ-বিরোধী প্রচারকার্য সত্ত্বেও, যুদ্ধের সঙ্কটকালে রাশিয়ার প্রতি আমেরিকার জনসাধারণের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল। আজ, যখন আন্তর্জাতিক সমস্যা ও অচল অবস্থার সমাধান অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, এই টালবাহানার সময় আমেরিকার জনমত আবার রাশিয়ার প্রতি বিরূপ হইতে শুরু করিয়াছে। এই চিঠিতে যে-সব বিপদের কথা বলা হইতেছে, তাহার একটি উৎস হইল মার্কিন জনমতের এই রুশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে কি কি কারণে রাশিয়া সন্দেহ করে, তাহার একটা তালিকা আমি এখানে দিতেছি :

প্রথম হইতেছে রাশিয়ার অতীত ইতিহাস। এই ইতিহাসের কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না, কারণ জগতের অন্যান্য জাতিগুলির সমস্ত নীতি ও কার্যকলাপ রাশিয়া এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিয়া দেখে। হাজার বছরেরও পূর্ব হইতে রুশিয়ার ইতিহাস হইতেছে বারম্বার বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের কাহিনী—বার বার তাহাকে মোগল, তুর্কী, সুইডেন, জার্মানী ও পোলাণ্ডের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধা দিতে হইয়াছে এবং বহুবার সেই বাধাদান ব্যর্থ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে রাশিয়া কোন দৃষ্টিতে দেখে

রাশিয়ার নিজ দৃষ্টিতে, বিগত ত্রিশ বৎসরব্যাপী সোভিয়েট সরকারের ইতিহাস হইতেছে তাহার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক সংগ্রাম। নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রথম চার বৎসর, ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত, রাশিয়াকে একদিকে আমেরিকার

সাহায্যপ্রাপ্ত বৃটিশ, ফরাসী ও জাপানী সেনাদলের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উস্কানি ও আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত রুশ প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর সেনাদলের ধ্বংসমূলক কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে বাধা দিতে হইয়াছে। তাহার পর এক যুগ ধরিয়া উত্তর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জার্মানীর সমরসজ্জা ব্যাপারে নীরব সম্মতি দিয়াছিল এই আশায় যে নাৎসীরা পশ্চিমে অগ্রসর না হইয়া পূর্ব প্রান্তেই অভিযান চালাইবে। ফলে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্র জার্মানী দ্বারা বিজিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং রুশরা স্বভাবতই মনে করে যে তাহারা একটি শত্রু বেষ্টিত জগতে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাইতেছে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার কাছে পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই আক্রমণের প্রস্তুতিরূপে দেখা দেয়। আমাদের 'মোন্‌রো' * নীতিকে প্রসারিত করিয়া পশ্চিম গোলার্ধের জাতিগুলিকে অস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা, আণবিক বোমা উৎপাদনে আমাদের বর্তমান একচেটিয়া কর্তৃত্ব, সুদূর প্রান্ত সমূহে যুদ্ধ-ঘাঁটি স্থাপনে আমাদের আগ্রহ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কার্যকলাপ দেশরক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমার মনে হয় যদি যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিরাজমান থাকিত, এবং সে অবস্থার প্রধান প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পূর্বের তুলনায় বিপুলভাবে সামরিক শক্তি প্রসার করিত—তাহা হইলে আমাদের মনোভাবও বর্তমানে রাশিয়ার মনোভাবেরই অনুরূপ হইত।

রুশ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে, আমাদের বৃটেনকে ঋণদান ও অপর পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আমাদের নিকট তাহার ঋণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান সোভিয়েট-বিরোধী দলকে শক্তিশালী করিবার আরেকটি লক্ষণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

শত্রুভাবাপন্ন বেষ্টনী

অবশেষে, উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত সকল ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য সাগর তীরবর্তী বন্দরে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার প্রচেষ্টায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য "বন্ধুতামূলক প্রতিবেশীরাষ্ট্র" গঠনে রাশিয়ার প্রয়াসকে আমরা বাধা দিয়াছি। ইহাতে রাশিয়ার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পঁচিশ বছর কোণঠাসা হইয়া থাকিবার পর রাশিয়া আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করিয়াছে। রাশিয়া আজ বিশ্বাস করে যে নূতন ভিত্তিতে তাহার রাষ্ট্র-মর্যাদা স্বীকৃত হইবে। পূর্ব ইউরোপে কখনও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের অহেতুক আগ্রহকে রাশিয়া তাহার দেশের চতুর্দিকে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরাষ্ট্রের আবেষ্টনী গড়িয়া তোলার নূতন ষড়যন্ত্র হিসাবেই দেখে। এইরূপ শত্রুবেষ্টনী গঠনের ষড়যন্ত্র গত মহাযুদ্ধের পর প্রকাশ পাইয়াছিল এবং উহা আজ অনায়াসেই আবার রাশিয়াকে ধ্বংস করার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর এই বিশ্লেষণ যদি যথাযথ হয়—ইহার স্বপক্ষে অনেক সাক্ষ্যই আছে—তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী সহজেই নির্ধারণ করা

---

* ১৮৩০ সালে প্রথম 'মোনরো' নীতিতে আমেরিকা মহাদেশের ব্যাপারে বহির্জগতের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

যাইতে পারে। রাশিয়ার সর্বপ্রকার আশঙ্কা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যুক্তিসঙ্গত কারণগুলি দূর করাই এইরূপ কর্মধারার মূলগত লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাতন পৃথিবী অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত না রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটা উপায় নির্ধারণ করিতে পারে ততদিন "ঐক্যবদ্ধ জগৎ" কিছুতেই সৃষ্টি করা যাইবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অনেকে দানিউব অথবা দার্দানেলিসকে আন্তর্জাতিক এলাকা বলিয়া ঘোষণার দাবী করি এবং এই সব অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের বিরোধিতা করি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের দাবীর যথার্থতায় নিঃসন্দেহচিত্ত। কিন্তু রাশিয়া যদি পানামা অথবা সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক এলাকা ঘোষণা করিয়া এই সব অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা রহিত করার পাল্টা প্রস্তাব আনে, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত হই। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রাশিয়ার দৃষ্টিতে সমস্ত অঞ্চলগুলি সমপর্যায়ভুক্ত। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সংগঠনের কাজে সহযোগিতাব জন্য, ও শান্তিচুক্তিতে নিজের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া কি কি বিষয় অপরিহার্য বলিয়া মনে করে, তাহা আবার আমাদের নূতন করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

আমরা এবং ইংরাজেরা আমাদের নিজের নিজের নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করি, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচাব করিতে হইবে রাশিয়া তাহাব নিজের নিরাপত্তার জন্য কোন কোন ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া মনে করে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ইটালীর চুক্তি এবং আরো কয়েকটি চুক্তি যেভাবে অগ্রসব হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সমস্যার এই দিকটিতে বোঝাপড়া করিয়া আমরা একটা সন্ধিতে পৌছাইতে পারি।

দুই প্রকার সমাজ ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকিতে পারে

আণবিক শক্তি সম্বন্ধে "ভেটো" অধিকারের প্রশ্ন আমরা আর তুলিব না। এ প্রশ্ন অবাস্তব এবং কথনও না তোলা হইলেই ভাল হইত। আণবিক শক্তিকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বে আনয়নের জন্য, নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পর্যায়ের সময় নির্ধারণ করিতে একটা চুক্তি প্রয়োজন। সেই চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য আলোচনা চালাইতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

আমার বিশ্বাস এককভাবে ইহাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এবং বর্তমানে ঘটনার গতি অচল অবস্থা সৃষ্টির দিকেই চলিতেছে, শেষ মীমাংসার পথে নয়।

কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি সংবাদপত্র সুসংবদ্ধভাবে আমেরিকার জনসাধারণের মনে রাশিয়া সম্বন্ধে যে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি করিতেছেন তাহা দূর করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। 'সাম্যবাদ' ও 'ধনতন্ত্র' 'শৃঙ্খলার কড়াকড়ি' ও 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'—একই জগতে পাশপাশি থাকিতে পারে না—এই ধ্বনি ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে নিছক প্রচারকার্য মাত্র। বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মমত (ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই নিজ মতকে একমাত্র সত্য ও মোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া দাবী করিয়া আসিয়াছে) বহু কাল ধরিয়া মোটামুটি পরম সহিষ্ণুতা বক্ষা করিয়া পাশাশাশি বর্তমান রহিয়াছে।

আমাদের এই দেশও তাহার জাতীয় জীবনের প্রথম অর্ধাংশে জগতের একমাত্র গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে জগতের অন্য সর্বত্রই ছিল স্বেচ্ছাতন্ত্রের রাজত্ব।

আজিকার জগতেও আমরা আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে কোনো কাজ করিব না। জগতে আজ আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র আমাদেরই দেশে যুদ্ধের সামরিক ধ্বংসলীলা ঘটে নাই, বরং যুদ্ধের পর আমরা আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য আমাদের তরফ হইতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা শুনিলে তাহা অপর জাতিগুলির কাছে প্রবঞ্চনামূলক বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক আলোচনাতে যোগ দিবার জন্যও আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সম্পর্কে আমরা এমন কিছু দাবী করিব না যে সব বিষয়গুলি প্রথমেই আলোচনা করা রাশিয়ার পক্ষে কঠিন। যে-সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার দাবী মূল আলোচনার সহিত সম্পর্কহীন সেই সব প্রশ্নও আমরা প্রথমেই আলোচনার শর্ত হিসাবে স্থাপন করিব না। এই ক্ষেত্রটীতে আমার কার্যবিভাগ প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি জড়িত। সমস্যার এই দিকটী অন্য অনেক সমস্যার মত সঙ্কটজনক নহে, এবং আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের সমস্যা অপেক্ষা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাফল্যজনক ভাবে আলোচনা চালাইলে, যে বিরোধের ভাব আমাদের পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তাহার অবসান ঘটাইবার পথ সুগম হইবে।

ঋণের প্রশ্নটীকে অর্থনীতি ও ব্যবসায়গত ভিত্তির উপর বিচার করিতে হইবে। রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ও আমাদের সমাজব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য হইতে উদ্ভূত ভুল বোঝাবুঝি হইতে স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়টীকে বিচার করিতে হইবে। বৃটেনকে ঋণদানের সময় যে সোভিয়েট-বিরোধী সমর্থনের প্রকাশ দেখা গিয়াছে, আপনি তাহা হইতে নিজেকে ও আমেরিকার জনসাধারণকে দূরে রাখিয়াছেন। বৃটিশ-ঋণ-বিলের খসড়াতে স্বাক্ষর করিবার সময় আপনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আপনি যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ও অনুরূপ অর্থনৈতিক শর্তাবলীতে সোভিয়েটকেও ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে সহজেই দেখানো যাইত যে আমাদের সম্পদ আমরা কূটনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি না। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাঙ্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে, যত শীঘ্র সম্ভব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাশিয়ার সহিত সাধারণভাবে আলোচনা চালানো বিশেষ প্রয়োজন।

পারস্পরিক বাণিজ্য

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে আলোচনা করা আজ একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনর্গঠনের কর্মসূচি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পূর্ণবিকাশের পরিকল্পনাগুলি আমেরিকার পণ্য বিক্রেতা ও কারিগরদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। রাশিয়াতে আমেরিকার উৎপাদনদ্রব্য, বিশেষ করিয়া সর্বপ্রকারের যন্ত্রপাতির স্থায়ী চাহিদা রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রাশিয়ার কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে, তৈল শিল্পে, ও লৌহ ভিন্ন অন্যান্য ধাতু শিল্পেও সাধারণত আমেরিকান যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

এই বাণিজ্য একতরফাও হইবে না। যদিও অতীতে সোভিয়েট রাশিয়া খুবই বিশ্বাসী অধমর্ণ জাতি ছিল,—শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত পণ্য ও কারিগরদের শ্রমসাহচর্যের পরিবর্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন অবশ্যই আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশে বিনিময় মূল্যের পণ্য রপ্তানী করিবে।

এই দেশে যে সমস্ত রুশ পণ্যের নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন আছে কিংবা যে সব রুশ পণ্য দেশীয় শিল্পজাত পণ্যের প্রতিযোগী নয় সেগুলির সংখ্যা অনেক—যথা, লৌহ ভিন্ন অন্যান্য খনিজ ধাতু, পশু লোম, বস্ত্র ও কাষ্ঠজাত দ্রব্য, বনৌষধি, কাগজ ও মণ্ড, কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

আমার মনে হয়, কার্যকরীভাবে বাণিজ্য স্থাপনের জন্য কথাবার্তা চালাইলে রাজনৈতিক ভুল বোঝাবুঝির কুয়াসা কাটিয়া যাইতে সাহায্য হইবে। নিরাপত্তার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা যখন একটা সর্বগৃহীত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চেষ্টা করিতেছি তখন এই সময়েই এই ধরনের আলোচনা চালানো যাইতে পারে। ভালভাবে আলোচনা চালাইতে পারিলে ইহা নিরাপত্তার সমস্যাকে সহজ করিয়া তুলিতেই সাহায্য করিবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আমি আপনাকে একটী স্মারক লিপি পাঠাইয়াছিলাম। আমি এই লিপিটি জেনারেল ওয়াল্টার বেডেল স্মিথ্‌কে (রাশিয়ায় মার্কিন দূত) পাঠাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি লিপিটি মস্কোতে লইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে আমি এই দেশে বাণিজ্য আলোচনার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আজ আমি সেই পুরানো প্রস্তাব আবার নূতন করিয়া পেশ করিতে চাই এবং মস্কোতে এই উদ্দেশ্যে একটী বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাঠাইতে অনুরোধ করি। এই বাণিজ্যপ্রতিনিধি দলের লক্ষ্য হইতে পারে রাশিয়ার পুনর্গঠনের জন্য, এবং মধ্যপ্রাচ্যের মত যে-সব অঞ্চলে আমাদের উভয়ের স্বার্থ স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে সেই সব দেশের শিল্পগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যুক্ত পরিকল্পনার খসড়া তৈয়ার করা। কে কে এই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলে যাইবেন সে সম্বন্ধে এবং কি কি অর্থনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে—সে বিষয়ে আমি আভাস দিতে প্রস্তুত আছি, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম।

স্টালিনকে আমন্ত্রণ

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বিভাগ স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহযোগিতায় জুলাই ও আগস্ট মাসে মস্কোতে দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ হইবে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ বিষয়বস্তু লইয়া প্রাথমিক আলোচনা চালানো। আমার মনে হয় রাশিয়ার সহিত সহযোগিতা রক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে রিপোর্ট দিয়াছেন সেই সব মার্কিন পর্যালোচকদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী মহলের লোক। এই ব্যাপারটী উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে আমার ওয়েণ্ডেল উইল্কি, এরিক জনস্টোন্‌ ও ভূতপূর্ব মস্কোস্থিত দূত ডেভিসের কথা মনে পড়িতেছে। মনে হয় রুশরা বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাহাদের শ্রদ্ধাও করে।

কয়েকজন পর্যবেক্ষকের মতে সোভিয়েট নেতারা নাকি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চান এবং অন্যান্য জাতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান

নাই। অপরপক্ষে, আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে রুশ নেতারাই প্রথম আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণগুলি নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সম্মিলিত নিরাপত্তার পথে মহাযুদ্ধ নিবারণের উপায় দেখান। এ ছাড়া, আমার মনে হয় তাঁহাদের বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার ইচ্ছা ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের গঠনমূলকভাবে কিছু করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। পূর্বোক্ত বাণিজ্য-প্রতিনিধি দল এই বিষয়ে অনেক কিছু করিতে পারিবেন। আমি যতদূর জানি, রুশ রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনকে যখন আমেরিকাতে আসিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন আপনার মনেও অনুরূপ চিন্তা আসিয়াছিল।

কার্যকরী সহযোগিতা

রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কিত সমস্যার সহজে সমাধান হইতে পারে, যদি একবার পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ভাব ফিরিয়া আসে এবং রাশিয়ার সহিত একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়া স্থির হয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনার দ্বারাও এই সমস্যাগুলির সুরাহা হইতে পাবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দানিয়ুব অঞ্চলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রসারের সম্মুখীন হইতে পারি এই অঞ্চলের সম্পদ কাজে লাগাইবার ব্যাপারে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা পেশ করিয়া। তাহার পরিবর্তে আমরা যদি শুধু জিদ্ ধরি যে এই অঞ্চলে রাশিয়ার একক বাণিজ্যপ্রচার রোধ করিতে হইবে, তাহা হইলে সেখানকার বর্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কোনো সমাধান হইবে না।

এই প্রস্তাব অনুসাবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারার কতকগুলি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্লাইতেই হইবে। আমাদেব হাতে সময় নাই। আমাদের যুদ্ধপরবর্তী কার্যকলাপে মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধকালীন সহযোগিতার শিক্ষা এবং আণবিক যুগের সত্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে।

ইহা অবশ্যই কাম্য যে দেশের মধ্যে যতটা সম্ভব আমরা বৈদেশিক ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইব। কিন্তু যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশে কলহ সৃষ্টি করিয়া, তাহা অযৌক্তিক ও বিশেষ বিপজ্জনক হইবে। আমার মনে হয় দুই জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, আমরা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দৃঢ় হইবার ভান করিয়া কঠোর বাস্তবতার নামে নিজেরাই সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারি।

আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি হইল শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা। শান্তি ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রথমে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। এই কাজ সহজ নয়। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং স্বরাষ্ট্র সচিবও এই বিষয়ে আভাস দিয়াছেন যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য, বিচ্ছিন্নভাবে থাকার চিরাচরিত মনোভাব এবং প্রত্যেক চুক্তিতেই দেওয়া-নেওয়া সমান পাল্লায় ওজন করার দাবী, ইত্যাদি কারণে রুশদের সহিত আলাপ-আলোচনা কঠিন।

প্রকৃত নিরাপত্তা

কিন্তু এই পথ এত দুরূহ নয়, যদি আমরা মনে রাখি অন্যান্য জাতিরা আমাদের বৈদেশিক-নীতি অর্থে শুধু আমাদের প্রচারিত আদর্শগুলি বিচার করে না, আমাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ

করে। মোটামুটি এই বিষয়ে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত জগতে সামরিক শক্তির ভিত্তিতে আমাদের পূর্বগত ধারণা অনুযায়ী নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় না। আমাদের সামরিক শক্তি যে 'নিরাপত্তা' রক্ষা করিতে পারে সে বিষয়ে একজন সেনানায়ক সিনেটের আণবিক শক্তি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন—'আণবিক অস্ত্রে আমাদের সমস্ত নগরী ধূলিসাৎ ও প্রায় চারকোটি নগরবাসী ধ্বংস হওয়ার পর আমরা দেশকে নিজেদের বিরুদ্ধে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারি'। আণবিক অস্ত্রের ভিত্তিতে ইহার চেয়ে ভাল নিরাপত্তা লাভ করা যাইবে না। আমাদের জনসাধারণ বা অন্যান্য সম্মিলিত জাতির জনসাধারণ এই নিরাপত্তা চায় না।

আমি মনে করি উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে প্রগতিশীল নেতৃত্ব কার্যকরী হইলে, ইহাতে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মনোভাব প্রতিফলিত হইবে এবং তাহাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ব্যাপারে ডেমোক্রাটিক দলের অগ্রগামী স্থান পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই নীতি আমাদের বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং বিশেষ করিয়া এক ভীষণ আণবিক যুদ্ধের পথে পৃথিবীর গতি নিরোধ করিতে পারিবে। ইতি,

বশম্বদ

এইচ. এ. ওয়ালেস

অনুবাদ : অনুকা গুপ্ত

নতুন খোকা

রাত্রি তখন অনেক। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা তখন ঘুমে মগ্ন, শুধু হরিশের ঘরটা ছাড়া। সে ঘরের মধ্যে লম্প জ্বলছে। হরিশ সদ্যঘুমভাঙা চোখ দুটোকে কটমট করে চেয়ে আছে তার দেড় বছরের ছেলে খোকার দিকে। খোকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্বিবাদে গুড়-বার্লিতে মুড়ি ভিজিয়ে খেয়ে চলেছে। খোকার পাশে বসে আছে তার মা মিনতি। মিনতি অত্যন্ত কুটিল কটাক্ষে লক্ষ্য করছে হরিশকে; নাকের পাটা দুটো তার স্ফীত হয়ে উঠছে ক্রমশ।

জানালা দরজা সব বন্ধ। এ কাজ মিনতির। সবে মাত্র অগ্রহায়ণ মাস পড়েছে, তবু ঠাণ্ডাকে তার এত ভয় যে ঘরের কোন সামান্য উন্মুক্ত রন্ধ্রপথকেও সে না ঢেকে ছাড়ে না। তা ছাড়া দাঙ্গার ভয় তো আছেই। এখান থেকে উনিশ-কুড়ি মাইল দূরে কলকাতা, সেখানকার দাঙ্গার খবর শোনা অবধি জানালা দরজা বন্ধ করতে শুরু করেছে। হরিশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কোনো ওজরই টেকেনি। মিনতির যুক্তি অকাট্য যেহেতু ভাড়াটেদের সমর্থিত। দরজা জানালা বন্ধ ঘরটার মধ্যে লম্পর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আবহাওয়াটা হয়ে উঠেছে গুমোট শ্বাসরোধী। লম্পর কালি দেয়ালে ছেয়ে যাচ্ছে কালো মেঘের মত, আর লম্পটার ঠিক উপরেই দড়িতে ঝুলানো জামা-কাপড়ে তার হাল্কা ছোপ্ লাগছে গিয়ে। হঠাৎ লম্পটার

দিকে নজর পড়তেই হরিশ সোজা উঠে জানালাটা খুলে দিয়ে লম্পটাকে একটু সরিয়ে রাখল। মিনতি বেশ গম্ভীর গলায় হরিশের দিকে না চেয়েই বলল, 'খোকার ঠাণ্ডা লাগবে, জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া হোক্।'

—বন্ধ করে দেব কি। হরিশ জবাব দিল, ঘরে কি রকম গ্যাস হয়েছে দেখেছ ?

—দেখেছি। ইচ্ছে হয় তুমি বাইরে গিয়ে বসে থাকো।—বলে সে নিজেই উঠে জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। দিয়ে নিজের মনেই বলল, মরতে তো এমনিই বসেছে, তা আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি হবে।

হরিশের মেজাজ চড়ে গেল। সে উঠে ফের জানালাটা খুলে দিল না বটে, কিন্তু বলল তিক্ত কণ্ঠে :

—এইটুকু ঠাণ্ডাতে যদি মরে যায় তো যাবে।

—লজ্জাও করে না। যেন খানিকটা নিজের মনেই বলে উঠল মিনতি।

—বাবুর ঘুম ভাঙালেই তম্বি শুরু করবে। তা আমাদের উপর কেন।

হরিশ ঝেঁজে উঠল, কে তোমাদের উপর তম্বি করছে শুনি ?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে মিনতি খোকাকে বলল, হয়েছে ? নে এবার একটু জল খেয়ে নে। তারপর শুবি চ।

কিন্তু খোকা খাওয়া শেষ করে হরিশের দিকে চেয়ে একটু হেসে সেদিকেই অগ্রসর হল। গোম্‌রা মুখে বলে উঠল হরিশ, আর সোহাগ কাড়তে এস না এখন, গেলা কোটা হয়েছে, যাও এবার শুয়ে পড়ো গে।

মাঝ পথেই থেমে গিয়ে খোকা ঠোঁট ফোলাল। মিনতির সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। খোকাকে টেনে নিল সে নিজের কাছে :—যেমন হয়েছিস তুই, বাপের সোহাগ তোর কপালেই আছে বটে! সোহাগ করে করে তো উনি একেবারে শেষ হয়ে গেলেন। সোহাগ!'

মিনতি উঠে দাঁড়াল। শাড়ির আবরণ থেকে তার স্ফীত জঠর বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সুডৌল, নিখুঁত গোলাকার অবয়ব। সে অন্তঃসত্ত্বা। সেইজন্যই বুকের অমৃত-ধারা তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। একফোঁটা দুধ নেই। দেড় বছরের ছেলে; সমস্তটা রাত সে ক্ষোভে, নিরুদ্ধ আক্রোশে দুগ্ধহীন মায়ের বুকে মাথা কোটে, কচি, ছোট, কয়েকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দেয়, কাপড় ছেঁড়ে। নরম দেহটির সমস্ত শক্তি নিয়ে হাত পা ছোঁড়ে, সে আঘাত লাগে মিনতির পেটে। তখন মিনতির অবস্থা বাস্তবিকই বড় মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। তখন বেচারি খানিকক্ষণ সমস্ত দেহটাকে বাঁকিয়ে বিকৃত মুখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে। অসহ্য বেদনায় পেটটা তার ফেটে পড়তে চায় যেন। তারপর একটু সামলে ওই ছোট্ট নরম পিঠের উপর দমাদম করে কষায় ঘা কয়েক। খোকা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জিদী গলায় চেঁচিয়ে সে ঘর ফাটিয়ে দেয়। তারপর ওঠে হরিশ। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই দুজনে লাগে ঝগড়া। ইদানিং এটা তাদের দৈনন্দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া খোকাকে আজকাল রাত্রে উঠে বার-দুয়েক বার্লি খাওয়াতেই হয়, নইলে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, ক্ষিদেও পায়। তাইতেই হরিশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে রাগে, দুঃখে হরিশের তখন ইচ্ছে যায় মাথা কুটতে। মনে হয় মিনতিকেই খানিকটা চড়িয়ে দিলে যেন তার শান্তি হয়।

খোকাকে জল খাইয়ে মিনতি মশারীর ভিতর গেল তাকে নিয়ে। খোকাকে ঘুম-পাড়ানো সে আবার বহুক্ষণের মামলা। ওইটুকু ছেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবে। সর্বদাই কিসের আক্রোশে যেন ক্ষিপ্ত। কথায় কথায় অভিমান করে, অল্পেতেই ঠোঁট ফোলায়। ভ্রূ সে কুঁচকেই আছে; যেন দুনিয়ার সবাই তার শত্রু। পাঁজর আর কণ্ঠার হাড়গুলো পড়েছে বেরিয়ে। যতক্ষণ সে না ঘুমোয় মিনতি আড়ষ্ট হয়ে থাকে—দমাস্ করে এক ঘা কষালেই হল।

কিন্তু অবস্থাটা ভীষণ হয়ে উঠেছে হরিশের। যেন মিনতির কাছে তার ভীষণ একটা পরাজয় ঘটে গেছে। অগ্নি-দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল মশারির ভিতর মিনতির ঝাপসা মূর্তিটার দিকে। কিছু বলতে গেলে ঝগড়াটা হয় তো চরমে উঠে যাবে। আশে-পাশে ঘরের ভাড়াটেরা রাগ করবে, হাসবে। মিনতি আজকাল তাকে ক্ষমা করতে ভুলেই গেছে। মাঝে মাঝে সে কেমন হিংস্র হয়ে উঠে। নিষ্ঠুরের মত হরিশের দুর্বল স্থানটিতে নির্মম ভাবে ঘা দেয়,—বউ ছেলেকে পাবে না যে লোক খাওয়াতে, ঘরে বসে সে লোকই মরদগিরি ফলায়। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে জীবনে। অপমানিত হরিশও ঝেঁজে ওঠে মিনতির ভাষায় একেবারে দুলে-কেওড়াদের মত। মিনতি বলে, অসভ্য, জানোয়ার!—জানোয়ার! হরিশের বুকের মধ্যে যেন হাজার হাতুড়ির ঘা পড়ে। মিনতিও আচম্বিতে মনের মধ্যে কেমন একটা ঘা' খায় হরিশকে জানোয়ার বলে ফেলে। কিন্তু সে পারে কই তার ক্ষিপ্ততা রুখতে। প্রতিনিয়ত অভাবের জ্বালা, রাত পোহালেই চাল ধারের জন্য এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘোরা—সবকিছু মিলে তার বুকটাকে নিঃশেষে ঝাঁজরা করে দিয়েছে। সে কি আর জানে না হরিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে একটা যেমন-তেমন চাকরীর জন্য! তবু সে পারে না নিজেকে রুখতে। অবশেষে তার বুকের মধ্যে ডুকরে ওঠে কান্না, মৃত্যু-কামনায় পড়ে ভেঙে।

হরিশ বিস্ময়ে অপমানে মূক হয়ে থাকে। মিনতি তাকে জানোয়ার বলে, এতে সে কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছে না। সমস্ত মনটাকে সে আতিপাতি করে খুঁজে দেখে কোথায় সেই পুরানো দিনের স্বপ্ন-আদর্শ। ছিটে ফোঁটা কি একটু যেন এখনও অনুভব হয়। তবু এই রূঢ় বিশ্রী জীবনের হীনতা থেকে সে বঞ্চিত নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই বলে নিজের হীনতা সে খুঁজে বেড়ায়। শঙ্কিত হয়ে ওঠে জীবন-ধারণের এই শ্রীহীন ধারায়। মনের মধ্যে সুপ্ত সেই সোনার টুকরোর মত এক ফোঁটা আভিজাত্য গুমরে ওঠে। চোখের উপর ভেসে ওঠে তথাকথিত ছোট লোকদের জীবন-প্রণালী, পায়রার খুপ্‌রির মত ঘরগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হরিশ হাত মুখ ধুয়ে ঘরের কোলে ছোট্ট বারান্দাটায় একটু বসে। খোকাকে দু'একবার ডাকে, তারপরে একটু দ্বিধা ভরে বলে, মিনু একটু চা খাওয়াবে?

মিনতি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। জবাব দিল, চিনি নেই। আর সেই পরশুদিন তো এনেছিলে চার পয়সার চা, তা কি আজও থাকবে?

ধুলো বালি মেশানো নাগাইয়ের দোকানের চার পয়সার চা।...দীর্ঘনিশ্বাসটা চেপে বিচলিত মুখে হরিশ উঠানের উপর নারকোল গাছটার ডগার দিকে তাকালো। আজ প্রায় দু'মাস চাকরী নেই। দেনা হয়েছে অকথ্য। অস্থায়ী এক ছোটখাটো মিলিটারি কারখানায়

কাজ করত সে। যুদ্ধের শেষে সে কারখানা বিক্রী হয়ে গেল এক দেশী-শিল্পপতির কাছে। ছাঁটাই হল অনেক লোক, হরিশ তাদের মধ্যে একজন। বেকার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে পেয়েছে চাকরী, তার ভাগ্যে জোটেনি এখনও। হাত দেখিয়েছিল সেদিন এক গণক-ঠাকুরকে। ঠাকুর বলেছে : এখন নাকি চলেছে তার শনির দশা। শনির দশার গূঢ়তত্ব সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও এটা সে বুঝেছে সম্প্রতি তার জীবনটা পরিচালনা করছে কোনো অপদেবতা। দেবতার মারটা ভাল। ঠিক সময়তে মিনতি ও—। হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ে। খস্ খস্ শব্দে পেছন ফিরে দেখল পাশের ভাড়াটেদের ছোট বউ ভেজা কাপড়ে আসছে পুকুর থেকে। পরিচিত ইঙ্গিত, হরিশ ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। খানিকক্ষণ মিনতিকে দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ;

—তোমার শরীরের অবস্থা কেমন ?

—ওই এক রকম।— স্পষ্ট কোনো জবাব দিতে মিনতি যেন ভুলেই গেছে।

—মানে এখনও—

দেরী কোথায়—এবার জোয়াল নামলেই হয়। বলে ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে—একটা কষ্ট-সূচক শব্দ করে মিনতি উঠে দাঁড়াল। একটা ছোট বাটিতে করে দুটি মুড়ি দিল খোকাকে খেতে।

এমনিতেই সংসারটা যেন মুহ্যমান, তার উপর কাল রাত্রে হয়ে গেছে খানিকটা খোঁচাখুঁচি। এর জন্য তারা অবশ্য একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে—একটা জীবন্ত অশান্তি যেন ঘরটার মধ্যে ঘোরাফেরা করে আবহাওয়াটাকে তিক্ত করে তুলছে। খোকাকে মুড়ি দিয়ে হঠাৎ কি মনে করে মিনতি হরিশকে জিজ্ঞেস করল : মুড়ি খাবে দুটি ?

—মুড়ি ? তা' দাও দুটি।—খানিকটা অনিচ্ছাবশতই বলল হরিশ।— তেল থাকে তো একটু মেখে দিও।

—তেল কোথায় ? তেলের বাজারে আগুন লেগেছে। মানুষের তেল খাওয়া—মাথা ঘুচেছে।

সত্যি, এ এক দিনকাল এসেছে ভাল। কার উপর যে রাগ করবে সহসা ভেবে পেল না হরিশ। স্থানীয় চটকলগুলোতে কন্‌সেসন্ রেটে যে তেল দেয়—তা ব্যবহারের কথা দূরে থাক্—কোথাও পড়লে অবধি তার উৎকট ইঁদুর পচার মত গন্ধে বমি উঠে আসে। সেই তেলই আবার কি করে যায় বাজারে, বিক্রী হয় চড়া দামে। পচা মাল আর বেশি দামে যারা জিনিস বিক্রী করে দুনিয়া জুড়েই কোথায় যেন এদের একটা নাড়ির বন্ধন আছে। বাজারের মুদীদের নীরস কুটিল মুখগুলি মনে পড়ে যায় হরিশের। মনে মনে তাদের শালা নামে ভূষিত করে—একগাল মুড়ি মুখে দিয়ে মুখটাকে বিকৃত করে চোয়াল দু'টাকে নাড়ে। হঠাৎ একেবারে একটা বিষাক্ত তীরের মত এসে তার কানে বিঁধল—র‍্যাশন কিন্তু নেই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চিবোনো বন্ধ করে সে তাকাল মিনতির দিকে। যেন হঠাৎ সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। মুড়ির বাটিটা আটকে রইল কোনো রকমে তার দুটো শিথিল আঙ্গুলের মধ্যে। তার দিকে না চেয়ে দড়িতে কাঁথা মেলে দিতে দিতে মিনতি বলল : গেল সপ্তাহে র‍্যাশন আননি, এই বাজারেও ধার করে চালিয়েছি। রোজ রোজ ধার দেবে না কেউ। যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

অন্যান্য ভাড়াটেদের উনুনে আগুন পড়েছে। সমস্ত বাড়িটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আর একটু বাদেই আঁচ উঠবে, চাপবে হাঁড়ি, কড়া। মিনতি ছটফট করবে, এধার ওধার ঘুরবে, তারপর এক সময় হয়তো বেরিয়ে পড়বে চালের যোগাড়ে। যোগাড় হয় ভাল, নয়তো কারুর উনুনে খোকার জন্য একটু বার্লি দেবে চাপিয়ে। আজ অবধি কোন দিনই রান্না কামাই যায়নি। কিন্তু এবার দেখা দিয়েছে সেই গতিক।

পাশের ঘরের ছোট্ট বোঁচা মেয়েটি কাঁসার গেলাসে করে খানিকটা চা এনে দিল হরিশকে। দেখে হরিশের শিথিল হাত-পা আঁট হয়ে উঠল। মেয়েটি বলল; কাকীমা দিয়েছে খান।

পাশের ঘরের ছোট বউটি আরও কয়েকদিন দিয়েছে ওরকম চা। স্বামী ভাল চাকরী করে—অভাব নেই তেমন। অন্যান্য বৌ-ঝিদের চেয়ে এর মেজাজটা একটু শরীফ—হাতটা একটু দরাজ। স্বামীটির আনুগত্য একেবারে নিশ্ছিদ্র। হরিশ চায়ের গেলাস হাতে করে তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিটা তুলে ধরল—উঠানের উপর মেলে দেওয়া শাড়িটার গায়ে। শাড়িটার আড়ালে বউটি রান্নার কাজ করছে।

—ভগবান করুন—আপনার আয়-পয় বাড়ুক।—খুশি গলায় বলে উঠল হরিশ। কথাটা যেন ঠাট্টার মত শোনালো। বউটি বড় জা'কে একটা ঠেলা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বড়-জা' হরিশের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলে উঠলেন: আশীর্বাদ করুন একটা রাঙা ছেলে যেন হয়।

—অ-মা-গো! ছোট বউটি লজ্জায় নীল হয়ে একেবারে গুম্ করে এক কিল বসিয়ে দিলে জা'য়ের পিঠে।

খাপছাড়া ভাবে হাসল একটু হরিশ। মনটা আবার বিমর্ষ হয়ে উঠছে। অবশিষ্ট একটুখানি চা' খোকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উঠে পড়ল সে। টাকা। গোটাকয়েক টাকার যোগাড় করতেই হবে। পথ চলতে চলতে পরিচিত অপরিচিত নানান্ জনের কথাই মনে হতে থাকে। এক কথায় টাকা দেবার মত লোক কে আছে।

—কোথায় চললেন হরিশ বাবু।

গলির মোড়ের দোতলা বাড়ির সেই ভদ্রলোক—যতীনবাবু ডাকলেন। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। মাইল তিনেক দূরে গ্রামের দিকে ভদ্রলোকের একটি ইঁটকল আছে; সম্প্রতি টালিখোলাও করেছেন। তিনি যেচেই হরিশের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। একদিন এক কাপ চা'ও খাইয়েছিলেন। হঠাৎ এঁকেই হরিশ বলে ফেলল: আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকারি কথা ছিল।—বলেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠল সে।

—আমার সঙ্গে? বেশ তো—বলুন না!— দরাজ আহ্বান।

বারান্দায় উঠে হরিশ ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু চট্ করে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তার ভাব দেখে আবার বললেন তিনি: বলুন না, অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?

—মানে—একটা ঢোক গিলে হরিশ বলল: আমাকে গোটাকয়েক টাকা দিতে পারেন?—বলে ফেলেই লজ্জায় গরম কান দুটো তার উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

—ওহো— এ আর এমন কি কথা—যেন ওঁর কাছে এ কথার কোনো গুরুত্বই নেই।

—ক'টা টাকা দরকার আপনার বলুন।

এত সামান্য পরিচয়ের মধ্যে বলতে গেলে পরিচয় আর কতটুকু। তাইতেই... হঠাৎ খুশিতে, সঙ্কোচে, লজ্জায় হরিশের বুক আলোড়িত হয়ে উঠল। কোনো রকমে সে বলে ফেলল: এই গোটা দশেক দিলেই হবে।

—তা' আর কি হয়েছে। দশটা তো টাকা। দিনকাল কি সবার সমান যায়? ঘুঁটে পোড়ে—গোবর হাসে—এমন দিন সবারি আসে; বড় খাঁটি কথা। আমি সে রকম লোক নই। দরকার পড়েছে, নিয়ে যান।

কোটের পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট নিয়ে দিলেন যতীনবাবু হরিশের হাতে। এমন মানুষও আছে! তা-ও একেবারে গলির মোড়ে—হরিশের এত সামনে!

—বসুন না ওই চেয়ারটায়। সামনের চেয়ারটা যতীনবাবু দেখিয়ে দিলেন। শ্রদ্ধায় আপ্লুত হরিশ বসল।

—দেখুন—তিনি আবার আরম্ভ করলেন: দেশের আজ এমন দিন, কেউ কাউকে না দেখলে চলবে না। দেখছেন তো কলকাতার অবস্থা?

সুরাবর্দির নামের আগে একটা অশ্রাব্য বিশেষণ প্রয়োগ করে বললেন, সে-ই তো এই গোলমালটা পাকালে। ব্রিটিশও তো দাঙ্গাই চায়—তার আর আপত্তি কি। কিন্তু সুরাবর্দি যতই করুক আর ব্রিটিশ যা-ই করুক, এ-জাত মশাই—তৈরী জাত। আর ছুঁচ ফোটাতে হবে না।

হিন্দুত্বের সনাতন মহিমা ঝলসে উঠল যতীনবাবুর মুখে। সুবোধ বালকের মত হরিশ ঘুট্ ঘুট্ করে ঘাড় নেড়ে চলল।

—সেদিন আর নেই, দেশের মোড় ঘুরতে বসেছে—বুঝলেন? সাহেবের চোখ রাঙানি সইবার দিন আমাদের চলে গেছে। দেখছেন না—দেশী কারখানা গড়ে উঠেছে—বাছাধনদের গুটিয়ে নিতে হচ্ছে সব। তা' এসব তো আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

সসম্ভ্রমে হরিশ বলল: তা তো বটেই।

যতীনবাবু থামলেন না।—বুঝুন, এসব দেশী কারখানা যতই হবে—ততই আমাদের ভাল। এতো আর বিলিতি নয়, এ আমাদেরই কারখানা। কিন্তু হলে কি হবে,......বিরক্তি এবং আফ্‌শোষের বক্র রেখা দেখা দিল যতীনবাবুর ঠোঁটে আর কপালে।

—ওই ধর্মঘটের লচ্ছারপনা করেই তো সব নষ্ট করছে লোকগুলো। বোঝে না—এতো নিজেদেরই। সবে সব হচ্ছে—এখন হুট্ করে একটা চাইতেই কি আর দেওয়া যায়। নতুন এখন সব আগে গড়ে উঠুক। তা-নয়—কথায় কথায় স্ট্রাইক, এ দাও, সে দাও। মুখ্যুগুলো দেশের অবস্থা তো বোঝে না।

হরিশেরও নাকের ডগাটা কুঁচকে উঠে একটা অস্পষ্ট বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। যেন ভদ্রলোকের যৌক্তিক বিরক্তির সাক্ষ্যস্বরূপ।

—এতে দেশেরই তো ক্ষতি।— যতীনবাবু তাকালেন হরিশের মুখের দিকে।

—নিশ্চয়ই।— যেন দশটাকার নোটটা হরিশের কণ্ঠনালীটাকে খোঁচা দিয়ে খুলে দিল।

ঘাড় উঁচু করে একটা হতাশার ভাব করে নিচের ঠোঁটটা উলটে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন যতীনবাবু। তারপর বললেন, আপনারও তো চাকরী নেই।—অভিভাবকের দায়িত্ব ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

হরিশের দীপ্তিহীন চোখে দেখা দিল আশার আলো।—আজ্ঞে—না।

—হুঁ!— চিন্তিত হয়ে উঠলেন তিনি।—গোটা কয়েক লোক অবশ্য আমাকে দিতে বলেছে। যেন নিজের মনেই বললেন কথাগুলি।

কোথায়? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আটকে গেল হরিশের। যতীনবাবু নিজেই বললেন, ওই আপনার বড়প্রসাদ না কি প্রসাদ কোম্পানী, আরে ওই যে রেল লাইনের কাছে মাঠের ধারে নতুন কারখানাটা হয়েছে—সেখানে। অতবড় কারখানাটা তৈরী করতে ইঁট সব আমিই সাপ্লাই করলাম কি না, তাই আমাকে খুব ইয়ে করে। দেখেছেন তো দেশী কারখানা ছটা সায়েব পুষছে। দেখ ব্যাটারা এখন কে কাদের খিদ্‌মত্‌ করে।— উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু পরমুহূর্তে হয়ে উঠলেন বিরক্ত।

—কিন্তু হলে কি হবে, ধর্মঘট করে বসে আছে সব। যেন শ্বশুরবাড়ির আব্দার! —তা আপনি লেগে যান না, বলেছে যখন আমাকে। আপনাদের দুঃসময়ে যদি একটু কিছু করতে পারি আপনাদের, আর আপনাদের করব না—করব কাদের বলুন?

বিগলিত হরিশের বুকের মধ্যে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল—কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম রে বাবা! টাকা—চাকরী। মনে মনে সে যুক্ত করে প্রার্থনা জানাল ভগবানের কাছে। বলল: নিশ্চয়ই, আপনি যদি দয়া করে দেন।

যতীনবাবু অমায়িক হাসি হাসলেন।— আরে দুর দয়া, কি যে বলেন। আজকে এ চাকরী করা মানে দেশের উন্নতি করা! কিন্তু গুণ্ডারা তা বুঝবে? হয়তো লাঠি সোঁটা নিয়ে—হাগডুম বাগডুম করতে আসবে। তা—সেজন্য আটকাবে না। একটু অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে এখানে আসবেন। কারখানার গাড়িই আপনাকে নিয়ে যাবে।

—আজ্ঞে আচ্ছা!— যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হরিশ।

—তা হলে ঠিক তো?

—নিশ্চয়ই!

—আচ্ছা, আচ্ছা—কাল আসবেন তা'হলে খুব ভোরে, আমি ওদের খবরটা দিয়ে রাখব। এবার আমি উঠি, একবার যেতে হবে খোলায়।

বাড়িতে এসে হরিশ খানিকটা ডগমগ হয়েই সবিস্তারে একটা বর্ণনা দিয়ে ফেলল ব্যাপারটার। কিন্তু স্পষ্ট হাসিটা যেন মিনতির ঠোঁটে ফুটে উঠল না। মনটা তার সহজ হল না। কেমন যেন একটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে। কি জানি...এলোমেলো মনটাকে সে চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে।

—আরে তোমার অত ভাবতে হবে না।—হরিশ মনে মনে স্থির—সহজ।

—এখন—র‍্যাশনকার্ড আর ব্যাগগুলো দাও দিকিন।

মিনতি ব্যাগ আর র‍্যাশনকার্ড এনে দিল। তার মুখের দিকে নজর পড়তেই হরিশ বলল: তোমার মুখটা অমন লাল দেখাচ্ছে কেন? চোখ দুটোও যেন ছল ছল করছে!

—কি জানি। কণ্ঠস্বরটা মিনতির কেমন ক্ষীণ চাপা শোনায়।

—ও!— চকিতে হরিশের মনে পড়ে যায় খোকার জন্মদিনের কথা, মনে পড়ে সেদিনকার মিনতিকে। চিন্তিত মুখে বেরিয়ে পড়ল সে।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে হরিশ চমকে উঠল একটা পোস্টারের দিকে চেয়ে।

"বুধনপ্রসাদের কারখানায় ধর্মঘট! দালালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও!"

রাস্তার এ মোড়ে ও মোড়ে দু'তিন জন করে ধর্মঘটিরা জটলা করছে। দাঙ্গার ব্যাপারে ১৪৪ ধারা আইন জারী আছে। বেশি লোক জড়ো হওয়া সম্ভব নয়।......তা আমার কি? নিজের মনে বলে উঠল হরিশ। তবু মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সে গিয়ে দাঁড়াল র‍্যাশন দোকানের 'কিউ'তে। সেখানেও ধর্মঘটেরই কথা। এছাড়া যেন দুনিয়ায় আর কোনো কথা নেই।

—আরে দালাল,—কারা যেন বলাবলি করছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠল হরিশ। চোখ দুটো তুলে তাকাতে পারল না।

—দালালের বাপকে শুদ্ধ টেনে আনব আমরা। ওসব চুতিয়া পেঁয়াজি চলবে না—বুঝেছ। ঘুঁগুড়োবাণ ছুটিয়ে দেব। আমাদের রুজি হাতিয়ে নেবে দালাল—শালা গায়ের চামড়া ছিড়ব না তা'হলে? আর একজন বললে: ধার করে, একবেলা লেগেছি আমরা। ছেলেটার অসুখ, শালা একটা ডাক্তার দেখাতে পাবি না, আর দালাল এসে আমাদের এত মেহনত ভেস্তে দেবে। চলবে না ওসব।

হরিশ প্রায় ভুলেই গেছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে যেন একটা বিষধর সরীসৃপ শির্‌শির্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন চাকরী প্রাপ্তির ফুর্তিটুকু উবে যাচ্ছে যেন। চোরা-চোখে লোকগুলির দিকে তাকাল সে। না, তাকে কেউ দেখছে না। দেখবেই বা কেন? আমি তো আর......। না—মনটা যেন কেমন অস্বস্তিকর গ্লানিতে জমাট বেঁধে উঠছে। মনটাকে সহজ করবার কোনো পথ খুঁজে পেল না সে। তাড়াতাড়ি র‍্যাশন নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

—মোদ্দা কথা ছাঁটাই চলবে না।

আবার ওই কথা! কিন্তু হরিশ দাঁড়ালো না। চলতে চলতেই শুনল; আর রোজ দশঘণ্টা খাটুনি সেটি হবে না। দেশী কারখানা বলে কি আমরা জানগুলো দেব? নিকুচি করেছে তোর দেশী কারখানার!

বাড়ি এসে হরিশ সহজ হওয়াব চেষ্টা করল। আমার কি? ধার করে একবেলা খায়, ছেলেব চিকিৎসা হয় না—তাতে আমার কি? আমাকে কে দেখে। বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। থাক্‌—এসব কথা মিনতিকে আর বলে দরকার নেই।

—কেমন বুঝছ তুমি?—মিনতির দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করল সে।

—কিসের?

—মানে—হরিশ মিনতির এলিয়ে বসার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করতে থাকে।

ক্লিষ্ট-স্বরে মিনতি বলল, বোধ হয়—। কোমরের দিকটা বড় কন্‌ কন্‌ করছে।

কিন্তু আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে হরিশ।

রাত্রিটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটল। মিনতির তো ছটফট করেই কেটেছে। খোকাও জ্বালাতন করেছে প্রায় সারাটা বাত। শেষ রাত্রির দিকে একটু ঘুমিয়েছে। হরিশ উঠে

পড়ল। দেরী করলে চলবে না। কিন্তু মিনতি,...কয়েকবার ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেয়েছে সে। সামনের একটা লাইনেই হিন্দুস্থানী ধাই আছে। খোকার বেলায় সে-ই খালাস করিয়েছিল। কাজে যাওয়ার আগে তাকে ডেকে দিয়ে যাবে স্থির করল হরিশ।.. মিনতি একা থাকবে? কিন্তু নতুন কাজ! মিনতির মতামতটা জানবার জন্যই সে বলল; আমি যাচ্ছি—বুঝলে? সেই ধাইটাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।— পাশের ঘরে ছোড়দি'রা উঠল কিনা দেখ তো।— মিনতির গলায় চাপা বেদনা, কান্নার মৃদু রেশ।

দরজা খুলতেই আশ্চর্য হয়ে হরিশ দেখল ছোট বউটি তাদের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে দাড়াল। সে পাশ দিতেই বউটি সোজা ঘরে ঢুকে বসল গিয়ে একবারে মিনতির পাশে। একটু অস্বস্ত হয়ে বেড়িয়ে পড়ল হরিশ। কিন্তু ঘরের এসব চিন্তা থেকে সে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

চাকরী তো সবাই করে। কিন্তু তার চাকরীটা যেন কি এক বিশ্রী নূতনত্বে ভরা। একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ধাইকে ডেকে দিয়ে সে এসে দাঁড়াল যতীনবাবুর বাড়ির কাছে। তখনো অন্ধকার।. ভাল করে ঠাহর করে দেখল তিনটি লোক বসে আছে বারান্দায়। কারা? কোনো কিছু ভাববার আগেই তারা এগিয়ে এল হারিশের কাছে। হরিশ ভয়ে কাঠ! মারধোর করবে নাকি লোকগুলো? একজন বলে উঠল: ও-হরিশবাবু আছেন। খুব জল্‌দি আসিয়াছেন তো? কে? হরিশ চমকে উঠল। সেই গুণ্ডার সর্দার রামসিং না? তাই তো! এখানে, এসময়ে কি মনে করে সর্দার?—একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল হরিশ। সর্দার হেসে উঠল হেঁপো রোগীর কাসির মত করে। দাদা ভারী ন্যাকা আছেন। আপনি যে জন্ত আসছে হামিও তাই। সঙ্গীরা হেসে উঠল চাপা গলায়। একজন বললে, আমরা দুষমন নই দাদা, আপনার দোস্ত। গাড়ি এলে আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

হরিশের বন্ধু! হরিশ তাকাল লোকটার দিকে ভাল করে। গণেশ হড়। একটি নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ, মদ্যপ। এই সেদিনও পাড়ার মধ্যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করেছিল।

এদের বন্ধু হরিশ। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু তোমরা...

বেশ উৎফুল্ল গলায় সর্দার বললে; হাঁ গো দাদা হামরা। ওই ধরমঘটী শালারা যাদের বোলে দালাল। হরিশের বুকের মধ্যে যেন হাতুরির ঘা' পড়ল। দালাল!

এমন সময় আর গুটিকয়েক লোক এল। হরিশ যাদের চেনে। তারা কেউ কোনোদিন চাকরী করে না। অলস, অসচ্চরিত্র, অসদুপায়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সমাজের বুকে বিষাক্ত বীজাণুর মত লালা ছড়িয়ে বেড়ায়—'ওরা তারা। এদের সঙ্গে হরিশ যাবে, একবেলা যারা খেয়ে থাকে নিজেদের অনমনীয় দাবীর জন্ত তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে, হরিশের নূতন চাকুরী—এরা তার সহকর্মী, বন্ধু। হরিশ দালাল। কি একটা যেন ঠেলে আসতে চাইছে তার কণ্ঠনালীতে। কিন্তু র‍্যাশন, দুধ, কয়লা, বাড়িভাড়া?

গোঁ গোঁ করতে করতে এল কারখানার গাড়ি। তার উপর বসে আছে দু'জন লাঠিধারী পুলিস।. একে একে এগিয়ে গেল সবাই। হুকুমের সুর ফুটে উঠল রামসিং-এর গলায়; উঠিয়ে পড়ুন হরিশবাবু জল্‌দি, উঠুন। দালালের সর্দারের হুকুম। হরিশ তো দালাল নয়। তার বুকের মধ্যে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ যুগপৎ গর্জে উঠল, কেঁদে উঠল, না।

—না ?—ক্রুদ্ধ সর্দারের দুই চোখ হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল।

—না—কয়েক পা পেছিয়ে হরিশ ঘরের পথে পা বাড়াল।

—না, আমি যাব না।

—আচ্ছা!—নিস্তব্ধ মুহূর্তটুকুকে ভয়াবহ করে তুলল সর্দারের দন্ত নিষ্পেশনের মৃদু তীক্ষ্ণ স্পষ্ট শব্দ। চকিতে পায়ের সামনে কংক্রিট দেয়ালের ভাঙ্গা টুকরাটা তুলে নিয়ে সজোড়ে ছুঁড়ে মারল। বোঁ করে এসে সেটা লাগল হরিশের কানের পেছনে। গাড়িটা গর্জন করে চলে যাওয়ার মত তার মাথার মধ্যে যেন গোঁ গোঁ করে উঠল। তবু সে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে—বাড়িভাড়া, র‍্যাশন, দুধ, জীবনের নিরাপত্তা তার অন্তরাত্মার বিনিময়ে, তার সবকিছুর পরিবর্তে—না না না...। সে এগিয়ে চলল। তার নতুন চাকরী দালালির জন্য মিনতিকে সে ওই অবস্থায় ফেলে এসেছে ; এ অপমান তার প্রাপ্য। খেয়াল করল না তার কানের পেছনে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ আকুল করে তুলল তাকে আসন্ন প্রসব বেদনায় রক্তাভ ব্যথিত মিনতির মুখ।

ঝড়ের মত এসে ঢুকল সে বাড়িতে। আকাশ প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। ক্রমে শহরতলীর বুকে জাগছে সাড়া। বৃদ্ধা ধাই দন্তহীন মুখে একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে ধরল : বখ্‌শিশ দাও, খোকা হয়েছে। নতুন খোকা, সুন্দর খোকা।

হরিশ শুনতে পেল নতুন শিশুর জন্ম-ঘোষণা—শিশুরই কচি গলায়। নতুন মানুষ, নতুন ধরা। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। ওই যে......ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার নতুন খোকা। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এল তার চোখ দুটো। হাসল গভীর তৃপ্তিতে। সে দালাল নয়, সে তাদের যারা নিজেদের দাবীর জন্য আধপেটা খেয়েও অনমনীয়, ওই ধর্মঘটীদের একজন।

বুক-পকেটে আঁকড়ে রেখেছিল যে ক'টা অবশিষ্ট টাকা, সব তুলে দিল সে ধাইয়ের হাতে। নিয়ে নাও, এসব নিয়ে নাও। কিন্তু এ আসল নয়, তোমার আসল পাওনা বাকী রইল।

সমরেশ বসু

জীয়ন্ত

পূর্বানুবৃত্তি

সুরেনের বাড়িটা একটু পুরানো আর বেঢপ এবং সেই জন্যই ভাড়ার অনুপাতে ঘর অনেকগুলি, স্থান অঢেল। সামনের অঙ্গনটা এত বড় যে যাত্রার আসর বসানো চলে। বাড়িওয়ালাকে মিঠেকরা উপরোধ অনুরোধ জানিয়ে জানিয়ে বিফল হয়ে সুরেন অগত্যা নিজেই পয়সা খরচ করে ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া চুণ বালির প্রলেপে বাড়িটার জীর্ণতা খানিক ঢাকবার চেষ্টা করেছে। সঙ্কল্প আছে ভাড়া থেকে টাকাটা কেটে নেবার কিন্তু খুব বেশি ভরসা নেই। বাড়িওয়ালা শ্রীমন্ত সাহা পাকা ঝানু লোক, আর এদিকে সরকারী চাকুরে হলেই বা কি, সে নিছক মুনসেফ। ছোট খাট একটা সাবডেপুটি হলেও লোকে কিছু ভয় করত, শ্রীমন্তও হয়তো বাড়ি মেরামতের অনুরোধটা অমান্য করতে সাহস পেত না, কিন্তু মুনসেফকে কে মানে, একটা ছেঁচরা চোরকেও যার পুলিস দিয়ে বেঁধে এনে জেলে দেবার ক্ষমতা নেই। অথচ সে হাকিম, জোর করে ভাড়া না দিলে বদনাম রটবে অমুক হাকিম বাড়ি ভাড়া দেয় না—জজসায়েবের কানে গেলে রাগ করবে, ধমক দেবে। এ এক বড় আপশোষ সুরেনের, বড় সে ঈর্ষা করে পুলিসি ফৌজদারী হাকিমদের।

ছাতে হোগলার মেরাপ তুলেছে, সেখানে সকলের পাতা পাতবার ব্যবস্থা। ভিতরের উঠানে ছোট সামিয়ানার নিচে বিয়ের আসর। সামনের অঙ্গনে মস্ত সামিয়ানার তলে বসবার জন্য ফরাস ও চেয়ার। ডে লাইট জ্বলে আর কারবাইড পুড়ে দরকারের চেয়ে বেশি আলো করেছে চারিদিক, যে ঘর আর আনাচ কানাচে এ আলো পড়ে না সেখানে জ্বলছে লণ্ঠন। রাত আটটা নাগাদ বর নিয়ে বরযাত্রীরা এসে হাজির হবার পর কিছু বাজীও পুড়ল, তুবড়ি এবং হাউই। তখন সাধারণ নিমন্ত্রিতেরা অনেকেই এসে গেছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুরু করেছে আসতে। সকলের সঙ্গে কুশ ঘাসের আসনে বসিয়ে পাতায় খাওয়ানোর বদলে এইসব পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকগুলিকে বড় একটা ঘরে ভিন্নভাবে বিশেষভাবে খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে বটে কিন্তু আসরে বসবার জন্য সাধারণ ভদ্রলোকের নাগালের বাইরে পৃথক কোনো রিজার্ভ ব্যবস্থা করা হয়নি, তাদের জন্যও ওই চেয়ার। তবু যেন কিভাবে প্রকৃতির কোন অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসবার একটা নিজস্ব এলাকা গড়ে উঠছে দেখা যায় সকলের মধ্যে! ফরাসে একাকার হয়ে গেছে ছোট বড় সাধারণ ভদ্রলোক, চেয়ারের সারিগুলির একদিকে খানিকটা মাননীয় ও গণনীয় উকীল ডাক্তার চাকুরেদের মধ্যে পর্যন্ত মেশাল পড়েছে সাধারণ লোকের, কিন্তু অপরদিকে শহরের শুধু সেরা ব্যক্তিদের নির্ভেজাল ঘাঁটি। ঘাঁটি গড়ার কেন্দ্রটা সহজেই লক্ষ্যণীয়, ক'জন বড় অফিসার। বসাওঠা নড়াচড়া হাসিকথা রকমসকম দেখে মনে হয় ওরাই চুম্বকের মত জমিদার, ব্যবসায়ী, নেতা, কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধিধারিদের কাছে টেনে জড়ো করেছে—খাঁটি চুম্বকের মত এরাই আসল সম্ভ্রান্ত, লোহার টুকরোর মত অন্যদের মান-সম্ভ্রম সঙ্গগুণে অর্জন করা। লগ্ন রাত সাড়ে এগারোটায়।

প্রথম ফাল্গুনে. শীতের ছোট দিন কিছু বড় হয়েছে বটে কিন্তু তিন চার ব্যাচে অনেক লোককে খাওয়াতে হলে আটটাই কম রাত নয়। প্রথম ব্যাচকে ভোজনে বসাতে হবে শীগগির। তার আয়োজন চলছে ছাতে। একতালায় চলছে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, অকারণেই নানা ছুতায় উলুধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। আসরে চলেছে আসুন বসুন রব তুলে সিগারেট বিতরণের সম্বর্ধনা।

সুরেন যেন একেবারেই নিরপেক্ষ। এ যেন তার মেয়ের বিয়ে নয়, তারই পয়সার ঘটা নয়, সেই যেন নগদেই শুধু সাড়ে তিন হাজার পণ দিয়া কলকাতা কর্পোরেসনের নতুন কাউন্সিলর অঘোরের কর্পোরেসনেই সদ্য নিযুক্ত কেরানী রোগা কালো পরিমলকে বাগায়নি মেয়েকে বিলিয়ে দেবার এই উৎসবের জন্য। কেমন তাকে মনে হয় মন-মরা, উদাসীন। জেলা জজ অরবিন্দবাবুকে পর্যন্ত ফাগুনের দখিণা হাওয়ায় গায়ে জড়ানো দামী শাল উড়িয়ে আসতে দেখেও এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে না, তার দাদা নরেন তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

অরবিন্দ বলে, সুরেন বাবু—?

জজ হয়েও বোকার মতই বলে, কারণ দু'জনেই তারা খানিক দূরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুরেনকে। বাঁশের খুঁটিতে ঝোলানো ডে-লাইটের নিচে তাদেরি দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সুরেন যেন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শুনছে তার মেয়ের বিয়ের সানাই। বাড়ির প্রধান দরজার ডাইনে রোয়াকে বসে লখীন্দর তান ধরেছে তার নিজস্ব মেশাল পূরবীতে : এ জেলায় লখীন্দর বিখ্যাত সানাইওয়ালা। বিভোর হয়ে বাজাচ্ছে লখীন্দর, ওটা তার স্বভাব। পোঁধরা তাল বাজানেদের নিয়ে সানাই বাজিয়ে মোট পাবে তেরটি টাকা, পাঁচ বেলা খাওয়া আর একখানি কাপড়, আটহাতি কি বড় জোর ন'হাতি হবে কাপড়খানা জানা কথাই, গামছাও হয়ে দাঁড়াতে পারে শেষ পর্যন্ত। তবুও মন দিয়ে সানাই বাজায় লখীন্দর, শুনে মন কেমন করে মানুষের।

মেয়ের বিয়ের ব্যাপার বুঝতেই তো পারেন, নরেন সবিনয়ে জানায় আসুন বসুন এসে, সুরেনকে খবর দিচ্ছি। আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন শুনলে—

কিছুক্ষণ এমনি বিভোর আনমনা হয়ে থাকে সুরেন আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ছটফট করে বেড়ায়, যাকে সামনে পায় তার সঙ্গেই কথা বলে। বলে যে সাড়ে এগারটায় লগ্ন, বিয়ে শুরু হতেই বারটা বাজবে, কি দিয়ে সকলকে সে যে আপ্যায়ণ করবে—একটু গান বাজনার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি! তার বিনয়ের জবাবে সকলে বিনয় করে, ওটা সে তার একটা গোপন প্রার্থনা বুঝে উঠতে পারে না, বলে সে আহা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিছু ভাববেন না আপনি, এতো আমাদেরই ঘরের কাজ!—কেউ ভুলেও বলে না তাকে যে গান বাজনার ব্যবস্থা নাই বা রইল, আপনিই আমাদের একটু কীর্তন শোনান না সুরেনবাবু? বলে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে চেপে ধরে তাকে বাধ্য করে না কীর্তন গেয়ে শোনাতে।

ভৈরব বরং বলে, আরে মশায় এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা করেননি, বেঁচে গেছেন। ওসব কিছু দিলেই ভজকট লাগে। কাজের ভার দিয়েছেন যাকে সে দাঁড়িয়ে গান শুনছে, খেতে বসতে ডাকছেন কেউ উঠছে না, আবার হয়তো এক সাথে সবাই হুড়মুড় করে এসে বসতে চাইছে। আরেকজন বলে, ডান হাতের আয়োজন আছে, আবার কিসের এন্টারটেনমেন্ট?

মাঝে মাঝে নরেন এসে তাকে ভর্ৎসনা করে যায়, তুমি করছ কি সুরেন?
আর ক্ষণে ক্ষণে এ এসে ও এসে জানায়, এটা চাই, ওটা হল না, সেটার কি করা যায়!

মেয়ের বিয়ে দেবার শ্রান্তিতে, চারিদিকের এই নীরস বাস্তব ব্যবস্থা কলরবের চাপে, উজ্জ্বল আলো আর উলঙ্গ আনন্দের কটুস্বাদে সত্যই ফাঁপর ফাঁপর লাগে সুরেনের। সব বন্ধ করে পালিয়ে যদি যাওয়া যেত দূরে, বহুদূরে, এসব হাঙ্গামার সীমা ছাড়িয়ে।

তা ঠিক, আর কি করার ছিল? পুরানো কথার আলোচনায় বয়নসঙ্ঘের ভবতোষকে সমর্থন করে ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, যে-ভাবে যে-পথে যিনি মুভমেণ্ট চালাবেন তিনিই যখন দেখলেন দেশের লোক সে-ভাবে সে-পথে চলেছে না, তাঁর নির্দেশ মানছে না, বুঝতেই পারছে না তার কথা, মুভমেণ্ট বন্ধ না করে তিনি করেন কি? তাঁরই মুভমেণ্ট তাঁরই দায়িত্ব তিনিই সব, চৌরিচৌরার পর আর তিনি পাবেন চালাতে? ডাক্তার রায়চৌধুরীর পরনে ফেণার মতো কোমল আর ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর, তার তুলনায় বয়নসঙ্ঘের ভবতোষের জামা কাপড় অনুজ্জ্বল, কর্কশ মোটা। বলতে বলতে প্রশান্ত উদ্দীপনার ভাব ফুটেছে ডাক্তার রায়চৌধুরীর মুখে, একটা কথা ভেবেছেন মশায়? গান্ধীজী ছাড়া কারো সাহস হত বলতে, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বন্ধ কর! মুভমেণ্ট শুরু করতে পারে অনেকে, বন্ধ করতে পারে কজন? আমরা তখন ধরতে পারিনি, শুধু উনি একা বুঝেছিলেন মুভমেণ্ট চলতে দিলে কি অবস্থা দাঁড়াত, একা ওর সে দূরদৃষ্টি ছিল।

কিন্তু ভৈরবের মেজ শালা গিরিশ বলে, আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারি না। মুভমেণ্টটা যখন আরম্ভই করলেন, ওঁর কি জানা আগেই উচিত ছিল না এতবড় দেশে ওরকম একটা মুভমেণ্ট চালালে এখানে-ওখানে হাঙ্গামা হবেই?

আহা, অ্যামেচার ক্লাবের অভিনীত স্বদেশী নাটকটির লেখক—উকীল নরেন দস্তিদার বলে, তাই তো উনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন ওঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। অন্য কেউ এমন সরলভাবে বলত একথা? ওঁর কাছে ছলচাতুরী নেই।

ঠিক কথা, ভবতোষ সায় দেয়, অহিংসা আর ওঁর সত্যই সাধনা। রাজনীতির চেয়ে তা ঢের বড় জিনিস। নইলে দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে দেবতার মত পূজা করে?

বাস্, গান্ধীজীকে বুঝে ফেলেছ তো তোমরা? ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, আপনিও বুঝে ফেলেছেন তো ভবতোষবাবু? অতই যদি সোজা হত গান্ধীজীকে বোঝা, তিনি গান্ধীজী হতেন না, আর দশটা পলিটিক্যাল লীডারের মত সাধারণ নেতাই হয়ে থাকতেন। গান্ধীজী কখনো ভুল করেন না। তিনি সব জানেন, সব বোঝেন, ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে আয়নার মত স্বচ্ছ। মুভমেণ্ট শুরু করার আগেই তিনি জানতেন কিছুদিন পরে বন্ধ করে দিতে হবে।

গিরিশ, নরেন ও ভবতোষ তো বটেই, আরও যারা শুনছিল সকলেই অল্প-বিস্তর ভড়কে যায়।—কি বললেন কথাটা? গান্ধীজী জানতেন? ফল কিছু হবে না জেনে শুনেই তিনি মুভমেণ্ট শুরু করেছিলেন বলতে চান?

ফল কিছু হবে না মানে? ডাক্তার রায়চৌধুরী যেন প্রশান্ত গম্ভীর মুখে চেপে বলেন, ওইখানেই ভুল করেন আপনারা। ফল কি হয়নি কিছু? সাড়া কি পড়েনি দেশে, দেশ কি

জাগেনি ? ওইটুকুই গান্ধীজী চেয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দেড়শো বছরের পরাধীন দেশ, হঠাৎ একটা আন্দোলনে একেবারে তার স্বাধীনতা আসে না, দেশকে শুধু জাগাবার জন্তই দু'টো একটা আন্দোলন দরকার হয়। গান্ধীজী তা জানতেন, তাই স্বরাজ আসবে না জেনেও মুভমেণ্ট চালিয়েছেন—স্বরাজ যদি আনতে হয় কোনোদিন এ মুভমেণ্ট করতেই হবে। সেইজন্তই যতদিন মুভমেণ্ট চালানো দরকার চালিয়ে ঠিক সময়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনার এ ব্যাখ্যা জানিয়েছেন নাকি গান্ধীজীকে ? অমিতাভ বলে হাসিমুখে, জানালে খুশি হবেন। আপনার মতে গান্ধীজী চালবাজ, না ডাক্তারবাবু ?

নরেন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানায়, উনি মনে মনে এক কথা ভাবেন আর দেশের লোককে অন্ত কথা বলেন ? আপনাদের মত ভক্তদের জন্তই মুভমেণ্টটা বানচাল হল।

আহা, মাথা গরম করবেন না নরেনবাবু ! গিরিশ বলে।

ডাক্তারবাবু জেল খেটেছেন, নাটক লিখে দেশোদ্ধার করেননি।—বলে ভবতোষ।

আপনার ব্যাখ্যার মানে কিন্তু তাই দাঁড়ায় ডাক্তারবাবু, গান্ধীজী সবাইকে ধাপ্পা দিয়েছেন। অমিতাভ সহজভাবে কথার কথা বলার মত করে বলে, উনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন ভুল করেছেন, হিমালয় পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ভুল করেছেন, দেশের লোক তার অহিংস নীতি মানল না। আপনি বলছেন তিনি ভুল করেননি, তিনি গোড়াতেই জানতেন সবাই পুতুলের মত মার সইবে না, উল্টে পুলিসকে মারবে। তাহলে তার মুভমেণ্টটাই ছেলে ভুলানো ধাপ্পা দাঁড়ায় না ?

চটে আগুন হয়ে ডাক্তার রায়-চৌধুরী বলে, তুমি কি বলতে চাও গান্ধীজী দেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করছিলেন ?

আমি কি পাগল ? অমিতাভ হাসিমুখেই জবাব দেয়, গান্ধীজী মহাপুরুষ, নেতা হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না, এতে আপনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে অদ্ভুত উদ্ভট কিছু বানাতে চান, তিনি সর্বজ্ঞ দেবতা, মহাঋষি, ম্যাজিসিয়ান, সব কিছু। আমার তাতেই আপত্তি। আপনার ব্যাখ্যা মানতেও আপত্তি হয় না, গান্ধীজীও তাতে ছোট হন না, তাঁকে যদি ধর্মপ্রচারক না করে রাজনৈতিক নেতা বলে ধরেন। আর কিছু না হোক বা হোক, ঘুমন্ত দেশটাকে শুধু জাগাবার জন্তই একটা আন্দোলন দরকার এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তিনি আন্দোলন চালিয়ে থাকেন, সে তো ভাল কথা, গৌরবের কথা। তাঁর বিশ্বাস ভুল কিনা, সে প্রশ্ন আলাদা। ভাবুন তো তাহলে কত সরল সহজ হয়ে যায় তার অহিংসা, আর সত্য ? অহিংসনীতি পরাধীন দেশের শিকল কাটার অস্ত্র, রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটেজি, আর কিছু নয়। বেদান্তের মাপকাঠিতে সত্য হোক বা না হোক, দেশের কোটি কোটি লোকের ভালমন্দের হিসাব কষে যা করা দরকার যা বলা দরকার তাই করা আর বলাই সত্য। হিসাবে ভুল কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা।

বাস্, হয়ে গেল ? বিক্ষুব্ধ ভবতোষ ব্যঙ্গ করে, উনি শুধু রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটেজির প্রতীক ? শুধু পাকা পলিটিসিয়ান ? ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞান কর্মের সাধনা যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে, বেশ একটা সার্টিফিকেট তাকে দিলে তো অমিত !

কি করব বলুন ? অমিতাভ নির্বিবাদে বলে যায়, অমন একটা মানুষের নামে যা-তা রটাতে ভাল লাগে না। ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞান কর্মের সাধনা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকে,

তাঁকে শত শত প্রণাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে রাজনীতি করতে আসেন কেন? চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি, সেটা শুধু একটা সাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করেছেন, একথা বললে যে তাঁর মত মহাপুরুষকে অপমান করা হয় ভবতোষবাবু! তাছাড়া দেখুন তাঁর নীতি বুঝতে হাবুডুবু খেতে হয়, কুল-কিনারা মেলে না,. একেবারে অবতারের লীলাখেলার সামিল করে তাঁর মত আর পথকে সমর্থন করতে হয় ডাক্তারবাবু। মানুষটা দেশের জন্য এত করেছেন এভাবে তাঁকে অপমান করা কি উচিত? তার চেয়ে তিনি যখন রাজনীতি করেন তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা বলে ধরে নিলেই গোল থাকে না। আমরা তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে তার নীতি বিচাব করতে পারি, তার পথ ঠিক না ভুল তাই নিয়ে ঝগড়া করতে পাবি।

তুমি করবে গান্ধীজীর বিচার! ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, তার চেয়ে সোজাসুজি গালাগালি দাও, তাতে কম অপমান করা হবে।

চটেন কেন? অমিতাভ বলে, স্বাধীনতার লড়াইটা ফেঁসে গেল, তার লজ্জা, গায়ের জ্বালাটাও একচেটে করে নেবেন? আমারও হার হয়েছে, আমারও লজ্জা করে, গা জ্বলে।

আশে পাশের ক'জন যারা শুনছিল সশব্দে হেসে ওঠে, ডাক্তার রায়চৌধুরীর নিরুপায়েব আঘাত হেনে আত্মসমর্পণের ঝাঁঝ উড়ে যায় সে হাসিতে।

এইখানে চেয়ারের সারির এই সাধারণ প্রান্তে এরকম আলোচনা বা তর্ক বা কথার লড়াই শুধু এইটুকুই চলে, তাও অমিতাভই আলোচনার সূত্রপাতটা ঘটিয়েছিল বলে। ডাক্তার রায় চৌধুরী সম্ভ সম্ভ গান্ধী আশ্রম ঘুরে এসেছে, সেখানে ইলেকসন সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা যে সাধারণ বৈঠক হয় সেই কমিটির একজন মেম্বারের সঙ্গে দর্শক হিসাবে, ডাক্তার রায় চৌধুরী তার ছেলে বেলার বন্ধু। অমিতাভ জানতে চেয়েছিল ভবিষ্যতের ভিত্তিতে আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে কি কথাবার্তা হয়েছে, নেতাদের মনোভাব কি—নিছক কৌতূহল নয়, জানবার তাগিদেই জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আলোচনা আরম্ভ হতে না হতে ফিরে গেল অতীতের ব্যর্থতার ব্যাখ্যায়, বেশি দূর অতীত নয়, এই সেদিন আকস্মিক রাশ টানায় গতিশীল জাতীয়তার গাড়িটা যে দুর্ঘটনায় উল্টে গেছে। অমিতাভ চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল আগ্রহে কান পেতে শোনে কে কি বলছে। বিয়ের আসরের নানাবিধ গান-গল্প হাসি তামাসা আর ঘরোয়া আলাপের সাথে সাথে না হোক, পাশে পাশে না হোক, ফাঁকে ফাঁকেও কেউ কি সাধারণ দুটো চারটে কথা বলবে না যে খাঁটি হোক ভেজাল হোক অন্তত দেশের কথা, দশের কথা, বাঁচার কথা? স্বদেশী একটা ডাকাতি যে হয়ে গেল শহরে কদিন আগে, শহর তোলপাড় হল কদিন ধরে, পুলিস তছনছ করল চারিদিক, তা নিয়েও কি দুটো কথা বলাবলি করবে না কেউ? বিয়ের আসরও কি অন্তত কয়েকজনের কাছেও চুলোয় যায় না এই বিবেচনায় যে একজনের মেয়ে বড় হয়েছে বলে তার বিয়ে দেবার সামাজিক বাস্তব প্রয়োজনের কল্যাণে তাবা একত্র হয়ে সুযোগ পেয়েছে অজস্র বলাবলির? বেঁচে থাকায় সহজ সরল তাগিদও কি এভাবে তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে যাওয়া সম্ভব প্রত্যেকের বাঁচার কথা মুলতুবী রাখার অর্থহীন অপরিসীম ব্যাকুলতায়।

আলো জেলে সামিয়ানা টাঙিয়ে আসর সাজিয়ে সানাই বাজিয়ে উলুধ্বনি তুলে সবাই কি জেগে থেকে ঘুমোবে ?

বিয়ের আসরে অমিতাভ খুঁজে বেড়ায় পরাধীনতার বেদনার, প্রতিবাদের চিহ্ন : একটু-খানি প্রতীক-চিহ্ন, ইঙ্গিত। বিয়ের আসরে কি স্বাধীন হয়ে গেছে ছ'সাত শো লোক সকলেই, বিলাতী বুটের ছ্যাচায় ব্যথা বষার জ্বালা মিলিয়ে গেছে ?

খালি যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছ অমিত ? দেখাচ্ছো নাকি যে খুব খাটছ ? চপলা বলে প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে। তার দেশি মিলেরই মিহি থানে প্রায় সাদা সিল্কের জলুষ, হাতকাটা সেমিজে সাদা আরও গাঢ়, গায়ের রঙে নিজেও যেন সে ফর্সা সুন্দরী মা, পতিহীনতায় আরও বেশি মহীয়সি।

না। অমিতাভ বলে।

ফাঁকি দিচ্ছ তো ? তা বাবা আমার একটা কাজ করে দাও। মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছি না, খোঁজও পাচ্ছি না। বেঁচে আছে, নিরাপদে আছে শুধু এই খবরটা তুমি আমায় এনে দাও। চপলা স্নিগ্ধ নির্ভয় অব্যাকুল শান্ত হাসি হাসে। সে ভুবনের বৌ, বি-এ পাশ, নাম করা মৃত বৈজ্ঞানিক স্তর রাধাদুলালের ভূতপূর্ব বৌ।

কথা কইছিলেন না ওর সঙ্গে ?

তারপর থেকেই তো খুঁজে পাচ্ছি না, একটু থতমত খেয়ে চপলা বল্লে, কোথায় সে গেল !

অমিতাভ মজা বোধ করে না। দশ মিনিটের অদর্শনে মেয়ের জন্য চপলার ব্যাকুল হবার ভানকেও ভান হতে দেয় না, ডেকে দিচ্ছি। বইটা পড়েছেন মাসীমা ?

কোন বইটা বাবা ?

চার পাঁচ দিন আগে বাড়ি এসে বইটা পড়তে নিয়েছে, চপলার মনেও নেই।

আইরিশ রিভোলিউসনের সেই বইটা নিয়ে গেলেন না ?

ও ! প্রতিমা পড়ছে। আমি কি পড়াশোনার সময় পাই ?

মা আমাকে খুঁজছে ? আশ্চর্য হয়ে প্রতিমা অমিতাভের মুখের দিকে কয়েকবার তাকায়, মুখের ভাবের ভাষা পড়বার জন্যই তাকায়, বয়স মোটে বছর ষোল হলেও এ মুখখানা সে অধ্যয়ন করে আসছে অনেক দিন, ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছে অনেকখানি।

মার শরীর ঠিক আছে তো ?

ঠিক থাকবে না কেন ?

তাই জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে ?

মাদ্রাজী একখানা শাড়ি পরেছে প্রতিমা, খানিকটা রাজপুতানা ধরনে। বন্দে বর্গী নাটকে নিখিল ঘোষালকে যে বেশে মেয়ে সাজতে দেখে তার ঈর্ষা জেগেছিল তারই অনুকরণে।

মাসীমা নিচে আছেন, দেখা করে এসো।

কি আবার দেখা করব।

খুঁজছেন তোমায়।

খুঁজছে না হাতি। এটুকু বুঝতে পার না? প্রতিমার দাঁতগুলি সুন্দর, হাসিটা ভারি মিষ্টি। কবে এসেছ কলকাতা থেকে, অ্যাদ্দিনে একবার দেখতে এলে না জ্যান্ত আছি না মরে গেছি। মার ভাবনা হবে না?

অমিতাভের নীরবতায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে মরে যায় প্রতিমার মিষ্টি হাসি।

কি ভাবছ?

কিছু না।

কি ভাবছিলে? বলো আমায় কি ভাবছিলে, বলতে হবে। অমন করে তাকিও না বলছি। কেমন যে কর তুমি!

কি হল তোমার? অমিতাভ বিপন্ন হাসি ফুটিয়ে বলে, রাগছ কেন?

চেপে গেলে তো? বেশ। যা শুরু করেছ, আমি বলে কথা কইলাম, আর কেউ হলে—

উদ্বেগের ব্যাকুলতায়, উদ্বেল অভিমানে, বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করা ভয়ে চপলার মত মুখখানা দেখায় প্রতিমাব, না জেনে না বুঝে কিছু যাতে বলে না ফেলে সে সংযম বজায় রাখার চেষ্টাটুকু কষ্টটুকুও অনুভব করা যাব। মায়া বোধ করে অমিতাভ, জোরালো মায়া। হাসি মুখে মিষ্টি কথা বলাব দুরন্ত সাধ জাগে। মনে হয়, মেয়েটাকে বড় আঘাত দেবাব চরম সঙ্কল্প খাড়া রেঁখেও বুঝি এখন ওব এইটুকু দুঃখ অভিমান উপেক্ষা করাব মত জোর সে খুঁজে পাবে না। তাই, নিজেকে একান্ত নিরুপায় ও অসহায় বোধ করায় অকারণ অর্থহীন কঠোরতার সঙ্গে ধমকের সুরে বলে, এখানে এখন ঝগড়া কোরো না প্রতিমা।

প্রতিমা যেন ঝগড়া করছে!

তাই প্রতিমার ভয় ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েই আবার বলতে হয়, কাল তোমাদের বাড়ি যাব, কথা আছে।

কি হয়েছে? আবার ধরবে নাকি তোমায়?

না না, তা নয়। বলব'খন কাল।

কখন যাবে?

সকালে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিমা তাকে খুঁজে বার করে।

মা চলে গেছে। আমায় বাড়ি পৌছে দিয়ে আসবে।

ভুবন তখনও যায়নি, তার বাড়ির ছেলে মেয়েরাও আছে। সে কথা তোলে না অমিতাভ, লাভ কি?

এখনি যাবে?

হ্যাঁ, যাই চল।

এবার সহজভাবে বলে অমিতাভ, সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরছে না বুঝি?

না, তা নয়।—একটু ভাবে প্রতিমা, আচ্ছা, বিয়েটা দেখেই যাই। বাড়ি পৌছে দেবে কিন্তু।

বাড়ি পৌছে দেব? বাড়িতে খেয়ে ফেলবে না!

খেয়ে ফেলুক। দু' চোখ জলে ওঠে প্রতিমার, সুন্দর দু' সারি দাঁত টুক্ করে আওয়াজ

তুলে ঠুকে যায়, তুমি আজ আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। বল পৌঁছে দেবে, কথা দাও। নইলে আজ এখানে আমি কেলেঙ্কারি করব।

তবে এখুনি চল।

না। বিয়ে দেখে যাব।

কালীনাথ বলে অমিতাভকে, তুমি যে মুষড়ে গেলে একেবারে। এতো জানা কথাই হতাশা থেকে অবসাদ আসবে, প্রতিক্রিয়া আসবে। একটা কথা ভুলো না অমিত, এ কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার হতাশা নয়, রোগীর মত নির্জীব, দুর্বল হবার অবসাদ নয়। মনটা শুধু সবাই গুটিয়ে নিয়েছে, সরিয়ে ফেলেছে। আর কিছুই করার নেই তাই। নেতাদের যেমন ভাব, আমাদেরও তেমনি। স্বাধীনতার কথা, লড়াইয়ের কথা কেউ আলোচনা পর্যন্ত করতে চায় না। সামনে কিছু নেই তো, দেশের কথা স্বাধীনতার কথা, লড়ায়ের কথা তুললেই পিছনে তাকাতে হয়। হেরে গেছে, লজ্জা করে, খারাপ লাগে, কষ্ট হয়। তার চেয়ে যাক বাবা, যা হবার হয়ে গেছে, চুলোয় যাক, এভাবে উদাসীন হওয়াই ভাল। কিন্তু আজ তুমি পথ দেখাও, লড়াই বাধাও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভড়কে যাবার কিছু নেই। তা বিশেষ করে বিয়ে বাড়িতে তুমি স্বদেশী আলাপ হাতড়ে বেড়াচ্ছ কেন বলত ?

আমার বোনের বিয়ে কবে হয়েছিল মনে আছে, সরলার ? রেগুলেসন জারি করেই প্রথম যে উমেশকে ধরে নিল, তার মাসখানেক পরে। বিয়ের সভায় শহরে ওই একটা অ্যারেস্ট নিয়ে লোকে যে কত বলাবলি করছিল। আর কদিন আগে এত হৈ চৈ হল, কেউ একবার উল্লেখ পর্যন্ত করছে না ?

শুনছ নারাণ ? কালীনাথ বলে, ওই এক কথাতেই আসছি আমরা—আসতে হচ্ছে। আজ এই হল রিয়ালিটি ! উমেশের অ্যারেস্টটা কি শুধু শহরের একজনকে অ্যারেস্ট করাই ছিল অমিত ? পিছনে দেশ জোড়া রেগুলেসন আইনটা ছিল না ? আইনটার বিরুদ্ধে তখন লোকের কি রাগ, কি জ্বালা সেটা ভুলছ কেন ? তখন সময়টাও কি রকম ছিল ভেবে দেখ। চারিদিকে গোলমাল বাড়ছে, লোকের মিলিট্যাণ্ট ভাব বাড়ছে। সামনে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে ফাইট করতে সবাই পাগল। নয় তো নন-কো-অপারেশন মুভমেণ্ট চলতো, না চালাতে ভরসা হত নেতাদের ? আজ অবস্থা অন্য রকম। কিন্তু তাতেও আপদ যেত না, যদি নারাণের সেদিনের কাণ্ডটা লোকের কাছে সামান্য বিছিন্ন ব্যাপার না হত।

মানে ? নারায়ণ বলে মুখ থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে খোসগল্প করার মত তাদের কথা চলছিল।

মনে হল, এ ঘটনার পেছনে লোকে বড় কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পুলিস হৈ চৈ না করলে লোকে যেটুকু নজর দিয়েছে তাও দিত না ব্যাপারটাতে। এই কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি নারাণ। আজ এসব ছাড়া ছাড়া ছোটখাট কাজের বিশেষ কোনো এফেক্ট নেই। তুমি বলছ নলিনীকে মারতে পারলে এফেক্ট হত, সাড়া জাগত। কি এফেক্ট হত ? কতটুকু হত ? দু'চারদিনের জন্য খানিকটা বেশি উত্তেজনা। লোকে আবার ভুলে যেত। লোকে আজ অনেক বড় কিছু চায়, ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস, এখানে ওখানে ঘা মেরে গায়ের ঝাল ঝেড়েই তারা সন্তুষ্ট নয় ! নলিনী কেন, আজ লাটসায়েবকে মারো, লোকে চমকে উঠবে,

বলবে একটা কাণ্ড হল বটে, বাস, তারপর চুপ হয়ে যাবে। এ তো শুধু একটা ঘটনা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটা চাকরকে মারলে, গবর্ণমেণ্টটা তো মরল না! লোকের মনে যদি বিশ্বাস আনতে পার যে এটা নিছক ঘটনা নয়, এটা বিপ্লবের আহ্বান, প্রস্তুতি, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আয়োজন চলছে, এরকম ছোট ঘটনার চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাছে বদলে যাবে। নারাণের ছেলে-খেলাটুকুর মধ্যেও তখন লোকে দেখতে পাবে, তাদের শহরেও বিপ্লবের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বিয়ের আসরে অমিতও শুনতে পাবে লোকে ওই কথ কানাকানি করছে।

লোকে জানবে কি করে বিপ্লবের চেষ্টা হচ্ছে? নারায়ণ বলে, হাত গুটিয়ে বসে থাকলে? কালীনাথ বলে, দুটো উপায় আছে। চারিদিকে একটার পর একটা ছোট ছোট অপারেশন ক্রমাগত চালানো কিম্বা কোথাও বিরাট স্কেলে একটা অপারেশন প্ল্যান করা শুধু এইভাবে তুমি দেশের লোককে জানাতে পার তোমার রিভোলিউশনারী প্ল্যান আছে, আর্গানিজেসন আছে, তুমি লড়াই চাও। তার স্কোপ পাচ্ছ কোথায়? নারায়ণ বলে, ছোট স্কেলে অনেকগুলি হোক আর বড় স্কেলে একটাই হোক, তার জন্য লোক চাই। দু' একটা নমুনা দেখিয়ে নাড়া দিয়ে সাড়া না জাগিয়ে তুমি লোক টানবে কি করে?

এটা আপনার ভুল হল, অমিতাভ প্রতিবাদ জানায়, নমুনা যথেষ্ট দেখানো হয়েছে, আমরা যখন আঁতুড়ে তখন থেকে দেখানো হচ্ছে। ক্ষুদিরাম থেকে শুরু আজ পর্যন্ত কম লোক কম নমুনা দেখাননি।

আজ ওরকম নমুনার দরকারও নেই, কালীনাথ জোর দিয়ে বলে, লাভও নেই ওতে। শক্তিক্ষয়, কাজের অসুবিধা। বিপ্লব, বিপ্লব গড়ে তোলার নমুনা দেখাতে পার দেখাও, নয় চুপচাপ থাকাই ভাল।

তোমার ফ্যান্সী মত অপারেশন গড়তে যদি দু'চার বছর লাগে?

লাগবে।

জুড়িয়ে বরফ হয়ে যাবে না দেশটা? যে কজনকেও পেয়েছ কাজের জন্য তারা ধৈর্য হারাবে না? ঝিমিয়ে পড়বে না? ছিটকে বেরিয়ে যাবে না অন্য দলে যারা অন্তত হাতেনাতে ছোটখাটও কিছু করছে আমার ছেলেখেলার মত?

এ যুক্তি উড়িয়ে দেবার মত নয়, এ সমস্যা কালীনাথকেও বিব্রত ও চিন্তিত করে রেখেছে। বিপ্লবের জন্য প্রাণ দিতে যে তরুণ এগিয়ে আসে কিছু করার জন্য এমন যে ছটফট করে, কাজ চাই, কাজ, বিপজ্জনক রোমাঞ্চকর গুরুতর কাজ!—প্রাণ দিতে একটু বিলম্ব যেন সয় না। কিছু করার জন্য, তাড়াতাড়ি করার জন্য, দলের এই চাপ বিপন্ন অস্থির করে তোলে নেতাকে। কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়, আরও বেড়ে যায় সবার উৎসাহ ও আগ্রহ কিন্তু একেবারে কাজের খোরাক না পেলে তারপর ঝিমিয়ে আসে, বাড়ে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, বিরক্তি, অবসাদ। কেউ কেউ সত্যই দল ছেড়ে দিয়েও চলে যায়, একেবারে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে নয়, অন্য সক্রিয় দলে, যারা শুধু প্রস্তুতি নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। কিছু করার এই অদম্য আবেগকে খানিকটা শান্ত রাখা যায় দলের কাজ দিয়ে, যাঁতে দায়িত্ব বিপদ আর গোপনীয়তার রোমাঞ্চ আছে। কাজ উদ্ভাবনও করতে হয় কিছু কিছু। তবু আয়ত্তে রাখা কঠিন হয় উৎসাহ।

সেইজন্যই তো আমাদের ঐক্য দরকার, মিলেমিশে প্ল্যান করা দরকার যতটা সম্ভব, ট্রেনিং যাতে আদর্শ আর কাজের সামঞ্জস্য রেখে হয় তাও দেখা দরকার।

এর বেশি আর কিছু বলতে পারে না কালীনাথ। সে জানে না কেন এই আপাত বিরোধিতা বিপ্লবী কর্মীর আদর্শবোধ ও উদ্দীপনাময় মনের কোন গহণে জটিলতার মূল। দেশের মুক্তি যার যত বেশি কাম্য, স্বাধীনতার আদর্শ যার কাছে যত বড় সত্য, যে যত বেশি নির্ভীক, বেশি তেজস্বী কর্মঠ জীবন্ত, সেই যেন তত বেশি উন্মাদ বিপ্লবে ঝাঁপ দিতে, প্রাণ দিতে দেরী যেন তারই তত বেশি অসহ্য! অথচ এদেরি চাই বিপ্লবী দল গড়তে, ধীর-শান্ত নিরুদ্বেগ অহিংস ভালোমানুষ যৌবনে বিপ্লব নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ বোমা গড়ে সঞ্চয় করে রাখা যায় যেদিন খুশি খাটানোর জন্য, তারুণ্যের প্রচণ্ড প্রাণশক্তির জীবন্ত বোমা গড়লে বড় হয়ে ওঠে তারই বিস্ফোরণের তাগিদ। [ক্রমশ]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু ও মুস্‌লিম

২

এ-প্রবন্ধের প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হয় শ্রাবণের "পরিচয়ে"। তার মাত্র কয়েক দিন পরেই মুস্‌লিম লীগের তথাকথিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"কে অছিলা করে ১৬ই আগস্ট তারিখে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে উন্মত্ত সংঘর্ষ ও কাপুরুষোচিত নৃশংসতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, তার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া শক্ত। তার পর থেকে প্রদেশে প্রদেশে পরস্পরবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, কি বিজাতীয় আক্রোশ দুই সম্প্রদায়কে যেন সহসা অন্ধ অমানুষিকতার আবর্তে ফেল্‌তে পারে, তার বিভীষণ মূর্তি আমরা দেখেছি।

কাকতালীয় ন্যায়ের সূত্র প্রয়োগ করলে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশকেই দুর্দৈবের জন্য দায়ী মনে করা যেতে পারে! অবশ্য কাকতালীয়ের কথা দূরে রেখেই অনেকে হয়তো ভাব্‌বেন যে আজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভবুদ্ধি প্রণোদনের চেষ্টা থেকে বিরত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শুভবুদ্ধি বিনা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামরূপ শুভকর্মই কি অনারব্ধ থেকে যাবে না, বহুদিন ধরে যে আশা আমাদের সঞ্জীবিত করে রেখেছে তা কি নৈরাশ্যে পরিণত হবে না?

সুখের বিষয় এই যে নিছক কূটনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের মধ্যে যথার্থ একটা মিটমাট এখনও না হলেও, দাঙ্গা এবং দাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে কলকাতা বা বোম্বাইয়ে, নোয়াখালী বা বিহারে বা গড়মুক্তেশ্বরে কিছুকাল যে বিকট সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার অকথ্য কাহিনী নিয়ে উভয়পক্ষে উল্লাসের মনোভাব দেখা গেছ্‌ল, আজ আর তা নেই। সুপ্ত মানবতা যে ক্রমে জাগ্রত হচ্ছে, নানা বাস্তব কারণেই যে তাকে আবার জাগ্রত হয়ে সমাজ জীবনে সৌষ্ঠব ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লাগতে হচ্ছে, তার প্রমাণ আমরা এইভাবে পাচ্ছি। মুসলমানের কাছে হিন্দু এবং হিন্দুর কাছে মুসলমান যদি চক্ষুশূল হয়েই থাকে তো সেটা নিতান্ত সাময়িক একটা চিত্তবিকারের চেয়ে বড়ো কিছু হওয়াটা হল অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইতিহাসগত কারণে এবং সামাজিক রীতিনীতি ও নিত্যকর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খানিকটা

ব্যবধান যে আছে তা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু ব্যবধানের অস্তিত্ব আছে বলে পরস্পরের মধ্যে অন্ধ বিদ্বেষ ও জ্বলন্ত জিঘাংসাকে অনিবার্য মনে করাও অসম্ভব।

যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দুর্ভাগা দেশকে যেতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, যে বিপর্যয়কে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নিদারুণ সাফল্য রূপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র দুনিয়ার দরবারে আজ মহোল্লাসে আত্মসমর্থন করে ভারত-বাসীদের নিন্দাবাদ করতে পারছে, সেটাকে কেবল একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল মনে করা ভুল। 'কলকাতার বিরাট হত্যাকাণ্ড' বলে ঐ হাঙ্গামার নামকরণ করেছিল এদেশের সেরা ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের বিশেষণ হিসাবে শুধু 'সাম্প্রদায়িক' কথাটি জুড়ে দিলেই যথেষ্ট হবে না। হিন্দু ও মুসলমানে অবশ্য লড়াই হয়েছিল; হিন্দুকে দেখলে বা তার কথা হলে মুসলমান হয়ে যেত দিগ্বিদিকশূন্য, আর মুসলমানকে দেখলে বা তার কথা হলে হিন্দু হত দিশাহারা—ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এই ছিল দাঙ্গার সময়কার নিয়ম। কংগ্রেসের সমর্থক বা বন্ধু হয়েও বহু মুসলমান কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হিন্দু জনতার হাত থেকে পার পায়নি, মুসলমানও প্রচণ্ড আক্রোশের সময় ভেবেছে যে প্রতিটা হিন্দু হল তার দুষমণ। বিকটত্ব এমন অভূতপূর্ব হওয়ার কারণ প্রধানত ছিল এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে তাকে রাজনৈতিক অন্তর্যুদ্ধ বলা উচিত আর ইতিহাস তো সর্বদাই সাক্ষ্য দেয় যে রাজনীতি নিয়ে ঘরোয়া লড়াই দুটো আলাদা দেশের মধ্যে লড়াইয়ের চেয়ে বেশি নির্মম প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ভুল হোক্ বা ঠিক হোক্, অধিকাংশ মুসলমানের মনে একটা ধারণা ঢুকেছে যে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে মুসলমানের স্বার্থ, মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য, মুসলমানের সত্তাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে যেতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আবার তেমনই অধিকাংশ হিন্দু লীগের তুলনায় কংগ্রেসের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, কংগ্রেস যখন আজ স্বাধীনতার ডাক দেয় তখন সাড়া দিতে অধিকাংশ মুসলমানের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে, আর স্থির করে যে লীগের নির্দেশ যারা মানে তারা দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কেই নিস্পৃহ, তারা স্বাধীনতারই শত্রু। মুসলমান ধরে নেয় যে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক হিন্দু হল কংগ্রেসের সমর্থক। আর হিন্দু ধরে নেয় যে প্রত্যেক মুসলমান হল লীগের অনুচর। তখন সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও রাজনৈতিক বিভেদ মিলে প্রচণ্ড এক অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

কেন এমন হয়, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সাধারণত এক পক্ষ অপর পক্ষের নিন্দাবাদ করে, অপর পক্ষই যে কেবল দোষী তা বলতে থাকে। যাদের রাজনীতিবোধ হল প্রখরতর, তারা বলে যে সাম্রাজ্যবাদই চক্রান্ত চালিয়ে, একবার একদিক আর একবার অন্যদিকে পক্ষপাত দেখিয়ে, উভয় পক্ষকে স্বতন্ত্রভাবে আশার ছলনায় মুগ্ধ করে, এ-অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে—সাম্রাজ্যবাদ যদি ফাঁদ পাতে তো সে-ফাঁদে আমরাই বা পা দিয়ে বসি কেন? সাম্রাজ্যবাদ যদি কল টিপ্‌তে থাকে তো আমরা লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পুতুলনাচ নাচি কেন? সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের কথা তো আমরা আবহমান কাল থেকে শুনে আসছি কিন্তু সে-চক্রান্তকে আমরাই একজোট হয়ে বিকল করে দিই না কেন?

জবাব হল এই যে আমরাই আমাদের মনে বিষ পুষে রেখেছি, নিজেদের পাপে নিজেরাই আমরা বারবার বিড়ম্বিত হচ্ছি, কিন্তু মন থেকে সে-পাপকে নির্মমভাবে উৎখাত

করতে পারছি না। ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস, আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হলেও আমরা হলাম বহু জাতি, কিন্তু কোন কোন জাতিতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য, কোন কোন জাতিতে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য, এবং বাঙালীদের মত জাতিতে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাসাম্য থাকলেও কোথাও মাত্র মুসলমান বা হিন্দু হিসাবে কোন জাতিই গঠিত হয়নি, বাংলার মুসলমান যেমন বাঙালী তেমনই সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু হল সিন্ধী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হলে পাঠান বলেই নিজের পরিচয় দেবে। এ-সত্ত্বেও আমরা ধর্ম-বৈষম্যের ভিত্তিতে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবছি, তাই অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানের আওয়াজ তুলেছে বা সে-আওয়াজে ভুলেছে, আর অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু অপেক্ষাকৃত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অখণ্ড হিন্দুস্থান ও সাভারকারী "হিন্দুত্বে"ই বিশ্বাস করছে। এ-সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট সংকেতে পরস্পরদ্বন্দ্বের কলুষপঙ্কে এত সহজে আমরা ডুব দিই কেমন করে? "If the light that is in thee is darkness, how great is that darkness !"

মুসলমানকে আজ বুঝতেই হবে যে ভারতবর্ষের সব মুসলমান মিলে এক জাতি, এ-কথা পাখিপড়ার মত আউড়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই, তাতে মুসলমানেরই স্বাধীনতা কোনদিন আসবে না। মুসলমানকে বুঝতেই হবে যে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রে তার স্থান, তার অধিকার সম্বন্ধে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সন্দেহ এবং অভিযোগ অযৌক্তিক না হলেও সে জোর করে এদেশের ছ'টা প্রদেশ দখল করতে পারবে না, করা উচিতও হবে না। যে কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কেরই ভোট দেওয়ার এক্তিয়ার থাকলে মুসলমান হিসাবেও তার দুশ্চিন্তার তেমন কারণ নেই; পুঁজিদারী সমাজে বড়লোকের শাসন কায়েম রাখার জন্য হরেক কায়দা যখন চলে আর বাংলাদেশে যদি অধিকাংশ ধনী হয় হিন্দু, তাহলে তো মুসলমানদের কর্তব্যই হয় পুঁজিদারী ব্যবস্থা দূর করে দিয়ে যথার্থ গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা—সুতরাং দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হওয়ার কারণ কোথায়? মুসলমানকে বুঝতেই হবে যে কংগ্রেসকে (এবং মোটের উপর সকল হিন্দুকে) শত্রু মনে করলে পরদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তো হটানো যাবে না, বরং তারা আরও জেঁকে বসবে; কংগ্রেসকে মতলবী হিন্দু প্রতিষ্ঠান মনে করলে আর কংগ্রেসের নেতাদের হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী বলে দুর্নাম করলে মুসলমান তো ইংরেজকে খেদিয়ে নিজেদের আজাদীই অর্জন করতে পারবে না। মুসলমান তো দেখে যে লড়াই যখন হয়—সে লড়াই রুজী-রোজগারের জন্য হোক্ বা সোজাসুজি আজাদীর জন্য হোক্—তখন হিন্দু আর মুসলিমে তফাৎ থাকে না, থাকলে লড়াই ভেস্তে যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের জন্য দেশকে যখন তৈরী হতেই হবে, তখন মুসলমান তো শুধু পাকিস্তানের নামে একটা ধোঁয়াটে নেশায় মশ্‌গুল হয়ে থাকতে পারে না।

আবার হিন্দুকে তেমনই বুঝতে হবে, স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমানকে স্বাধীনতার আসল লড়াইয়ের সময় পেছুপাও মনে করাটা হল একটা মস্ত ভুল, স্বীকার করতেই হবে যে স্বাধীনতার ঐতিহ্যে মুসলমানের অবদান হল মহামূল্য। স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু প্রাধান্যের কথা ভাবলে মুসলমানের মনে বিভীষিকা সঞ্চার হল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বীকার করতেই হবে যে সর্বব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুদের মতিগতি সম্বন্ধে মুসলমানের

মনে সন্দেহ ও অভিযোগ না থাকাই আশ্চর্য। হিন্দুকে মানতেই হবে যে কেতাবী বুলি আউড়ে যখন মুসলমানপ্রধান সিন্ধুদেশকে আলাদা প্রদেশ হিসাবে খাড়া করতেই হিন্দু আপত্তি করেছে কিম্বা কেন্দ্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বদলে এক-তৃতীয়াংশ দিতে গররাজী হয়েছে কিম্বা মামুলী গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এসেছে, তখন একটার পর একটা ভুল করে হিন্দুই মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধকে কটুভাবে প্রকট করেছে, হিন্দুর কাছে সুবিচারের আশা যে মুসলমান করতেই পারে না এ ধারণা সৃষ্টি করেছে। হিন্দুকে বুঝতেই হবে যে স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমানকে বাদ দিয়েও সাফল্য লাভের আশা হল দুরাশা। বুঝতে হবে যে স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদই আমাদের ভেদাভেদের সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। হিন্দুকে বুঝতেই হবে যে মুসলমানকে 'তলোয়ারের বিপক্ষে তলোয়ার' বলে হুমকি দেওয়া আর কৌশলী সাম্রাজ্যবাদীদেরই গুণপনার বাহবা দেওয়া দেশভক্তের কাজ নয়, বুঝতেই হবে যে পাকিস্তানকে কেবল হেসে উড়িয়ে দেওয়া এবং প্রতিবেশী, ভ্রাতৃস্থানীয় মুসলমানকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেরই সাথী বলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা না করা হল দেশদ্রোহিতা।

কেমন করে ভারতের বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে পূর্ণ-আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করলে, এমন কি ঐসব অঞ্চলের সর্বভারতীয় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করলে, এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ন্যায্য দাবী সুপ্রতিষ্ঠ করা যায়, সে-কথা প্রথম প্রবন্ধে বলা হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি বিনা মুসলমানকে ভাই বলে কোল দেওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে পারে, তা আজ না মেনে উপায় নেই। ধর্ম, সংস্কৃতি, শীলতার দিক থেকে মুসলমানকে ভাই বলে যদি হিন্দু অগ্রসর হয়ে যায় তার সঙ্গে মিলবার জন্য আর মুসলমানও যদি হিন্দুর প্রতি অনুরূপ মনোভাব নিয়ে আসে, তো নিশ্চয়ই তা হবে পরম কাম্য, আমাদের মানবতা তখন সাম্প্রতিক অবমাননার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে ভেদবোধ এতো প্রকট হয়ে উঠেছে, বহুদিনের পরস্পরসংশয় এমন অপঘাতের পথে উভয়কে ঠেলে নিয়ে চলেছে, যে আজ আর শুধু "হিন্দু-মুস্‌লিম এক হও" আওয়াজে তেমন প্রাণের সাড়া মেলে না, স্বার্থনিরপেক্ষ সহানুভূতি ও পরস্পর মৈত্রীর ভিত্তিতে হিন্দু আর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নোয়াখালীতে গান্ধীজী যে প্রচেষ্টায় নেমেছেন, তা যে সম্পূর্ণ সফল হবে আশা করার ভরসা হয় না। ভারতবর্ষের বহু জাতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের যে সম্ভাবনা বর্তমান এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে মনোমালিন্য আজ সর্বনাশারূপে দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃত প্রতিকার করতে পারে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অকুণ্ঠ নির্ভীক স্বীকৃতি।

কিন্তু তখনও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিলেই কি সব মুশ্‌কিলের আসান হবে? যে মুসলমান আজ পাকিস্তানকে মনে করে অকাট্য, মনে করে পাকিস্তান হল তার সর্বনিম্ন দাবী, সে কি আত্মনিয়ন্ত্রণের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হবে? ভাষা, সংস্কৃতি, বসতি, বৃত্তি ও মানসগত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় জেনে ভারতবর্ষের বর্তমান ভুক্তিব্যবস্থাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে নিলেই কি মুসলমানের সকল সন্দেহের নিরাকরণ ঘটবে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা পুঁথিগত নীতি নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ হল

একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। কাগজে কলমে, আইনের অজস্র মারপ্যাঁচ সমেত, এদেশের প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হল বলেই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হয় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থই হল এই যে জনতা তার ভাগ্য, তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে, পূর্ণ গণতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর নতুন সমাজের ইমারৎ বানানো হবে, আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবল কয়েকটি সভাসমিতি আর সম্মেলনে বচনবাগীশদের বাক্‌চাতুরীর ফলে অর্জিত হবে না, অর্জিত হবে জাগ্রত, সংহত জনতার সচেতন সংগ্রামের ফলে। অর্থাৎ আজ্‌কের দিনে ভারতবর্ষের দিকে দিকে সাধারণ মানুষের যে সংগ্রাম চলছে, যে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুমুসলমান ভেদাভেদ হল অপ্রাসঙ্গিক, সে-সংগ্রামের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির যোগ হল অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক। কতকগুলো আইনসভায় কিম্বা রাষ্ট্রগঠনপরিষদে চমকপ্রদ বক্তৃতার মারফৎ আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না, হবে গণসংগ্রামের মধ্যস্থতায়, যে-সংগ্রাম আমাদের সকল আভ্যন্তরীন বিভেদের অক্লান্ত পরিপোষক ও প্ররোচক সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতার পথ সুগম করবে। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি যারা বাস্তবিকই গ্রহণ করেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য করবে, মাত্র মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে সে-নীতিরই অসম্মান করবে না।

ঠিক এই কারণে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কোন কোন নামজাদা নেতা বলে থাকেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি তাঁরা সমর্থন করেন, অথচ দেখা যায় যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির আনুষঙ্গিক যে অধিকার হল মৌলিক, অর্থাৎ যুক্ত রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজন বোধে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অধিকারকে তাঁরা বরদাস্ত করেন না। আর যে গণসংগ্রামের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতিকে অঙ্গাঙ্গি বন্ধনে বেঁধে না দিলে জনসাধারণের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা কেতাবী বুলি হিসাবেই থেকে যায়, সে-গণসংগ্রামকে তাঁরা তো আজ বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতিরই আছে, অকাট্যভাবে আছে,—এমন কি, কোন জাতি যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থির করে যে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক ঐক্যের চেয়ে তার নিজের স্বতন্ত্র স্বকীয়, স্বাধীন জাতিসত্তার গুরুত্ব ও উপযোগিতা বেশি বলে তার স্বাতন্ত্র্য সে বজায় রাখ্‌বেই, তখন তার বিরুদ্ধেও নীতির দিক থেকে কোন আপত্তি চলে না। এ-কথা আজ স্বীকার না করলে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান মিলবে না; কেবল মানবতার নামে হিন্দু ও মুস্‌লিমকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা শ্রদ্ধেয় হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা হবে অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতিকে অবাস্তব মানসরাজ্য থেকে নামিয়ে এনে জনতার দৈনন্দিন সংগ্রাম এবং তৎসম্ভূত সংহতি ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এ-কাজ যাঁরা পারেন না, তাঁরা বহুমানভাজন নেতা হয়েও আজ দিশাহারা দেশকে পথের সন্ধান দিতে পাবেন না।

সারা ভারতবর্ষে আজ নিদ্রিত জনগণ বিপ্লবের আবাহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, অধীর আগ্রহে তারা সংগ্রামের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আজ এ-আলোড়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে যার ঐতিহাসিক সূচনা, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের সময় যার বিরাট

গম্ভীর মূর্তি আমরা দেখেছিলাম, সারা ভারতের রেল, তার, ডাক শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যে যার ভাস্বর প্রকাশ হয়েছিল, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুরের চিরলাঞ্ছিত জনগণের দুর্জয় পরাক্রমে যার আসন্ন বিজয়ের সংকেতু দেখা দিয়েছে, দেশের সর্বত্র কৃষক ও শ্রমিকের বিপুল সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ এবং অমলনের, ত্রিচিনপল্লী, ওয়র্লি, কানপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি শত স্মরণীয় তীর্থে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী সরকারের হুকুমে চালানো গুলিকে অগ্রাহ্য করে জনগণের অনমনীয় সংহতিতে যার শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই আলোড়নকে আজ অস্বীকার করবে কে? লীগের নেতারা যতই এ-ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য ও বৈরিভাব দেখান্ না কেন, কংগ্রেসের নেতারা যতই সর্দার প্যাটেলের মত হুম্‌কি দিন না কেন, কিম্বা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর মত বিপ্লবগন্ধী কথার কুহকী জাল বুনে চলুন না কেন, এ-আলোড়নকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেশবাসী দেবে না। দেশবাসীর চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে নোয়াখালীর সন্দীপে হিংসায় উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে বিপ্লবী লালমোহনের আত্মত্যাগ, তারা সাম্প্রতিক অন্তর্যুদ্ধের কথা মনে করে বলবে সাম্প্রতিক কবিতার ভাষায়—

প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে,
নিকটে সুদূরে, কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে, বক্তাক্ত গোল্ডেন বকে,
অনেক হাসানাবাদে প্রাণের আবাদে......

ভারতের সর্বাগ্রগণ্য নেতারা আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারীদেরই ছলনায় মুগ্ধ হয়ে যেন আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। রাষ্ট্রগঠন পরিষদে বক্তৃতা প্রকরণে স্বাধীনতা আসবে বলে জনসাধারণকে আশ্বাস দিচ্ছেন। পরিতাপের কথা, কারণ যাঁরা সেদিন বলেছিলেন, যে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হয়ে গেছে, তাঁরাও তো বুঝছেন, "হনোজ্ দিল্লী দুরস্ত"! আজ জনসাধারণের আশা, স্বাধীনতার আশা, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য নির্মূল করার আশা হল জনসাধারণেরই সংগ্রাম—আত্মনিয়ন্ত্রণের অকুণ্ঠ ভিত্তিতে নতুন স্বাধীন ভারত গড়ার জন্য আকুমারী হিমাচল যে জন-আন্দোলন চলেছে, তাকে পুষ্ট করে, সুদৃঢ় করে, সুসংহত করে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। এ-সংগ্রামে দ্বিধাহীন সাহচর্য যাঁর কাম্য নয়, হিন্দু ও মুসলিমের পরস্পর সম্পর্কগত সমস্যা সমাধানে তাঁর কাছে কোন সহায়তাই মিলবে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোচনা

"অভিযাত্রী"—ছায়াচিত্র—কাহিনী-রচয়িতা ও প্রযোজক শ্রীজ্যোতির্ময় রায়।

এই ছবিখানি অল্পদিন হল কলকাতায় দেখান শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে কিন্তু এটি শহরের মধ্যে একটি বড় রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এর সম্বন্ধে নানা রকমের আলোচনা ও মন্তব্য লোকমুখে শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, ছবিখানির মধ্যে কোনো গল্প নেই, কেউ বলছেন আঙ্গিকের দিক দিয়ে এটি ভাল উতরোতে পারেনি, আবার কারুর মতে চরিত্রগুলির মধ্যে নাটকীয় সংঘাত ও পরিণতি নেই। আমি এসব ব্যাপারে একেবারে

আনাড়ি,—আর্টের যেটা বাহ্য দিক, যাকে আঙ্গিক বলা হয়, তার সম্বন্ধে আমার জোর করে কথা বলবার অধিকার নেই। কিন্তু তবুও আমি মনে করি আঙ্গিক জিনিসটা আর্টের অনেকখানি হলেও সবটা নয়। আঙ্গিকের কিছু দোষ ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলেও বিষয়-বস্তুর গৌরবে যে-কোনো আর্ট বড় আর্ট হয়ে উঠতে পারে। সমঝদারদের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে আংশিক সত্য থাকতে পারে একথা মেনে নিলেও, আমার মতে 'অভিযাত্রী' যে একখানি উঁচুদরের ছবি হয়েছে তাই নয়—অপূর্ব ছবি হয়েছে।

'অভিযাত্রী' শ্রীজ্যোতির্ময় রায়ের চিত্রজগতে দ্বিতীয় অবদান। তাঁর প্রথম অবদান 'উদয়ের পথে' তাঁকে একদিনে স্বনামধন্য করেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, তিনিই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম সেই ছবিতে উদ্ভট কল্পনাকে বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজের বাস্তবতাকে অনেকটা প্রতিফলিত করেছেন—গতানুগতিকের বাঁধা রাস্তা ছেড়ে অভিনব পথে যাত্রা করেছেন। ধনতন্ত্রের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত ও নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত নরনারী যা অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে অথচ প্রকাশ করবার ভাষা পায়নি তারই প্রতিধ্বনি তারা শুনেছে ছবির নায়কের মুখে। তাই ঘন ঘন করতালি দিয়ে তারা সমর্থন জানিয়েছে—ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাব্দিক অভিযানকে। কিন্তু কি উপায়ে একে ধ্বংস করা যায় তা তারা এখনও জানে না। কাহিনী রচয়িতা সে-পথের নির্দেশও তাদের দিয়েছেন। ইঙ্গিত করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি। তিনি যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বলতে চেয়েছেন "ঐ দেখ শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে ধনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তোমরাও অসহায় ভাব ও নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করে সংঘবদ্ধ হও, মজুরদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, তাদের কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ো, অত্যাচারের অবসান হবে।" কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের বা শ্রমিক মনোবৃত্তির যে-চিত্র তিনি দেখিয়েছেন তা মধ্যবিত্তের মনে কোনো উৎসাহ বা উদ্দীপনা আনা দূরের কথা তাদের মনে শ্রমিকদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা বা অনুকম্পার সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্তের ছেলে ও বড়লোকের মেয়ে যাচ্ছে মজুরদের কাছে—তাদের সাথী হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবার জন্য নয়, তাদের ওপরে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব করবার জন্য এবং সে-নেতৃত্ব যোগাচ্ছে শ্রেণী চেতনাসম্পন্ন শ্রমিকমন নিয়ে নয়, মধ্যবিত্তসুলভ মনোবৃত্তি নিয়েই। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে মধ্যবিত্তের যেন একমাত্র কর্তব্য তাকে সাহায্য করা, সংঘবদ্ধ করে তোলা, নেতৃত্ব দেওয়া—এক কথায় মজুরদের উপকার করা। মজুর শ্রেণীর চেতনা সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা ও তাদের আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব—এই দুই কারণে 'উদয়ের পথে' একখানি বহুলাংশে বাস্তবচিত্র হয়েও সম্পূর্ণ বাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি।

পূর্ববর্তী ছবিগুলি থেকে 'উদয়ের পথে' যত অগ্রসর, 'উদয়ের পথে' থেকে 'অভিযাত্রী'কেও ততখানি অগ্রসর বলা চলে। প্রথমচিত্র পরিবেশন করে জ্যোতির্ময় বাবু চুপ করে বসে ছিলেন না—তিনি নিজেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। তাই 'উদয়ের পথে'তে যার সূচনা 'অভিযাত্রী'তে তার পরিণতি দেখতে পাই। এখানে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলেও সময় নষ্ট করা হয়নি। ধনতন্ত্র যে খারাপ সেটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। আসল সমস্যা হচ্ছে কথা নয়—কাজ, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। আর তারা অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে

মার খায় না। তারাও জেগেছে—সকলে মিলে অত্যাচারের প্রতিবাদ তারা করতে শিখেছে—ধর্মঘট করতে শিখেছে,—যেমন বাস্তব জীবনে তেমনি ছবিতে। তারা শুধু ধর্মঘট করে না—ধর্মঘট করে ধর্মঘটী মজুর ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ায়—তাদের সাথে মিলে লড়াই করে—যুক্ত ষ্ট্রাইক কমিটি গড়ে। মজুরকে আর তারা ছোট লোক বলে অবজ্ঞা করে না—তারা বুঝেছে তারাও মজুর—তারাও মেহনত বিক্রি করে।

'অভিযাত্রী' একটি বাস্তব ছবি। 'উদয়ের পথে'র চেয়ে বেশি বাস্তব। কিন্তু এ বাস্তবতা এক নিশ্চল অবস্থার আলোক চিত্র নয়—এক পরিবর্তনশীল সংঘাত ও পরিণতির প্রতিফলন যা হচ্ছে আর্টের আসল কাজ। সংঘাত ও পরিণতি যে ছবিখানিতে নেই তা নয় —কিন্তু যা আছে তা দুই ব্যক্তির মধ্যে নয়, দুই মত ও আদর্শের মধ্যে এবং সে দুই আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের প্রগতির বা ঊর্ধ্বগতির দুই বিভিন্ন স্তর সূচিত করে। সংক্ষেপে বলতে হলে একটাকে বলা চলে সংস্কারবাদী আন্দোলন, অপরকে বৈপ্লবিক আন্দোলন। শ্রমিকশ্রেণী যত পশ্চাৎপদ থাকে, সংস্কারবাদ তত ওদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে ও সমর্থন পায়। আর এই সংস্কারবাদের ধারক ও বাহক হচ্ছে বিশেষ করে ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শ্রমিক-শ্রেণী যতদিন এই শ্রেণীর প্রভাবাধীন থাকবে ততদিন তারা সংস্কারবাদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর অন্য শ্রেণীর প্রভাব কাটিয়ে যতই তারা স্বশ্রেণীচেতন হয়ে উঠবে ততই তারা বৈপ্লবিক ভাবধারা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। জ্যোতির্ময়বাবু এই দুটি আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন দেবেশ ও জয়ার মধ্য দিয়ে।

জয়া স্বদেশপ্রেমিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সে শ্রমিক আন্দোলন করে। কিংবা একথা বল্লে আরও ঠিক হবে যে, শ্রমিক বর্জিত জাতীয় আন্দোলন দিয়ে শুরু করে সে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতীক এই জয়া। অন্যদিকে দেবেশ ধনিকের ছেলে হলেও আর্ত ও দুঃখী জনগণের সেবাকেই জীবনের মূলমন্ত্র করেছে। ওর জন্য সে এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। তার দাম্ভিক ভাই পরেশের দুর্ব্যবহারে ও অত্যাচারে হল তাদের আপিসে কেরানী বাবুদের ও কারখানায় মজুরদের ধর্মঘট। বেগতিক বুঝে বুড়োকর্তা বিজয়বাবু পরেশকে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত কারখানা পরিচালনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিলেন দেবেশকে—দুই শর্তে। প্রথম পরেশ ধর্মঘটীদের কাছে ক্ষমা চাইবে না; দ্বিতীয়, তিনদিনের মধ্যে ধর্মঘট তুলে নিয়ে ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যাবে কিন্তু কোনো সংঘ রাখতে পারবে না। দেবেশ এই দুই শর্ত নিজে মেনে নিয়ে—ধর্মঘটিদের রাজী করাতে গেল। সে বল্লে, 'আমি, তোমাদের সম্পাদক, যখন পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছি—তার মানে তোমরাই পাচ্ছ—তখন আর সংঘ রাখবার কি প্রয়োজন?" কেউ কেউ মনে করতে পারেন, "এ উক্তি দেবেশের মত লোকের পক্ষে অসঙ্গত। আমার মনে হয় যে বড়লোকের ছেলের পক্ষে সংকট মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য দেবেশের মত ভাবা খুবই স্বাভাবিক এবং আমার মতে জ্যোতির্ময়বাবু ভুল করে নয় ইচ্ছে করেই দেবেশের মুখ দিয়ে ঐরকম সংস্কারবাদী কথা বলিয়েছেন। তা না হলে তাকে খুব বড়লোকের ছেলে সাজাবার দরকার ছিল না। গরিবের ছেলে করলেই শুধু চলতো না, বেশি সঙ্গত ও শোভন হত।

আপিসের কেরানী বাবুরা দেবেশের শর্ত মেনে নিল। সদ্যজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের মধ্যে অবতারবাদ বা অছিগিরিতে বিশ্বাস বদ্ধমূল, তারা যে সংস্কারবাদকে সহজে মেনে নেবে

তা বিচিত্র নয়, কারণ তারা দান গ্রহণে অভ্যস্ত—অধিকার অর্জনে নয়। সংগ্রামের চেয়ে ফল প্রাপ্তিই ওদের কাছে বড়। এক সাধারণ মজুর আনন্দের কথায় জয়া দেবেশের প্রতিবাদ করল। সে বল্ল, "সংঘ রাখবার ও করবার অধিকার আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে দানের দ্বারা ধনিকের কাছে বাঁধা আছি শ্রমিকদেরও কেন সেই বাঁধনে আটকাবার চেষ্টা হচ্ছে। দান শুধু দারিদ্র্যকে বাঁচিয়ে রাখে, দরিদ্রকে নয়।" দেবেশ যখন জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর না?" জয়া তখনই বলল, "এই বিষাক্ত ধনতান্ত্রিক আবহাওয়ার চাপে আপনি যে বদলাবেন না তার প্রমাণ কি?" জয়ার বাণী হল বিপ্লবের বাণী—শ্রেণী চেতনা সম্পন্ন শ্রমিকের বাণী।

কিন্তু এই মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েই জয়া ক্ষান্ত হল। সে কার্যত কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় না। এখানে লেখক আর একটি সংঘাতের সৃষ্টি করেছেন। সে হল বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, নীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের, আদর্শের সঙ্গে প্রেমের। জয়া দেবেশকে ভালবাসে—সেই কারণে সে কার্যত দেবেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজি নয়। এখানে আবার শ্রেণী চেতনা সম্পন্ন মজুর, আপোসহীন সংগ্রামকামী মজুর, আনন্দ জয়াকে উদ্বোধিত করল। তাই আমার মতে ধনীর ছেলে দেবেশ এই গল্পের আসল নায়ক নয়, আসল নায়ক হল খাঁটি মজুরের সন্তান আনন্দ, যদিও তার ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও আপাতত গৌণ। সে রুখে দাঁড়াল বলেই জয়া তার অন্তরের দৌর্বল্যকে জয় করতে পারল ও ঘটনা প্রবাহের মোড় ফিরে গেল।

শ্রমিকদের বেশির ভাগই দেবেশের কথায় কাজে ফিরে যেতে চায় কিন্তু বদ্ধপরিকর অল্পাংশ রইল জয়ার সাথে। তারা পিকেটিং করল কারখানার সামনে। দেবেশ ছুটে গেল বাপের কাছে খবর দিতে। বাবা ইত্যবসরে ফোনে পুলিসকে খবর দিয়েছেন। সেই কথা শুনে দেবেশের চৈতন্য ফিরে এল। সে সমস্ত কর্তৃত্ব ত্যাগ করে ছুটে গেল কারখানার দিকে। বাপকে বলে গেল, "যারা বাধা দিচ্ছে তারা কি আমার লোক নয়?" পুলিস ততক্ষণে জয়ার বাবা মহেন্দ্রবাবুকে গুলি করেছে। জয়া কেঁদে বাপের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। বাপের শেষ উপদেশ হল, "তোমাদের শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী। দেখ যেন তোমাদের মধ্যে বিভেদ না থাকে, সমস্ত শক্তি তোমরা এক কর।" জনতা ফিরে পুলিসের দিকে এগোতে লাগল—যেন প্রতিরোধের জন্য। আর দেবেশ ও জয়া শোক সংবরণ করে প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়ে দূরের—যেন ভবিষ্যতের—দিকে তাকিয়ে রইল।

এই ছবিখানিকে আমি অপূর্ব বলেছি এইজন্য যে এর পূর্বে আর অন্য কোনো দেশী ছবিতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতখানি গুরুত্বপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়নি। কোনো রকম ছ্যাবলামি বা ন্যাকামি এর মধ্যে নেই। সস্তা যৌন প্রেমের কাহিনীও এতে নেই। বস্তুত চিরাচরিত মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছ ঘটনাপরম্পরা যা আমাদের তথাকথিত সামাজিক চিত্রের প্রধান উপজীব্য তার সম্পূর্ণ অভাব এই চিত্রের মধ্যে। তবুও আমার মতে 'অভিযাত্রী'র মত বস্তুনিষ্ঠ ছবি এ পর্যন্ত আমাদের পর্দায় দেখা যায়নি। কারণ জরাজীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থ বা সফল প্রেমের ইতিহাস আজ আমাদের জীবনে বাস্তব নয়, বাস্তব হচ্ছে অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ধর্মঘট করা, জেলে যাওয়া, গুলি খাওয়া। আর সবচেয়ে বড় বাস্তব ঘটনা হচ্ছে শ্রমিক

ও কৃষকের জাগরণ ও অভ্যুত্থান। এই ছবিখানি মহান, কেন না এটা সমসাময়িক সত্যকে প্রতিফলিত করেছে এবং গল্প, টাকা কিম্বা জনপ্রিয়তা কিছুরই খাতিরে প্রযোজক ব্যক্তিগত দুর্বলতার কাছে নীতিকে বলি দেননি বা সংস্কারবাদী আদর্শের কাছে বৈপ্লবিক আদর্শকে পরাজিত করেননি।

মহেন্দ্রবাবু, বিজয়বাবু, জয়া ও পরেশের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বিজয়বাবুর পুত্রের প্রতি উপদেশ, "যদি রাজনীতি করতেই হয়, বংশমর্যাদা ও সম্পদকে কাজে লাগাও, আইন সভায় গিয়ে দেশের নেতা হও। জনগণ কখনও নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব গড়তে পারে না, তার জন্য তাদের আসতে হয় আমাদের কাছে। দেশের কর্তৃত্ব এখনই কতকটা ও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতেই আসবে"—একজন ঝানু মালিকের উপযুক্তই হয়েছে। নিরস্ত্র ধর্মঘটীদের ওপর পুলিসের অকারণ গুলিবর্ষণের দৃশ্যের অবতারণা করে লেখক যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

জ্যোতির্ময়বাবুকে এখানে বন্ধুভাবে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি, বর্তমান ছবির খুঁত ধরবার জন্য নয়—পরবর্তী চিত্র যাতে আরও ভাল হয় তার জন্য। ছবি ঘটনার অনুপাতে একটু দীর্ঘ হয়েছে বলে মনে হয়। গোড়ার দৃশ্যগুলি অনেকটা আসল গল্পের ভূমিকার মত কাজ দিয়েছে। সেগুলোকে কেটে ছোট করে গল্পটিকে আরও জমাট করা যেতে পারত কিনা তিনি ভেবে দেখবেন। যক্ষ্মারোগীকে জেল থেকে বের করে না নিয়ে এলে, সুশান্তকে পর্দায় অতখানি জায়গা না দিলে, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্য কেন্দ্রে বসে ব্যক্তিগত ব্যাপারের আলোচনা (তা যতই সংক্ষিপ্ত ও সংযত হোক না কেন) না করলে, একজন সহকর্মীকে মোড়া দিতে হুকুম না করে নিজের হাতে মোড়া বার করে নিলে, জয়াকে আপিসে বসিয়ে রেখে সংঘ সম্পাদক ব্যারাকপুর চলে না গেলে—ছবির ভাল হত না মন্দ হত সে কথাও তাঁকে একবার ভেবে দেখতে বলি।

কিন্তু ছবিটির আধেয় এত মহান যে সেদিক থেকে বিচার করলে এ ত্রুটিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। এটি সত্যই একটি প্রগতিশীল চিত্র এবং বহুদিন এ-দেশের চিত্রশিল্প জগতে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। শুধু তাই নয়। বর্তমানে হাজার হাজার লোক এই ছবি দেখছে। তাদের সকলের মন বদলে দিচ্ছে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শকদের (নেহাৎ দু'চারজন উন্নাসিক ছাড়া) শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলছে এই ছবি। আজকের দিনে এর চেয়ে বড় সমাজসেবা কিছু হতে পারে না। আর এমন কৌশলে, এমন শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে এই ছবিটির প্রযোজনা করা হয়েছে যে, ভদ্রলোকেরা দুঘণ্টা বসে মজুরদের কাহিনী দেখছে ও দেখে বিরক্তিবোধ করছে না। এটা আর্ট সৃষ্টির দিক থেকে কম কথা নয়। এইসব কারণে আমি গল্প-লেখক ও প্রযোজককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা তাঁর তৃতীয় চিত্রের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে 'অভিযাত্রী'কেও ছাড়িয়ে যাবেন।

রাধারমণ মিত্র

সংস্কৃতি-সংবাদ

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

১৯১০ সালে দুইজন ইংরাজ রাসায়নিক —পি. এস. ম্যাকমোহান এবং জে. এল. সাইমনসেন, প্রথম অনুভব করেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পরস্পর সংযোগের অভাব। প্রধানত তাদের চেষ্টায় গড়ে উঠল ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস পরিষদ। ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্বোধন সভা বসে। প্রথম পৌরহিত্য করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তারপর বৎসরানুক্রমে বিভিন্ন জায়গায় অধিবেশন বসেছে; সবচেয়ে বেশী বার বসেছে কলিকাতায়—ছয় বার। বাঙ্গালী সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন আট বার। কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী, অর্থাৎ ২৫তম অধিবেশন বসেছিল কলিকাতায় ১৯৩৮ সালে। সে এক স্মরণীয় ঘটনা। সেবার ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস এবং বিলাতী বিজ্ঞান-সমিতির যৌথ অধিবেশন বসে। প্রধান সভাপতি ছিলেন স্যার জেমস জীন্‌স্। বহু খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক যোগদান করেছিলেন। এবৎসর দিল্লীতে বসেছিল বিজ্ঞান-কংগ্রেসের চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন। এবারকার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিলাত ছাড়া রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও চীনদেশ থেকে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এসে সহযোগিতা করেছিলেন। ফলত, এবারে বিজ্ঞান-কংগ্রেস আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল। আরও একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। এবার সাধারণ সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। অন্তবর্তী কালীন সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীবর্গও ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগদান করেছিলেন। কোন লাট সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়নি। পুলিসের উপদ্রব মোটেই ছিল না। সব দিক থেকে এটি যেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরম্য অট্টালিকায় এবং প্রাঙ্গনে কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ভারত হিতৈষী স্যার মরিস্ গায়ার। ইনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় ইনিও সর্বস্ব ত্যাগী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন না, কেবল মাত্র একটী কামরায় থাকেন। ভারতবর্ষেই জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই দিল্লীতে ভারতের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন।

উদ্বোধন সভা আহ্বান করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রান্তরে। মূল-সভাপতি, বিদেশীয় অভ্যাগত বিজ্ঞানী মণ্ডলী; এবং শাখা-সভাপতিদের বসবার স্থান করা হয়েছিল একটি ছোট শামিয়ানার মধ্যে। বাকি সকলে বসে ছিলেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায়। অন্যূন তিন হাজার বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানোৎসাহী জমা হয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু কোন কাগজ পত্র না দেখেই সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন! বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইতিহাসে

এটি একটা নূতন প্রবর্তন। প্রথমে কিছুক্ষণ হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়ে পরিশেষে ইংরাজীতে বল্‌লেন। তিনি বলেন,—ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সেজন্য ভারতীয় বিজ্ঞানের পথ অবারিত। কিন্তু বিজ্ঞানের আদর্শ কেবল ব্যক্তি বিশেষের সত্যানুসন্ধিৎসায় পর্যবসিত হলে চলবে না। তাকে সমাজ সেবার সুমহান ব্রত গ্রহণ করতে হবে। ভারতের চল্লিশ কোটী বুভুক্ষু নরনারীর নানা বিষয়ের সমস্যার সমাধানই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কর্তব্য। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনের সহিত বিজ্ঞানও জড়িত। সেজন্য বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন কাজ চল্‌তে পারে না। অথচ আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের শতাংশের এক ভাগকেও ঠিকমত বিজ্ঞানের সেবায় লাগানো হয়নি।

তারপর হিরোশিমাতে আণবিক বোমা নিক্ষেপকে নির্দেশ করে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে প্রকৃত পক্ষে এটি এক নূতন যুগের প্রবর্তক। যেমন বারুদের আবিষ্কার মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্রকে বিদায় দিয়ে নব্য যুগের ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি আণবিক শক্তি আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গুঁড়ো করে দিয়ে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করবে। অবশ্য এটা সকলেই স্বীকার করেন যে হিরোশিমার বিপর্যয় অবর্ণনীয়। কিন্তু ধ্বংস ছাড়া বিজ্ঞানের সৃষ্টিরও একটি দিক আছে। আণবিক সৃজনী ক্ষমতা দুনিয়ার আবহাওয়া বদলে দেবে।

পরিশেষে পণ্ডিত নেহরু উপস্থিত বিদেশী প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানান এবং ভারতের তরফ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, বিশ্বের শান্তি ও প্রগতির জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ক্ষেত্রে ভারত বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। কিন্তু ভারতকে জোর করে অপর একটি যুদ্ধে লিপ্ত করা চলবে না।

সভাপতি পণ্ডিত নেহেরুর পর বৃটিশ প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র সার চার্লস ডারুইন বৃটিশ এসোসিয়সনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তৃতা দেন। তারপর উঠলেন ফ্রান্সের একাডেমী অফ্ সায়েন্সের সদস্য পৃথিবী বিখ্যাত গণিতবিদ্ অশীতিপর বৃদ্ধ হাডামার্ড। তিনি পণ্ডিত নেহরুর শান্তির আবেদন সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাবাতিশয্যে অশ্রু সম্বরণ করতে অসমর্থ হন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী বসানো হয়েছিল যাতে দেখানো হয় বহু নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণাবলী। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) লৌহ ফুসফুস (Iron Lungs)—এই যন্ত্র দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা যায়। বহু মৃত্যুপথযাত্রীকে এই লৌহ দানব জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোটে একটি যন্ত্র ছিল। সেটিও বিদেশী ধন কুবের লর্ড ন্যুফীল্ডের দান। এটির দাম লক্ষাধিক টাকা। সম্প্রতি এই যন্ত্রটি ভারতের কারিগর দিয়ে ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হয়েছে।

(২) রেডিও সন্ধানী (Radar)—এই যন্ত্রটি ইংলণ্ডের আবিষ্কার। গত মহাযুদ্ধে বৃটেন কেবলমাত্র এইটির সাহায্যে জার্মান বিমান-হানা ও 'ভি-২' বোমা থেকে রক্ষা পায়। একটি বেতারের প্রেরক যন্ত্র থেকে সূক্ষ্ম তরঙ্গ (microwave) পাঠানো হয়। সেটা শত্রুর বিমান কিম্বা বোমা থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। তারপর শত্রুর সম্পূর্ণ

গতিবিধি ভেসে উঠে একটি অনচ্ছকারের পর্দার উপর। এই প্রসঙ্গে আমাদের জানা উচিত যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এইরূপ যন্ত্রের প্রথম পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজও রাডার প্রস্তুত হয়নি।

(৩) স্ফটিক-ফলক (Piezo-electric quarter)—আজকাল বেতারের প্রেরক যন্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ। তাছাড়া সাবমেরিন অনুসন্ধান করবার কালে এটার ব্যবহার অপরিহার্য। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ছাড়া piezo-electric স্ফটিক পাওয়া দুর্লভ ছিল। সম্প্রতি আমাদের দেশে হাজারিবাগ ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর স্ফটিক পাওয়া গেছে। প্রদর্শনীতে স্ফটিক চিনবার এবং ঠিকমত কাটবার সরঞ্জাম এবং উপায় দেখানো হয়েছিল।

(৪) চলন্ত এক্স-রশ্মীর গবেষণাগার এবং তার কার্য প্রণালী বিশদ ভাবে বোঝানো এবং দেখানো হয়েছিল।

উপরোক্ত জিনিসগুলি ছাড়া ভারতে প্রস্তুত অসংখ্য নূতন জিনিস, যেমন, প্লাস্টিক্স্ রেলগাড়ির ইঞ্জিনের কলকব্জা, ব্যবহারিক রসায়ন ফ্যাক্টরীর যন্ত্র, পেনিসিলিন প্রভৃতি নূতন ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহারের প্রণালী ইত্যাদি দেখানো হয়েছিল।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যসূচীর সঙ্গে দুইটি নূতন গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। প্রথমটার নাম জাতীয় পদার্থ বিদ্যার গবেষণাগার (National Physical Laboratory), সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু; দ্বিতীয়টার নাম শ্রীরাম ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুট, সভাপতি ছিলেন ডাঃ জন মাথাই। প্রত্যেকটার পিছু ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা স্থির হয়েছে। প্রথমটার ব্যয়ভার বহন করবেন অন্তর্বর্ত্তী সরকার এবং দ্বিতীয়টার জন্য খরচ করবেন সার শ্রীরাম। ইতিপূর্বে রসায়ন কাচ, ধাতব, ইন্ধন, খনিজ, পথ এবং গৃহনির্মাণ সম্বন্ধীয় গবেষণাগার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং ইনডাষ্ট্রীয়াল গবেষণা সমিতির (Council of Scientific & Industrial Research) উদ্যোগে এই সব নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌ছে।

জাতীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে স্বাধীনতার বাতাস ভারতবর্ষের বুকে সোনার কাঠি বুলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চতুর্দিকে গবেষণাগার, ফ্যাক্টরী, নদীর উপত্যকা এবং বাঁধ গঠন প্রভৃতি গড়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব প্রতিষ্ঠান যখন পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে তখন তিনি হয়ত বেঁচে থাক্‌বেন না; তথাপি এদের সঙ্গে জড়িত থাকাতেও আনন্দ আছে।

এবারের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগের বক্তৃতা। অধিকাংশ বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সান্ধ্য বৈঠকে। প্রথমদিন বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন। তাঁর বিষয় ছিল "হীরক"। সম্প্রতি হীরক সম্পর্কে গবেষণা করে ইনি একটা নূতন মতবাদ প্রচার করেছেন। অধ্যাপক রামনের মতবাদ বিলাতী বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। এই বক্তৃতায় অধ্যাপক রামন নূতন নূতন গবেষণার ফল এবং যুক্তিদ্বারা প্রতিপক্ষের মতবাদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর বক্তৃতা দিলেন ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট। এঁর বিষয় ছিল নভোরশ্মি (cosmic rays) ইনি 'উইলসন চেম্বার'-এর গবেষণায় সবচেয়ে অগ্রণী। স্লাইডের সাহায্যে ছবি দেখিয়ে ইনি বহু অপূর্ব

আণবিক ঘটনা এবং তথ্যের অবতারণা করেছিলেন। অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের কাছে গবেষণা করে কয়েকজন বাঙ্গালী ছাত্র ও ছাত্রী যশস্বী হয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা দিলেন সেণ্ট এণ্ডরুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সার ডারসি টমসন। এঁর বয়স ৮৬ বৎসর। প্রাণী জগতের শরীর তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে ইনি একটা সুন্দর বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন যে তিনি বহু ভাল ভাল বক্তৃতা শুনেছেন এবং বহু নিজে দিয়েছেন। কিন্তু এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা কখনও শোনেন নি। তারপর অধ্যাপক মনরো ফক্স প্রাণীদের আচার ব্যবহার সম্পর্কীয় গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

তৃতীয় দিনের বক্তা সার চার্লস ডারুইন বিলাতের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে বলেন। ইনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। বিলাতের প্রত্যেকটা নূতন জাহাজ, এরোপ্লেন অথবা কোন নূতন যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা এখানে পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া চাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইনি বলেন যে পুরাতন হাউস অফ কমন্স জার্মান বোমায় ভেঙে যাওয়াতে নূতন করে গড়া হচ্ছে। শীতকালে আগুন জ্বেলে বাড়িটিকে গরম করা হত। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থাটা সামান্য ভ্রমাত্মক ছিল, কারণ সভ্যদের পায়ের দিকের তাপ কম ছিল এবং মাথার কাছে তাপ বেশী ছিল। এই ভুলটু সংশোধন করার জন্য National Physical Laboratory একটি ঘরে ছেলেদের খেলাঘরের মত একটি নকল হাউস অফ কমন্স গড়েছে। এখন পরীক্ষা চল্‌ছে কি করে সভ্যদের পা গরম রেখে মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়।

তারপর বক্তৃতা দিলেন হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষ হার্লো শেপ্‌লি। বিষয় ছিল নীহারিকা-পুঞ্জ। সমগ্র বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে এত উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা শোনা যায়নি। এঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্প্রতি ইনি কলিকাতায় এসে দুটি বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। সে বিষয়ে বিশদভাবে বারান্তরে বলবার ইচ্ছা রইল।

চতুর্থ দিনে বিলাতের রাজজ্যোতিষী সার হ্যারল্ড স্পেন্সার জোন্স পৃথিবীর সন্নিকটে অন্যান্য গ্রহে প্রাণীদের বসবাস করার সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ এবং আলোচনা করেন। এঁর মতে কেবল মঙ্গলগ্রহে জীবন্ত প্রাণী থাকতে পারে। পরে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সূর্যের কলঙ্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সম্প্রতি সূর্য থেকে বেতার তরঙ্গ এসে পৃথিবীর বুকে ধরা পড়েছে। অধ্যাপক সাহা এই নূতন তথ্যের ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার পর আমেরিকার প্রতিনিধি অধ্যক্ষ শেপ্‌লি জানান যে সম্প্রতি অধ্যাপক সাহাকে আমেরিকার Astrophysical Societyর সভ্য করা হয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষে এই সম্মান লাভ প্রথম।

রাশিয়ার প্রতিনিধিরা বিমান গোলযোগের দরুন দিল্লীতে পৌঁছতে কয়েকদিন দেরী করেছিলেন। এঁদের সম্মানার্থে একটি বিশেষ সভা আহূত হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্যাভ্‌লভস্কি (প্রাণীতত্ত্ববিদ্) এবং অধ্যাপক উমারভ্ (পদার্থবিদ্)। এঁরা দুইজনেই রুশ ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিলেন একটি রুশ তরুণী। দেখা গেল আমরা রাশিয়া সম্বন্ধে যা জানি তার চেয়ে বহুগুণ বেশী জ্ঞান রাখেন এঁরা ভারত সম্বন্ধে। নূতন পরীক্ষা দ্বারা এঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর এনেছেন। ভারতবর্ষেও কি করে সেগুলি প্রচলিত হতে পারে এই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়।

অধিবেশনের শেষ দিন ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদিগের বাড়ি ফেরার জন্যে চিরন্তন হুড়াহুড়ি। একে একে সকলে নিজেদের গবেষণাগারে ফিরে এলেন, বুকে নিয়ে নূতন আশা এবং চোখে নূতন দীপ্তি।

শ্রীবিজ্ঞানবিৎ

মানববিদ্যা মহাসম্মেলন

বাংলাদেশে, ও বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে, কোন ছাত্র স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ইউনিভারসিটির দ্বারস্থ হলেই, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে বাধ্য করে একটা গুরুতর নির্বাচনের সম্মুখীন হতে,—সে আর্টস পড়বে, না সায়েন্স। ছাত্রটির জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র ও কৃতিত্ব একান্তভাবে নির্ভর করে এই নির্বাচনের ওপর। প্রথম নির্বাচনের পর একটি থেকে অন্যে চলে আসার ব্যবস্থা অবশ্য আছে, কিন্তু তা সাধারণ নিয়ম নয়, ব্যতিরেকী-অনুমতি-সাপেক্ষ। কাজেই ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা হয় আর্টস-পন্থী নয় সায়েন্স-পন্থী। ইংরজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের যুগে এই বিভাগ ছিল না; তখন সকল ছাত্রকেই পড়তে হোত সব বিষয়। মাইকেলের গণিত-বিরাগ ও অকস্মাৎ একদিন অসাধারণ সাফল্য শিক্ষার ইতিহাসে ইতিকথার মতো সুবিদিত। তারপর ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের দেশেও তার প্রভাব এসে পড়ে। তাই প্রবর্তিত হল নির্বাচন ব্যবস্থা বি.এ. পড়ার সময়—এ কোর্স অথবা বি কোর্স। একটিতে ছিল সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি, অন্যটিতে গণিত, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাই সম্প্রসারিত হয়ে এখন ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে এসে পৌছেচে—আই-এ ও আই-এস-সি। ফলে তরুণ বয়স থেকেই যে সব ছাত্ররা আর্টস পড়ে তারা সায়েন্স জানে না, এবং তার বিপরীতও সত্য। আমাদের দেশে জ্ঞানরাজ্যে এই যে বিভাগ, মনে হয় না এর মূলে কোন বস্তুনিষ্ঠ চেতনা আছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, এমন কি, ভূগোল, ইতিহাস পর্যন্ত কতকগুলি বিষয় কেন যে আর্টস শ্রেণীভুক্ত, সায়েন্স নয়, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। এককালের অক্সফোর্ডে 'ট্রিভিয়াম' ও 'কোয়াড্রিভিয়াম' নামে যে মধ্যযুগীয় বিষয়-বিভাগ প্রচলিত ছিল, আমাদের ইউনিভারসিটিগুলিতে বর্তমান বিষয়-বিভাগ মনে হয় তারই বিলম্বিত ও অবাঞ্ছিত প্রতিফলন।

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স থেকে আলাদা করে যেসব বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা হয়, সমগ্রভাবে তাদের বলা হয় হিউম্যানিটিস, মানববিদ্যা। আমরা যাকে আর্টস বিষয় বলি তার সবই এই মানববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মানবতার পূর্ণ বিকাশের আদর্শ সামনে রেখে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সমগ্রতার কথা বিবেচনা করলে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব সায়েন্স বিষয়গুলির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এই সব বিষয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রদের ভিতর পরস্পর যোগাযোগ ও আলোচনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয় এদেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যার কর্তৃত্বে এই যোগাযোগ সম্ভব হয়, যেমন আছে সায়েন্স বিষয়গুলির বেলায়। ভারতীয় বিজ্ঞান

কংগ্রেসের অধিবেশন আমাদের শিক্ষাজগতে সর্বজনপ্রণিধেয় ঘটনা। তার আন্তর্জাতিক প্রভাবও বেড়ে চলেছে। এর বিশদ বিবরণ খবরের কাগজের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অধিকার করে থাকে। সেই খবরের কাগজ খুঁজে দেখলে তবে চোখে পড়বে হয়ত সেই সময়ে বা তার কাছাকাছি, মানব-বিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়গুলিরও অধিবেশন বসছে, কোনোটি পাটনায়, কোনোটি ত্রিবেন্দ্রমে, কোনোটি লাহোরে, কোনোটি পুণায়। সভাপতিরা যে সব জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পড়েন, যে সব গবেষণার প্রবন্ধ সেখানে আলোচিত হয়, তা সাধারণত লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। এই দুরবস্থার প্রধান কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকদের একত্রিত করার সংযোজক প্রতিষ্ঠানের অভাব। এবার দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে অন্তত বারোটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, যদিও বিজ্ঞান কংগ্রেস যখন প্রথম শুরু হয় তখন বিষয় সংখ্যা তিন কি চারের বেশী ছিল না। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই প্রসার দেখে মানববিদ্যার্থীদেরও চৈতন্য হওয়া উচিত। তাঁদের প্রতিরোধ বিষয়ের অগ্রস্থতির জন্য পরস্পরের সহযোগিতা ও সম্মেলন অবশ্য কর্তব্য নয় কি? যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা ইণ্টার ইউনিভারসিটি বোর্ড বা রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি এই আয়োজনে অগ্রণী হন তাহলে এ দেশের শিক্ষার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

শ্রীজিজ্ঞাসু

পুস্তক-পরিচয়

সপ্তর্ষি—বনফুল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

জনপদ—বিজন ভট্টাচার্য। সিগ্‌নেট প্রেস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান রঙ্গমঞ্চ ভারতের বাইরে অবস্থিত হলেও যে-সংকট থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল সে সভ্যতার সংকট, তাই তার ছায়া গভীরভাবে পড়েছিল ভারতেরও জীবনে ও সাহিত্যে। বর্তমানের উপত্যকা থেকে বিগত কয়েক বৎসরের বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সমস্ত ঘটনাবহুলতাকে ভেদ করে একটি সাধারণ সত্য ভেসে ওঠে। সে হচ্ছে এই যে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। 'পথের পাঁচালী'র বিভূতি, 'কজ্জলী'-র পরশুরাম, 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মানিক, 'কয়লাকুঠি'র শৈলজানন্দ, 'বন্দীর বন্দনা'-র বুদ্ধদেব, 'চেতন স্যাকরা'র অমিয় চক্রবর্তী, 'বনলতা সেন'-এর জীবনানন্দ, 'নিশীথ নগরী' ও 'প্রথমা'-র প্রেমেন্দ্র, 'একদা'-র গোপাল হালদার, 'চোরাবালি'-র বিষ্ণু দে, 'ফসিল'-এর সুবোধ, 'পদাতিক'-এর সুভাষ—এ সকলের প্রভায় যে বাংলা সাহিত্য ঝলমলিয়ে উঠেছিল, সে বাংলা সাহিত্য আর নেই। স্থিতি ও প্রসারের ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য নিঃশেষ হয়ে গেছে, আবার আরম্ভ হয়েছে গতিচঞ্চল, পরীক্ষাচঞ্চল সন্ধানের পর্যায়। যুদ্ধের নিদারুণ সংকট—বাহ্য ও অন্তর, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-কে যাঁরা নিছক জীবনপ্রীতির জোরে অথবা স্থির সত্যদৃষ্টির ফলে উত্তীর্ণ হতে পারলেন তাঁরা অবতীর্ণ হলেন নতুন যুগের

সংগ্রামী ভূমিকায়, যাঁরা পারলেন না তাঁদের অনেকেরই কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল অথবা পূর্বতন প্রতিভা হারিয়ে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল।

কথাসাহিত্যের আসরে এই সংকটোত্তর পর্যায়ে অব্যাহত বীর্য দেখতে পাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের রচনায় (কেবল খ্যাতনামাদের কথাই বলছি)। অক্লান্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন যুগের কথা-সাহিত্যের হাতিয়ার গড়ছেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বর্তমান যুগের রচনা সর্বত্র বক্তব্যের প্রগতিশীলতার প্রতি দাবী না রাখলেও লিপিকৌশলে তাঁর পূর্বতন ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। বনফুলকে সচেতন প্রগতিশীলতার কাঠামোতে ফেলা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁরও সাম্প্রতিক রচনায় দেখা যাবে বর্তমান জীবনের ছাপ, নবপর্যায়ের পরীক্ষা-চাঞ্চল্যের ছাপ। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ও সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীতে লিখিত 'সে ও আমি'-তে মধ্যবিত্ত যৌবনের দ্বিখণ্ডিত সত্তা ও ব্যর্থ সম্ভাবনার আলেখ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবার আশ্চর্য হলাম তাঁর নূতনতর পরীক্ষা 'সপ্তর্ষি' পড়ে।

এক অর্থে 'সপ্তর্ষি'কে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক উপন্যাস—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উদ্দীপনা থেকে সাম্প্রতিক বিপ্লবের দিকে সমাজের গতির আলেখ্য। একই পরিবারের তিনটি পুরুষের সাতটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার জীবনধারাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন বনফুল। 'হংস-শুভ্র'-এর বনেদী পরিবারের শাখা-প্রশাখায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্ময়ানা, ঘোর হিন্দুয়ানী আর চূড়ান্ত সাহেবীয়ানার ফুল ধরেছে, অহিংস কংগ্রেসী, অস্ত্রধারী টেররিস্ট আর নাস্তিক কমিউনিস্ট একত্র হয়েছে একই সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিভূ হিসাবে। যথাসাধ্য নিরপেক্ষভাব সঙ্গে গ্রন্থকার বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাসকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই নিরপেক্ষতা সর্বত্র সমানভাবে সফল না হলেও সমস্ত বইটিকে কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত, লক্ষপতি ব্রাহ্ম সোমশুভ্র খদ্দরের জামা গায়ে টেবিলে বসে সযত্নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুরি দিয়ে আলুর ফালি কাটেন, চব্বিশবার চাল ধুয়েও সন্তুষ্ট হন না, উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন করেন, লক্ষাধিক টাকা দিয়ে যান তার প্রিয় বিদ্যার উন্নতি-কল্পে। রজতশুভ্র খামখেয়ালী শিল্পী, থেকে থেকে শ্বেতাঙ্গনিধনের জন্য রিভলভার পালিশ করে, আঁকতে যায় নারীমুখ, হয়ে যায় হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ ছোরা। হীরকচন্দ্র কমিউনিস্ট, জেল থেকে রজতশুভ্রকে আন্তরিক পত্র লেখে সাম্যবাদের মর্ম বোঝাবার জন্য। হীরকশুভ্র কিছু ভারতীয় সাম্যবাদীর হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, তবে তার চরিত্র সম্বন্ধে বনফুলের বোঝবার ভুল থাকলেও—ভুল বোঝাবার প্রয়াস নেই। হীরকশুভ্রের এই পত্রেই গ্রন্থ শেষ হয়েছে।

অভিনব প্রয়াস সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরীক্ষামাত্রেই কীর্তি নয়, পরীক্ষার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। 'সপ্তর্ষি'ও বনফুলের কোনো বিরাট কীর্তি নয়, পাঠককে লেখার আবেদনে ততটা মুগ্ধ করে না, যতটা করে প্রধান লেখকের সন্ধানস্পৃহা ও সাহসিকতায়। কারণ 'সপ্তর্ষি'-র বিরাট কল্পনা এক বিরাট জীবন্ত উপন্যাসের সৃষ্টি না করে একটি স্বল্পায়তন খসড়াবিশেষে পরিণত হয়েছে। চতুর লেখনভঙ্গী, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিলাভের আন্তরিক প্রয়াসেও একে খুচরো কাজের সুলভ সীমা থেকে উত্তীর্ণ করতে পারেনি। 'জঙ্গমে'-এ বনফুল একটি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনায় মনোনিবেশ করেছেন বলেই হয়ত তাঁকে অন্যান্য

কল্পনাগুলিকে অল্পজলের মাছ হিসাবে জীইয়ে রাখতে হয়েছে। এর ফলে 'সপ্তর্ষি' তার অভিনব সম্ভাবনাকে মোটেই পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেনি।

কিন্তু এতেই এই উপন্যাসের ব্যর্থতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শেষ হয় না। যে নিরপেক্ষতা 'সপ্তর্ষি'তে কিছু পরিমাণ অভিনবত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে তাই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর নির্বীর্যতার। কোনো স্বপ্ন, বেদনা বা উদ্দীপনা নেই যাতে এই প্রতিলিপিকে জীবনরসে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে। 'নিরপেক্ষ' থাকার চেষ্টায় আলেখ্য কেবল আলেখ্যই রয়ে গেছে, রঙে, রসে, রক্তে, মাংসে জীবন্ত হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। এ গ্রন্থ লেখকের বুদ্ধিবৃত্তির মশলায়ই তৈরী, হৃদয়বৃত্তির স্পর্শ এতে নেই।

'জনপদ'এর লেখক 'নবান্ন'-এর নাট্যকার হিসাবেই পরিচিত। উপন্যাসে এই তাঁর হাতে খড়ি। তিনি সেই সংকটোত্তর উঠ্‌তি পুরুষের লেখক, যাদের বিগত যুগ থেকে নতুন যুগে পথ কেটে আসতে হয়নি, কারণ নতুনের মধ্যেই তাদের জন্ম। তবু প্রবীণতর লেখকদের সঙ্গে এই উঠ্‌তি পুরুষের লেখকের যোগ স্পষ্ট, কারণ বিজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য নতুন হলেও টেকনিক অপেক্ষাকৃত পুরাতনপন্থী। মালিনীর বৈধব্যদগ্ধ যৌবন শান্তি পায় অভিনব সমাধানে, কৃষিবিপ্লবের ভূমিকায়; কিন্তু তার দাহের প্রকাশ পূর্বতন লেখকদেরই স্মরণ করিয়ে দেয়। মালিনীর বৃদ্ধ স্বামী অম্বিকাচরণ, প্রতিবেশিনী চপলাসুন্দরী ও খুড়ো বংশলোচন, বাংলা সাহিত্যের সনাতন টাইপগুলিরই হেরফের। এমনকি, চাষীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কৃষিবিপ্লবী কালীচরণেও সনাতন 'দা-ঠাকুর'-এর ছোঁয়াচ অল্পস্বল্প লেগেছে। কিন্তু গল্পের শেষে যখন পুলিসের গুলি অগ্রাহ্য করে বাঁধ কাটার উদ্দীপনা জেগে ওঠে তখন গল্প চলে আসে একেবারে সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তের কোঠায়। এতে করে সনাতন গ্রাম্যজীবনের ছবি থেকে এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অথচ যোগটাও বজায় থাকে। দেখা যায় যে, সেই সনাতন ঘড়ঘড়ে কাশিভরা বৃদ্ধ স্বামী আর দোজবরে বিবাহিত যুবতী, প্রেমজ্বরজর বোষ্টমী, আর আত্মভোলা সন্ন্যাসী দা-ঠাকুরের গ্রামই আজ কোন পথে পা বাড়িয়েছে।

কিন্তু সনাতন গ্রাম ও নতুন ইতিহাসের মাঝখানে যে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফাঁক—সেটা তেমন ভাবে ভরাট হয়নি। চিরপরিচিত বাঙালী গ্রামের বিপ্লবী উত্থান যেন একটু আচম্‌কা মোড়ের বাঁকেই এসে পড়ে। পলিমাটির স্তর জমে জমে কিভাবে বিদ্রোহী মনোভাবের চর তৈরী হয়, সেটা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। এইখানেই রসবস্তু ও মানবিক পটভূমির দিকে ঘাটতি পড়ে, সমাধানে লেগে যায় একটু কামচারিতার ছোঁয়াচ। আবার মালিনীর যৌবন-বেদনার বর্ণনায় মিশিয়ে থাকে একটা সূক্ষ্ম রোমাণ্টিক আবেশ, যার সঙ্গে শেষের রূঢ় বাস্তব সুষ্ঠুভাবে খাপ খায় না। দুটি সমান্তরাল ধারা গড়ে ওঠে কিন্তু ভালোভাবে জোট বাঁধে না। তার মধ্যেও আবার মালিনীর ব্যক্তিগত 'ধারাটি'ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সুষ্ঠু বলে বোধ হয়,— অপর দিকটিতে খানিকটা আকস্মিকতা থেকে যায়।

সুতরাং যেমন 'সপ্তর্ষি'তে তেমনি 'জনপদে'ও দেখা যায় লেখকের মনের পাল্লা ঝুঁকেছে কি ঘটেছে তারই দিকে, কেমন করে ঘটেছে তার দিকে নয়। এর ফলে সমস্ত নৈপুণ্য সত্ত্বেও বৃহৎ ধারণার অনুযায়ী বৃহৎ প্রয়াস ও বৃহৎ কল্পনার অভাবে অনেক সম্ভাবনার অন্যায় পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়বৃত্তির জারক রস অধিক পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও প্রয়াসের অভাবে 'সপ্তর্ষি'র মতোই 'জনপদ'ও খসড়াবিশেষেই পরিণত হয়েছে।

প্রবীণ লেখকের পাকা হাতের কাজে আর নবীন লেখকের উৎসাহী রচনায় এই একই অভাব দেখে 'উন্নাসিকতা'র কাঠগড়ায় দাঁড়াবার ভয়কে উপেক্ষা করেই বলতে ইচ্ছা হয় যে, 'সামাজিক' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের উচিত প্রতি গ্রন্থ লেখার পূর্বে নতুন করে টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' পড়া।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

English Episode. By Charles Poulsen. Progress Publishing Company Ltd. London.

Time Must Have A Stop. By Aldous Huxley—Chatto & Windus, London.

পোলসেনেব এই বইটি ইংলণ্ডের ১৮১ সালের কৃষক-বিদ্রোহ নিয়ে লেখা। অত্যাচারিত ও বঞ্চিত কৃষকরা অন্যান্য দেশে এর আগে অনেকবার বিদ্রোহ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যের শেষাশেষি, ইসলামের গোড়ার দিকে পাবস্যদেশে, ১০০০ খৃষ্টাব্দে জর্মানীতে এবং ইংলণ্ডের এ-আন্দোলনের কয়েক বছর আগে (১৩৫৮) হুসাইট আন্দোলনের ফলে ফ্রান্সে কৃষকরা অকথ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইংলণ্ডের এ কৃষক-বিদ্রোহ তার প্রচণ্ডতা ও ব্যর্থতায় অনন্যপ্রায় এবং এ-কাহিনীই লেখক বিচিত্র আন্তরিকতায় রচনা করেছেন।

এ-বিদ্রোহের পেছনে রয়েছে কালো মৃত্যুর ছায়া। যে-মহামড়ক প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে নাকি গ্রাস করেছিলো তা ইংলণ্ডে প্রকাশ প্রায় ১৩৪৮ সালে। ফলে দেশের অর্ধেক লোক মাবা গেলো, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠলো। মাঠের শস্য মাঠে পচতে লাগলো চাষীর অভাবে, উর্বর জমি চাষের অভাবে খাঁ খাঁ করতে লাগলো। জমিদাররা দেখলে সমূহ বিপদ। তখন তারাই ছিলো পার্লামেন্টের সভ্য, দেশের দরিদ্রের হর্তাকর্তা বিধাতা। অতএব পরবর্তী বছরে তৃতীয় এডওয়ার্ড Ordinance of Labourers আইন পাস করলেন, যাব ফলে কালো মৃত্যুর আগে যে মজুরী ছিলো তার চেয়ে বেশি মজুরী দাবী করা আইনত নিষিদ্ধ হোলো এবং নানাভাবে কৃষক-মজুর-চাষীদের পরাধীনতার বন্ধন আরো দৃঢ় করা হোলো। এতেও সব হোলো না দেখে ১৩৫১ সালে আবার কয়েকটি আইন পাস হোলো—Statute of Labourers। শুধু তাই নয়, সকলের ওপর পোল-ট্যাক্সও বসানো হোলো।

এসব হোলো আইন করা অন্যায়। তাছাড়া ভূমিদাস মজুরদের জীবন দুর্বিসহ করবার জন্য জমিদাবদের বেআইনী অন্যায়ের অন্ত ছিলো না। এবং তাব বিরুদ্ধে কোনো বিচারও ছিল না। এই সময়ে ওয়াইক্লিফ নামে এক পাদ্রীজাতীয় লোক পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। যে-সব কথা তিনি বলতে লাগলেন সে-যুগের দরিদ্র কৃষক-মজুরদের জন্য তা বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তিনি বললেন, সম্পত্তি হোলো পাপের ফল এবং সম্পত্তি রাখা খৃষ্টবিরুদ্ধ কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "দবিদ্র পাদ্রী"র দল

সৃষ্টি করলেন দেশের দরিদ্রের মাঝে সত্যের বাণী প্রচার করবার জন্য। ফলে কৃষক-মজুররা অন্যায়কে জানলো সুষ্ঠুভাবে, মনুষ্যত্বের লুপ্ত গৌরব আবার সাড়া দিয়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

ওয়াইক্লিফের সূত্র ধরে জন বল নামে আরেক পাদ্রী প্রচার কার্য শুরু করলেন। ধনী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ তাকে পাগল বললে, আবার কেউ কেউ সাংঘাতিক ব্যক্তি বুঝে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। জন বল বাধায় দমলেন না; জনসাধারণের মধ্যে নতুন-নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। ধনীরা কেন ধনী থাকবে, মানুষে-মানুষে কেন শ্রেণী বিভেদ থাকবে এবং যে-কথাটা সরাসরি নিপীড়িতদের মন গ্রহণ করলো তা হোলো, 'ইভ-আদমের সময়ে কে ছিলো ভদ্রলোক?' ধর্মের রাজত্বের দিনে যখন ধার্মিকদের ওপর জনসাধারণের আস্থা একবার ভাঙতে পারলো, তখন যারা তাদেরকে নিপীড়ন করছে, বঞ্চিত রাখছে, নিষ্ঠুরভাবে তাদের বিরুদ্ধে অন্তরের বিদ্রোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেলো না।

গ্রেট কোম্পানী নামে এক গুপ্ত দল গড়ে উঠলো ভূমিদাস মজুরদের মুক্তিকামনায়। গ্রামে গ্রামে উদ্দেশ্য প্রচারিত হোলো, একটা দিন নির্দিষ্ট হোলো বিদ্রোহ ঘোষণার। যথাদিনে গ্রামে গ্রামে দেশ জুড়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলে বালক রাজা রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য। রাজার প্রতি তাদের যেমন অটল বিশ্বাস তেমনি তাদের ঘৃণা রাজপরিষদের সভ্যদের প্রতি। গভীরতম বেদনার কথা যেটা সেটা হোলো এই যে তারা সে-রাজার দ্বারাই নির্মমভাবে প্রতারিত হোলো। তাদের স্বপ্ন তো ধূলিসাৎ হোলোই, সমগ্র দেশময় তারা কচুকাটা হোলো।

Froissart এ-বিদ্রোহের নিখুঁত ও অনেকাংশে সত্য বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সে-বিবরণ পোলসেনের রচনায় এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে বিস্ময়কর। সহজ সরল মানুষদের কথা তেমনি সহজ সরল ভাবে বলেছেন, তাছাড়া আন্তরিকতায় আগাগোড়া টলমল। সমস্ত সভ্যতা ছাড়িয়ে আসল মানুষের যে কোনো যুগে মৃত্যু নেই, এ-কথা বলিষ্ঠ ভাবে বলা হয়েছে একান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। এবং এ-মানুষ যতদিন না মুক্তি পাবে ততদিন এর যাত্রা চলবে, হয়তো পরাজয়ে মধ্যে দিয়ে: কারণ একদিন জয় নিশ্চিত। এ-বিদ্রোহের কাহিনী পরাজয়েব শেষ হয়েছে, কিন্তু এতে নিরাশার কথা নেই। যে-বিরাট গণশক্তি উথলে উঠেছিলো কয় শত বছর আগে সে-শক্তির পরাজয় এই কারণেই ঘটেছিলো যে কেবল শক্তির দ্বারা তারা জয় চায়নি; সত্যে বিশ্বাস তাদের অটল। বর্বব শক্তিতে কেবল যদি তাদের বিশ্বাস থাকতো তবে ইংলণ্ডের ইতিহাস ভিন্ন ভাবে লেখা হতো।

ইওরোপের যুদ্ধক্লিষ্ট ঘুণ ধরা সভ্যতায় অলডাস হাক্সলি গোড়া থেকে বীতশ্রদ্ধ; কখনো-কখনো মনে হয় তা তাঁর মনে বিভীষিকা জাগায়, যার ফলে মুক্তির সন্ধানে তিনি অন্ধভাবে ছুটে বেরিয়ে যেতে চান। তিনি শান্তি চান, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ মানবজাতির মুক্তি কামনা করেন। তাঁর বিশ্বাস এতটা আঘাতপ্রাপ্ত যে তাঁর যেন কিছুতেই আস্থা নেই, না রাজনীতিতে, না মানুষের গতানুগতিক জীবনে। ইদানীং তিনি দেশবিদেশের ধর্মকথায় গভীরতর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন। তার ফলে গত বছর আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি Perennial Philosophy যার প্রারম্ভ আলোচ্য বইটিতে মেলে। তিনি বলেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য সময়কে অনন্তকালের মধ্যে বিসর্জন দেবার জন্য। মানুষ যদি সত্যিকার শান্তি ও সফলতা কামনা করে

তবে তাকে অনন্ত দর্শন যে জগতের সব ধর্মের highest common factor—এ-কথা উপলব্ধি করাব সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম থেকে, রাজনীতি থেকে "পৌত্তলিকতা" বর্জন করতে হবে। অতীতের জন্য বর্তমানে কিছু করা যেমন ভুল তেমনি ভবিষ্যতের জন্যও বর্তমানে কিছু করা ভুল, এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষের চিন্তা ও কর্মই হোলো গোড়ার অনিষ্ট। সেমিটিক ধর্ম অনন্তকালকে বড় করে না দেখে একটা নির্দিষ্ট কালকে বড় করে দেখেছে, ফলে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহই হয়েছে, শান্তি হয়নি, যদিও সর্বাগ্রে সে সব ধর্ম শান্তি কামনা করেছে। স্পেনের ক্যাথলিসিজম অতীতকে পূজা করেছে, এবং বর্তমানে জাতীয়তাবাদ, কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে বলি দিচ্ছে। অতএব পেছনে তাকানো চলবে না, সামনে তাকানো চলবে না, সময়হীনতা অর্জন করে অনন্ত সত্যলাভ করতে হবে।

বর্তমান ইওরোপে সমাজ যে-রূপ গ্রহণ করেছে তাতে সংবেদনশীল মন আহত না হয়ে পারে না, এবং সমাজকে মুক্ত করার চিন্তা অত্যন্ত সাধু চিন্তা। কিন্তু হাক্সলি যে পথ দেখাচ্ছেন ক্রুণোর চরিত্রে যে আদর্শ ফোটাতে চেয়েছেন, অনন্তের যে-স্বপ্ন রূপায়িত করেছেন, তাতে গৌতম বুদ্ধের সফলতার নয়—ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে উদাহরণ হিসাবে। আধ্যাত্মিক উপায়ে মানুষের মুক্তি কামনা যাঁরা করেন তাঁরা মহৎ হতে পারেন বটে কিন্তু তাঁরা স্বপ্নবিলাসী, বাস্তব তাঁদের চোখে ধূলি হয়ে যায়। হাক্সলি অন্ধভাবে মানুষের মুক্তি কামনা করছেন। যিনি নিজেকে দুনিয়ার সব স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন রেখে অবাস্তব উচ্চশিখরে নিঃসঙ্গ করে রেখেছেন, তাঁর কাছে মানুষের জীবনের তুচ্ছ ঘটনা, হাস্যকর অভ্যাস, মুদ্রাদোষ, কামনা ও ভোগ, স্বার্থের প্রয়োজনে প্রেম ও মমতা ইত্যাদি কুৎসিত ঠেকতে পারে, মধ্যবিত্ত সমাজের বীভৎসতায় তিনি মর্মাহত হতে পারেন, এ নিয়ে কৌতুকও করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে সত্য পথ বাতলে দেওয়া তাঁর কাজ নয়।

তিনি সোনালী যুগে বিশ্বাস করেন কি না জানি না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর যে ঘৃণা থেকে থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে কারো-কারো মনে হতে পারে হয়তো বা অবচেতনায় তাঁর এমনি একটা আছে। বর্তমান তার কাছে এত কদর্য ও কুৎসিত হয়ে উঠেছে যে তিনি মুক্তি চান সেখানে যেখানে-বর্তমান নেই, সময় নেই, এমনি একটি অসম্ভব কল্পনায়। (ব্যক্তিবিশেষে তা হয়তো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের জন্য তা ভাবাও অন্যায়)। মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ও mysticisn-এর সংমিশ্রণের ফলে তাঁর চিন্তা ও উপসংহার এমন এক স্তরে গিয়ে পৌছেচে যেখানে সমস্ত অবাস্তব। তাঁর সমাজকে তিনি চিনেছিলেন ভালো, এবং তার বর্ণনা তাঁর লেখায় এমন নিখুঁত ফোটে যে চমকপ্রদ, কিন্তু মৃতবৎসা মায়ের অন্ধের সন্তান প্রীতি, মানুষের আবেগ ইত্যাদির প্রতি তাঁর বিরূপতার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভুল ত্রুটিতে সৃষ্ট মানুষের প্রতি যাঁর মমতা নেই, তাঁর পক্ষে মানুষের মঙ্গল কামনা করা নিরাপদ নয়।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্

What Happened in History : by Gordon Childe (Penguin : 1s.)
Progress and Archaeology : by Gordon Childe (Thinkers Library : 2s.6d)
The Story of Tools : by Gordon Childe (Cobbett Pub. Co. Ltd. : 1s. 6d.)
From Savagery to Civilisation : by Graham Clark (Cobbett press : 7s. 6d.)
Progress of Indic Studies (1917-1942) : Edited by R. N. Dandekar.
(Bhandarkar Oriental Research Inst, Poona : Rs. 8/-)
Ancient India Nos. 1 & 2. (Bulletin of the Archaeological Survey of India : Rs. 2/- each)

প্রধানত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-সভ্যতার ইতিহাসই আলোচ্য গ্রন্থগুলির বিষয়-বস্তু। মানব-সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ প্রত্নবিদ্যা (Archaeology) ও নৃবিদ্যার (Anthropology) অন্তর্ভুক্ত। আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই তাই বিখ্যাত প্রত্নবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পাষাণের কথা" গ্রন্থে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'ভূমিকার' কথা মনে পড়ছে। এই ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন : "বুড়া মানুষ না হয় একশত দেড়শত বৎসরের কথা বলিবে, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেখায় পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেকদিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিষে লেখা হয়, সে ত আর বেশী দিন টিকে না। কাগজ আট নয় শত বৎসর টিকে, তালপাতা বার চৌদ্দশত বৎসর টিকে, ভূর্জপত্র পনের ষোল শত বৎসর টিকে, পেপিরস্ না হয় দু'হাজার বৎসর টিকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে শুনিব, পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই।" পাথর বলতে শাস্ত্রী মহাশয় এখানে শিলালিপির (Inscriptions) কথা বলেছেন। রাজা-রাজড়ারা বাটালি দিয়ে দু'চারটে কথা পাষাণের গায় লিখে গিয়েছেন। মুদ্রণ বা লেখ্য ভাষার বিকাশ যখন হয়নি তখন পাষাণই ছিল আমাদের আধুনিক কাগজ এবং লেখনী ছিল বাটালি। কিন্তু হাজার হাজার বছর পরে পাথরের গায়ের বাটালির দাগও মিলিয়ে যায়। তাছাড়া বাটালি দিয়ে পাথরের গায়ে যে-ভাষায় তৎকালীন ইতিহাসের দু'চারটে কথা খোদাই করা হয়েছে, সেই 'ভাষারও' বয়স ত খুব বেশি হলেও পাঁচ ছয় হাজার বছরের বেশি নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস প্রায় আড়াই লক্ষ বছরের। পাথর ও পেপিরস-এর গায়ে মাত্র ৫।৬ হাজার বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারও আগেকার ইতিহাস যদি জানতে হয় তাহলে ভূ-বিদের কাছে যেতে হবে। ভূ-বিদের ভাষা হ'ল 'ফসিল', আর তাঁর 'কাগজ' হ'ল পর্বতমালা। স্তরে স্তরে সাজানো নানা জীবজন্তু ও গাছপালার 'ফসিল' দেখে তিনি জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাস বলবেন, আর 'আদিমতম' মানুষের ফসিলের সন্ধান যেহেতু তিনি উচ্চতম স্তরে পেয়েছেন, সেইজন্যে 'মানুষকেই' তিনি জীবজগতের শ্রেষ্ঠ 'জীব' বলে রায় দেবেন। এই পর্যন্ত ইতিহাসই তাঁর কাছে জানতে পারব। তারপর আসতে হবে নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে। আদিমতম অসভ্য, বর্বর মানুষ কিভাবে ভয়ংকর প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সংগ্রাম ক'রে, প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনেছে, তার রূপ বদলেছে, সভ্যতার গোড়াপত্তন ক'রে, ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে স্থূলদেহ, স্থূলবুদ্ধি 'পিথিক্যানথ্রোপাস্' থেকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ঋজুদেহ আধুনিক মানুষ হয়েছে, প্রায় আড়াই লক্ষ বছরের সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের সন্ধান দেবেন

নৃ-বিদ্। মোটামুটি নৃ-বিদের এই 'ইতিহাসকেই' আমরা 'প্রাগৈতিহাস' বলে থাকি। এই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ ক'রে প্রত্নবিদ্ আরও এগিয়ে আসবেন ঐতিহাসিক যুগের দিকে, এবং সেই আসার পথে তাঁকে মাটি খুঁড়ে, জংগল কেটে অনেক অবলুপ্ত মানবসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে হবে। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে লিখিত-ইতিহাস বা ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সেতু রচনা ক'রে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন। ভূ-বিদ্যা, নৃ-বিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা এবং আধুনিক ইতিহাস, এই নিয়ে মানুষের ও সভ্যতার পরিপূর্ণ ইতিহাস। ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এইভাবেই দেখতে হয়। এ-ছাড়া অন্য শ্রেণীর যে-সব ইতিহাস আমরা সাধারণত পড়ে' থাকি তাহ'ল রাজারাজড়ার জীবনচরিত এবং যুদ্ধবিগ্রহের 'ক্যাটালগ' মাত্র। 'What Happened in History' গ্রন্থের 'প্রত্নবিদ্যা' ও 'ইতিহাস' নামক প্রথম অধ্যায়ের গোড়াতেই গর্ডন চাইল্ড এই কথা বলেছেন এবং প্রত্যেক বিজ্ঞানীই তাঁর কথা সমর্থন করবেন।

অতীত যুগগুলির ইতিহাস কোন্ ভাষার সাহায্যে সন্ধান করব? সভ্যতার সর্পিল, দুর্গম পথের বাঁকে বাঁকে মানুষ যুগে যুগে তার জীবন-সংগ্রামের কোন্ চিহ্ন, কোন্ প্রতীক ফেলে গিয়েছে যার সাহায্যে তার অলিখিত ইতিহাস উদ্ধার করব আমরা? পেপিরস্ বা শিলালিপি না-হয় পাঁচ ছয় হাজার বছরের 'ইতিহাস' উদ্ধার করল, কিন্তু তারপর? তার আগে কোন শিলাগাত্রে মানুষ তার সমাজ ও সভ্যতার সামান্য পরিচয়ও কোনো সাঙ্কেতিক চিহ্নের মধ্যে ব্যক্ত করে যায়নি। একমাত্র মানুষের জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ারের সাহায্যে আমরা সমস্ত অন্ধকার অতীত যুগের উপর আলোকসম্পাত করতে পারি। মানুষের জীবন-সংগ্রামের এই হাতিয়ারই একমাত্র বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি যার সাহায্যে শুধু মানবসভ্যতার অতীত যুগ নয়, সেই সুদূর অতীত যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি। এ-ছাড়া আর সমস্ত মাপকাঠিই অচল এবং বিজ্ঞানসম্মতও নয়। এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে আমরা মানুষের জীবন-সংগ্রামের আদিমতম 'হাতিয়ার' দেখতে পাই 'পাথর', তাই মানুষের আদিমতম সভ্যতার নামও 'প্রস্তর যুগ' দেওয়া হয়েছে। 'হাতিয়ারের' উপাদানের নামে যুগ-সভ্যতার নামকরণ করা হ'ল। এই 'প্রস্তর যুগ' মানবসভ্যতার সুদীর্ঘতম যুগ, প্রায় দু'লক্ষ বছরের বেশী এর অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে। তাই এই যুগকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রস্তর যুগের উষাকালকে বলা হয় 'Eo-lithic' ('Lithic' গ্রীক্ শব্দ, অর্থ হ'ল 'পাথুরে'), প্রাতঃকাল থেকে মধ্যাহ্ন-কালকে বলা হয় 'Paleo-lithic' বা 'আদিপ্রস্তর যুগ' এবং অপরাহ্নকালকে বলা হয় 'Neo-lithic' বা 'নব্যপ্রস্তর যুগ'। আদি-প্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগকে নৃবিজ্ঞানীরা যেসব স্থানে ক্রমোন্নত হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেই সব স্থানের নামানুসারে নানা উপযুগে বিভক্ত করেছেন। প্রস্তর যুগের পর আসছে ধাতুযুগ এবং এই ধাতুযুগের গোড়াতে প্রথমে দেখতে পাই মানুষের তামার ব্যবহার, তারপর ব্রোঞ্জ, তারপর লোহার। তাই প্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগগুলিকে বলা হয়েছে 'তাম্রযুগ' (কেউ কেউ 'Chalco-lithic' বা 'তাম্রপ্রস্তর যুগ' বলেন, কারণ বিশুদ্ধ তামার ব্যাপক ব্যবহার কোথাও দেখা যায়নি, তামার হাতিয়ারের সঙ্গে পাথরের হাতিয়ারেরও

প্রচলন ছিল), ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ। তারপর আধুনিক যন্ত্রযুগের আবির্ভাব পর্যন্ত এই লৌহযুগের বিচিত্র গতি ও বিস্তার দেখা যায়। গত হাজার বাবশ' বছরের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি যন্ত্রযুগের নানা পর্যায়ের ইতিহাস বলতে পারি। এই যন্ত্রযুগকে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ল্যুইস্ মাম্‌ফোর্ড (Lewis Mumford) তাঁর "Technics and Civilisation" গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-যুগের সভ্যতার মতো 'Eo-technic', 'Paleotechnic' ও 'Neo-technic Phase'-এ ভাগ করেছেন। এইভাবে বর্তমান ঐতিহাসিক যুগকে ভাগ করলে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার দিক থেকে কিছুমাত্র অন্যায় করা হয় না, বরং সেইটাই বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। কিন্তু এভাবে আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনা করার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টা হয়নি। কার্ল মার্কস্ এসম্বন্ধে তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বলেছেন : "সামাজিক জীবন এবং প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি হ'ল বাস্তব উৎপাদন-পদ্ধতিব ক্রমবিকাশের ধারা। সেদিকে ঐতিহাসিকরা আজ পর্যন্ত বিশেষ দৃষ্টিপাত করেননি। প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলিকে কিন্তু তথাকথিত ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা হয়নি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই তাদের বিচার করা হয়েছে। সেই সব যুগে মানুষ প্রকৃতির যেসব উপাদান দিয়ে উৎপাদনেব হাতিয়ার নির্মাণ করেছে, সেই উপাদানের নামানুসারেই যুগগুলির নামকরণ করা হয়েছে। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলিকে বলা হয় প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ"—(ক্যাপিটাল—প্রথম খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ের একটি পাদটিকা)। 'Tools' অর্থাৎ মানুষের আদিমতম হাতিয়ার এবং আধুনিক যন্ত্রের (Machine) মধ্যে পার্থক্য কি তা নিয়ে কার্ল মার্কস্ তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। মানুষের হাতের 'হাতিয়ার' ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত বিরাট যন্ত্রের অক্লান্ত ও অটোমেটিক যান্ত্রিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির পথে মানুষের হাত-পায়ের সীমাবদ্ধ শক্তি থেকে 'হাতিয়ার' মুক্ত হয়েছে, কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে সে আজও মুক্ত হয়নি। এইভাবেই মানবসমাজ 'ম্যানুফ্যাক্‌চার' বা হস্তশিল্পের যুগ থেকে ধীরে ধীরে 'মেশিনোফ্যাক্‌চার'-এর বা যন্ত্রশিল্পের যুগে পৌঁছেচে। মানুষের উৎপাদন ও জীবিকা-সংগ্রামের 'হাতিয়ার' আজ যন্ত্রযুগের 'যান্ত্রিক হাতিয়ারে' পরিণত হলেও আজও মানুষের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষ সম্পর্কচ্যুত হয়নি। যন্ত্র তা সে যত বড় ও বিকট যন্ত্রই হোক না কেন, আজও তাকে প্রথমে চালু করতে হয় মানুষকেই, আজও তার রূপের নকসা করতে হয় মানুষকেই, আজও তা বিকল ও অচল হলে আবার সচল করতে হয় মানুষকেই। আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেমন, আজও তাই তেমনি ঐ উৎপাদন হাতিয়ারের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিচার করা যায়। এই 'টেক্‌নোলজিই' আজও ঐতিহাসিকদের একমাত্র মাপকাঠি যা দিয়ে তাঁরা মানবসমাজ ও সভ্যতার বিচার করতে পারেন। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাদটিকা এখানে উদ্ধৃত করব। এই পাদটিকায় মার্কস্ বলেছেন : "জীবন-ধারণের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব বিকাশ ও বিলোপের সঙ্গে জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা ক'রে ডারুইন্ প্রাকৃতিক টেক্‌নোলজির ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষের জীবন-সংগ্রামের উপাদান ও উৎপাদনের হাতিয়ার, যে-হাতিয়ার সকল শ্রেণীর মানবসমাজের একমাত্র বাস্তব বনিয়াদ, তার ইতিহাস কি এই

একই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় ? ভিকো বলেছেন মানবেতিহাস ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের ইতিহাস মানুষেব হাতে গড়া আর প্রকৃতির ইতিহাস তার হাতে গড়া নয়। মানবসমাজের 'টেক্‌নোলজির' ইতিহাস সেই কারণে কি প্রাকৃতিক টেক্‌নোলজির ইতিহাসের চাইতে লেখা আরও সহজ নয় ? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিচয় দেয় 'টেক্‌নোলজি', তার জীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও উৎপাদিকা-শক্তির অব্যর্থ নির্দেশ দেয় 'টেক্‌নোলজি'। তারই আলোকে আমবা মানুষের সমাজ-জীবন এবং এই সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে গ'ড়ে ওঠা মনোজগতের আসল রূপ দেখতে পাই।" ছক্ কেটে দেখালে মার্কসের এই দৃষ্টি কোন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

মানসলোক (সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবন)

মানব-সমাজ (সমাজ-গঠন, পরিবার, রাষ্ট্র)

যন্ত্রলোক (টেক্‌নোলজি : আদিম হাতিয়ার (Tools), আধুনিক যন্ত্র (Machine) পর্যন্ত
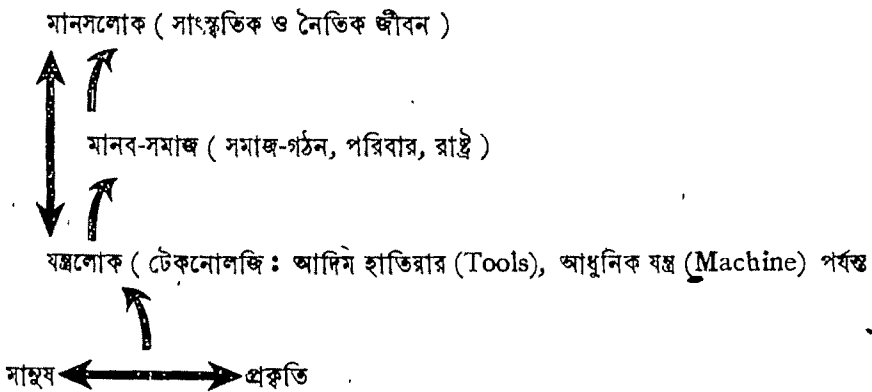
মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত থেকে 'যন্ত্রলোকের' উৎপত্তি। প্রকৃতিকে জয় করার, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা এই যন্ত্রলোকের মধ্যেই জান্‌তে পারব। এই যন্ত্রলোকই হ'ল মানবসমাজের বনিয়াদ। যে-হাতিয়ার বা যন্ত্র দিয়ে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, জীবিকা উৎপাদন করছে, সেই যন্ত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করছে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধের 'ফ্যাক্‌সিমিলি' হ'ল পরিবার (Family), আর তারই 'ক্লোজ্ আপ্' সমাজ ও রাষ্ট্র (State)। এই সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের, এই পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে 'মানসলোক' অর্থাৎ মানুষের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আদর্শ। মানুষের জীবন-সংগ্রামের, মানুষের সমাজের একটা সুসমন্বিত রূপ ফুটে উঠ্‌ছে মানসলোকে এবং সেখান থেকে রূপায়িত হচ্ছে সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে। এই মানসলোকের মারফৎ উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ তার জীবনসংগ্রামের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও উপাদান, তার সংগ্রামের রীতি ও পদ্ধতি, তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিচয় লাভ করছে, এবং সেই শক্তিতে শক্তিবৃদ্ধি ক'রে সে যুগ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং 'যন্ত্রলোক' আর 'মানসলোকের' সঙ্গে যান্ত্রিক সম্বন্ধ আর থাকছে না, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং 'মানসলোকে' তার নিজস্ব শক্তি ও গতিবেগ অর্জন করছে, যে-শক্তি যুগে যুগে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। 'মানসলোকেরও' (Ideology) বনিয়াদ তাই 'যন্ত্রলোক' (Technology) হলেও, যন্ত্রলোকের প্রতিচ্ছবি 'মানসলোক'

নয়, এবং দু'য়ের মধ্যে নিছক যান্ত্রিক সম্বন্ধও নেই। 'যন্ত্রলোক' যেমন প্রধানত 'মানস লোকের' রূপ-নিরূপণ করছে, তার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, তেমনি 'মানসলোকও' আর একদিক থেকে যন্ত্রলোককে প্রভাবিত করছে। এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই মানুষের বাস্তব ইতিহাস রচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্টাকেন্‌বুর্গের কাছে লেখা এঙ্গেল্‌সের পত্র (২৫ শে জানুয়ারী, ১৮৯৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে এঙ্গেলস্ বলেছেন : "রাজনৈতিক, নৈতিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, ও সাংস্কৃতিক আদর্শের বনিয়াদ হ'ল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। কিন্তু এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও যুগপৎ ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ-জীবনের বিকাশ হয়, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাত অর্থনৈতিক কাঠামোকেও আঘাত হানে।" (Marx-Engels Selected Correspondence)

গর্ডন চাইল্ড তাঁর What Happened In History গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এই বলে যে, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁরা নাকি আদর্শলোক বা মানসলোকের (Ideology) স্বতন্ত্র সত্তা ও শক্তিকে স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেছেন যে, মার্কসবাদীরা স্বীকার না করলেও তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে অচল ও জীর্ণ আদর্শবাদ দীর্ঘকালব্যাপী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের পথে কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে উঠ্‌তে পারে। মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে গর্ডন্ চাইল্ডের এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত—আগে সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। মার্কসবাদীরা একশ'বার মানসলোকের 'স্বতন্ত্র শক্তিকে' স্বীকার করেন। তাঁরা একথাও কোনোদিন ভুলে যান না যে অচল আদর্শবাদ অনেক সময় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে বাধা দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু অচল আদর্শবাদ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, সেই হেতু মার্কসবাদীরা একথা কখনই স্বীকার করবেন না যে সেই অচল আদর্শবাদের অবসান সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তন সাধন ভিন্ন সম্ভব। সুতবাং অচল আদর্শবাদকে পরাজিত করতে হলে শুধু অচল আর সচল আদর্শবাদের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সংগ্রামকে পরিচালিত করতে হবে সমাজের পুরাতন, জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ চূর্ণ ক'রে নূতন বনিয়াদ গঠন করার দিকে। অচল অর্থনৈতিক কাঠামোর অবসান হলে অচল আদর্শবাদ ইত্যাদি উপরের যা কিছু আবর্জনা তা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যা জীর্ণ, যা রুগ্ন তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। মানসলোকের স্বতন্ত্র বা একক সত্তাকে মার্কসবাদীরা স্বীকার করেন না কিন্তু তার ভার ও তার স্বাধীন শক্তিকে সর্বদাই স্বীকার করেন। নূতন আদর্শবাদ যেমন নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভিন্ন পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না, ব্যাপকতা ও সমগ্রতা লাভ করতে পারে না, তেমনি পুরাতন জীর্ণ আদর্শবাদও পুরাতন অর্থনৈতিক বনিয়াদের বুকের উপর স্বাভাবিকভাবে অবলুপ্ত হতে পারে না। মার্কসবাদীরা তাই 'আদর্শবাদ' বা 'মানসলোকের' স্বাধীন শক্তি ও প্রবল প্রভাবকে স্বীকার করেও তার স্বতন্ত্র, একক, নিরপেক্ষ সত্তাকে স্বীকার করেন না।

প্রারম্ভে যদিও মিঃ গর্ডন্ চাইল্ড মার্কস্‌বাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন, তাহলেও একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে তাঁর আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে

তাঁর বিরুদ্ধে মার্কস্‌বাদীদের বিশেষ কোনো অভিযোগ থাকবে না। কারণ তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তাঁকে 'near Marxist' বললেও আদৌ ভুল হয় না। আদিপ্রস্তর যুগ থেকে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা পর্যন্ত ইতিহাস তাঁর "What Happened in History' গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই ঐতিহাসিক ধারা তিনি বাস্তব জগতের 'human technology'র সাহায্যেই বিচার করেছেন এবং মার্কস্‌বাদীদের 'ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা' সম্বন্ধে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও, তিনি নিজেই সেই ব্যাখ্যাকে তাঁর গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এখানে আদিপ্রস্তর যুগ থেকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন গর্ডন্‌ চাইল্ড তাঁর প্রথম গ্রন্থের মধ্যে এবং তাঁর পরবর্তী দুটি গ্রন্থের (Progress and Archaeology এবং The Story of Tools) বিষয়বস্তু এক হলেও আলোচনার ধারা স্বতন্ত্র। 'Progress and Archaeology'-র মধ্যে তিনি অধ্যায়গুলিকে ভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। প্রথমে 'প্রত্নবিদ্যা' সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তারপর 'খাদ্যের সন্ধানে', 'হাতিয়ার, যন্ত্র ও উৎপাদন', 'বাসস্থান', 'সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও বিকীরণ', 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', 'উৎসর্গ ও মন্দির-নির্মাণ, এবং 'প্রগতির ফলাফল'—এইভাবে অধ্যায়গুলিকে ভাগ ক'রে আদিপ্রস্তর যুগ থেকে প্রধানত লৌহযুগ পর্যন্ত তিনি মানব-সভ্যতার অর্থনৈতিক কাঠামো, তার উৎপাদন-যন্ত্র ও পদ্ধতির বিকাশ, বাসগৃহ-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যাদু-পূজাপার্বণ-উৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার সংস্কৃতির বিকাশ, সভ্যতার বিস্তার এবং উপসংহারে প্রগতির মোট ফলাফল কি তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম গ্রন্থে যে ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে এক-একটি যুগ ধরে আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় গ্রন্থে সভ্যতার 'নানাদিক' থেকে তাকে বিচার করা হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ 'The Story of Tools' ব্রিটেনের 'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের' অনুরোধে লেখা এবং এর মধ্যে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে 'হাতিয়ারের' ক্রমবিকাশের উপর। অর্থাৎ সভ্যতার প্রগতি বিচার করার যে প্রধান মাপকাঠি 'টেক্‌নোলজি' তারই ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে তৃতীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলেও প্রথমেই 'The Story of Tools' পাঠ করা হয়ত উচিত হবে না। সমালোচনার জন্য বইগুলিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে সেইভাবে পর পর পাঠ করলে পাঠকেরা বেশি উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি।

গ্রাহাম ক্লার্কের 'From Savagery to Civilisation' গ্রন্থের বিষয়বস্তু এক হলেও, গর্ডন্‌ চাইল্ড ও মিঃ ক্লার্কের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আদিপ্রস্তর যুগ থেকে ব্রোঞ্জযুগ, অর্থাৎ মিশরে ও সুমেরে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ পর্যন্ত মিঃ ক্লার্ক আলোচনা করেছেন। কিন্তু ব্রোঞ্জযুগের টেক্‌নোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের জন্যে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয় নীল, টাইগ্রিস্‌-ইউফ্রেতিস্‌ ও আমাদের ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীরে, তার আলোচন-প্রসঙ্গে তিনি কেন সিন্ধু-সভ্যতার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না তা জানি না। মিঃ ক্লার্ক আদিপ্রস্তর যুগের সভ্যতার প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। নব্যপ্রস্তর যুগের টেক্‌নোলজিক্যাল্‌ বিপ্লব যার ফলে কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ, প্রভৃতির উদ্ভব হয়, বিশদভাবে সেই বৈপ্লবিক যুগের আলোচনা মিঃ ক্লার্ক তাঁর গ্রন্থের মধ্যে করেননি। মিশর ও সুমের সভ্যতার আলোচনাও যথেষ্ট নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে

মিঃ ক্লার্কের আলোচ্য গ্রন্থের এই ত্রুটি সর্বপ্রথম নজরে পড়ে। এছাড়া গর্ডন চাইল্ডের লেখার যে প্রসাদগুণ আছে, তাঁর যে কল্পনা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে সভ্যতার ইতিহাস প্রত্যেকটি যুগের বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে সমগ্রতা লাভ করে, জীবন্ত হয়ে ওঠে। মিঃ ক্লার্কের সে-শক্তি, গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী কোনটাই নেই। তাঁর এই 'যান্ত্রিক' দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর গ্রন্থের মারাত্মক ত্রুটি বলে আমার মনে হয়েছে। প্রত্যেক যুগের টেক্‌নোলজি, ইকনমি ও কাল্‌চার সম্পর্কে (বিশেষভাবে আদিপ্রস্তর যুগের) আলোচনা করলেও এই 'যান্ত্রিক' দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাঁর ইতিহাস শেষ পর্যন্ত 'ক্রনিকল্' ও 'ক্যাটালগেই' পরিণত হয়েছে। আদিপ্রস্তর যুগের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ফাটল ধরল কেন, তার মধ্যে বিরোধ দেখা দিল কোথায়, কেন প্রথম সামাজিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব্য-প্রস্তর যুগের আবির্ভাব ও প্রভাব বিস্তার সম্ভব হ'ল, সে-সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'আদিপ্রস্তর যুগ' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করেননি। নব্য-প্রস্তর যুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ কোথায়, সেই বিরোধের ফলে কিভাবে তার ভাঙন ধরল, এবং ধাতুযুগ বা তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের আবির্ভাব হ'ল সে-কথাও তিনি বলেন নি। ব্রোঞ্জযুগের বিরাট সমৃদ্ধিশালী সভ্যতা কেন পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ স্থানে, নদী-উপত্যকায় গড়ে উঠলো, সেই সভ্যতায় কেন রাজা-রাজড়াদের, ফারাওদের একাধিপত্য ও দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সমাজে নূতন শ্রেণী-বিন্যাস কিভাবে দেখা দিল, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রসার কি কারণে সম্ভব হ'ল এবং অবশেষে কেনই বা ব্রোঞ্জযুগের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিরোধ দেখা দিল, সে-ইতিহাসও মিঃ ক্লার্ক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর গ্রন্থের পরিসর সংকীর্ণ হলেও তিনি প্রত্যেকটি আলোচ্য যুগের প্রতি সুবিচার করতে পারতেন। কারণ তিনটি মাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগ নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। সেইজন্যই মিঃ ক্লার্কের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়, যদিও তথ্য-সংগ্রহে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলি সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিলাম বলা চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বোধ হয় নূতন জাতীয়তা বোধের প্রেরণায়, এইদিকে ভারতের বিদ্যোৎসাহীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকলেও এবং ভারতের বিদ্যোৎসাহীরা স্বতন্ত্রভাবে অনেক মূল্যবান গবেষণা করলেও, এখনও সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল বলা চলে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া, বা তাদের কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ববোধ বিদেশী সরকারের না থাকাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে যদি স্বাধীন জাতীয় গবর্নমেণ্ট এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা আশা করতে পারি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হবে এবং আরও অনেক বেশি উৎসাহ পাবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিচয় যতদিন না স্পষ্টভাবে আমরা জানতে পারব ততদিন ভারতবর্ষের প্রকৃত 'ইতিহাস' রচনা করা সম্ভব হবে না। ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজভাবে করতে হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলি থেকে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় এবং

ইতিহাসের স্বরূপ তার মধ্যেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেইজন্যে বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রাগৈতিহাসিক যুগই হ'ল প্রশস্ত ক্ষেত্র। ভারতীয় প্রাগেতিহাস সম্বন্ধে যেটুকু গবেষণা বা অনুসন্ধান করা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে প্রস্তরযুগের কথা বলতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভূবিদ্‌রা যেসব পাথুরে হাতিয়ার সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো ভারতবর্ষেও প্রস্তরযুগের আবির্ভাব হয়েছিল। ব্ল্যাণ্ডফোর্ড, বল্, লোগান্ প্রমুখ ভূবিদ্‌রা আদিপ্রস্তর যুগের নানারকম হাতিয়ার ভারতবর্ষ থেকে আবিষ্কার করেন, কিন্তু রবার্ট ব্রুস্ ফুট্ মাদ্রাজে ভূবিদের কাজে নিযুক্ত থাকার সময় এই শ্রেণীর হাতিয়ারের সবচাইতে বেশি সন্ধান পান এবং তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতের আদিপ্রস্তর যুগের একটা ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন এই হাতিয়ারগুলির সাহায্যে। তারপর ভূবিদ্ কোগিন্ ব্রাউন্, নৃবিদ্ ডাঃ পঞ্চানন মিত্র ও অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এইসব নিদর্শনের উপর মোটামুটি নির্ভর ক'রে 'প্রাগৈতিহাসিক ভারতের' পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেসব পাথুরে হাতিয়ার এঁদের প্রধান উপাদান হ'ল সেগুলি সবই প্রায় ভূপৃষ্ঠের উপরে নদীর চড়ায় অথবা পাহাড়ের কোলে পাওয়া যায়। তৎকালীন জন্তু জানোয়ার, উদ্ভিদ্ বা আদিমানবের কঙ্কাল তখনও পাওয়া যায়নি এবং পাথুরে হাতিয়ারগুলির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়নি বলেই আদিপ্রস্তর যুগের ইতিহাস অনেকটাই অনুমান ও কল্পনা-সাপেক্ষ ছিল এতদিন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এই অভাব দূর হয় আমেরিকার কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ও ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হেলমাট্ ডি টেরা ও পেটার্সনের দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীরে ও হিমালয়ের পাদদেশে ১৯৩৫ সালে ভূতাত্ত্বিক অভিযানের ফলে। হিমালয়, সিন্ধু ও কাশ্মীর উপত্যকায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পর ডাঃ টেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারতের চারটি প্রধান হিমযুগের (Glacial Ages) আবির্ভাব হয়েছিল। অত্যাধুনিক যুগের (Pleistocene) প্রাথমিক, মধ্যম ও শেষ স্তরে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিমযুগের আবির্ভাব হয়। এই হিমযুগের ক্রমাবর্তনের ধারার সঙ্গে ডাঃ টেরা ভারতের আদিমানব ও তার আদিম সংস্কৃতির অর্থাৎ আদিপ্রস্তর যুগের ক্রমবিকাশের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় হিমযুগ ও নাতিশীতোষ্ণ যুগ (Inter-Glacial Epoch) থেকে মহেঞ্জ-দড়ো ও হড়প্পা পর্যন্ত সংস্কৃতির বিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের নির্দেশ পাওয়া যায় বলে ডাঃ টেরা মন্তব্য করেছেন (De Terra & Patersonএর Studies in Ice Age in India and Associated Human Cultures" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ডি টেরা ও পেটার্সনের অনুসন্ধানের পর ভারতীয় আদি-প্রস্তর যুগের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে। কাশ্মীর অবশ্য ভারতবর্ষের একটা অংশ বিশেষ। আরও অনেক নদী-উপত্যকায় আজও ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়নি। ডি টেরার অনুসন্ধানের পর ভারত গবর্নমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন। ১৮৯৩ সালে ব্রুস্ ফুট যেখান থেকে অনেক পাথুরে হাতিয়ার সংগ্রহ করেছিলেন, ভারত গবর্নমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ 'ডেকান্ কলেজ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের' সহযোগিতায় সেই সবরমতী ও গুজরাটের অন্যান্য নদী-উপত্যকায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁদের অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপর আরও অনেক আলোকসম্পাত করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

নব্য-প্রস্তরযুগের নিদর্শন ভারতবর্ষে যা আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তাই দিয়ে আমরা সেযুগের ইতিহাস সহজেই রচনা করতে পারি। তাছাড়া ভারতের আদিম জাতি, কোল্-ভিল্-ওরাঁও-মুণ্ডা ইত্যাদির মধ্যে আজও এই নব্য-প্রস্তরযুগের সভ্যতার যে প্রমাণ ও পরিচয় রয়ে গিয়েছে তাও এই ইতিহাস রচনার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। তারপর আসে তাম্র-প্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগ, অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব ৩০০০-২৫০০ বছরের ইতিহাস। মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পার লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কারের পর সেই ইতিহাসের নিশ্চিত পরিচয় আমরা পেয়েছি। যদিও আজ পর্যন্ত সিন্ধু-বর্ণমালার (Indus Script) পাঠোদ্ধারে সব পণ্ডিত একমত হতে পারেননি, তাহলেও একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মিশর ও সুমের সভ্যতার সমসাময়িক হ'ল হড়প্পা-মহেঞ্জদড়োর সভ্যতা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানও যথেষ্ট ছিল, যার ফলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সিন্ধু-সভ্যতা যে প্রাগার্য (Pre-Aryan) ও প্রাক্-বৈদিক (Pre-Vedic) সভ্যতা তাও আজ অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তারপর আর্যদের আগমন ও বৈদিক যুগ থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত (যখন থেকে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হল বলা চলে) ইতিহাস আজও সম্পূর্ণরূপে রচিত হয়নি, কারণ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক গবেষণা হয়নি এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের উপর (এই ইতিহাসের উৎস-স্বরূপ) সম্পূর্ণ নির্ভর করাও সম্ভব হয়নি। এদিক দিয়ে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত রায়চৌধুরীর "Political History of Ancient India" এবং ১৯৪১ সালে প্রকাশিত মেহেতার "Pre-Buddhist India" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়সওয়াল, প্রধান প্রমুখ বিখ্যাত ভারতবিদ্দের গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগ থেকে মৌর্য যুগ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি লৌহযুগ (Iron Age) বলতে পারি। এই যুগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উদয় হয় ইয়োরোপে, সমাজে দাসপ্রথা (Slavery) ও ছোট ছোট গণরাষ্ট্রের প্রবর্তন হয়, বিজ্ঞান ও দর্শন সমৃদ্ধ হয় এবং তারপর দাসপ্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ এই বিরাট সভ্যতার অবনতি ও অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু ইয়োরোপের প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মতো আজও আমাদের প্রাক্-মৌর্য যুগের ইতিহাস রচিত হয়নি। যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাতে আমরা এই যুগের সমাজ ও সভ্যতার একটা চলনসই খস্ড়া করতে পারি মাত্র।

মোটকথা, গবেষণার অভাবে ভারতীয় প্রাগেতিহাস আজও স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক যুগগুলির সঙ্গে 'টেক্‌নোলজিক্যাল্ ক্রমোন্নতির' সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে আজও আমরা আদিপ্রস্তর যুগ থেকে তথাকথিত ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে পারিনি। কোন কোন জায়গায় আজও ফাঁক রয়ে গিয়েছে। এই ফাঁক ভরাট করা দরকার। কিন্তু তাহলেও প্রাগৈতিহাসিক ভারতের একটা 'কাঠামো' আজ আমরা নিঃসন্দেহে রচনা করতে পারি। ভারতবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় আজ পর্যন্ত যা গবেষণা হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে হলে এই গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। এই দিক দিয়ে "ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের" সম্পাদক মিঃ ডাণ্ডেকার একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য, প্রাকৃত, সংস্কৃত, প্রাগেতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ভাষা, পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি ভারতবিদ্যার

বিভিন্ন শাখায় গত ২৫-৩০ বছরের মধ্যে যা গবেষণা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় Progress of Indic Studies (1917-1942) গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত ক'রে তিনি ভারতের প্রত্যেক বিদ্যোৎসাহীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারত গবর্নমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ পূর্বে মধ্যে মধ্যে 'রিপোর্ট' ও 'মনোগ্রাফ্' প্রকাশ ক'রে তাঁদের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলাফল জানাতেন। সম্প্রতি গত বৎসর থেকে Ancient India নাম দিয়ে একটি ক'রে ষাণ্মাসিক বুলেটিন এই বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁদের এই নূতন পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। আজ পর্যন্ত দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম সংখ্যায় মিঃ স্টুয়ার্ট পিগটের "The Chronology of Prehistoric North-West India' প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে মিঃ পিগট্ প্রধানত মৃৎপাত্রের রং ও নক্সার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হড়প্পা-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার সঙ্গে ঈরান ও মেসোপোটামিয়ার তৎ-কালীন সভ্যতার তুলনা করেছেন এবং তাদের ক্রম (Sequence) নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় দক্ষিণ ভারতের একটি নবাবিষ্কৃত "রোমক-ভারতীয়" অঞ্চল সম্বন্ধে বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সংখ্যাতে বলা হয়েছিল যে, ভারতের প্রস্তর-যুগ সম্বন্ধে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে, কিন্তু তা করা হয়নি। এর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ভারতের প্রস্তর যুগ, তাম্র-প্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগ লৌহযুগ ও প্রাক্-মৌর্য যুগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার দিকে যদি এই বিভাগের কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেন তা হলে ভারতীয় প্রাগেতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অনেকের জাগতে পারে এবং Ancient India প্রকাশ করাও সার্থক হতে পারে।

বিনয় ঘোষ

পাঠক-গোষ্ঠী

[পৌষের 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' বিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের কাছ থেকে কয়েকটি পত্র পেয়েছি। এখানে তার দু'টি প্রকাশিত হল। সম্পাদক, পরিচয়।]

শ্রদ্ধাস্পদ

পরিচয়-সম্পাদক

সমীপে,

মহাশয়,

পৌষের পরিচয়ে আপনি 'প্রভাতী' পত্রিকায় লিখিত শ্রীসুবোধ দাশগুপ্তের "নূতন সাহিত্য" প্রবন্ধে নির্ণীত দু'টি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা আহ্বান করেছেন।

সুবোধবাবু সাহিত্য থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিতে ঠিকই ব'লেছেন এবং ভগবানকে মেনে নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল ক'রতে হবে। বিপ্লব ভেঙে ফেলতে চায় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে, সংস্কার করতে নয়। যা আছে, তাতে ভালমন্দ দুই-ই আছে। ভালকে রেখে মন্দকে বিনাশ করার প্রয়াসকে সংস্কারপন্থীরা মানতে পারেন, কিন্তু বিপ্লবী জানে একটাকে রেখে আর একটাকে ভাঙা যায় না—দু'টোই যে অবিচ্ছেদ্য—অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে—জট্‌ছাড়ানো শক্ত। এতে ভয়ের নেই এইজন্যে, যেটা সত্যিকারের ভাল এবং সেই হিসেবে মানুষকে অনেকখানি গ্রাস করে রেখেছে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা প্রকাশ পাবেই—নতুনতর রূপে। সুতরাং রবিঠাকুরকে বাতিল ক'রতে আপত্তি কেন? তাছাড়া, একটা নিয়ম বেঁধে দিলে—সেটা যদি 'ষ্টিম-রোলার'-এর মত না চলে, ব্যক্তি-বিশেষকে অব্যাহতি দেয় ত কায়েমী-স্বার্থ বা vested interestকে প্রকারান্তরে জীইয়ে রাখা হোলো। রবিবাবুর শিল্পী হিসেবে দাম কমছে না, তাঁরই কথিত

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ক্রোধ তারে যেন তৃণসম দহে"

বাণীর প্রয়োগটা তাঁরই বেলায় খাটাবো না কোন্ যুক্তিতে? যে 'সেন্টিমেন্ট' আপনার আহত হ'চ্ছে, তার জেরে দেখ্‌বেন শেষপর্যন্ত গাঁয়ের একটি ঠগকেও বাছা চ'ল্‌বে না। অথচ নির্মূল করার ব্রত নেওয়া হোলো।

এখানে আপনার ভয় আরও একটু ভাঙা দরকার ১৯৩০ সালে রবীন্দ্র-পরিষদের সভা তাঁরই বিচিত্রা গৃহে তিনি ডাকেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হোলো সাহিত্যে শাশ্বত মানদণ্ড আছে কি না যাতে কোন্ সাহিত্য চিরকাল থাক্‌বে ব'লে দেওয়া যাবে। তিনি বল্লেন, তা অসম্ভব। জীবন গতিশীল, সে এক বস্তুকে একই ভাবে চিরকাল আঁকড়ে থাকতে পারে না। আজ পর্যন্ত

কালিদাস, সেক্‌স্‌পীয়র বেঁচে আছেন বলা যায়, অথচ কত পরে এসে কিপলিং কত দ্রুত মারা গেলেন। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, তিনিও জানতেন, চিরকাল তাঁর সাহিত্য থাকবে না—। তিনি বলেছিলেন তা। আমি উপস্থিত ছিলাম সে সভায়।

সুবোধবাবুর দ্বিতীয় নীতিটিও নির্ভুল। 'নেতি' দিয়ে বিপ্লবের শুরু। 'এও' তো অনেক দূরে। সুতরাং ভাঙার পরে একথা ভাববার দরকারই নেই যে, কোন্ নীতিটা মানবো। নীতি যদি কিছু থাকে তো সে পুরোনোকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ ভাঙার কাজটাই হবে নীতি।

"নির্জলা ব্যক্তিবাদ" কথায় কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে, এটুকু জানি, বর্তমান ইনস্টিটিউসনগুলো ভেঙে নিঃশেষ ক'রে দিলে যা বেঁচে থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তি। নূতন সৌধ গড়ে উঠবে তাদের নিয়ে নূতন ক'রে। ঐ ব্যক্তিটি চাপা পড়ে আছে আজ ইনস্টিটিউসন-এর চাপে। তাকে খুঁজে মুক্তি দেওয়াই গোড়ার কথা। গড়বার কথায় সুবোধবাবু আসেননি এখনো, কারণ, সে কাজটা দরকার হবে ভাঙা শেষ হলে। তার ঢের সময় পাওয়া যাবে। তার নেতা জন্মাবে ভাঙার কাজে যারা মাতবে তাদের ভেতর থেকেই।

এখানে একটা কথা বলে শেষ করি। 'প্রগতিশীল' কথাটা সংস্কার-গন্ধী—সুতরাং বর্জনীয়। 'প্রগতিশীল' সাহিত্যিকের কর্ম নয় ঈশ্বর বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার শ্মশান যাত্রা করা। তাঁরা 'ঈশ্বর', 'ভাল', 'নীতি'—সবই মানবেন। খালি, তাঁদের মাঝে যেটুকু মন্দ তাকে বাদ দিয়ে। সুবোধবাবু বোধ হয় চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যের সূচনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রদ্ধেয় 'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

পৌষের পরিচয়ে আপনার পত্রিকা-প্রসঙ্গ আলোচনা পড়লাম। আধুনিক সাহিত্যের যে-ধারাটি বহু তর্কের পর অনেকেই গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে তর্কের পুনঃপ্রবর্তন করায় সত্যই বিস্মিত হয়েছি। সে যা হোক, বিশেষ করে সুবোধবাবুর কথা-বার্তার অন্ধতামসিকতা আমাকে হতবুদ্ধি করেছে। এর চেয়ে তাঁর কথায় আমল না দেওয়াই হয়ত ভালো ছিল। কিন্তু আপনারা যখন আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কে সুবোধবাবু যে-দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে বিচারের ক্ষেত্র থাকায় আমি কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্ভব ও তার প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে সুবোধবাবু বোধ হয় পূর্ণমাত্রায় সচেতন নন। এই সঙ্ঘ যখন গঠিত হয় তখন তার নাম ছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। কারণ তখন পৃথিবীতে মানব সভ্যতার প্রধান শত্রু হিসাবে ফ্যাসিজম্ তার কুটিল ফণা বিস্তার শুরু করেছিলো। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এক কথায় মানুষের সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক জীবনের (spiritual life) প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ফ্যাসিজম্। সুতরাং উক্ত সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে, বিশেষ করে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ফ্যাসিস্টসুলভ মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করা। এঁদের কাজ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফ্যাসিজম্‌কে প্রতিরোধ করার

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যুগোপযোগী প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিকাশের কাজেও অগ্রণী হন। এ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলার সংস্কৃতিতে বিশেষ করে সাহিত্যে পুরাতনী মনোবৃত্তিকে কাটিয়ে তাকে নূতনতর অভিজ্ঞতার পথে চালনা করা এবং এক সুস্থ সবল সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করার পথেই এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়ে ওঠে। এর ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অতীতকে উত্তরাধিকার হিসাবে নিয়ে ভবিষ্যৎএর নব সার্থকতার পথে পা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজজীবনের গণমুখী ধারাটিরও পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। ফ্যাসিজম্‌-এর প্রধান আক্রোশ শোষিত জনগণের উপর। সুতরাং এই শক্তির প্রতিরোধে জনগণের স্বার্থকেই সফল করে তোলা হয়েছে এবং একমাত্র তাদেরই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর নির্ভর করা হয়েছে। অতএব, রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে অপূর্ণতার আক্ষেপ প্রকাশ করে অথ্যাতজনের যে-কবিকে আহ্বান করে গিয়েছিলেন তারই সাক্ষাৎ মেলে ফ্যাসিজম্‌-এর পরে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে।

আজকাল কংগ্রেসসাহিত্য সঙ্ঘের প্রচেষ্টাকে বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল আন্দোলন হিসাবে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। এবং এরই জন্য প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে। আমার মনে হয়, সুবোধবাবু এই দলেরই প্রতিভূ। তাঁর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সম্বন্ধেও যেমন কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই, তেমনি কংগ্রেসসাহিত্য সঙ্ঘকেও তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য, প্রগতিসাহিত্য হতে পারে কিন্তু কংগ্রেসী সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই। প্রগতিসাহিত্য আন্দোলনের পেছনে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও আধুনিক যুগের জীবনবোধের কড়া তাগিদ কাজ করছে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা সাহিত্যকে যুগোপযোগী পর্যায়ে এনে তার গতিধর্ম বজায় রাখা, তাকে সজীব করে তোলা। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে কংগ্রেসী সাহিত্য কথাটি নিছক সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসী মতবাদের পূর্ণ সার্থকতা থাকলেও সাহিত্যে তা অচল।

সুবোধবাবু বলেছেন যে, সাহিত্যের প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে হোলে বিপ্লবের প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রচেষ্টার পেছনে, কি বিপ্লবী প্রয়োজন বা তাগিদ নেই ? সুবোধবাবু হয়ত না বলতে পারেন, কিন্তু সকলের পক্ষে ও-কথা বলার মত বুদ্ধির ধৃষ্টতা এখনও হয়নি। প্রগতিশীল সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন বা করছেন তাঁদের যে কেবলমাত্র এক বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তা নয়। আসলে তাঁদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে আধুনিক সমাজজীবনের মূলে। ধনী দরিদ্রের এই বৈষম্যমূলক অবস্থায় সাধারণ মানুষের অপমান তাঁদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে তাঁরা এই বিভেদের কৃত্রিমতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছেন। সুতরাং আধুনিক প্রগতিবাদী লেখকরা যখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থা.রীতিনীতিকে কাটিয়ে নূতন পথের নূতনতর অভিজ্ঞতার সন্ধানী হচ্ছেন তখন তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে বিপ্লবী প্রয়োজন বা তাগিদ যে নেই তা কি করে বলা সম্ভব ?

এর পর সুবোধবাবু উপরোক্ত বিষয়েরই সুর টেনে কতকগুলি কথা বলেছেন। সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ধার করা বিদ্যে নিয়ে প্রগতিশীল হওয়ার প্রহসন, সাহিত্যের শ্লোগান সর্বস্বতা ও দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা। এই অভিযোগগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তাই উত্তরও আমি

একসঙ্গে দেবার চেষ্টা করব। আজকে যে-সমস্ত লেখক প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁদের পেছনে নিশ্চয়ই সমাজসচেতন মনের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। এখন এই সমাজসচেতনতা শুধুমাত্র একটা মতবাদ নয়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে হোলে যাঁদের মঙ্গলের জন্য আমরা আগামী দিনের সমাজকে রূপায়িত করতে চাইছি সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হবে, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে হবে। এরই ফলে সমাজ-সচেতনতা শুধুমাত্র মতবাদ হিসাবে থেকে তার সঙ্গে আন্তরিকতার সংযোগ হবে। আর উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই আন্তরিকতাকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারলে প্রগতিশীল আন্দোলন সত্যই সার্থক হবে। অন্যথায় প্রত্যক্ষ সংযোগ ও উপরোক্ত আন্তরিকতার অভাবে সুবোধবাবু যে দোষগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি দেখা দেবে।

তারাশংকর মানিক বন্দোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ এবং সর্বাধুনিক ননী ভৌমিকের গল্প-উপন্যাসে আমরা এই আন্তরিকতার অভাব দেখি না। এই সমস্ত লেখক সব সময়ই আধুনিক জীবনের মূল সুরের সন্ধান করে চলেছেন এবং এই পরীক্ষার পথে তাঁরা সব পরিশ্রমই স্বীকার করেছেন। আমরা কি সত্যই বলতে পারি যে, এঁদের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রগতিশীলতার প্রহসন, শ্লোগান সর্বস্বতা ও দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট? এঁরা প্রত্যেকেই নিপীড়িত মানুষের হৃদস্পন্দন অনুভব করে তাকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং এদের মুক্তিকে সর্বমানবের মুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ যদি দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা হয় তো হোক। প্রগতিশীলতার প্রহসন এঁরা করছেন না, করছেন তাঁরা—যাঁরা এই নূতন আবহাওয়ায় পুরাতনকে পরিত্যাগ না করে মুখরক্ষার খাতিরে প্রগতির মুখোশ পরে জনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছেন। এঁদের সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সহমর্মীতার কোনো বালাই নেই। নিজেদের অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন হওয়ায় এঁরা কতকগুলি মেকি জিগির তুলেছেন।

এখন সুবোধবাবু সমালোচনার যে দুটি ধারার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি বিচার করা যাক। প্রথমে তিনি বলছেন সমালোচনার নীতি হিসাবে বস্তুবাদকে চরম সত্য হিসাবে মেনে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করে আমরা প্রগতির প্রথম লক্ষণ হিসাবে মার্ক্সীয় মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি। আর মার্ক্সীয় মতবাদে বস্তুকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার ভিত্তি হিসাবে বস্তুবাদকে গ্রহণ করায় কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। আসল বাধা দেখা দেয় এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে আমরা লেখকের কাছে কোনো মতাবলম্বীতাব দাবী করতে পারি না। সাহিত্যিকের রচনা কেবলমাত্র তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের তালিকা হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়। এজন্যই এঙ্গেলস বলেছিলেন: "The more the views of the author remains hidden, the better for art," তাঁর মতে বালজাকের রচনাই বাস্তবতার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন কারণ, এখানে লেখকের ব্যক্তিগত মতবাদ চরম জয়লাভ করেনি।

এঙ্গেলস আরো বলেছেন: "but even socialist novelist, did not have to propound their views in novels. It is enough for them to depict real conditions faithfully and thus destroy the conventional illusions and at

the same time arouse doubts concerning the eternal validity of the existing order. This aim could be attained without directly presenting the reader with a solution of these problems and, in certain cases, even without indicating where the sympathy of the author lay. সুতরাং বস্তুবাদী সমালোচনার নীতিকে গ্রহণ করে সব সময়েই উপরোক্ত দোষগুলিকে কাটিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় বস্তুবাদ আমাদের কাছে হাতিয়ার হিসাবে না থেকে আমাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুবোধবাবুর মতে সমালোচনার দ্বিতীয় মাপকাঠি হচ্ছে কোনো রকম প্রভুত্ব না মানা। একথা একেবারেই অসত্য। কোনো কিছুকে না মানা একমাত্র এ্যানার্কিস্টদের পক্ষেই সাজে। কিন্তু এ্যানার্কিজমকে ত আজ প্রগতিশীল মতবাদের ক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হয় না। কথাটা অবিশ্যি খুব রোমান্টিক—কোন প্রভুত্ব না মানা! আসলে কিন্তু ঐ স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। সমাজবিবর্তনের ধারা হিসাবে ভবিষ্যৎএর আদর্শসমাজ সাম্যবাদীসমাজ রূপেই গঠিত হবে। সুতরাং আজকের সাহিত্যিক যখন সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও দুঃখ কষ্টের অবসান চাইছেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বমানবের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা তখন তাঁকে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আনুগত্য মেনে নিতেই হবে। আর এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সাহিত্য রূপায়িত হবে। সমালোচনার ক্ষেত্রে ঠিক এই কথা খাটে। এখানে নীতিকে না মানার কোনো প্রশ্নই ওঠা সম্ভব নয়। বিশেষত, যখন আমাদের আকাঙ্খিত বস্তু এখনও নাগালের বাইরে থেকে গেছে।

আলোচনা শেষ করতে গিয়ে একটি কথা বলব। অপ্রীতিকর হোলেও আশা করি সুবোধবাবু বোঝবার চেষ্টা করবেন। আধুনিক সাহিত্যের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে ঝপ্ করে কোনো মত প্রকাশ করা একমাত্র নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। মত প্রকাশের শুরুতে বহু বিষয় ভাববার রয়েছে, বহু পঠনপাঠন ও আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। সুবোধবাবু যদি একেবারেই পুরোপুরি রায় না দিয়ে এগুলি বোঝবার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়ত তিনি এভাবে আত্মপ্রকাশ করতেন না, আর আত্মপ্রকাশ করলেও, তাঁর মতবাদে এতটা যুক্তিহীনতা ও অপরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যেত না। ইতি। ২৮শে পৌষ, ১৩৫৩

বিনীত,
প্রভাতকুমার দত্ত

সম্পাদক
হিরণকুমার সান্যাল
গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং
৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৫৩

ভারতে নারী মুক্তি আন্দোলন

কথারম্ভ

মানুষের সমাজব্যবস্থার বিকাশ পৃথিবীর সব দেশে এক তালে চলেনি। বিভিন্ন দেশে তার তাল আর লয়ের পার্থক্য সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কোনো দেশ এই বিকাশের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে—আবার কোনো দেশ রয়েছে বিস্তর পেছিয়ে। আন্দামানের নেগ্রিটো আর সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের জীবনযাত্রার যে বিভিন্নতা তার পরিমাপ করতে গেলে বড় বড় বেশ কয়েকটা ধাপের হিসাব নেবার দরকার হয়ে পড়ে। সমাজব্যবস্থার এই পার্থক্যের ফলে স্বভাবতই তাদের রাজনীতি, দর্শন থেকে শুরু করে আচারব্যবহার সব কিছুতেই (এক কথায় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসাবে মানস সম্পদে) এই পার্থক্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এর একটা ফল দাঁড়ায় এই যে, কোন দেশের বা জাতির কি বৈশিষ্ট্য তার দিকেই ঝোঁক পড়ে আমাদের বেশি—অথচ এই বৈশিষ্ট্যের তলায় তলায় একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যের যে স্রোত বয়ে চলেছে সেটা সাধারণত থেকে যায় দৃষ্টির অন্তরালে। অবশ্য সকল দেশেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা থেকে যখন অতিমাত্রায় স্বদেশভক্তরা প্রচার করতে শুরু করেন যে তার দেশ অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সুতরাং সমাজবিকাশের মূলগত ধারা সম্বন্ধে নিয়মগুলো অপরের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হলেও তার এখানে খাটবে না, তখন কথাটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রথমে মনে রাখা দরকার যে, খুঁটিনাটি এবং ছোট খাট বিষয়ে প্রত্যেক দেশের 'নিজস্ব' বিকাশভঙ্গি থাকলেও সমাজবিকাশের সাধারণ ধারা থেকে কোন দেশই স্বতন্ত্র, ছন্নছাড়া কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে সমাজব্যবস্থা এবং তারই ফল হিসাবে সংস্কৃতির বিকাশের বৈশিষ্ট্য যেমন আলোচনা করতে হবে তেমনিই এর মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে উদাসীন হলে চলবে না।

নারী আন্দোলন সম্পর্কেও এ কথা সর্বাংশে প্রয়োগ করা চলতে পারে এবং এর হেতুও সুস্পষ্ট। নারী আন্দোলন সমাজব্যবস্থার রূপান্তরেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মাত্র। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দেশে উৎপাদন প্রণালীর ক্রমবিকাশের ফলে সমাজের যে পরিবর্তন এসেছে নারীর ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই হিসাবে নারী মুক্তি আন্দোলন সামাজিক মুক্তি আন্দোলনেরই একটা বিশেষ অংশ। তবু এই অংশকে অন্য অংশের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার যথেষ্ট আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর

একটা কারণ এই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর বর্তমান শোষিতের অবস্থা প্রায় শুরু হয়েছে সমাজে শ্রেণীবিভেদ আত্ম-প্রকাশের সময়। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের পরেই পুরুষ কর্তৃত্ব পাকাপাকিভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং নারীকে গ্রহণ করতে হয়েছে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিকা। অবশ্য ব্যাপারটা সব সময় নিতান্ত শান্তভাবে হয়নি—এই অধিকার বজায় রাখবার জন্য সে সংগ্রাম করেছে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে। তবু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এল তার প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। প্রথমটি ঘটবার পর দ্বিতীয়টিকে ঠেকিয়ে রাখার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, থাকতেও পারে না। তারপর থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একদিকে যেমন শুরু হল নিম্নবর্গের উপর নির্যাতন, তেমনি অন্যদিকে চলল নারী জাতির উপর আধিপত্য। দু'টিরই কারণ অর্থনৈতিক। শ্রেণী হিসাবে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের উপর শোষণ করতে সক্ষম হয় এই কারণে যে, তার হাতেই উৎপাদন যন্ত্র রয়েছে, স্ত্রীর উপর পুরুষের আজকের দিনে আধিপত্যের হেতু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষই অর্থ সংগ্রহ করে, তার ওপরই সংসার ভরণপোষণের ভার। স্বভাবতই সেই হয় সংসারে দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। বৃহত্তর শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণীসম্পর্ক বিদ্যমান, পরিবারের মধ্যেও তারই ক্ষুদ্র একটা সংস্করণ খুঁজে পাওয়া যায়। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন : Within the family he is the bourgeois and the wife represent the proletariat.

বস্তুত শ্রেণীসংঘর্ষের সঙ্গে এই নারী মুক্তি সমস্যার সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে সমাজ-বিকাশের উৎকর্ষের ব্যারোমিটার হিসাবে একে ব্যবহার করলে অন্যায় হয় না। বরং সেটাই উচিত। এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে ভারতবর্ষ, বৃটেন-আমেরিকা, এবং সোভিয়েট দেশের নারীর স্থানের কথা স্মরণ করলে। আমাদের দেশে এখনও সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের শেষ বোঝাপড়া হয়নি চরমভাবে—এর ফলে দেখি আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের মেয়েরা নূতন প্রথা গত কলেজে যায়, লেখাপড়া শেখে, ট্রামেবাসেও ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তবু পুরানো সংস্কার এখনো রয়েছে—সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যে একেবারে কেটে যায়নি তার পরিচয়ও একেবারে অপ্রতুল নয়। মেয়েদের চাকরী করতে দেখলে, অনেক "আধুনিক"পন্থীকেও বিব্রত বোধ করতে দেখা যায়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য এভাব ক্রমেই বিলুপ্ত হতে চলেছে; আমাদেরও অর্থনৈতিক কারণে অবস্থাটা ধাতসহ হয়ে আসছে। বৃটেন-আমেরিকার মত ধনতান্ত্রিক দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকার—সেখানে নারী অনেকাংশে পুরুষের সমান সুবিধা ভোগ করে। তবু সেখানে সত্যকার নারীর স্বাধীনতা নেই—অবস্থাটাও সেখানে স্বাভাবিক বলা চলে না। আমাদের দেশের চেয়ে সে সব দেশের মেয়েরা অবশ্য অগ্রসর কিন্তু তাদের আন্দোলনটা আবার ভারসাম্য হারিয়ে ঝুঁকে পড়ছে উৎকটভাবে অন্যদিকে। আমেরিকায় কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদের একটা অর্থই কেবল সম্ভব—সেটা হল এই যে, ধনতন্ত্রের পীঠস্থানে আধুনিকরা সত্যকার স্বাধীনতার স্বাদ পাননি, তাদের প্রয়াসটা স্বাধীনতার বিকৃতি। অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে নারীকে যে ভোটাধিকার পুরুষের সমান দেওয়া হয়নি সেদিন পর্যন্ত, সে কথা ছেড়ে দিলেও, যখন দেখা যায় মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নারীকে পণ্যে পরিণত করা হয়, তখনই এই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার বুর্জোয়া সমাজে নারীর কুলটাবৃত্তিতে

সমাজের নীতিজ্ঞানে আঘাত লাগে না; তাদের ব্যবস্থা, কুলটাবৃত্তিরও একটা 'লাইসেন্স' থাকা দরকার,—এটা না থাকলেই যত আপত্তি! যে সমাজে নারী নিজের দেহ দারিদ্র্যের তাড়নায় পণ্যের মত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, সে সমাজে কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকলেও নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা যে আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বোঝবার জন্য অসাধারণ বুদ্ধির দরকার লাগে না। মানুষের ইতিহাস কালে দেখি এক সোভিয়েট ইউনিয়নেই সর্বপ্রথম নারী-পুরুষের সত্যকার অধিকারসাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারণ, সেখানে শুধু পুরুষ নয়, নারীও অর্থনৈতিক দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে; অভাবের তাড়নায় সেখানে নারীকে আত্মবিক্রয় করতে হয় না, পুরুষের মত নারীও সেখানে সামাজিক উৎপাদনের অংশীদার; তাই যে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বলে পরিবারের মধ্যে পুরুষই ছিল প্রধান, সে কর্তৃত্বের আজ অবসান হয়েছে। অর্থাৎ কথাটা এই: নর-নারীর সম্পর্কে যে ভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে সমাজের প্রগতিও চলেছে তার সমান্তরালভাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াপত্তন

এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার পর ভারতে নারী আন্দোলনের বিকাশধারাব দিকে নজর দিলে অবস্থাটা পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়। ইয়ুরোপে ধনতান্ত্রিক যুগেব গোড়াপত্তনের সময় সামন্ততন্ত্রের আমলের অসূর্যম্পশ্যারা স্বাধীনতার প্রথম কলকাকলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া আন্দোলন এদেশেও প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার গোড়াপত্তন করে। অবশ্য ইয়ুরোপ ও আমাদের দেশে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল, সেটা পরে বলছি। তবে গোড়া থেকেই এ কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব মুহূর্তে এদেশের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে নারীর যে স্থান ছিল তাকে আর যাই বলা যাক স্বাধীনতা বলা চলে না। হাজার শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেও এই সহজ সত্যকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। চিরকাল অবশ্য সমাজে একই অবস্থা ছিল না, কিন্তু ইংরাজ আগমনের পূর্বে সমাজরক্ষকদের মনোভাব ছিল এই যে, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার কখনই হয় না। সনাতন হিন্দু পরিবারে যে ভাবে গঙ্গা স্নানার্থে মেয়েদের পাল্কী করে নিয়ে গিয়ে পাল্কী শুদ্ধ চুবিয়ে আনার প্রথা ছিল তাকে মধ্যযুগের ইয়ুরোপে মেয়েদেব অবস্থার সঙ্গে অনেকটা তুলনা করা যেতে পারে।

বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে ইংরাজ আমলের বুর্জোয়া চিন্তাধারার সংঘাতেই এদেশে সত্যকাব নারীর অবস্থার পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল। এর পূর্বে বাইরের থেকে বড় রকমের আঘাত এসেছিল আর একবার—সেটা মুসলমান বিজয়ের সময়। ভারতবর্ষ কোন দিনই এই নূতন বিজেতাদের আত্মসাৎ করতে পারেনি একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, ইসলামের সংস্কৃতিও ভারতের পূর্বতন সংস্কৃতিকে ভেঙেচুরে দিয়ে তার ওপর নিজের জয়টিকা পরাতে সক্ষম হয়নি—পরবর্তী কালে যেটা সম্ভব হয়েছিল ইংরাজ বিজেতাদের পক্ষে। এর কারণ অবশ্য আছে এবং সেটা একেবারে ঐতিহাসিক। ইসলামী সাম্যবাদ সত্ত্বেও যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে ইসলামের জন্ম তা ভারতের সমাজব্যবস্থা থেকে উন্নত ধরনের তো ছিলই না, বরং তাকে পশ্চাৎপদ বলা চলতে পারে। এ রকম

অবস্থায় উন্নত সামরিক শক্তির বলে ভারত দখল করলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরাতন ব্যবস্থার উপর জয়লাভ করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। তাই কালক্রমে হিন্দু উচ্চবর্ণ এই নবাগত মুসলমানদেব সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিল—মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যেও সৃষ্টি হল অভিজাত শ্রেণী। ইসলামের সাম্যবাদ ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে কেবল কথা মাত্রে পর্যবসিত হল। প্রথম দিকে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, সুদে টাকা ঋণ নেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামের যে তীব্র বিরুদ্ধতা ছিল তার বিশেষ কোন মূল্যই রইল না। ("But as Islam spread through the world, it was seized by all the vices of feudalism and its democracy and equality became purely formal."—S. A. Dange—Literature and the People.)। ভারতের উন্নত সমাজযাত্রার ব্যবস্থা ইসলামকে আত্মসাৎ করতে না পারলেও—তার প্রগতিমূলক ধারার বলিষ্ঠতাকে মিইয়ে দিতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া, নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টি বিশেষ উদার ছিল তা বলা চলে না। আদৎ এবং শরিয়ৎ উভয়েই বিধান দেওয়া আছে যে স্ত্রীলোকের পরামর্শ ব্যতিরেকেই তাকে কেনা কিংবা একজন পুরুষের হাত থেকে অন্য পুরুষের হাতে স্থানান্তরিত করা চলবে। পর্দাপ্রথা ইসলামের বিধানে খুবই কড়াকাড়ি। ইসলাম বিজয়ের ফলে নারীর অবস্থা যে খারাপ হয়েছে আগের চেয়ে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মধ্য এশিয়ার তাজিকস্তানে ইরানী আদিবাসীদের মধ্যে নারীর অবস্থা ইসলামের বিজয়ের আগে যে রকম ছিল ইসলাম বিজয়ের পরে তার চেয়ে খারাপ দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থার অবনতি মোল্লা, ব্যবসাদার, কর্মচারী এদের মেয়েদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল খুব দ্রুতগতিতে, কিন্তু পার্বত্য কিসান এবং স্তেপভূমির যাযাবরদের মধ্যে এ অবনতি হয়েছিল ধীরে ধীরে। কারণ এই যে, যাযাবরদের মধ্যে পরিবারে স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল কিন্তু শহরের লোকদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক কোন ভূমিকা বিশেষ ছিল না। (দ্রষ্টব্য "Dawn Over Samarkand"—Joshua Kunitz)। এই অবস্থায় ভারতে মুসলমান বিজয়ের ফলে নারীর অবস্থার কোন উন্নতি কেন ঘটল না তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ভারতে ইংরাজ আগমন ছিল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ভারতের নূতন বিজেতারা যে সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছিল তা ভারতের সমাজযাত্রার ব্যবস্থার সম পর্যায়ভুক্ত নয় তার চেয়ে আর এক ধাপ ওপরে। এই নূতন শাসকদের সংস্পর্শে এসে ভারতে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হল তাঁরাই সত্যকার নারী মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন ইয়ুরোপের মত।

অবশ্য ইয়ুরোপের সঙ্গে এদেশের তৎকালীন অবস্থার একটা মূলগত পার্থক্য ভুললে চলবে না। এদেশে বুর্জোয়া আন্দোলন মাটির ভেতর শিকড় গেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারেনি, বিদেশী শিক্ষার মারফৎ এসেছিল। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার এইটাই ছিল একটা প্রকাণ্ড অন্তর্বিরোধ। বাঙলা দেশেই এই নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাই বাঙলার কথা মনে রাখলেই ভারতের বৃহত্তম পটভূমিকা বুঝতে পারা যাবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে এসে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এমন ব্যবস্থা করল যাতে এদেশে শিল্পোন্নতি না ঘটে। এই ব্যবস্থারই আর একটা দিক হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি।

প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থা ধ্বংস হল, পল্লী-শিল্প নির্জীব হল কিন্তু নূতন শিল্প সৃষ্টির কোন পথ উন্মুক্ত রইল না। নূতন যে বাঙালী বণিক শ্রেণী আপনা থেকে গড়ে উঠছিল তাদের বণিক পুঁজি বিস্তারের পথ হল অবরুদ্ধ—কেবল টাকা খাটানোর একটি পথ ছিল, তা ভূমিতে।

এই ভাবে ভারতে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রতিকূলতা নূতন বিলাতী শাসকেরা করল বটে কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আবার ফল হল উল্টো। এদেশে শাসন ও শোষণ যন্ত্র সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এদেশীয় কেরানী না হলে চলবার কোন উপায় ছিল না। সেকেলে ইংরেজী প্রথায় এখানে শিক্ষাব্যবস্থা চালাবার যে আয়োজনের সূত্রপাত করলেন তার মূলে ছিল এই বৃটিশ শোষণযন্ত্রের উপযুক্ত কেরানী তৈরী করাই। এর অধিক কিছু নয়। কিন্তু সে সময়কার বিলাতী সংস্কৃতি শিক্ষা ইত্যাদি তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রগতিশীল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থারই একটা ফল। তাই এদেশের নূতন মধ্যবিত্তের দল কেরানীগিরির আগ্রহে শুধু যে ইংরেজী শিখল তাই নয়, শিখল আরো অনেক কিছু বেশি। যে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে ওঠার পথ নূতন বৃটিশ শাসকেরা সর্বপ্রকারে তখন বন্ধ করছিল ঠিক সেই বুর্জোয়া সমাজেরই মানস সম্পদের আওতায় ভারতবাসী মানুষ হতে লাগল। এক হাত দিয়ে যে সম্পদ থেকে ইংরাজ বেনিয়ার দল আমাদের বঞ্চিত করেছিল আর এক হাত দিয়ে তাই দান করল তারা। আমাদের দেশের তখনকার নবজাত মধ্যবিত্তের দল সাগ্রহে এই বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে আপনার করে নেবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও শুরু হল ভারতের বুর্জোয়া আন্দোলনের পর্যায়। ইয়ুরোপের মত এদেশেও নারী মুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল এই বুর্জোয়া আন্দোলনের ফলে। তবে পার্থক্যটাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইয়ুরোপের বুর্জোয়া আন্দোলন ছিল সেখানের উৎপাদন শক্তির ক্রমবিকাশেরই প্রত্যক্ষ ফল; আমাদের দেশের আন্দোলনের মাটিতে কোন শিকড় ছিল না, বিলাতের সমাজব্যবস্থার ফলে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল আমরা রস সংগ্রহ করলাম তাই থেকে। তবু সেটা যে বুর্জোয়া আন্দোলনই এবং বুর্জোয়া আন্দোলনের নারী মুক্তির ধারা তারই স্বাভাবিক পরিণতি একথা ভুললে চলবে না।

নব্য-প্রাচীন সংঘাত

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই যে নারীর স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হল এর নেতা অবশ্যই পুরুষেরা ছিলেন এবং এটা প্রধানত চারিটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে: (১) সতীদাহ নিবারণ, (২) বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, (৩) স্ত্রী শিক্ষা, (৪) বহু বিবাহ নিবারণ। এর প্রত্যেকটি ধারা নিয়ে নূতন বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের শব রক্ষকদের সংগ্রাম কিরকম তীব্র আকার ধারণ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র পাতায় পতায়। নব্যপন্থীরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন এই প্রাচীন ঘুণ ধরা ব্যবস্থার আবর্জনা নির্মম হস্তে ঝাড়ু দিয়ে সাফ করতে না পারলে নূতন কিছু গড়ে তোলার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর এবং পরে বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই চেষ্টাই দেখাে যায়। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের শব রক্ষায় যাদের কায়েমী স্বার্থ প্রচুর তাঁরা সনাতন ধর্ম ইত্যাদির নামে নূতন

ব্যবস্থার প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হলেন এবং পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে নানাবিধ আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণ খুঁজে বার করার তোড়জোড় করলেন।

রামমোহন রায়ই প্রথম বুঝেছিলেন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। ইংরাজ শাসনের এই প্রগতিমূলক দিকটা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। তিনি আরো বুঝলেন যে সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি সামন্ততন্ত্রের যে নিগড়ে নারী সমাজ তখন আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্তি না দিলে এই সংস্কার আন্দোলন থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। ইয়ুরোপে বুর্জোয়া আন্দোলনের ইতিহাস থেকে রামমোহন সামাজিক বন্ধমূলক কুসংস্কার দূর করার কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। রামমোহন প্রথম স্মরণ করিয়ে দিলেন যে স্ত্রীলোককে বুদ্ধিহীনা বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া পাগলামি। তিনি লিখলেন, "বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী)। বস্তুত এই থেকেই হল সূত্রপাত। তারপর একদিকে ব্রাহ্ম-সভাপন্থী আর একদিকে ধর্মসভাপন্থীদের বাকবিতণ্ডা কিরকম তীব্র আকারে চলল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুই তরফের মুখপাত্র তৎকালীন কাগজগুলিতে। নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের মুখপাত্র হিসাবে "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকৃতির প্রয়োজনে লেখেন, "জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এ মত কখন মনে করেন নাই যে, একজন অন্যজনের দাস হইবে কিংবা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী এবং দয়াল তাঁহার এ মত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্য জনের দাস হইবে। কিন্তু মানুষের শঠতা ক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।" (জ্ঞানান্বেষণ—১৮৩৭)। মনে রাখা দরকার মিলের "Subjection of Women" তখনও বার হয়নি।

এইভাবে নূতন বুর্জোয়া ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্তের দল যখন ব্রাহ্ম সভার ভিতর দিয়ে হিন্দু সমাজের জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায় কাঠামোর উপর আঘাত করছিলেন তখন পুরাতন সমাজকে আঁকড়ে থাকার জন্য ধর্মসভার মারফৎ প্রতিপক্ষ সনাতন প্রথার নামে এঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে লাগলেন। এ থেকে অবশ্য মনে করার কোন কারণ নেই যে, হিন্দু ধর্মের জন্য এই শেষোক্ত দলের সত্যকার কোন অনুরাগ ছিল কিংবা এঁরা ইংরাজ শাসকদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বরং সে সময়ের বিভিন্ন পত্রিকার বিবরণ থেকে উল্টা কথাই প্রমাণিত হয়। তবু এঁরা যে হিন্দু ধর্মের নামে প্রাচীন ব্যবস্থাকে সংরক্ষণের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন তার কারণ অতি সহজ এবং সরল। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে তাঁদের স্বার্থ জড়িত ছিল কোন না কোন রকমে। তাই এঁরা স্ত্রী শিক্ষার ভীষণ বিরুদ্ধতা করতেন—তবে তার যুক্তি ছিল একমাত্র এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা করেননি আমরাই বা তা করব কেন? স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনই নেই—তাদের একমাত্র কর্তব্য পতির সেবা করা, তাহলেই স্বর্গে যাবার পথ তাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে—স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই ছিল ধর্ম সভাপন্থীদের যুক্তি!

সতীদাহের মত অমন বর্বর প্রথার অবসান ঘটাতে রামমোহন কি অসাধারণ বাধাবিঘ্নের

সম্মুখীন হয়েছিলেন তা স্মরণ করলে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে এই বিরুদ্ধতায় আশ্চর্য হবার কারণ নেই। সতীদাহ প্রথা রোধ হলে সমাজে অনাচার যে একেবারে ছেয়ে যাবে এ বিষয় হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীদের কোন সন্দেহ ছিল না। বস্তুতপক্ষে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নারীর প্রতি এমন চরম অবজ্ঞা, সন্দেহ ও অত্যাচারের নিদর্শন অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তন্ত্রধারকবর্গ একদিকে মনু থেকে "যত্র নার্যস্তু পুজ্যন্তে"—বলে শাস্ত্র কপ্‌চাতেন, আব অন্য দিকে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মুণ্ডপাত করে লিখতেন, "যদিও কয়েক মাসে অন্যান্য কয়েকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে—সে সকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কয়েকজন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে অপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রী শ্রীযুত (সরকার) জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ।" (সমাচার চন্দ্রিকা ১৮৩৫)। এইভাবে অন্ধ কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের আবর্জনাকে সযত্নে লালনপালন করার প্রয়াস কেবলমাত্র স্ত্রী শিক্ষা এবং সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রইল না। কুলীন প্রথার, বহু বিবাহের ভয়াবহ অবস্থা ও বিধবা-বিবাহ না থাকায় সমাজে অনাচার, অত্যাচারএর সীমা পরিসীমা ছিল না। সমাজের গতি তাই হয়ে পড়েছিল রুদ্ধ, স্ত্রীলোকের হিন্দুসমাজে মর্যাদা কাহিনী হয়েছিল শুধু লোক ভুলানো গালগল্প, নারীর সতীত্ব প্রভৃতি নিয়ে যে বাগাড়ম্বর শোনা যেত তার লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। সনাতনপন্থীরা এ সব নীরবে হজম করে নিতেন, সংস্কারের কোন চেষ্টা করতেন না কারণ তাহলে তাদের কৌলিন্যের ব্যবসা নষ্ট হবে। ইংরাজী শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্তের দল এ সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুললেন যখন তখন এই সনাতনীরা যে ক্ষেপে উঠ্‌লেন তাতে আশ্চর্য হবার তাই হেতু দেখা যায় না। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহু বিবাহ নিবারণ করে সামাজিক অনাচার দূর করার চেষ্টার সূত্রপাতে তাই ধর্মসভাপন্থীরা ব্রাহ্মসভাপন্থীদের বিরুদ্ধে যত তীব্র ভাবে পেরেছেন বিষোদ্‌গার এবং কুৎসা রটনা করেছিলেন। মৃতপ্রায় সমাজব্যবস্থার কর্ণধারদের এই অস্ত্র চিরদিনের।

তবু সত্যকথা বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসভাপন্থীদেরই জয়লাভ ঘটল। হিন্দু সমাজ নূতন শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলে যে তার সংস্কার প্রয়োজন, তা না হলে তার মৃত্যুও অনিবার্য। এতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মসভাপন্থীরা হিন্দু-মুসলমানের যে সংস্কারের আবশ্যকতা নিয়ে আন্দোলন করছিলেন সেই উদ্দেশ্যেই বাঙলার 'কালচারের' তৃতীয় ধাপে হিন্দু সমাজের মধ্যেই অনেক এগিয়ে এলেন—এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। নূতন সংস্কৃতি বিস্তারের দ্বিতীয় পর্বে (ইয়ং বেঙ্গল) নব্য শিক্ষকেরা কেবল ইংরাজী চালচলনের, আচারব্যবহাব, আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত হয়েছিলেন। ফলে তাল রাখতে না পেরে তাঁরা নিজেরাই তলিয়ে গেলেন—বাঙলার সমাজকে টেনে তুলতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখেছিলেন, নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্থায়িত্ব দিতে হলে এদেশের সঙ্গে তার নাড়ীর টান থাকা আবশ্যক। বাংলাভাষার মারফৎ পাশ্চাত্য শিক্ষাদান ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে তিনি যে বিরাট পরিবর্তন আনলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাম মোহন পর্বের প্রবর্তিত স্ত্রী শিক্ষা এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সজীব করে তাকে

বাস্তবিক কার্যকরী করে তোলায় ঈশ্বরচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য। ১৮৫০ খ্রীঃ পূর্বে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট নিজে কিছু করতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল বিষয়টা তাঁদের কর্তব্যের অন্তর্গত নয়। আলোচনা ও আন্দোলনের স্তর পার হবার পর রাজা রাধাকান্ত দেবের মত কয়েকজন এবং মিশনারীরা স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর জানতেন, বাইরে পড়বার জন্য মেয়ে পাঠাতে হিন্দুদের আপত্তি কতখানি হতে পারে তবু তিনি স্থির বুঝেছিলেন স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের কখনো উন্নতি হতে পারে না। তাঁরই চেষ্টায় আর যত্নে গভর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে শেষে সম্মত হলেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মত কি ছিল তা নিম্নোক্ত উক্তিটি থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে—"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়। দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।" (বিধবা বিবাহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।) অবশ্য সে সময় হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলদের আক্রমণ ঈশ্বরচন্দ্রকেও সহ্য করতে হয়েছিল তা আমরা ভাল করেই জানি। তবু একটা কথা সহজেই বলা চলতে পারে। ব্রাহ্মসভা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে সংস্কার করার যে দাবী তুলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দু সমাজ তার প্রায় সবগুলি মেনে নেয় বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক সমাজ নেতাদের নেতৃত্বে।

ফলাফল

উনবিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তি আন্দোলনের খতিয়ান করতে গেলে আমরা কি দেখতে পাই? সতীদাহ প্রথা গবর্নমেণ্ট আইন করে বন্ধ করে দিয়েছেন; কুলিনের বহু বিবাহ প্রথা অর্থনৈতিক কারণেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে,—সামন্ততন্ত্রের আওতায় নিশ্চিন্ত জীবিকা নষ্ট হওয়ার ফলে বহু বিবাহের সামর্থ্য আর অনেকেরই নেই; স্ত্রীশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে বটে কিন্তু বেশিদূর সেটা অগ্রসর হতে পারছে না; তা ছাড়া বিধবা-বিবাহ আইন করে প্রবর্তনের ব্যবস্থা হলেও সমাজে তা চলল না ভাল করে;—সেটা কেবল আইনেরই শোভাবর্ধন করতে লাগল—সমাজে বিধবা-বিবাহ হয়ে রইল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতে নবজাগরণের শেষ ও প্রধান প্রতিনিধি বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায়: "গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পোশাকী ধরনের। এই সংস্কারের চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় রমণীর কোন সম্পর্কই নাই। আর এতদবধি সকল আন্দোলনই সর্ব সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন তাহাদেরই জন্য। তাহারা নিজেদের ঘর শক্ত করিতে এবং বৈদেশিকগণের

নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই।" (ভারতীয় নারী—বিবেকানন্দ)। কিন্তু এ রকম হবার প্রকৃত কারণ বিবেকানন্দও সঠিক ধরতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন অধিকাংশ চেষ্টা যে কাগজে কলমের বেশি অগ্রসর হয়নি তার কারণ প্রকৃত ধর্মশিক্ষার ভিত্তিতে সেটা লাগানো হচ্ছে না।

অথচ আসল হেতু ছিল অন্য। সংস্কার আন্দোলন নিম্নবর্ণের নারীদের যে স্পর্শও করেনি তার কারণ অবশ্য এই যে, এর নেতারা ছিলেন সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। তাই সেই সমাজের সমস্যার প্রতিই প্রধানত তাঁদের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার আইনে পাস হওয়া সত্বেও কার্যে পরিণত না হবার হেতু খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের বুর্জোয়া আন্দোলনের মূলে যে আত্মবিরোধ ছিল সেটাই এর কারণ। গোড়াতেই একটা কথা বলা হয়েছিল যে, আমাদের বুর্জোয়া আন্দোলন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠেনি—সেটা বিলাতী বুর্জোয়া শিক্ষার দান হিসাবে আমরা পেয়েছিলাম। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে মানসিক। এর ফল দাঁড়াল এই যে, এদেশের বুর্জোয়া আন্দোলনের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য দেখে মোহিত হলেন কিন্তু বুঝলেন না যে, সেটা বিলাতের নূতন উৎপাদন ব্যবস্থারই একটা ফল এবং এদেশে ঐ বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে জীবন্ত করতে হলে সেখানের মত এ দেশেও উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর সংঘটিত করতে হবে। সুতরাং তাঁরা কেবল মানসিক সম্পর্কের দিকে ঝোঁক দিলেন, সমাজের বাস্তব রূপান্তরের প্রশ্ন তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেল। সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক যেখানে বহুলাংশে রয়ে গেল সামন্ততান্ত্রিক সেখানে কেবল আইন পাস করলেই পূর্বতন নারী-পুরুষের সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক সংস্কৃতির কর্ণধারেরা এ তথ্য উপলব্ধি করতে পারেননি তখন।

বিংশ শতাব্দীর রূপান্তর

বিংশ শতাব্দীতে এসে নারী আন্দোলনের আবার একটা রূপান্তর দেখা দিল; সেটা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই রূপান্তর ঘটল দুইটি ধারায়—যদিও দুইটি একই কেন্দ্র থেকে উদ্ভব। প্রথমত বিংশ শতাব্দীতেই প্রথম নারীরাই এগিয়ে এলেন নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে; দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী নিয়েও নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তি আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল এই যে, এই আন্দোলন পুরুষের প্রচেষ্টায় এবং আগ্রহে অগ্রসর হচ্ছিল এবং এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল সামাজিক অবস্থার সংস্কারের মধ্যে। এইটাই যে সে সময়কার অবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল তা অনুমান করা আজকের দিনে আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। নারী আন্দোলন নারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবার পূর্বে কতকগুলি প্রাথমিক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তখনকার দিনে ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে এই রূপান্তর সংঘটিত হবার হেতু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জীবন যাত্রার বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়ে যাওয়ার ফলেই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল।

বিলাতী বণিকদের কোন কালেই এ দেশে শিল্প বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই শিল্প বিস্তার কিছু পরিমাণে ঘটেছে। নিজেদের প্রয়োজনে ওয়েলেস্‌লির আমলে এদেশে রেল লাইন পাতা হল। কার্ল মার্কস তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই রেল লাইন পাতার ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা যা চায় না তাই হবে, ভারতেও আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করবে। বাস্তবিক পক্ষে বিংশ শতাব্দীতে ভারতে এক বিদেশীদের অধীনে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর মধ্যে তুচ্ছ করবার মত নয়। এই শিল্পযুগের উদ্ভবের জন্য শুধু নারী আন্দোলনের ধারাতেই রূপান্তর ঘটেনি, সমগ্র বুর্জোয়া আন্দোলনের ধারাতেই পরিবর্তন এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া আন্দোলন কেবল সামাজিক সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বলা যায়, ১৯০৫ থেকে ভারতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত। নারী সমাজ যে তাঁদের সামাজিক দাবী-দাওয়ার মধ্যেই সন্তুষ্ট না থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীও উত্থাপন করলেন তাও এই বৃহত্তর পরিবর্তনেরই একটা অংশ। ভারতে বুর্জোয়া আন্দোলন যতদিন কেবল সামাজিক সংস্কারের মধ্যেই নিজের সীমানা রচনা করেছিল, ততদিন নারী আন্দোলনের পক্ষেও সামাজিক সীমানা অতিক্রম সম্ভব হয়নি। ১৯০৫ সালে বুর্জোয়া আন্দোলনে সত্যকার একটা পরিবর্তন ঘটল; শুধু সামাজিক অধিকার নয়, রাজনৈতিক অধিকারও যে আয়ত্ত করা আবশ্যক বুর্জোয়া আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে বিষয়ে সচেতন হলেন। এর মূলে ছিল সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না, যখন আমরা দেখি স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বিদেশী বস্ত্র বয়কট করার ফলে বোম্বাই-এর নবজাত স্বদেশী শিল্প মালিকেরা কিরূপ প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। এর তালে তালে চলল নারী মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ। ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় মন্টেগু সাহেব এ-দেশে সফরে এলে মাদ্রাজে নারীদের পক্ষ থেকে একদল ভারতের স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দাবী করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়, এই দাবী প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতীয় নারীদের অনেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যা।

জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় নারী মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণের সম্পর্ক কিরূপ ঘনিষ্ট তা আর একটা কথা স্মরণ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় মহিলাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সৃষ্টি ১৯২৭ সালে। এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যের নারী প্রতিনিধিরা যাতে সংঘবদ্ধ ভাবে মতামত জ্ঞাপন করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা। রাজনীতি নিয়ে মাথাব্যথা করার কোন উদ্দেশ্য তখনও ঘুণাক্ষরে তাঁদের মনে আসেনি। এমন কি মহিলা সম্মেলনের নিয়মতন্ত্রের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধেই স্পষ্ট করে লেখা আছে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ১৯৩২ সালে মহিলা সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশন—"It was clearly seen that although the constitution of the conference debarred it from taking part in Party politics, it could not, if it were to perform its function of establishing women in their rightful position in the state and in society,

avoid concerning itself with politics in the widest sense of the term. (All India Women's Conference Report—Twelfth Session—Nagpur, 1937). নারী মুক্তি আন্দোলন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটা অংশ বিশেষ ভারতীয় মহিলারা এই সময় সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কিন্তু নারী আন্দোলনের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের এই পরিবর্তন কেন ঘটল তা চিন্তা করবার মত। এর একমাত্র হেতু ১৯২৭ সাল এবং ১৯৩২ সালের মধ্যে ঘটেছিল ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট জাগরণ। ১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ভারতেব এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি বিরাট আলোড়ন তুলেছিল,—যারা কোনদিন রাজনীতির ধার ধারত না এমন অনেকেও প্রথম সচেতন হয়ে উঠল রাজনীতি সম্পর্কে। সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টও এই আন্দোলন দমন করেছে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। এই রাজনৈতিক জাগরণেরই একটা ধারা হিসাবে তাই ভারতের নারী সমাজ বুঝেছিলেন যে, সমাজে নারীকে যদি নিজের স্থান করে নিতে হয় তবে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চললে তা সম্ভব হবে না কখনো। শুধু রাজনীতি নয়, তখনই হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের দাবীও (অর্থাৎ অর্থনৈতিক দাবীও) মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় রূপান্তর, পুরুষ নেতৃত্ব থেকে নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব নারীদের হাতে ন্যস্ত হওয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে কি রকম বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে স্ত্রী শিক্ষার গোড়া পত্তন হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। বিংশ শতাব্দীতে এই স্ত্রী শিক্ষার প্রসার আরো হল। হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৪-৩৫ সালে সমস্ত রকম স্কুল-কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৮, ৯০, ২৪৬ ; এই সংখ্যা ১৯৪১ সালে এসে দাঁড়ায় ৩৭, ২৬, ৮৭৬। ভারতের নারীর সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এই সংখ্যা যে একেবারেই যথেষ্ট নয় তা বলাই বাহুল্য। তথাপি এই শিক্ষা প্রসারে নারীরা যে শিক্ষা পেলেন তার ফলে তাঁরাই এগিয়ে এলেন নিজেদের সমস্যার সমাধানের আশায়। নারী আন্দোলনেব নেতৃত্ব নারীদের পক্ষে গ্রহণ করার বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। তা ছাড়া পুরাতন সমাজের জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরেছিল ; নূতন ধনতান্ত্রিক শিল্পযুগ আরম্ভের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটেছে তাতে অনেক হিন্দু পরিবারে স্ত্রীলোককেও নিজের ওপব নির্ভর করতে হয়। সামন্ততন্ত্রের আমলে জীবিকা অর্জনের যে স্থিরতা ছিল তা আজ আর নেই ; নূতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মধ্যবিত্তের জীবিকা অনিশ্চিত করে তুলেছে। ফলে একদিকে বহু বিবাহ তো রোধ হয়েছেই উপরন্তু আবার জীবিকার স্থায়িত্ব না থাকায় অনেক যুবকও বিবাহ কবতে সাহস পায় না। পূর্বে মেয়েদের বিবাহ যে ভাবে জীবিকার উপায় স্বরূপ ছিল আজ আর তা নেই ; অনেক শিক্ষিতা মেয়েই তাই নিজেরা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হয়ে বেরিয়েছেন চাকরী করতে। জীবিকার প্রয়োজনে নারী যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আয়ত্ত করল পুরাতন সমাজের বুকে তা একটি প্রচণ্ড আঘাত। নারী-পুরুষ সম্পর্কও এর ফলে পরিবর্তিত হতে বাধ্য ! যে পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থ রোজগার করে সে-পরিবারের ওপর পুরুষের আধিপত্যের বাস্তব ভিত্তিই নষ্ট হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নাই। নারী আন্দোলনের পুরোভাগে নারীরাই যে এসে দাঁড়িয়েছেন তার মূলেও এই স্বাবলম্বী মনোভাব বিদ্যমান।

রূপান্তরের হিসাব-নিকাশ

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের ফলে যেমন কিছু কিছু ক্ষমতার ছিটে ফোঁটা লাভ ভারতের উচ্চবর্গের ভাগ্যে জুটেছে, নারী আন্দোলনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতের নারী সমাজও আন্দোলনের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের সামান্য অংশ পেয়েছেন। সামান্য ভোটাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি তাঁরা পেয়েছেন। রাও বিল পাস হওয়াতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার আইনের মারফৎ ভারতের নারী সমাজের ভাগ্যে লাভ হয়েছে। কিন্তু এই সুবিধাগুলির স্বরূপ আলেচনা করলে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এর ফলে যাঁরা লাভবান হয়েছেন তাঁরা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রমণী। ভারতের অগণিত কৃষক-মজুর যেমন আজও রাজনৈতিক অধিকারের কণামাত্র থেকে বঞ্চিত তেমনি, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-মজুর মেয়েদের কোন সুবিধা এই সংস্কারের ফলে হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই থেকে আর একটা কথাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ভারতে মহিলা আন্দোলন এখনো বুর্জোয়া নেতৃত্বে রয়েছে— তার সংস্কারপন্থী মনোভাব তাই এখনো প্রবল।

রাও বিলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের উত্তরাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। এটা একটা প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং বিত্তবান ঘরের স্ত্রীলোকেরা এতে উপকৃত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক রমণীরা এতে লাভবান হবার মত কিছুই দেখতে পাবে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেশের এই শতকরা নব্বুই জন মৃত্যুকালে ছেলের জন্যই কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারে না; সুতরাং মেয়েদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সেখানে নিতান্তই অবান্তর। বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যাও বর্তমানে মূলত এই অভিজাতদের ও মধ্যবিত্তের সমস্যা। নিম্নবর্গদের মধ্যে সমস্যার প্রাবল্য তত নেই। এ থেকে অবশ্য কেউ যদি মনে করতে বসেন যে, এই সংস্কারের কোন আবশ্যকতা ছিল না তবে মস্ত ভুলই করা হবে। বুর্জোয়া আন্দোলনকে সম্পূর্ণ করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই ছিল; রাও বিলের বিরুদ্ধে প্রধানত সামন্ততন্ত্রের মৃতপ্রায় প্রতিনিধিদের চীৎকারই প্রমাণ করেছে ভারতে নূতন যুগের পক্ষে এই সংস্কার দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু নারী মুক্তি আন্দোলনের সার্থকতার বিচারে এর অসম্পূর্ণতা তা বলে আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। যেখানে সমাজের নির্যাতিতাদের একটা বড় অংশই পূর্বের অবস্থাতে রয়ে গেল সেখানে মুক্তি কখনই সত্যকার রূপ নিতে পারে না। তার বিকাশের ধারাও সেখানে স্তব্ধ হতে বাধ্য। নারী মুক্তি মাঝপথে কখনই থেমে থাকতে পারে না। তার বিকাশকে যদি সর্বাঙ্গীন করতে হয় তবে সমাজের প্রকৃত শোষিতের মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গেও তাকে সংযুক্ত হতে হবে। আমাদের বুর্জোয়া আন্দোলন বিলাতের বুর্জোয়া আন্দোলনের মানসপুত্র; নারী মুক্তি আন্দোলনের অভিজাত বংশীয়ারা সম্ভবত এখনো বিলাত ও আমেরিকার প্রেরণাকেই তাঁদের চরম আকাঙ্ক্ষা রূপে দেখে থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের রায় থেকেই আমরা জেনেছি যে, ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও নারীদের সত্যকার মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি—সেখানেও প্রকৃত অধিকার নানা ভাবে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে লাঞ্ছিত হয়। নারী মুক্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া চিন্তাধারার পর্যায়ের পরও এই ধারণার আরো বিবর্তন হয়েছে। সোভিয়েট বিপ্লব এবং সোভিয়েটের নূতন সংস্কৃতি বিশ্ব-মানবের সামনে দেখিয়েছে

মানব সমাজের এবং সেই সমাজের অংশ হিসাবে নারী সমাজের মুক্তি কোন পথে। ভারতের নারী আন্দোলনকেও তাই এই নূতন পথের পথিক হতে হবে; কিন্তু অভিজাত ও মধ্যবিত্তের পরিচালনায় মহিলা সম্মেলন যে এখনো এ-পথে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়নি, এই বৎসর সম্মেলনের অধিবেশনে তার পরিচয় পাওয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নারী মুক্তি আন্দোলনেও এক নূতন ধারার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

সমাজ বিপ্লব ও নারী মুক্তি

এই ধারাকে বুঝতে হলে প্রধান কথা যা মনে রাখা আবশ্যক তা এই যে, সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নেই, আজ এসেছে বিপ্লবী সংগঠনের যুগ। এই নূতন পরিবর্তন মনে রাখা খুব দরকার—অন্যথা নারী আন্দোলনের এই ধারার সত্যকার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী শুধু নারী আন্দোলনই নয়, সর্বপ্রকার আন্দোলনই ছিল মূলত সামাজিক এবং সংস্কারমূলক। বিংশ শতাব্দীতে আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ ধারণ করল বটে, কিন্তু সংস্কারমূলক প্রকৃতি তার পরিবর্তিত হল না। একথা নারী আন্দোলনের পক্ষেও যেমন সত্য, বৃহত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষেও তেমনি সত্য। কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বলা যায় যে, অসহযোগ আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত যে ক'টি বড় বড় আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তার কোনটিব উদ্দেশ্য বিপ্লব করা ছিল না; প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের সামনে নিজেদের শক্তির প্রাবল্য দেখিয়ে কিঞ্চিৎ সংস্কার আদায় করে নিতে। এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে আন্দোলন যখনই গণ-বিপ্লবে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে তখনই ঊর্ধ্বতম নেতারা আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দেবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই কারণেই প্রত্যেক আন্দোলনের ফলে ভারতের ভাগ্যে জুটেছে এক এক দফা সংস্কার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কার আন্দোলন প্রগতিমূলক ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই—কারণ তখন বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একথা আর বলা চলে না। বিপ্লবের পক্ষে আবশ্যক সর্বপ্রকার অবস্থাই আজ বিদ্যমান; সুতরাং এখনও যাঁরা সংস্কারের মাহাত্ম্য প্রচার করেন তাঁদের ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কথাটা এইখানে বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক। ভারতে জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের ফলে অভ্যুদিত নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী; যে পর্যন্ত সংস্কার আন্দোলন প্রগতিশীল ছিল ততদিন এই শ্রেণীও প্রগতিশীল ভূমিকা অভিনয় করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শত্রুদের সঙ্গে আপস রক্ষা করতে শুরু করেছেন। যে মুহূর্তে স্বাধীনতা আন্দোলন সংস্কারের চতুঃসীমা পার হয়ে বিপ্লবের রাজপথে পদার্পণ করতে উদ্যত তখনই বুর্জোয়া শ্রেণী যে এর বিরুদ্ধে নিজের শক্তি প্রয়োগ করছে তার কারণ অবশ্যই ভেবে দেখার যোগ্য।

কারণ আর কিছুই নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের নানা প্রকার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতে এক শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে—সৃষ্টি হয়েছে শক্তিমান পুঁজিপতির দল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারত প্রথম দেনাদার দেশ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে পাওনাদার

দেশ। এই সমাজব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন সহজেই অনুমেয়। ভারতের পুঁজিপতিদের মধ্যে দেখা দিয়েছে শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ—এই স্বার্থ এতই প্রবল যে, ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তাঁরা পশ্চাৎপদ নন। ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ—যার বিরুদ্ধে ভারতের বুর্জোয়ারা একদা সংগ্রাম করেছিলেন—আজ তারাই এঁদের আত্মীয়—তাদের সঙ্গে এক হয়ে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের নূতন দাবীদারদের নিষ্পেষণ করার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিপ্লবের বন্ধুর পথে পদক্ষেপ করে কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে তাঁরা নারাজ। পৃথিবীর ইতিহাসে এককালীন প্রগতিকামীদের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ এই নূতন নয়—অবশ্য সে কথা না বললেও চলে।

কিন্তু নেতার অভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন আটকে থাকতে পারে না; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও থাকবে মনে করার কারণ নেই। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্য এবার তাই অগ্রসর হয়েছে নূতন শক্তি—ভারতের অগণিত শোষিত কৃষক এবং শ্রমিক। আসন্ন বিপ্লবে এরাই নেতৃত্ব করবে অবস্থা দৃষ্টে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ দেখা যায় না। এই নূতন পরিবর্তন এবং রূপান্তর শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষেই নয়, ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনের পক্ষেও অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নারী মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ পূর্বেই সে আলোচনা করা হয়েছে। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন একটা মূলগত পরিবর্তনের সূচনা হল তখন নারী আন্দোলনেও তার প্রভাব না পড়ে পারে না। এই প্রভাব পড়বে কি ভাবে? এতদিন নারী আন্দোলন অভিজাত এবং মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে—এবার এই আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিক এবং কৃষক রমণীদের হাতেই যাবে বলে আমার ধারণা। ইতিহাসের গতিও সেই দিকে। পুরুষ ও নারীর অধিকার-বৈষম্য উচ্চস্তরে যত বেশি শ্রমিকদের মধ্যে তত নয়। কারখানায় পুরুষ এবং নারী শ্রমিক এক সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে—ধর্মঘটের সময়ও সংগ্রাম করে এক সঙ্গে। সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্য শ্রমিক শ্রেণী যখন অগ্রসর হবে তখন শ্রমিক নারীরাও হবে সেই নেতৃত্বের অংশ বিশেষ। এক্ষেত্রে একটা সমস্যা-সঙ্কুল প্রশ্ন অবশ্যই দেখা দিতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন, নারী সমাজ নিজেই যখন একটা শোষিত শ্রেণী বিশেষ তখন শ্রমিক কৃষকদের ন্যায় শোষিত শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমগ্রভাবে নারী আন্দোলনের সংযুক্ত হতে বাধা কোথায়? অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রমণীরা শোষিত নারী সমাজের অঙ্গ হিসাবেই নূতন ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হতে কেনই বা পারবেন না? একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কষ্টকর নয়। নারী সমাজ ব্যাপক অর্থে শোষিত সমাজ তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু এ কথা কেবল বলা চলে তখনই যখন আমরা নারী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের হিসাব গ্রহণ করি। কিন্তু যখন শুধু নারী সমাজের কথাই চিন্তা করি, তখন দেখি যে, এই সমাজের মধ্যেও আবার রয়েছে শ্রেণী পার্থক্য। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হন তাতে, নারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক এবং কৃষক মেয়েদের তাঁরা নিজেদের সঙ্গে এক দলে ভাবতে পারেন না। যে ভোগ-বিলাসের জীবনে তাঁরা অভ্যস্ত তাতে তাঁদের পক্ষে মনে করা কঠিন হয় যে, নিম্নস্তরের

নারীদের সঙ্গে স্বার্থ তাদের এক। শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের ফলে নারী সমাজের সত্যকার মুক্তি ঘটবে সে বিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই ; কিন্তু যে অভিজাত পরিবেশে উচ্চঘরের মহিলারা প্রতিপালিত শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবে সেই অভিজাত পর-শ্রমভোগী পরিবেশের অবসান অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই নিজেরা শোষিত হলেও অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মহিলারা শোষিত শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারেন না। পুরুষের সঙ্গে তুলনায় তাঁরা শোষিত, কিন্তু নিম্নবর্গের নারীদের সঙ্গে তুলনায় তাঁরা কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি।

কিন্তু নিম্নবর্গের নারীদের মুক্তি আন্দোলনে এ ধরনের কোন বাধা বা স্ববিরোধ নেই ; কারণ তাঁরা নিজেরাও শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীরই অন্তর্গত। শ্রমিক এবং কৃষকের সংগ্রাম তাঁদের মুক্তি আন্দোলনকে করে তুলবে প্রভূত শক্তিশালী—তাঁদের নিজেদের মধ্যে সঞ্চার করবে নূতন চেতনা—নূতন প্রেরণা। এই ধারণা যে কত সত্য ইদানীং ভারতীয় কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর যে সমস্ত বড় বড় সংগ্রাম হয়েছে তা থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যের চেয়ে বড় সাক্ষ্য কিছুই নেই। বাঙলা দেশের কৃষক শ্রেণী সম্প্রতি যে তে-ভাগার দাবীতে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করছেন—তার ফলে কৃষক রমণীদের মধ্যে কি অভূতপূর্ব উদ্দীপনা এবং চেতনা সঞ্চার হয়েছে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা অজ্ঞাত নেই। কৃষক সমাজের পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও সমানে সংগ্রাম চালিয়েছেন অত্যাচার, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নারী সমাজ পুরুষের সঙ্গে যে সমান অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়েছেন ভবিষ্যতে তাই এনে দেবে বৃহত্তর পটভূমিকায় অধিকার সাম্য। নারী মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব এইভাবে শোষিত শ্রেণীর নারীদের হাতে চলে যাচ্ছে শুধু বাঙলাদেশেই নয়—অন্যত্রও। হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ—যেখানেই কৃষক এবং শ্রমিকরা শোষকের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বজ্রমুষ্টি তুলে ধরেছেন সেখানে নারীরাও এগিয়ে এসেছেন পুরুষের সহকর্মী রূপে—জীবন সংগ্রামের সহযোদ্ধা রূপে। যতদিন নারী মুক্তি আন্দোলন অভিজাত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন দাবীর পরিমাণ যত ছিল, দাবী কার্যকরী করার জন্য সংগ্রামের আয়োজন তত ছিল না। আজ নারী মুক্তি আন্দোলনের নূতন নেতৃত্ব সংগ্রামের পথে দাবী আদায়ের পথ বেছে নিয়েছেন।

এই আন্দোলন কবে সাফল্য লাভ করবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর স্পর্ধা কারুরই থাকতে পারে না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যৎ ভারতে নারী-পুরুষের অধিকারসাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নারী আন্দোলনের কর্মীদেরও তাই নূতন বিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনা হওয়া আবশ্যক। আজ যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে তার সাফল্য ভারতের সমাজে যে বিপ্লব আনবে তার সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের ইংরাজ অধিকারের ফলে যে সমাজ বিপ্লব ঘটেছিল তাও ম্লান হয়ে যায়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের এবং ভারতীয় নারী সমাজের বন্ধন দশা ছিন্ন করার আন্দোলন আজ এক খাতে বইতে শুরু করেছে। সমাজ বিবর্তনের এক ধাপে একদিন সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নারী সমাজের যে কর্তৃত্ব নষ্ট হয়েছিল এই নূতন বিপ্লব আবার সেই কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নারী সমাজের আবার পরাধীনতার অবসান ঘটাবে। উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রগুলি তখন ব্যক্তির সম্পত্তি না হয়ে হবে সামাজিক সম্পত্তি, নারীও পুরুষের পাশে এসে সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে মুক্তির অধিকারকে

কার্যে পরিণত করবে। ("We can already see from this that to emancipate women and make her the equal of the man is and remains an impossibility so long as the woman is shut out from social productive labour and restricted to Private domestic labour. The emancipation of woman will only be possible when woman can take part in production on a large, social scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time"—Engels, Origin of the Family Etc). যখন স্মরণ করি ভারতের নারী সমাজের মুক্তি বিশ্বের নারী আন্দোলনে সোভিয়েট বিপ্লবের মতই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচনা করবে, তখন আমাদের দায়িত্বও সেই সঙ্গে মনে না করে পারি না।

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রার্থী

হে সূর্য ! শীতের সূর্য !
হিমশীতল সুদীর্ঘরাত তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমিতো জানো
আমাদের গরম কাপড়ের কতো অভাব !
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে
কতোকষ্টে আমরা শীত আটকাই !

সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিকে ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও ;
আর উত্তাপ দিও—
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক-একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবো !

তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

আমার রচনা

আমার দ্বিখণ্ড সত্তা যুক্ত হোক হোক ;
মর্ত্যের ধূলিতে সৃষ্টি হোক রূপলোক !
কবি আজ কর্মী হোক, কর্মী হোক কবি,
স্বপ্ন মোর রূপ নিক, মূর্তি নিক ছবি !

যে তুচ্ছ আমার—আমি বন্দী আজ সংসারের শত সর্প পাকে
কুটিল জীবন বাঁকে
সত্তা যার কুব্জ আজ প্রয়োজন ভারে
সে-আমারে
অতিক্রম করি
তারার সেতুরে ধরি ধরি
অতিক্রমি প্রত্যহের সংকীর্ণ প্রাচীর,
আবর্তিত দিন আর রজনীর নীড়
সংসারের স্তূপীকৃত শত তুচ্ছ কাজ
মুক্তি মোর আজ !...

মুক্তিকামী
আমার যে-আমি
পলাতক সবুজে-সুনীল,
সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণে,
তারার মিছিলে,
আকাশ-মন্দিরে
পূজার্থীর ভিড়ে,
ভ্রূ-উদ্ধত সে-আমিরে
বার বার বিদ্ধ করে বিদ্রূপের তীরে
ক্ষুধা-ক্লান্তি-ইচ্ছাতুর মোর-তুচ্ছ-আমি !
ভারাক্রান্ত যে-আমার-আমি
রৌদ্রে খাটে,
ঘর্ম-ঝরা রাজপথে হাঁটে,
জীবিকার বহে দায়,
উন্নতির সাধনায়

প্রভুর বন্দনা করে,
অপরাহ্ণ ক্লান্তপদে ফিরে আসে ঘরে,
স্ত্রীর সাথে কুৎসিত কলহে
মিলনে বিরহে
জীবন কাটায়,
নির্বোধ জন্তুর মত খায় ও ঘুমায়,
যুদ্ধ করে লোভাতুর নির্মম নখরে
জীবিকার অন্বেষণে দয়াহীন জনতার ভীড়ে,
শতছিন্ন, দীন, ক্ষুদ্র সে তুচ্ছ-আমিরে ঘৃণা করে
চন্দ্রাক্রান্ত মোর উচ্চ-আমি !
এ দুই-আমিরে
যুক্ত করা এক লক্ষ্যে
যুক্তি মোর আজ !
আমার জিজ্ঞাসা এই—
'কবিতা যাহার কর্ম,
কর্ম তার হবেনা কবিতা ?
চন্দ্র তার দিনের সবিতা ?
স্বপ্নের মঞ্জরী তার কর্মের কুসুম ?
কর্মের প্রেরণা তার রজনীর ঘুম ?'

আমার সাধনা এই—
'কুব্জ দেহ, ন্যুব্জ পৃষ্ঠ মোর
ঋজু হবে !
স্বচ্ছন্দে গানের মতো
জীবনের ভার ববে !
ঘর্ম মোর কালি হবে
ইস্পাত-কঠিন হাত আমার লেখনী
আনন্দের বীণা হবে স্পন্দিত ধমনী
দীপ্ত চোখে সৃষ্টির প্রেরণা
কর্মের কবিতা হবে আমার রচনা !

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

চতুর্দশপদী

(১)

অদ্ভুত প্রেমের গতি, বিচিত্র মনন ; সমাধান
নেই তবু মুহূর্তেই সমাধান আনে বারবার,
হে প্রেয়সী, পরিবর্তনের এই আল্পনা যাহার
জড়ায় জীবন-যাত্রা, বক্রবেগ, জটিল প্রধান।
উভয়ে একাকী তাই ; স্বাধীন এ প্রণয়ের খেলা।
(স্মরণ-ফুলের গুচ্ছ বাতায়নে কভু কম্পমান।)
ইসারা তোমার আনে রমণীয় বিচ্ছেদের গান—
উভয়ে তাই কি শুনি ? তাই বুঝি কেটে যায় বেলা !

তবু এ মিলন ও বিচ্ছেদের দ্রুত আনাগোনা
ছড়ায় দৃষ্টি শুধু—ব্যক্তিত্বের অপূর্ব বিকাশ।
আপনার অজানাতে রাত্রি-দিন, পূরবী-বিভাস
বৈপরীত্যে মিল পায় এ কথা কি তুমিও জাননা ?
সার্থক মোদের প্রেম। হে প্রেয়সী, আজ এ সন্ধ্যায়
তোমার আমার মাঝে সন্ধ্যাদীপ কে যেন কাঁপায়।

(২)

অর্থের দাক্ষিণ্যে যেথা প্রাণ বাঁচে, কঠিন সমাজে
সামাজিক জীব জীব শুধু—অন্ধ অনুষঙ্গে মাতে,
সেখানে স্বতই মন নিরালম্ব, দানের নিলাজে
অপরে বাঁচায় যত মরি নিজে খেদোক্তি স্বখাতে।
কিন্তু যখনি ভাবি, পাই যবে প্রেমের প্রসাদ
মূল্যহীন কি ঐশ্বর্যে ভরে মন, (এ নীল আকাশ
সূর্যের কঠিন আলো সুষমায় জাগে কত সাধ)
বাড়াই সহজে হাত, ঘিরি দেহ, দীর্ঘ অবকাশে।
তবু জানি হে প্রেয়সী, তুলে ধব আপন শুচিতা
সমুদ্র দ্বীপের মতো একাকী ও একান্ত নির্ভার,
অথচ নিঃসঙ্গ নও—প্রাণের কল্লোল যার মিতা,
স্থিতি তাই অনবস্থা, আনন্দ বা দুঃখ একাকার।
তুমি কি শেখাবে মোরে হে প্রেয়সী, তত্ত্ব একাকীত্ব
মিল যাব প্রকৃতিতে, শিশুতে ও স্মৃতিতে সুসংপৃক্ত।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাস্তব

এ পীড়ন সহ্য হয়, ভালো লাগে তিক্ত জ্বালাতন
সহিতে পারিনা তবু এক ফোঁটা দয়াব ছলনা,
অনন্ত ক্ষুধার পাশে এতোটুকু পানির সান্ত্বনা,
গোধূলীর আলো মেখে দিবসের ভণ্ড আস্ফালন!

যে রস শুকায়ে গেছে সূর্যলোভী বালুকার টানে,
যে প্রাণ মরিয়া গেছে পাষাণের আকণ্ঠ শোষণে,
সে আজ পড়িয়া থাক, ফেলে আসা আঁধার গহনে,
অলীক মরীচি মোহে ঘুরিব না দিনের উজানে!

আজ সব শেষ হোক, পিষে যাক যতোটুকু বাকী,
বাস্তবের রূঢ় চাপে আসুক না দীপ্ত অভিশাপ,
মাথায় পড়ুক বজ্র, দগ্ধ হোক্, বিষ পরিতাপ,
প্রাণ চেয়ে বেঁচে থাকা, সেতো শুধু মুখোসের ফাঁকি!
আসুক দহন জ্বালা তীব্রতর হলাহলে ভরা,
সেও ভালো, তারো চেয়ে অসহ্য এ-দয়ার পসরা!

হাবীবুর রহ্‌মান

আবার।

১

সেদিন আকাল ছিল দুরন্ত ঝড়ের রাত
ঘরের বাসিন্দা তবু অন্ধ উদাসীন
ঝড়ের গর্জনে ছিল স্বেচ্ছায় বধির
কার কত অংশ নিয়ে কলহে তন্ময়।

আদিগন্ত সারা আসমান
লণ্ডভণ্ড ঝড়ের দাপটে
ঘর ভেঙে উড়ে গেল উদ্বাস্তু সংসার
উলঙ্গিনী গৃহলক্ষ্মী ভিক্ষাপাত্র হাতে
অক্ষমের ক্ষমাহীন দ্বন্দ্বে নিরাশ্রয়
অনাদৃতা নেমে এল পথে নিরুপায়।

সেইক্ষণে সেই ঘোর কলঙ্কের দিনে
রাজ্যের প্রহরী দুস্থা ঘরের লক্ষ্মীরে
পক্ষপুটে রক্ষা করি' সফল প্রয়াসে
জন্ম দিল ঘৃণিত জারজে

২

মানুষের মতো তবু নয় সে মানুষ
পশুর চেয়েও নীচ তবু পশু নয়
সেই এক জাত
আমি তার পেয়েছি সাক্ষাৎ।

পশুতে মানুষ খায়, এরা পশু নয়
মানুষ খায় না তবু কৌশলে মানুষ মারে
এরা অদ্ভুত
এক দিকে হাড় তুলে আর দিকে সোনা
মানুষের মূল্য মাপে সোনার ওজনে
এক-এক মানুষ মুদ্রা এক-এক হাজার।

এ-জাত জাতির ঘরে বিজাতির চর
স্বজাতিব রক্ত শুষে বিজাতিরে করে বলবান
তেরশ' পঞ্চাশ তার জীবন্ত প্রমাণ।

এরা এক জাত
শহরে বন্দরে রাজপ্রাসাদে দরবারে
যখন যেমন
নানা রূপে ঘোরাফেরা করে
বহুরূপী বুদ্ধিতে ওস্তাদ
আকালের দিনে তার পেয়েছি সাক্ষাৎ।

৩

এবারে আবার
মেঘে মেঘে স্বদেশের আকাশ গুমোট
উপরে চক্রান্ত শুরু
ভাঙা ঘরে ভাঙা মন তেমনি বিমুখ
হাতের শিকল নিয়ে চলে হাতাহাতি
এবারে আবার
শহরে বন্দরে রাজপ্রাসাদে দরবারে
সে-জাত তুলেছে মাথা

সেই এক জাত
মানুষের মতো তবু নয় সে মানুষ
পশুর চেয়েও নীচ তবু পশু নয়
সেই এক জাত
আবার আকাল আসে
আমি তার পেয়েছি সাক্ষাৎ।

অনিল কাঞ্জিলাল

সলিমের মা

ধান কাটার পর ধূ-ধূ করে বিস্তীর্ণ বাদামী মাঠ। আঁকা বাঁকা আল বেয়ে মানুষের চলার পথ শাদা হ'য়ে তক্‌তক্‌ করে। নিচু জমির জলজ ঘাসগুলো পেকে হলুদ হয়ে আছে কোথাও। কোথাও ছোট ছোট তামাকের সবুজ ক্ষেত। কদাচিত উইটিবির মত দু'একটা কুঁড়ে ঘর চোখে পড়বে এখানে ওখানে। লম্বা দড়ির খুঁটটুকু ধরে কদাচিত দু'একটা ন্যাংটো ছেলেকে দেখা যাবে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া মানুষ দেখা যায় না বড়ো। সারা বছর ধরে ক্ষেতে ক্ষেতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোথায় হারিয়ে থাকে তারা। বুভুক্ষা আর আক্রোশ নিয়ে লুকিয়ে থাকে দশ হাজার বিঘা মাঠের ফাঁকায়।

তারপর ধান পাকে একদিন। মেঠো পথে টাল খেয়ে সারবন্দী গরুর গাড়ি চলতে শুরু করে তখন। মানুষ দেখা যায় হঠাৎ। দূর হাটের পথে পাড়ি দেবার চওড়া রাস্তার পাশে ঘাসটুকুর ওপর বসে হাঁটুভর্তি ধুলো নিয়ে। অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করে, গবেষণা চলে ধানের দর নিয়ে। ধান বিক্রি করে দেবে সবাই। বিক্রি ক'রে কাপড় কিনবে, কম্বল কিনবে। দুনো সুদে কর্জা শোধ দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাইবে দু'মাসের জন্যে।

হাট নয়, মেলা। পৌষ মাসে ধান কাটা হয়, মাঝে মাঝে মেলা বসে জমজমাট। দশ বারো ক্রোশ এলাকা জুড়ে যতো আধিয়ার চাষী, সবাই গিয়ে জোটে সেখানে, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই। লজ্জার বিধিনিষেধ যাদের শক্ত নয়, সেই সব ক্ষত্রিয় মেয়েরা পরস্পরের আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বেঁধে মেলা ঘোরে দিনের পর দিন। মাটিতে জোয়াল নামানো গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা ফাঁক করে মুসলমান ঘরের মেয়েরা চেয়ে থাকবে উৎসুক তৃপ্তি নিয়ে। নির্বোধ উৎসব চলবে কয়েকদিন।

'ধানকলের পাইকাররা কিনিবার চায় না, কি করা বাপুরে—।'

'কটকটা বুদ্ধি উঁয়াদের...'

সারা বছর মেহনৎ করে যে ধান ঘরে উঠল সে ধান বিক্রি করে দেয় অনায়াসে। তারপর বিষণ্ণভাবে বাড়ি ফেরে এক এক করে।

মুই-মুড়কি-মোয়া, গুড়ের তৈরী মিঠাইয়ের দোকান, জোলার কাপড়-গামছা, গরু-হাটির অগুন্তি জোয়ান জোয়ান গরু—শীত পোয়াবার জন্য জ্বলানো সারি সারি ঘোলাটে আগুন—অন্ধকারে মেঠো জোনাকির মত ঝিলমিল করে মাঠ জুড়ে।

'গরু কেনা গেল না'

'না, কেনা গেল না—'

তারপর রিক্ত ক্ষেতের এখানে ওখানে উইটিবির মত নিঃশব্দ কুঁড়েগুলোয় ফিরে আসবে এক এক করে। দশ হাজার বিঘা জমির ফাঁকায় আবার হারিয়ে যাবে।

মঈনুদ্দিন প্রধানও ফিরে আসে আর সকলের মত। গরু কেনে না, কাপড় কেনে না। ফিরে এসে উঁচু দাওয়াব ওপর বসে হাঁপায়।

ভাঙা দাওয়া। তিনটে ঘরের মাটি গলে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। প্রশস্ত ফাঁকা আঙিনায় দুটিখানিক ধান শুকোয়;

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় না ওকে। আপন মনে ধান কুটে চলে সলিমেব মা। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বুড়ি দাদী আপন মনে ঘ্যান ঘ্যান্ করে বলতে শুরু করে এক সময

'তুই মরিবু, তুই মরিবু সলিমের মা—'

একটা চাপা অস্বস্তি আর শত্রুতায় টান ধরে বুকের ভেতর। বসে থেকে থেকে মঈনুদ্দিন হঠাৎ কাঁপা গলায় চিৎকার করে ওঠে—'ভাত দিবার হয় কি না হয়—'

মঈনের মুখের দিকে তাকিয়ে টের পায় সলিমের মা। গাইনটা নামিয়ে রেখে মাটির দিকে শক্ত হয়ে চেয়ে থেকে অপেক্ষা করে।

ভোঁতা মত চেলা কাঠ একটা খুঁজে বেড়ায় মঈন। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে কুঁদে কুঁদে এগিয়ে যায় সলিমের মার দিকে। স্থির হয়ে নীরবে মার হজম করে সলিমের মা। কাঁদে না, প্রতিবাদ করে না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তারপর ভাত বেড়ে দেয় মঈনকে।

এরকম মার খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে সলিমের মা'র। মঈনুদ্দিনের রূঢ় মুখের প্রত্যেকটি নিষ্ঠুর ভাঁজ ও ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। অপরাধ হোক না হোক, জানে কখন মানুষটা হিংস্র হ'য়ে উঠতে চাইবে।

অথচ এমন ছিল না মঈনুদ্দিন। এমন হালও ছিল না এ বাড়ির। আঈনুদ্দিন প্রধানের বেটা মঈনুদ্দিন প্রধানের বাড়ি এ এলাকার সকলে চেনে। নাম ছিল, ক্ষমতা ছিল, সম্মান ছিল প্রধানদের। তবু এক পুরুষ দু'পুরুষের ভেতরেই কেমন করে যেন সম্পন্ন কৃষক আধিয়ারে পরিণত হয়ে যায়। আঙিনার ওপর গোলা দুটো ভরাট হয় না আর। কোঠা বাড়ির টিনের চালের ওপর হলুদ হয়ে মরচে ধরে।

অনেককাল আগে গরুর গাড়ি চেপে সলিমের মা এসেছিল এ বাড়িতে নতুন বৌ হয়ে। গাড়ির ভেতর ছিল মঈনুদ্দিন, বাকি সবাই পেছনে পেছনে হেঁটে আসছিল। মুসলমানের বৌ, তাই ছই ফেলা গাড়িতেও হয়নি, কাপড় গামছা গুঁজে ঢেকে, দেওয়া ছিল ছইয়ের মুখটা। কাপড়ের আবরণটা অল্প একটু ফাঁক করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সলিমের মা। মাঠের পর মাঠ আশমান ছুঁয়েছে। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়, মাদার গাছ, কাঁঠাল গাছ দু'একটা।

এত জমি, অথচ মানুষ নেই যেন। একটু করে জমি পড়ে থাকলে ছুটে আসবে না লোকে, ভিড় করে কাড়াকাড়ি শুরু করবে না?

'তোমাদের গাঁয়ের মানুষগুলা ধনী।' নতুন বৌ বলেছিল মঈনকে। শুনে হেসে উঠেছিল মঈনুদ্দিন। রঙীন লুঙ্গি পরা, পাটের পিরান গায়ে বয়স্ক জোয়ান মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নতুন বৌ।

'হাসেন কেনে তুমি?'

'করম আলি, করম আলি! এত বড়ো ধনী তোমার গাঁওর্ত নাই। দশ হাজার বিঘা—তামান জমি ওঁয়ার, বুঝো?

গাড়ি এসে থেমে ছিল এ বাড়িতে। ঘরের সামনে বেড়া দেওয়া তামাকের ক্ষেত। অনেক দিন আগেকার সচ্ছল অবস্থার আঁচ পাওয়া যায় নকসা কাটা খুঁটিতে। মাটিরই দাওয়া —তবু কিছু কিছু ইঁট দিয়ে বাঁধাবার চেষ্টা হয়েছিল বোঝা যায়। চওড়া আঙিনার চারপাশে ছয় সাতটা মাটির ঘর। এককালে হয়ত ভর্তি থাকত মানুষে, এখন অব্যবহৃত ধস-খাওয়া। আর আছে প্রধানদের ঘরের আব্রু বাঁচাবার মতো ঘেরাটোপ মাটির উঁচু দেয়াল।

রাত্রে মঙ্গৈমুদ্দিন সহসা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'মানী ঘর আমাদের। তিন হালের চাষ ছিল বুড়ো দেওনিয়ার আমলে, এখন একটি হাল। কিন্তু আবার তো হবে? করম আলির সঙ্গে মামলা চালাচ্ছে ও। মুন্সেফ্ কোর্ট থেকে জজ্ কোর্টে, জজ্ কোর্ট থেকে চাই কি হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চলবে বৈকি। শহরের উকিল আমলারা বলে দিয়েছে—হাঁ, জয় হবে। আইন আছে দলিল আছে, জয় হবে।

'তুমি হামার জমি দখল করিবার আসছেন? খুঁটিগাড়ি কবি দিবেন? হামার তো বন্দুক নাই। না—ই। বন্দুক নাই, পিয়াদা নাই। কিন্তু আইন আছে...।'

স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলেছিল মঙ্গৈন। গরিব হয়েছি, কিন্তু এ ঘরের ইমান বড়ো কড়া বৌ। ঘরের বাইরে পা বাড়িও না, আচেন পরপুরুষের মুখের দিকে চেয়ো না—মঙ্গলের মা-ও উপদেশ দিয়েছিল ওকে।

বাঁশের তৈরী তাতে নক্‌সা তোলা ধোকর বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে গল্প করে শোনাত পুরনো দিনের কথা। মঙ্গৈমুদ্দিনের বাপ আইমুদ্দিন—তার বাপ ছিল এ তল্লাটের সেরা লোক। ধনী, মানী। চারটে 'বিয়া' করেছিল মানুষটা। একটার বেশি ছেলে হয়নি। তাই খুব পেয়ার করত ছোট বউকে।

খুব সুন্দর নাকি ছিল বৌটা। তিনদিনের পথ পেরিয়ে দক্ষিণ দেশ থেকে বহুত টাকা দিয়ে ঘরে এনেছিল। কিন্তু খেয়াল ভাল ছিল না সে বৌয়ের। দক্ষিণ দেশের মেয়ে— বেসরম হয়ে তাকাত পরপুরুষের মুখের দিকে। একদিন দেওনিয়া দেখল—হাটের পাইকারের সঙ্গে হেসে কথা বলছে ছোট বৌ।

খুব রাগ হয়েছিল তার। ছেলেকে কেড়ে নিযে মারতে মারতে ঘরের বার করে দিয়েছিল পেয়ারের বৌকে। আর কখনও ঢুকতে দেয়নি। বজ্জাত বৌটাও নাকি ফিরে আসেনি আর...

হামাক মারে নাই, ঐ মঙ্গৈনের বাপ? রাগ হ'লে না ভাঙালে চলিবে না যে মানুষ-গুলার—গল্প শুনে হিম হয়ে আসত বুকের ভেতর।

কিন্তু ভালো লেগেছিল বৈকি এ সংসারকে। মন তার থাকত নানান কাজে—ধান কোটা, কাঠ ফেড়া, গরুর দেখাশোনা করা। জোলার পেশ নীল সাড়ি পরণে। শামলা হাতের কব্জি ঢেকে চওড়া নকসা খোদাই রূপোর চুড়, নাকে কানে সোনা, আলগা পায়ে বাঁকা মল—নানান কাজে অন্দরের ভেতর ঘুর ঘুর করত ও।

তারপর ছেলে হল একটা। বোঁচা বোঁচা গোলগাল দেখতে। ছেলের নাম ছিল সলিম। সেই থেকে ওকে সবাই ডাকত সলিমের মা বলে।

আর এক একদিন শহরে মামলা করে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মঙ্গীন ফিরত হাসিমুখে।

'পড়ালিখা লাগে। কতো টাকা লাগে—তবে উকিল হচ্ছে ওমরা। ওঁয় ধরিছে একটা আইন। করম আলি কেমন পার পায় মুই দেখিমু—'

তারপর গামছায় বাঁধা পোঁটলাটা খুলতে খুলতে ডাকত—'সলিমের মা—'

'কি ?'

'দেখি যাও কেনে—'

শুধু সলিমের মা নয়, সলিমের দাদীও আসত উৎসুক হয়ে। প্রদীপ উঁচু করে দেখত গামছায় বেঁধে কি এনেছে মঙ্গীন। কোলের ভেতর বাচ্চা সলিমও আঁকুপাঁকু করে উঠত।

'চুড়ি আনছি, বেলোয়ারী চুড়ি। আর সলিমের একটা লাল কোট আনছি—'

'ওগো মা, ধান যে সব বিচি দিবার ধরছিস এদিক—'

কপট ধমক দিতে গিয়ে সলিমের দাদী হাসত দরাজভাবে।

মাঝে মাঝে মুখ কালো করে ফিরত মঙ্গীন।

'কাহাকার শক্তি মামলায় ইমান ঠিক রাখিবার পারে। ইমান ঠিক রাখে কেটা ?'

ঐ কেমন একটা ঝোঁক ছিল মঙ্গীনের। ক্ষেতের কাজকর্ম, দেখাশোনা সব ফেলে শহরে যেত ক্ষেপার মত। করম আলির গ্রাস থেকে সমস্ত জমি উদ্ধার না করে স্বস্তি ছিল না ওর। সলিমের মাকে আদর করতে করতেও অন্যমনস্ক হয়ে যেত মামলাবাজ, সলিমের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো জোয়ান গড়নের মানুষটা।

'ইটা হামার লড়াই—ঐটা মামলা—'

কিছুক্ষণ হাঁ করে শুনত সলিমের মা। কিন্তু পুরুষ মানুষের এই সব চিন্তা দুশ্চিন্তা তেমন করে স্পর্শ করত না তাকে। সলিমকে উপুড় করে ঘুম দেবার জন্য কানের ওপর থাবড়াত আস্তে আস্তে।

'সলিমটা বড়ো হইবে, ভাতের থালা মাথাত করি নিয়া যাইবে মাঠে। তোমরা কাজ করিবেন...'

কিন্তু একের পর এক মামলায় হেরে গিয়েছিল মঙ্গীন। নিজের হাতে হালচাষ শুরু করেছিল ও। সারাদিন ক্ষেতে খাটত, সন্ধে বেলা চলে যেত ভিন গাঁয়ের দেওনিয়ার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে। যতো হেরে যাচ্ছিল ততো বদরাগী হয়ে উঠছিল মঙ্গীন।

'কোম্পানী আইন করোছে, কিন্তু আইনটা হামার হকের আইন, না বে-হকের আইন ?'

ঘোলাটে চোখে গলার শিরা ফুলিয়ে বকাবকি করত অন্য আধিয়ারদের সঙ্গে। বাইরের ঘরে মাটির মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসত ওরা। তামাক খেত, কাশত আর চিৎকার করত বেসামাল হয়ে। অন্দরের ভেতর থেকে শোনা যেত ওদের তকরার ঝগড়া।

সেবার ধান কাটার সময় এল। একলা সব ধান কেটে তোলা যায় না বলে বেহারী ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে প্রতি বছর চুক্তি করত মঙ্গীন। তারা বাড়িতে থাকত চৌদ্দ পনের দিন। চারপাঁচ জনের জন্যে বেশি করে ভাত রান্না করতে হত সলিমের মাকে। প্রতি বছরের মত সেবারও তারা এসেছিল কাজের চুক্তি করতে। কিন্তু ধমক খেয়ে ফিরে গেল। এ বাড়ির

খোলানে ধান উঠল না এবার, করম আলির ঘরে সব ধান পৌঁছিয়ে দিয়ে এল মঈন। সেইখানে ভাগযোগ করে ন্যায্য পাওনা নেবে করম আলি।

দাওয়ার ওপর কপাল ঠুকে ঠুকে নিঃশব্দে কেঁদেছিল সলিমের দাদী—'হায় গে সর্বনাশ! মাথাটা তোর কাটা গেল্…'

বাস্তুটুকু ছাড়া যে কয় বিঘা জমি ছিল মঈনুদ্দিনের, তাও নাকি গেছে। সে আধিয়ার হয়ে-গেছে করম আলির।

এক পহর রাত পর্যন্ত করম আলির খামারে বেগার দিত মঈন, ঝাড়াই সাড়াই করত, কাজ না থাকলে পাটের দড়ি পাকাত বসে বসে। তারপর রাত্রে যখন ও পুরনো, ভাঙা, অন্ধকার ঘরে ফিরে আসত শুকনো, চেহারা নিয়ে, তখক ওকে দেখে ভয় হত কেমন।

'কত খাটিবেন তুমি একা?'

পিদেমটা উস্কিয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করেছিল সলিমের মা। মঈন উত্তর দেয় নাই।

'কহছি কি ক্ষত্রিয় বিটিছোয়াগুলাও তো খাটে। হামরা গরিব মানুষ হছি, সলিমের বাপ, হামাদের লাজ সরম নাই। হামরাও মাঠে খাটিমু—'

প্রস্তাব শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল মঈন। মুসলমানের বাড়ী নয় এটা? প্রধানদের ঘরের সম্মান ইজ্জত নাই একটা। বাদশা ফকির হতে পারে—কিন্তু এ বাড়ির বৌ তাই বলে ইজ্জৎ খুইয়ে ক্ষেতে খাটবে পুরুষের সঙ্গে?

প্রাক্তন স্বচ্ছলতা হারিয়ে বুকের ভেতর একটা আহত জায়গা লুকিয়ে রাখত মঈন সেইখানে হাত পড়েছে। একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে এক মুহূর্তে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে মঈন—

'কাম করবু তুই? পরপুরুষের মুখ না দেখিলে যে তোর সুখ নাই! হামাক দরদ দেখাবার চাস যৈবনের গরবী? টের পাছি বিস্তর দিন—'

গলার শিরা ফুলিয়ে কুঁজো হয়ে চিৎকার সুরু করে মঈন। একবার ছুটে এসে হিঁচকা টানে সলিমকে ছিনিয়ে নেয় মার কোল থেকে। আবার দূরে সরে গিয়ে চিৎকার করে। কেমন একটা কাতর যন্ত্রণা নিষ্ঠুর মোচড় দেয় ওর গলার আওয়াজে।

'ঘর থিকা বার বার চাস তুই!'

'না মারো সলিমের বাপ্'—ভয়ে মুখ শুকিয়ে অস্ফুট মিনতি করেছিল সলিমের মা।

চওড়া বনেদী উঠোনের ওপর প্রদীপের ছায়াটা কাঁপছে দপ্ দপ্ করে। দূরে দূরে ভাঙা ফাঁকা অব্যবহৃত ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে কালো হয়ে। দশহাজার বিঘা মাঠ থেকে ঝিঁঝির একঘেয়ে শীতার্ত শব্দ মিশে যায় মঈনের কাঁপা চিৎকারের সঙ্গে।

'হামাক মারে নাই? হামাক মারে নাই মঈনের বাপ? পূব মুখে না যায়া হালের গরুটা পছিম মুখে যাবার চাহে। না মারিলে ঐয় ঘুরিবে?' কি জানি কেন, খ্যানখেনে গলায় বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছিল সলিমের দাদী।...

তারপর আকাল এল দেশে। একটানা দশহাজার বিঘা জমির ধারে মাদার গাছের তলে কয়েকটা সাঁওতাল পরিবার এসে ডেরা বেঁধে রইল কয়েকদিন। তারপর চলে গেল আবার।

'কুনঠাঁই যাবে তোমরা?' ঘর ছেড়ে দু-পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসেছিল সলিমের দাদী।

'উত্তরে যাছি—চা-বাগানের কাম আছে—' দলের ভেতর থেকে বুড়ি মতো মেয়েটা ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছিল অনিচ্ছায়।

বাঁশঝাড়ের ওপাশে মুসলমান আধিয়ারদের দুটো ঘর ফৌত হ'যে গেল একেবারে।

কর্জা বন্ধ করে দিলে করম আলি।

বর্ষা মাসটা কাঁঠাল খেয়ে চলেছিল, বর্ষার পরে হাতের চুড়, নাকের সোনা, কোমরের গোঠ সব খুলে দিতে হ'ল মঙ্গীনের হাতে।

খুলে দেওয়ার সময় বড়ো বড়ো চোখে মঙ্গীনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সলিমের মা। তা দেখে নিষ্ঠুরভাবে তেড়ে এসেছিল মঙ্গীন—'কি দেখ জুল্ জুল্ কবি? কি দেখ তুই?'

তারপর বিড় বিড় করতে করতে বেড়িযে গিয়েছিল ও—'দেখিমু আবার, যাউক এ বৎসর ডা। মামলায় হামার হক, কি তোর হক—

বর্ষার পরে মড়ক লেগেছিল গাঁয়ে। দুদিনের জ্বরে মরে গিয়েছিল বাচ্চা সলিম। কাঁথা ঢাকা হ'য়ে বহুক্ষণ পড়ে রইল ও। হাত দুটো মুঠ হয়ে আছে, ঠাণ্ডায় বেঁকে গেছে মুখটা। দু'একজন লোক ছুটল। কাফন এল। গোর দিতে নিয়ে গেল মঙ্গীন নিজে।

তখন ধুলোর ভেতর লুটোপুটি করে কেঁদেছিল সলিমের মা। মঙ্গীনের পেছু পেছু গিয়েছিল তামাক খেড়া পর্যন্ত। সেখানে চিৎকার করে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে।

এক একজন করে লোক জুটেছিল কান্না শুনে। যে কয়ঘর লোক ছিল মেয়ে পুরুষে তারা এসে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে তাকিয়ে ছিল নিষ্প্রাণ চোখে। মাঝে মাঝে কি মনে করে হঠাৎ মাথা ঝাঁকাচ্ছিল চিন্তিত ভাবে।

'না কাঁদো, না কাঁদো—কি করা'...

রাত্রে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরতে চেয়েছিল সলিমের মা। কবরের কাঁচা মাটির ওপর কাঁটা দেওয়া আছে তো' খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে—হয়ত মাটি খুঁড়ে সলিমকে টেনে বার করছে শেয়ালে—

সান্ত্বনাতে নয়, সলিমের মার কান্না থেমে গিয়েছিল প্রচণ্ড চাষাড়ে এক ধমকে।

'দুনিয়ার মানুষের সামনে উদলা হয়া কাঁদিস তুই? পরধানের বাড়ির বৌ—! কত্তো, ভাঙ্গি, কতো কাঁদা দেখি মুই আজ—'

বিমূঢ় আতঙ্কে একেবারে চুপ হয়ে গেল সলিমের মা। নোংরা ভোঁতা একটা কাঠ তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি বাড়ি মেরে চলেছে মঙ্গীন। মুরের দুদিকে সারা গালে খোঁচা খোঁচা কর্কশ দাড়ি। শুকনো পুরু ফাটা ফাটা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে একটু। থ্যাবড়া নাকের দুপাশ দিয়ে গালের চামড়া কুঁচকিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে বেঁকে গেছে।

একবছর, দুবছর তিনবছর—পর পর কেটে গেছে তারপর, আকালের বছর শেষ হতে চায় না কিছুতে। প্রতিবছর মাঠে ধান পাকে, সে ধান ফুরিয়ে যায় করম আলির কর্জা শোধ দিতে। হাটে কাপড় নুন দিয়াশালাইয়ের দর কমে না একটু।

পহর রাত পর্যন্ত করম আলির বাড়িতে বেগার দিয়ে হন্যে হয়ে ফিরত মঙ্গীন, দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে নিজের মনে বকাবকি করত একতরফা, মাঝে মাঝে ছুতো করে এগিয়ে আসত

সলিমের মার দিকে—' মঙ্গীনের মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেত সলিমের মা। নিশ্বাস বন্ধ-করে কাঠের মত স্থির হয়ে অপেক্ষা করত। মার খাওয়ার পর ঝিম ধরে বসে থাকত কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে যেত গেরস্থালি কাজে।

'বেটাক খার্ম্মস, এলায় তুই মরিবু—' মার খেতে দেখলেই খ্যান্‌খ্যান্ করে একটানা বকতে স্থুরু করত সলিমের দাদী।

একদিন রাত্রে ফিরে এসে দাপাদাপি করে বেড়াল মঙ্গীন—'হামাক শোনায়। হামাক শোনাস কেনে? পাথর ইঁট রাখিছে—লাঠিয়ালগুলাক খাসী ভাত খিলাইবে—এত কথা তোর হামাক শোনাস কেনে?'

'কি কহছেন?

'করম-আলি করম-আলি। কেনে, ঘুরি বেড়াছে না গরিবগুলি? লুটপাট করি ধান কাড়ি নেয়, কি না নেয়—তো হামাক শোনাস কেনে?'

সেইদিন মঙ্গীনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যাবৃত আশঙ্কায় বুকের ভেতর হিম হয়ে এসেছিল সলিমের মা'র। মার খেতে হবে বলে নয়—মার খাওয়া সহ্য হয়ে গিয়েছিল ওর। অন্য কি একটা অপরিচিত ভয়ে হাঁপ ধরেছিল বুকের ভিতর।

দশহাজার বিঘা জমি। কালো মেঘের মত একটানা ধানে ছেয়ে গেল। অঘ্রাণের শুরুতে হলুদের ছোপ পড়ল জায়গায় জায়গায়, কিন্তু ধান কাটার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, তত কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল মঙ্গীন। যাকে সামনে পেত, তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ত ও। একদিন গাঁয়ের সমস্ত আধিয়ার এসে জুটল ওদের বাহির বাড়িতে। মাটির ওপর বসে বসে তামাক খেল কাশল আর চিৎকার করল এলোমেলো।

'ধান কাটি নিজের খোলানের তুলিবার চাস, কিন্তু আইনটা কুনঠাঁই পালি তুই?'

'ইটা হামার কৃষকের আইন!'

'হাঁ ইটা হামারই আইন—'

'লাঠিয়াল আনিছে। কালো মাথা লাল করি দিবে। কিন্তু হামাক শোনায় কেনে এত কথা?'

'ইটা হামারই আইন। দেখিবু শক্তি—'

অন্দরের ভেতর থেকে সলিমের মা আর সলিমের দাদী জেগে বসে থাকত কানপেতে। বুক টিপ টিপ করত ওদের।

পরদিন থেকে দল বেঁধে ধান কাটা শুরু করে দিল ওরা।

ঘরের সামনেকার তামাক ক্ষেতের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দেখা যায় দশহাজার বিঘা জমির ধান পেকে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ধান-ক্ষেতের মধ্যে কর্ম্মরত আধিয়ার কৃষকদের কালো কালো মূর্তিগুলো বিন্দুর মত নড়ে। ধানের আঁটি মাথায় ক্ষত্রিয় মেয়েরা আলবেয়ে হেঁটে আসে নিজেদের খোলানের দিকে।

নিজেদের খোলানে ধান তুলবে আধিয়াররা। কৃষকের ন্যায্য বিচার হোক। ন্যায্য বিচার অনুসারে ভাগ হোক ধানের। অবাক লাগে সমস্ত জিনিসটা। ঠাহর হয় না কি হচ্ছে। শুধু অনেক দিনকার চাপা পড়া কি যেন নাড়া খেয়ে ওঠে বুকের ভেতর।

সলিমের দাদী বিড় বিড় করে বকে, আর অকারণে ঘোরা ফেরা করে ধানের পুঁজের কাছে। প্রধানদের বাড়ির পুরণো সচ্ছলতার স্মৃতি আছে প্রশস্ত খোলানটায়, সহজে ভরাট হতে চায় না, নরম মাটিতে ইঁদুরের পুরণো গর্তগুলো বুঁজিয়ে বুঁজিয়ে নিকিয়ে রেখেছে সলিমের দাদী।

'মুই বুড়ি হছি কি নাহছি ? এইটা কথা শুনিবু মুই আজ—'

'বুড়ি হছেন তো কি করিবেন ?' জিজ্ঞেস করেছিল সলিমের মা।

'মুই বুড়ি হছি তো হামার সরম করে ? মুই যায়া ধান আনিবু মাথাত করি—'

বারণ না শুনে, আপন মনে বকতে বকতে বুড়ি চলে গিয়েছিল ক্ষেতের দিকে, ক্রোশ খানেক দূরে যেখানে ধান কাটছে মঙ্গনরা।...

এমন সময় হাঁক দিতে দিতে এল ওরা। একদল সিপাহী, একদল চৌকিদার, দুজনের হাতে বন্দুক, বাকি সবার হাতে লাঠি। ভাড়াটে লেঠেলও ছিল একদল, করম আলিকে খুশী করার জন্য লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্ফালন করছিল ক্রমাগত। সবার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল বুড়ো করম আলি জোতদার নিজে। খালি গাড়ি দিয়ে এসেছে দুটো, 'ধান চাপাও গাড়ীতে—'

ঘোমটা টেনে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে আপত্তি করেছিল সলিমের মা। ধানের পুঁজ-ভেঙে ছত্রখান করছিল যখন তখন একসময় বেড়িয়ে এসেছিল উন্মাদিনীর মত—'ধান নিবেন কেনে তোমরা—কেনে নিবেন—'

ধানের পুঁজ দুই হাতে জাপটে ধরে মরিয়া হ'য়ে শুয়ে পড়েছিল সলিমের মা।

মঙ্গন এসে পৌঁছাবার আগেই আরো অনেকে এসে জুটেছে। ধানের পুঁজ ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে, কয়েকজন তা কুড়িয়ে এনে স্তূপকরে রাখার চেষ্টা করছে আবার, ধান নিয়ে যেতে পারে নি ওরা। অত্যাচার করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে শত্রুদের।

মেয়ে আর পুরুষের ভিড়ে মাঝখানে হতভম্বের মত বসে আছে সলিমের মা। কাপড় চোপড় এলোমেলো ছেঁড়া খোঁড়া। আব্রুর বালাই নেই। শরীরের কয়েকটা জায়গায় মাটি লেগে আছে, কয়েকটা জায়গায় রক্ত চোঁয়াচ্ছে টিপ টিপ করে।

'হায়রে বাপ—'

মঙ্গনকে দেখে অস্ফুট কোলাহল করে' এগিয়ে এল সবাই। কি হয়েছিল, কারা হানা দিয়েছিল, সলিমের মার সাহায্যে ছুটে এসেছিল কারা, সঙীনের খোঁচা খেয়েও কেমন করে ধান আটকিয়েছে—তাই বললে, উল্টোপালটা এলোমেলো করে। অনেক রাত পর্যন্ত মঙ্গনের বাড়িতে রইল ওরা, তারপর চলে গেল।

অন্ধকার নেমেছে চারিদিকে। পুরনো নিসঙ্গ বাড়িটা নিঝুম হ'য়ে আছে আশঙ্কায়। চওড়া আঙিনা পেরিয়ে একটা অব্যবহৃত ভাঙা ঘরের কোল ঘেঁসে জোনাক জ্বলছে কয়েকটা। মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার টানে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শিশির ভেজা পাকা ধান গাছের তীব্র গন্ধ।

ভীত অস্বস্তিতে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকায় সলিমের দাদী আর অপেক্ষা করে মঙ্গনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে শীর্ণভাবে জিজ্ঞেস করে সলিমের মা—'তুমি মারিবেন না হামাক—'

'কেনে মারিব মুই? কেনে বাপুরে—' মঙ্গনের গলার আওয়াজ ভেঙে আসে অসহ্য যন্ত্রণায়।

'মোসলমানের বিটিছোয়া।...বে-ইজ্জত করিগেল ডাকাতেরা...'

একটা বিচিত্র আবেগে কাঁদতে শুরু করে সলিমের মা। রুক্ষ চওড়া হাত দিয়ে আনাড়ীর মত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মঙ্গন।

'না কাঁদো সলিমের মা। চুপ করো—'

'সলিম...সলিমটা মরি গেল্...'

কি বলতে গিয়ে গলায় আটকিয়ে যায়।

ননী ভৌমিক

নূতন সাহিত্য

কিছুদিন পূর্বে আমাদের জানানোর মত একটা খবর রয়টার খুঁজে পেয়েছিল সোভিয়েট দেশ থেকে, তার সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায়, "সোভিয়েট লেখক সংঘ" থেকে জশ্‌চেঙ্কোর মত জাঁদরেল লেখক বিতাড়িত হয়েছেন—। বাস ঐ পর্যন্ত—বিশ্ববার্তা প্রতিষ্ঠানটির সত্যনিষ্ঠার কল্যাণে এই ঘটনা-বিজড়িত সম্পূর্ণ রহস্য জানবার সুযোগ আমাদের হয়নি। তা হয়েছে অবশ্য অনেক পরে অন্যজাতীয় উৎস থেকে—ব্যাপারটি এমন কিছুই নয় যার ভিতরে কোন ব্যক্তিঘটিত "অবিচার" বা পূর্ব্বপরিকল্পিত রাষ্ট্রীক স্বৈরাচার ফুটে উঠেছে। সমর অবসানে ওদেশে যেন পুনর্গঠনের হিড়িক পড়ে গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও; বহুদিন ধরে সমগ্র দেশ-ব্যেপে লেখক ও পাঠকদের যে অবিরাম আলোচনা চলেছে তার অন্যতম ফল হিসেবে এই বহিষ্কারের ঘটনাটিকে দেখা চলে। লেনিনগ্রাডের লেখকদের দ্বারা বিগত ২২শে আগস্ট তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে জশ্‌চেঙ্কো তাঁর লেখাগুলিতে সোভিয়েট জনগণকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিলেন; "একটি বানরের দুঃসাহসিক কার্যকলাপে" তিনি লেনিনগ্রাডের যুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক প্রতিরোধের উপরেও এক হাত নিয়েছেন এই প্রতিপন্ন করে যে পশুশালার একটি বানরের পেটে যতটুকু বুদ্ধি আছে তাও না থাকার দরুন ঐ মহানগরীর বাসিন্দারা শুধু বোকার মত দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অহেতুকভাবে জান দিয়েছে। তাঁর কলম এজাতীয় আরও কিছু কিছু প্রসব করেছে যার পক্ষে নৈতিক বোধ-শোধ একেবারে বিসর্জন না দিয়ে কেউ সুপারিশ করতে পাবেন না, এ সত্ত্বেও লেখক সংঘের একটি দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন অনেক দিন ধরে, কিন্তু সাম্প্রতিক আলোচনার পর এরূপ প্রহসনের সত্যিই অবসান ঘটেছে। হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে একবার বাড়িয়ে দেওয়া যায় না এমত বর্তমানে সোভিয়েট

দেশস্থ সব লেখকই পোষণ করেন, আমাদেরও কাজে-লাগতে পারে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসে তাঁরা পৌঁছেছেন, যেমন,

(১) সমরকালীন কোন কোন রুশ লেখায় পশ্চিম ইউরোপীয় সাহিত্যেব ডিকাডেণ্ট সুরটি ধ্বনিত হয়েছে, তা মোটেই সজীবতার লক্ষণ নয়। যে সামাজিক ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে রেখে আসা হয়েছে তার পতনধর্মী আদর্শ অনুসরণের প্রশ্ন একটি এগিয়ে যাওয়া সমাজ-তান্ত্রিক দেশের শিল্পীদের বেলায় উঠতে পারে না। মহিলা কবি আখমাটোভা, খাজিন, জশ্‌চেঙ্কো প্রভৃতি কিন্তু এই অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বরণ করে নিয়েছেন, তাঁরা যেন স্বদেশের ভালো কোন কিছুই দেখতে ভুলে গিয়েছেন এবং আর্টকে সমাজ-বিরোধীরূপে কল্পনা করতে তাঁদের বাধেনি। এই সমাজবিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে কোন প্রকারেই আমল দেওয়া চলতে পারে না।

(২) পিটার পাঞ্চ নামে ইউক্রেনীয় লেখকটি যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে লেখকদের "ভুল করবার অধিকার" থাকা সঙ্গত তা মানা চলতে পারে না, কারণ ভুল করবার ওজুহাত মারাত্মক ; তা যদি সচেতনভাবে করবার দুর্বুদ্ধি কাউকে পেয়ে বসে, যেমন অনেককে পেয়ে বসেছে।

(৩) প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি বর্তমানকালে হতে পারে না, তার জন্য ভাবীকালের মুখ চেয়ে থাকতে হবে এরূপ ধারণা পোষণ করলে সমসাময়িক লেখকরা প্রকৃতি সৃষ্টির তাগিদ হারিয়ে ফেলবেন।

(৪) সমগ্র সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে এবং সাম্যবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীকে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা যে সাহিত্যিক কর্তব্য এ ভুলে থাকা চলবে না। আরও ভুলে থাকা চলবে না যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাসমর অবসানের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে ফেলবার এবং জনগণের অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করবার মহৎ দায়িত্ব থেকে কোন একেলে লেখক নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

এই সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে আর একটি ঐতিহ্যভারাক্রান্ত দেশের আর্ট ও সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সম্প্রতি ফরাসী দেশে যে আর্ট সম্বন্ধীয় বিতর্ক হয়ে গেছে, তার মধ্যে প্রধানত তিনজন অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনজনই মার্ক্সবাদী এবং কমিউনিস্ট হলেও বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। (ক) রজের গারোদি বলেছেন যে, "রসতত্ত্বে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোন জিনিস নেই", উর্দি পরে কোন কমিউনিস্ট শিল্পী আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না ; তাঁর মতে কোন শিল্পীর পক্ষে কোন লাইন মেনে না চলে নিজের মত চলাই সঙ্গত, তবে কোন অনুপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে যেন তিনি সৃষ্টি করতে না বসেন, তাহলে তাঁর পরিকল্পিত আদর্শকে রূপ দিতে পারা দূরে থাকুক তাকে মাটি করতে বসবেন।

(খ) পিয়ের এর্ভে বলেছেন যে কমিউনিস্ট রসতত্ত্ব বলে কিছু নেই, আর্টের ক্ষেত্রে সমালোচক রসতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করতে পারেন।

(গ) লুই আরাগঁ রসতত্ত্বে কমিউনিস্ট পার্টির নিরপেক্ষতা অস্বীকার করেছেন, তাঁব মতে রসতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে এবং তা না মানার মানে হল এই যে শ্রেণী সংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই একরকম প্রায় না মেনে নেওয়া।

প্রথম দুজনের কথামত রুশ সাহিত্য ক্ষেত্রে তদ্দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির গায়ে পড়ে কোন কথা বলাই উচিত হয়নি হয়ত, যদিও এ জাতীয় ব্যাপার সেখানে একাধিকবার ঘটেছে, যখনি কোন সঙ্কট মুহূর্ত দেখা দিয়েছে। অবিশ্যি কোন পাকাপোক্ত ছক কেটে রুশ সাহিত্যিকদের তা অনুসরণ করতে কোনকালেই বলা হয়নি, সে ধরনের অপবাদ নানা আকারে ইঙ্গিতে বহু তরফ থেকে উক্ত দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চললেও। যে বিষয়ের উপর সাধারণত জোর দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে একটি দল বিশেষ (অপর দেশীয় বুর্জোয়া সমাজের চক্ষুশূল হলেও) ওদেশের সামাজিক অগ্রগতিকে পথ দেখিয়ে চলেছে, তার কার্যক্রম সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলে ওদেশের কোন আন্দোলন বা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন-মূলক ব্যাপারকে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর তা না করতে পারলে লেখকের পক্ষে সমসাময়িক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। তা প্রগতিবাদীর পক্ষে সাম্য হতে পারে না। চোখের সামনে যা ঘটছে তার অর্থ বুঝে তার রসরূপ দানই হচ্ছে তাঁর কাজ, তার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে রেখে তাঁকে চলতে হবে তার উপরে উক্ত দল বিশেষের অঙ্গুলিসঙ্কেত অন্তত অতি সাধারণ ভাবে কাজ করতে পারে। লুই আরাগঁ বোধহয় নিজের দেশের পটভূমিকায় এ কথার সত্যতা না মেনে পারেননি। নিরপেক্ষতার নামে লেখক বোখুশী সৃষ্টি করতে আত্মিক নির্দেশ পেয়ে হয়ত সচেতনভাবে "ভুল করবার অধিকার" দাবী করে বলতে পারেন, তার ফলে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" সূত্রটিকে প্রসারিত করতে করতে তিনি এমন পথ ধরতে পারেন যাতে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে মুখোমুখী রুখবার কথা বিস্মৃত হয়ে যেতে পারেন—এতে প্রগতির দুশমনদেরই (যাঁরা "চিন্তার স্বাধীনতার" শ্রেষ্ঠ শত্রু) খুশী হয়ে ওঠার কথা! বর্তমান পৃথিবীতে জনগণের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, বরঞ্চ সঙ্কটকালের মধ্য দিয়ে সব দেশ চলেছে—এ সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র কায়েমীস্বার্থ রক্ষার শেষ চেষ্টা করছে এবং ছদ্মবেশী ফ্যাসীবাদ নিজেকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তাই যুদ্ধ-সময়ের মত দুইটি পক্ষ আমাদের সামনে ভাসছে, এর একপক্ষ গ্রহণ করতে হবে এবং নিরপেক্ষতার কোন পথ আর খোলা নেই (যাঁরাই এর জন্য মায়াকান্না করুন)—আজকের জনযুদ্ধ লড়বে যারা তাদের জন্যে শিল্পীর কিছুই করবার নেই কি? এরূপ বিচার থেকেই লেখনীর অবাধ গতিকে বাধা দেওয়ার কথা ওঠে, যেমন হিটলার-আতঙ্কের সময়ে রাশ দৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। যে হিটলারবাদের ভূত আজও বেঁচে রয়েছে বিভিন্ন দেশের কায়েমী স্বার্থকে আগলে কি ভূমিব্যবস্থার মধ্যে কি শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, তার সম্বন্ধে প্রগতিকামী লেখকদের তরফ থেকে নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যের কোন অবকাশই নেই—একথাই যেন লুই আরাগঁ বলতে চেয়েছেন।

এতখানি উদ্ধৃতির প্রয়োজন হ'ল আর একটি সাহিত্যসম্পর্কিত আলোচনাকে যথার্থ ভাবে যাচাই করতে। বলা বাহুল্য সে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে প্রগতি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে একটি সাম্প্রতিক আলোচনা, এর সূত্রপাত করেছেন শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত "প্রভাতী" পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "নূতন সাহিত্য" প্রবন্ধে। তাঁর বিপক্ষে-স্বপক্ষে নানা কথা উঠেছে। প্রভাতীতেই অশোক মিত্র, অরুণকুমার সরকার প্রভৃতি তাঁদের মতামত পেশ করেছেন, এমন কি পরিচয়ে হিরণবাবুর মত কম লিখিয়ে লেখক, যিনি সচরাচর নানাবিষয়ে চুপ করে থাকতে ভালবাসেন, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে এ আলোচনায়

যোগ দিয়েছেন। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে হবে লেখককে, সে বিষয়ে সকলেরই উক্তি প্রায় এক প্রকারের, অর্থাৎ সকলের মতেই দেউলিয়া পুঁজিবাদ-ফ্যাশিবাদের স্তাবক সাজতে পারেন না কোন বিবেকবান লেখকই। সমাজ-প্রগতি যে আপনা থেকেই সম্ভব হয়ে উঠবে তা নয়, তার সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার বিষয়ে দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে হিরণবাবুর কোন মতানৈক্য নেই।

সুবোধবাবু তাঁর মন্তব্যগুলিকে যথাসাধ্য বেশী শাণিত করবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার দরুণ কিছু অহেতুকভাবে রূঢ় হতে হয়েছে তাঁকে। আজকের দিনে আক্রমণাত্মক সমালোচনার চেয়ে যা বেশী দরকার—তা হয়েছে constructive criticism বা পথনির্দেশক আলোচনা, যা সাহিত্যিককে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিতে অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। এরূপ আলোচনা নিছক নেতিমূলক (negative) না হলেই ভাল হয়; অথচ এদিকে অনেকেই কেন যেন ঝোঁকেন না। প্রগতিশীল নামধারীদের লক্ষ্য করে—"ধারকরা বিদ্যে" এঁদের সম্বল, প্রগতির ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করেও সাহিত্যক্ষেত্রে এঁরা দাঁড়কাকই হয়ে রইলেন, দলবিশেষের ফরমাইস অনুসারে এঁরা লেখেন ইত্যাদি—একটির পর একটি চোখা চোখা বাক্যবাণ সুবোধবাবু তাঁর তূণ থেকে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁদের সম্পূর্ণ দোষগুণ ভাল করে বিবেচনা না করেই প্রায় এক কথায় তাঁদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা ফ্যাশিবাদকে অপরোক্ষভাবে সহায়তা করা ছাড়া আর কিছুই এ কয়েক বছর ধরে করেন নি। বোধ হয় তাঁর বক্তব্য এই যে, সত্যকাব বিপ্লবী মন নিয়ে যে সব সাহিত্যিক দেখা দেবেন তাঁরা এঁদের থেকে স্বতন্ত্রজাতের, তাঁরা বাস করছেন ভবিষ্যতের জঠরে। একথা বলা মানে সমসাময়িকদের সৃষ্টিক্ষমতাকে উৎসাহ না দিয়ে স্পষ্ট বলে দেওয়া যে সাহিত্যের আসর থেকে এইবেলা তোমরা বিদায় নিতে পার। এরূপ কথায় সাহিত্যান্দোলনকে সাহায্য না করে প্রকারান্তরে ব্যঙ্গ করাই হয়। এর দ্বারা সুবোধবাবু যে নয়া আন্দোলন সৃষ্টি করতে চান তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমার মনে হয় সাহিত্যালোচনার মাপকাঠিকে প্রগতিশীল করতে গিয়ে এমন একটি সঙ্কীর্ণ ছকে রূপান্তরিত করে ফেলা উচিত নয় যা অনুসরণ করতে গিয়ে হিরণবাবুর ভাষায় ঠক বাছতে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক যদি ঠক সেজে থাকেন তাঁর ভুল দেখিয়ে দেওয়া অসঙ্গত নয়, কিন্তু গাল দিয়ে ঠিক সেই কাজটি সাধিত হতে পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মাপকাঠিতে একালের সকলেই মারা পড়েন, পূর্ববর্তীরাও মারা পড়েন, যেমন, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই। তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন নি, অতএব তাঁরা তাঁদের সময়ে যে প্রগতিশীল দায়িত্ব পালন করেছেন সে কথাও অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। তাঁর পথানুবর্তী অরুণবাবু বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম আমাদের মনেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন, এখানেই তাঁর সফলতা ও শক্তি।" একথাও অযথার্থ উক্তির সামিল, কারণ বঙ্কিমের যুগ দিয়ে তাঁকে বিচার করা হচ্ছে না; তিনি যে সময়ে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সে সময়ে এদেশী মুসলমানেরা অনেকে নিজেদের বিদেশী বলে মনে করতেন এবং তা থেকে তখনকার নবজাগ্রত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বাদ দিয়েই নিজেকে ঘোষণা করেছে, এ একটা ত্রুটী

সন্দেহ নেই, কিন্তু এর জন্তে প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে বঙ্কিম পড়েন না (একথা গোপাল হালদারও স্বীকার করেছেন)। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আনাচে কানাচে বহু ডিকাডেন্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি অন্তত এদেশী সমস্ত মানসকে যে অনবরত আঘাত হেনেছেন এদিক দিয়ে যুগপ্রগতিকে তিনি রীতিমত প্রেরণা দান করেছেন। ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য নূতন করে বিশ্লেষণ করে আঘাত করেছেন দেশের জবুথবু অনড় অচল সনাতন সমস্ত বিশ্বাসগুলিকে। (মধুসূদন-বঙ্কিমও বহুপ্রকারের সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাসগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন)। অবশ্য ত্রুটী থেকে তাঁরা কেউ মুক্ত নন এবং বালজাক অথবা সারভেন্টিসের কাজ কেউ করতে সক্ষম হননি, তার কারণ এদেশীয় বুর্জোয়া মানস পরদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আওতায় অস্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেজন্তে সামন্ত জীবনধারাকে চরম আঘাত হানবার যে দায়িত্ব পালনে বুর্জোয়াধর্মী দিক্‌পাল সাহিত্যরথীরা অক্ষমতা দেখিয়েছেন তা ভালভাবে সুষ্ঠুভাবে শেষ করবার দায়িত্ব পড়েছে বর্তমানের শিল্পীদের উপরে। তাঁরা কতখানি সে কাজে এগিয়ে গিয়েছেন তা বিচার করেই তাঁদের সম্বন্ধে রায় দান সঙ্গত। বিপ্লবী কর্তব্যের দুটি দিক রয়েছে, Negative বা নেতিমূলক এবং Positive বা গঠনমূলক। দুদিকেই প্রগতিশীল শিল্পীদের নজর দিতে হবে, বোধ হয় হালের সাহিত্যিকরা কম বেশী নেতিমূলকভাবেই দৃষ্টিভঙ্গীকে সৃষ্টির কাজে সঞ্চালিত করেছেন। তাই দেখতে পাই বিপ্লবী চরিত্র তাঁরা কেউ আঁকতে পারেন নি বা পারছেন না (এমন কি মধুসূদন যেমন রাবণকে এঁকেছেন অথবা বঙ্কিম যেমন আনন্দমঠের কর্মীদের এঁকেছেন অথবা শরৎচন্দ্র যেমন বলিষ্ঠ মানস-শক্তিসম্পন্ন সংস্কারকামী যুবকের চরিত্র এঁকেছেন, ঠিক তেমনি করেও কোন আধুনিক শিল্পী কোন চরিত্রাঙ্কনের কেরামতি দেখাননি, তার অর্থ বিপ্লবের গতি চিত্রণে তাঁরা উৎসাহী নন অথবা অনিচ্ছুক যাই বলুন)। তাঁদের লেখায় সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ফুটে ওঠেনা, কিন্তু সেহেতু তাঁরা কি সবাই ফ্যাশিবাদের দোহাররূপে কাজ করছেন? তাঁরা অন্তত বর্তমান সামাজিক পরিবেশের যথার্থ রূপ আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, তার নোংরামী, তার দুঃখ-দৈন্ত, দারিদ্র্য-দুর্দশা, দুর্বলতাকে নানাভাবে ফুটিয়েছেন, সে সাফল্যকে সাময়িক প্রয়োজনানুগ বলব না তো কি? যেমন তারাশঙ্কর আগে গ্রাম্য সামন্ত সমাজের ছবি আঁকতেন রোমান্টিক মন দিয়ে, কিন্তু গণদেবতা—পঞ্চগ্রামের আলেখ্য গ্রাম্য শোষকদের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন গল্পে শোষকচরিত্রের ভণ্ডামী-বেয়াদবীকে রূপ দিয়েছেন; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও রোমান্টিক ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, বোধ হয় পারবেন না যদি না কাব্য-ঘেঁষা আঙ্গিক, ভঙ্গী এবং দৃষ্টি-কোণকে তাড়াতাড়ি সময় থাকতে বদলে ফেলেন, সকল কুলের মনোরঞ্জনের বাহাদুরীর মোহ বর্জন করেন; প্রবীণ শিল্পী পরিমল গোস্বামীর নাম প্রগতি সাহিত্যপ্রসঙ্গে উচ্চারিত হতে বড় দেখিনা, কিন্তু অন্তত কতকগুলি গল্পে যুদ্ধোত্তর অথবা যুদ্ধকালীন কদর্যতার যে ব্যঙ্গরূপ অঙ্কন করেছেন তার মূল্য কম করে দেখা উচিত নয়; সুশীল জানাও দুর্ভিক্ষ-চোরাবাজার-বিধ্বস্ত গরিব সমাজের চিত্রাঙ্কনে প্রথমশ্রেণীর না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর দক্ষতা দেখিয়েছেন; গণনাট্যের দু-একটি নমুনায় ভেঙ্গেপড়া জীবনযাত্রার ছবিই ফুটে উঠেছে তেমন সাফল্যপূর্ণভাবে না হলেও; ভাষার জোর এবং অদ্ভুত মানসিক সৎসাহস থাকা

সত্বেও বিনয় ঘোষ ছোট গল্পে সফল হতে পারেন নি বোধ হয় প্রাবন্ধিক মানসিক গঠনের দরুণ, তবু তাঁর "শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ" চোরাবাজারীয় সভ্যতার উপব চমৎকার ব্যঙ্গরচনা-সমষ্টি-রূপে বর্ণিত হতে পারে; এমনি আরও অনেকের সম্বন্ধে বলা চলতে পারে। এঁদের সকলের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন হয়েছে, সমগ্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এরও প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে পাবে না। এঁদেব যে ক্রটীগুলির কথা আমাদের মনে হয়ে থাকে তা হচ্ছে—এঁরা (এক পবিমল গোস্বামীকে বাদ দিয়ে ধরলে) গল্পাংশের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট নন, কতকটা যেন এঁরা ফটোগ্রাফিক মনোবৃত্তি দেখিয়ে থাকেন, তাই এঁদের হুবহু বাস্তবের অনুকৃতিরূপে অঙ্কিত চিত্রগুলি কখনো কখনো morbid অথবা নীরস হয়ে পড়ে, সজীব ও সবল কল্পনার আশ্রয় এঁরা কখনোই প্রায় নেন না; এমন কি তারাশঙ্করের মত শক্তিশালী শিল্পীও অনাবশ্যক আড়ম্বর সৃষ্টি করে প্রায়শ নীরস হয়ে পড়েন পাঠকের কাছে, মানিকের তো কথাই নেই। এ ছাড়া অনেকেই অনবরত লেখার তাগিদে নির্বাচিত ঘটনাগুলিকে ভাল করে স্বীয় মানসে সাজিয়ে না নিয়ে শিল্পরূপ দিতে বসেন, তার ফলে অনেক অবাঞ্ছিত বাহুল্য এঁদের রচনায় অনিবার্য হয়ে পড়ে যা পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর। আর একটি কথা, এঁদের লেখায় উইট্‌ কি হিউমার্‌ নামীয় বস্তুটির অভাব বড় চোখে পড়ে, অর্থাৎ হাস্য-রসের বালাই এঁদের লেখায় নেই দুই একজনের ক্ষেত্রে ছাড়া, এঁরা যেন পণ করে পাঠকের চোখে ধারা বইয়ে দিতে অথবা পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করতে লেখনী ধারণ করেছেন। বর্তমান জীবনের গলদ নিয়ে কাঁদুনীর চেয়ে তার উপরে ব্যঙ্গচিত্রেব দাম বেশী। এঁদের সম্বন্ধে সুবোধবাবুব কড়া মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সত্যি না হলেও এঁদের আত্মসন্তুষ্টি সর্বতোভাবে সমালোচনা করা কর্তব্য। তিনি একটি কথা যথার্থই বলেছেন যে বিপ্লব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা এঁদের নেই, ধারণা থাকলেও অন্তত লেখায় তা ফুটে ওঠে না। সেজন্য বর্তমান শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে কিছু পরিচিত থাকাও এঁদের বেলায় আবশ্যক হয়ে পড়েছে, অবশ্য সে পরিচিতি একেবারে নেই সেকথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। কত বড় মহৎ কাজ এঁদের সামনে রয়েছে! বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি বর্তমানে আর বুর্জোয়া শিল্পীদের দ্বারা সাধিত হতে পারে না, তা বোঝা যাচ্ছে বিপরীত ভাবাপন্ন লেখকদের ধরণ-ধারণ লক্ষ্য কবে, সে কাজগুলি এবং গ্রাম্য-সহুরে সর্বহারাদের পথনির্দেশক চিত্রাঙ্কনের কাজগুলি একসঙ্গে করে যাওয়ার দায়িত্ব ঘাড় পেতে এঁদের নিতে হবে, নইলে প্রগতির যথার্থ বাহক এঁরা হতে পারবেন না। যদি কেউ বলেন যে এঁদের দ্বারা তা সম্ভব হবে না, তাহলে তিনি সাহিত্যান্দোলনের শ্রেষ্ঠ ক্যাডারদের বাদ দিয়ে তা সফল করতে সংকল্প করেছেন, যা হতে পারে না। শুধু খুঁত দেখে দেখে সাফল্যের দিকটা একেবারে না দেখতে পারার মধ্যে বুদ্ধির জলুস থাকতে পারে, কিন্তু কৃতিত্ব নেই। ছদ্মবেশী দিশী-বিদেশী ফ্যাশিবাদের যে কোন রকমের গণ-আন্দোলনের উপর আক্রমণ থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে তার মরণ-কামড়ের পালা শুরু হয়েছে, প্রগতিকামীদের বর্তমানে তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পালা, সে লড়াইয়ে তাঁরা অক্ষমতা প্রমাণ করেছেন অথবা করবেন এমন কথা বলে তাঁদেব এক পা এগিয়ে যাওয়াকেই যেন রুখে

দেওয়া হয়। এভাবে সুবোধবাবু-পরিকল্পিত নূতন রেনেসাঁ আন্দোলন শক্তিলাভ করবে না।

সুবোধ বাবু ধর্ম বা নীতি না মেনে চলবার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর কল্পিত আন্দোলন-কারীদের। সার বস্তুকে এড়িয়ে গিয়ে তার উপরে যে খোলস রয়েছে তাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগার মত কথা এ যেন। যে ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে টিকে রয়েছে, তার কলেবরে সনাতনের অস্থিকঙ্কাল অনেক কিছুই রয়েছে ওতপ্রোত হয়ে, সামন্ততান্ত্রিক এমন কি গোত্রতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক বিশুদ্ধ শোণিতের ব্যবস্থাগুলিও গোপনে তার মধ্যে ধুক ধুক করছে, তার পরিচয় এ যুগের অনুসৃত বিধিনিষেধগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু তার সব কিছুর মধ্যে বড় সত্য হয়ে রয়েছে আধাসামন্ত আধাবুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট শোষণ ব্যবস্থা, তার উপরেই আর সব কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়লে উপরের যাবতীয় নির্মাণ কার্য ধূলিতে লুটিয়ে পড়বে। আজকের শিল্পীর দৃষ্টি বিশেষ করে পড়া দরকার সেই বনিয়াদটির উপরে, তার দুর্বলতা ও একালের সহিত সামঞ্জস্যহীনতাকে লোকমানসের গোচর করাই হবে তার সবচেয়ে বড করণীয়। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদের চেয়েও ভণ্ড ধার্মিকদের প্রকৃত সামাজিক রূপ উন্মোচন জনসাধারণের আত্মসম্বিৎলাভের পথে অধিকতর কাজে লাগবে। "ঈশ্বরকে না মেনে চল" এধরণের বৈজ্ঞানিক-দ্বান্দ্বিক সদুপদেশ হয়ত শ্রেণীসংগ্রামের মূলে আঘাত করতে পাবে, কারণ নিপীড়িত শ্রেণীমানসে ধর্মের ধোঁকাটা এমনভাবে রয়েছে যে উপদেশদ্বারা তার উৎপাটন সহজ না হওয়াই স্বাভাবিক, তার চেয়ে সেই সংগ্রামের গতিবেগ বৃদ্ধির পক্ষে অনুপ্রেরণা দিতে পারে এমনতরো সাহিত্যিক সৃষ্টি বেশী কার্যকরী হবে। অর্থাৎ সুবোধ বাবু সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাক্‌টিক্যাল্ দিকটা তলিয়ে দেখছেন না, গালভরা বড় বড় কথার মধ্যে প্রগতির স্বরূপ অনুসন্ধান করছেন। "কিছু মানবনা" অথবা "যে বিধিনিষেধ টিঁকে রয়েছে তা একবাক্যে অস্বীকার কর" এ জাতীয় উক্তির মধ্যে লেনিনবর্ণিত বামপন্থী বিচ্যুতি (Left deviation) ধরা পড়ছে, যা আজকের সংগ্রামসাফল্যকে এগিয়ে না দিয়ে বরং পিছিয়ে দেবে, শিল্পীর পক্ষে তো ঐ বিচ্যুতি তাঁকে ধর্মান্ধ জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই সাহায্য করবে। অর্থাৎ গণশিল্পী জনগণ থেকেই বেশী উগ্র আক্রমণকারী হতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তাছাড়া যে সব লেখকদের মনে সংস্কার বেঁচে রয়েছে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁদের সঙ্গে একত্র সম্মিলিত ফ্রণ্টে থেকে যে লড়াই কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে করা চলছে, তাকেও এক আঘাতে দু টুকরো করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সর্বতোমুখী জেহাদ অর্থের চেয়ে অনর্থই অধিক প্রসব করবে, যা সুবোধবাবুও আকাঙ্ক্ষা করেন না। প্রগতি-শিল্পীদের বরঞ্চ দলকেন্দ্রিকতা (Sectionalism) কিছু বেশী পরিমাণে রয়েছে, যা একটা বড়রকমের ত্রুটী, তা থেকে অব্যাহতির আবশ্যকতা ফ্যাসীবিরোধী সংঘ গড়তে গিয়ে এই সেদিন তাঁরা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সে ত্রুটী ক্ষালন হয়ে যায় নি। সম্মিলিত ফ্রণ্টকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা কখনোই প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে আপোষ প্রবৃত্তিরূপে নির্ণীত হতে পারে না। আরও সুবোধবাবু যেন ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন যে পূর্ববর্তী শিল্পীদের থেকে গা বাঁচিয়ে থাকলেই যেন আজকের সাংস্কৃতিক আদর্শকে অক্ষত রাখা যায়। কিন্তু পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কিছুই শিক্ষণীয় নেই কি ? তাঁদের নানারকমের লেখায় যে আবেগ, প্রাণ চাঞ্চল্য ও সৃজনীশক্তি ছড়িয়ে রয়েছে, তার অভাব বেশী করে চোখে পড়ে

একালের লেখায়—শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সাহিত্যে প্রাণের আবেগ যেন অন্তর্ধান করেছে! আধুনিক শিল্পীমন যে অভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে তা পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে পূর্ববর্তী সাহিত্যের ঋণ অসংকোচে স্বীকার করে নেওয়া। মাইকেল-বঙ্কিম-যুগের জীবন্ত শিল্পসাধন একালের সাধনাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিতে পারে। সে যুগে সামন্ত সংস্কারগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয়নি এবং ধর্মবিশ্বাসকে ছিন্ন করবার প্রশ্নও ওঠেনি, শুধু সমাজগত ও ধর্মগত ব্যবস্থাকে সংস্কার করবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, তবু তার মধ্য দিয়েও প্রচলিত বিধি বিধান প্রচুর আঘাত লাভ করেছে, সময়ের তুলনায় সে কম কথা নয়। আরও লক্ষনীয় এই যে সে যুগের শিল্পী যা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন তার-ই শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, সেই অনুভূতির প্রাবল্য একালের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্তের অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছে, এ কিন্তু আমার কথা নয়। তাই বিগত যুগের নিকটে শিক্ষানবিশীর প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া চলে না তাঁদের পক্ষেও যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে একেবারে নূতন সমাজ গড়বার জন্য লড়াই করবেন।

সুবোধবাবু সমসাময়িক প্রগতির ছাপ মারা সাহিত্যে কোন দলীয় ফরমাইসের গন্ধ অনুভব করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর মত অনুসারে এর কোন মার্জনা নেই, যদিও প্রগতিশীল সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও প্রচারমূলক হতে বাধ্য। সোজা কথায়, প্রচারমূলকতায় দোষ নেই, দলীয় হুকুমনামার দ্বারা যেন সাহিত্যের গতি নির্ধারিত না হয়। একথা অনেকাংশে সত্যি। কিন্তু বঙ্গদেশীয় সাহিত্যান্দোলনে ঠিক এই জিনিষটি ঘটেছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না কি? কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের প্রচারের একটা দিক থাকা নিন্দনীয় কিছু নয়, তার সৌকর্যার্থে কোন কোন শিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টার সামান্য অংশ হয়ত নিয়োজিত হতে পারে, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁর সমস্ত সাধনাকে দলীয় কাজে লাগাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। যদি দলবিশেষের সাধারণ চিন্তাধারা, যেমন মজুর ধর্মঘট কি কিষাণের তে-ভাগা আন্দোলন বা জমি দখলের লড়াই অথবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ থেকে কেউ সৃষ্টির প্রেরণা পান তা কি একান্তই দোষের? প্রথমেই বিচার করে দেখা কর্তব্য যে সেই বিশ্লেষণ সামাজিক প্রগতির বিরোধী রূপ গ্রহণ করেছে কিনা অথবা করতে পারে কিনা। তার মধ্যে যদি এমন আন্দোলন সৃষ্টির ইঙ্গিত থাকে যা আজ অথবা আগামীকাল সামাজিক বিপ্লব সাধনে সহায়ক হবে, তবে তার প্রতি উদাসীন থেকেই কি বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির কাজ ভাল চলবে? সোভিয়েট দেশে যে সাম্প্রতিক সাহিত্যালোচনার পর্ব শেষ হয়েছে, যাঁর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে এ প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর সম্ভবত পাওয়া যেতে পারে। সৃষ্টির পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা থাকাই অপরাধ নয়, যদি না সেই পরিকল্পনা অকেজো অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিপোষক হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সেরা সেরা সৃষ্টির পশ্চাতে ফরমাইসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আজ যদি কেউ ভাল একখানি শ্রেণীসংগ্রামের আলেখ্য অঙ্কন করেন, তা হয়ত দলীয় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তা বলে কি তার সাহিত্যিক মূল্য নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে তো "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমের সাহিত্যিক মৃত্যু অনেক পূর্বেই ঘটে গেছে? অবশ্য একথা যথার্থ যে দলীয় বিধিনিষেধ কোন সাহিত্যিকের ঘাড়ে চেপে বসলে সুফল ফলতে পারে না। সুবোধবাবু কি তার কোন প্রমাণ বাংলার প্রগতিশীল নামধারী লেখকদের আচরণে

পেয়েছেন ? বোধ হয় শ্লোগানমুখর দু একটি গানের কলিতে তাঁর বিভ্রমের কারণ ঘটেছে। কিন্তু প্রগতিশীলদের সমগ্র প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে পরিচয় রেখে কি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন ? আজ দেশের বুকে যে ঝড় বয়ে চলেছে তার ঝাপটা শিল্পীমনকে কিছু পরিমাণে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, কিন্তু তাকে দিশেহারা হতে দেওয়া চলবে না। তাই শিল্পীকে মাঝে মাঝে কঠোর মন্তব্য শুনতে হবে বৈকি, কিন্তু অকারণ আক্রমণে তাঁকে ঘায়েল করবার প্রবৃত্তি ঠিক সমালোচকসুলভ নয় একথা স্মরণে রেখে আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে, যার জন্য সুবোধবাবু ঠিক সাময়িক প্রয়োজনীয়তা হিসেব করেই আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের আলোচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্য, এবং এর সূত্রপাত করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

প্রগতি সাহিত্যান্দোলনকে সফল করবার কথা আজ সকলের মনে জেগেছে, এ আশার লক্ষণ। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আন্দোলন আমরা আরম্ভ হতে দেখেছি কয়েকজনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, যখন সুরেন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ সামনে রেখে "প্রগতি লেখক সংঘ" গড়েছিলেন; তারপর যুদ্ধের হিড়িকে এ সংঘের নাম পালটায় এবং আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু পরিবর্তনও দেখা দেয়; তারপর পূর্বের নামটিই পুনরায় গৃহীত হয়েছে। এর ভিতরে নূতন করে জীবনসঞ্চার করতে আন্তরিকভাবে কেউ যদি চান তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় যে মামুলী ধরণের পেশাদার হওয়া তার চলবে না, যেহেতু তাঁর কাজটি হচ্ছে সেই ধরণের যা বঙ্গীয় রেনেসাঁর সূচনার মুখে মাইকেল তাঁর সামনে দেখেছিলেন। এক যুগ তার সব কিছু দুর্বলতা বুকে করে শেষ হয়ে যেতে চলেছে, কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, তার সাহিত্যিক আদর্শও যেন শেষ করে ফেলেছে তার পরমায়ু—সে আদর্শ যেখানে জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি অথবা আধা-সামন্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে রফা খুঁজতে চেয়েছে সেখানে নূতন পথ কেটে চলবার সময় এসে গেছে। অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে প্রচলিত ব্যবস্থার বহু ক্লেদ-পঙ্ক-গল্‌তি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, এসবের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন, তা হচ্ছে Negative vision বা নেতিমূলক পর্যবেক্ষণ—তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয় এই যুগসন্ধিক্ষণে, এই জঘন্য সামাজিক জগৎ থেকে বেড়িয়ে আসার পথ তিনি যেন তাঁর সম্মুখে দেখতে পান, তা নইলে ভাবী বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে কি করে তাঁর সৃষ্টিগুলিতে রূপ দিতে পারবেন ? প্রথম কাজটিতে দক্ষতা অনেকে দেখিয়ে চলেছেন তার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে—কিন্তু শেষোক্ত কাজ, মানে যা ঠিক চিত্রকর বা ফটোগ্রাফারের দায়িত্ব থেকে কিছু স্বতন্ত্র, এড়িয়ে গিয়ে কেউ কি যথার্থভাবে নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে পারেন ? সুবোধবাবুর বেপরোয়া গাল মন্দের ভিতর দিয়েও এরূপ প্রশ্নই যেন ভাষালাভ করেছে, যেহেতু আন্তরিকভাবে তিনি একটি সৃষ্টিশীল-সাহিত্য যুগের জন্য সবল ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন, অন্তত এ জন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছিনে।

অনিলা গোস্বামী

এ্যাড হক

পাশাপাশি দুটো দোকান। একটাতে দেখা যায় টিনকরা পেতলের বদ্না, অ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, কেরোসিন কাঠের কয়েকটা টেবিল, তুন্দুরে সেঁকা মোটা মোটা রুটির তাড়া, আর কাঠকয়লার আঁচে ঝলসানো শিক কাবাব। আর একটায় মাটির হাঁড়ি, পানের পিক, ন্যাতা আর উড়ে ঠাকুরের গোদ। দুটোতেই প্রভুদাস বীনাকরের সমান নিরপেক্ষ হাজিরা। লোকটা বেঁটে, রোগা, একমুখ দাড়ি, গায়ে আধময়লাটে ছেঁড়া একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী, বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানটায় খানিকটা হলদে ছোপ। বয়স চব্বিশ থেকে চুয়াল্লিশ।

সাগনের কারখানাটায় বারোটার ঘণ্টা পড়তেই দোকান দুটোই ভরে ওঠে। পঙ্গপালে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। একটা দোকানের সামনে নেড়ীকুত্তার ভিড় জমে, আর একটায় পাতের ফাঁকে ফাঁকে সপরিবার একটা বেড়াল খাদকের মেজাজ বুঝে খাস্তের দিকে থাবা বাড়ায়।

"আরে বেটির আবার এ তিনটে কবে হল ?" সরস কণ্ঠে পালোয়ান মোড়ল চোখের একটা ভঙ্গী করল। "আঃ আঃ চু চু ! শালীব পুঁইশাক রোচে না—বিইয়ে অরুচি হয়েছে।"

"বিয়োবে না ? তোর মত ?" একটু তাতিয়ে তোলা গলায় গৌর বাগ বলে "এক ছেলের জন্মো দিয়ে বাই জন্মে গেল। অমোন মাগ পেলে বছরে দুটোর জন্মো দিতুম।"

ফস করে আর এক পাত থেকে হরিমোহন কেলে বলে উঠল, "একা শানাও না বাগ মশাই !"

হাগার ম্যান দক্ষিণা চাটুজ্জে বিচক্ষণ লোক, সাত বছরে পাঁচটি সন্তানের জনক, চিবিয়ে চিবিয়ে বলে "ছেলের জন্মো দিতে সবাই পারে হে, মাগ থাকলেও আর না থাকলেও, খাওয়াবার ক্ষ্যামোতা থাকা চাই।"

"ওপোর-টাইম লিখিয়েছেন চাটুজ্জে মশাই ?" পালোয়ান জিগেস করল।

"না লেখালে চলবে কেন ? পাঁচটা কাগের বাচ্চা হাঁ করে আছে।"

"আপনি রোজ কি করে লেখান ? পাঞ্জাবী সাহেবকে কিছু খাইয়েছেন টাইয়েছেন নাকি ?"

"যা যা ডেঁপোমি করিস নি। বয়েস হোক বুঝবি।"

"বলুন না ! বলুন না চাটুজ্জে মশাই !" আরও কয়েকজনের উৎসুক দৃষ্টি দক্ষিণা চাটুজ্জের মুখের ওপর।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে গলাটা ঈষৎ খাটো করে দক্ষিণা বলল "আরে কাজের টাইমে মাল কম দিতে হয়। এখন মালের দরকার, ওপোর-টাইম না দিলে মাল হবে না।" আত্মপ্রসাদী ধূর্ত হাসি হেসে উঠল দক্ষিণা।

"না !"

ফোনের থেকে দৃঢ় কণ্ঠস্বর। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল সবাই প্রভুদাসের দিকে।

"না না! মাল বেশী দেবেন আর নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবেন।" প্রভুদাসের গলায় হৃদ্যতা "মালিক লাভ করবে—করছে ত দেখছেন"—ভাতের গ্রাসটা মাঝপথে থামিয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে প্রভুদাস আবার বলল, তার গলার সতেজ সততা তাদের আকৃষ্ট করেছিল, "আর আপনারা আধপেটা খেয়ে থাকবেন? কারখানা আপনাদের, পয়সা মালিকের, কিন্তু মাথার ঘাম পয়সার নয় আপনাদের! কল আপনি চলে না, যন্তোরে চাই আপনাদের হাত। ইউনিয়নের এই হোল গোড়ার কথা।"

সম্মানসূচক সম্বোধন, অধিকারের গাঢ়ত্ব—সোজা তীর।

"গড়তে হবে। একজোট হতে হবে। ইউনিয়ন করে তার কোম্পানী মাসে আঠারো টাকা মাগিগভাতা আদায় করেছে। কোম্পানীর কাছে সস্তায় চাল পাবার জন্তে লড়ছে তারা এখন।"

একে অধিকার তায় লড়াই! কুরুক্ষেত্র পাণিপথ চোখে দেখা যায়।

পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে কাল্লু হাঁক দিল "এই পালোয়ান কি হচ্ছে রে?"

"তাব কোম্পানী বিশ টাকা মাগিগভাতা আর তিন টাকায় চাল দিচ্ছে।" হাঁক দিল পালোয়ান।

পানামাথা, ম্যালেরিয়া জড়ান, সরস উর্দু বেরিয়ে এল মহম্মদ কাল্লুর মুখে। ভিড় জমতে লাগল।

* * * * * *

"ওদের নাচাচ্ছে কে?" দেওয়ালে সাঁটা প্রোডাকশন চার্টটার দিকে চেয়ে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আলেক্জাণ্ডার বলে উঠলেন "প্রোডাকশন এত পড়ছে কেন?"

খাকী হাফ প্যাণ্টের নীচে বিশাল দুই উরু, গায়ে খাকী হাফ শার্ট, সরস মেদবহুল মোটা চেহারা, ভঙ্গীতে ক্ষমতার ঔদ্ধত্য।

ফোরম্যান গাঙ্গুলী জবাব দিল "আর কাজে কারও মন নেই স্তর, দিনরাত ফিসফিস চলছে। দক্ষিণা বলছিল ওরা নাকি ইউনিয়ন গড়েছে, এ কারখানা ওদের। দেখা হলে আর সেলামও জানায় না।"

"ডাখিনা? বোলাও ডাখিনাকো!"

ডাখিনা হাজির হয়। সংঘবদ্ধভাবে পাওনা আদায় সাপেক্ষ। উপস্থিত পিটচাপড়ানো আর পারিতোষিক উপরি। সাহেব মধুব হয়ে উঠেছেন।

জেনারেল ম্যানেজার ফোনটা তুলে নেন "··সার্জেন্ট রবিন্স? আলেকজাণ্ডার হিয়ার মর্নিং···মর্নিং। অনেকদিন তুমি আমার এখানে আসনি···হাউ আর দি ওয়াইফ্ অ্যাণ্ড্ বেবি? আই হাড্ এ লাভ্লি থিং ফর ইউ···আর রবিন্স—আই হাড্ এ লিট্ল্ ট্রাবল্ হিয়ার···সাম বীণাকর···ডু সামথিং, উইল ইউ···মাচ্ ওবলাইজ্ড্!"

সাঁড়াসী দিয়ে গরম লোহাটা চেপে ধরে গৌর বাগ প্রশ্ন করল "কি বললে রে বড় সাহেব?"

হাতুড়ীটা তালরেখে পড়ল, কয়েকটা আগুনের ফুলঝুরী ছিটিয়ে গেল।

"শুনিয়ে দিয়ে এসেছি" এক বুক নিঃশ্বাস টেনে দক্ষিণা জবাব দিল। "শালা গরুখোর"

হাতুড়ী উঠছে "আমরা কি ছাগল ভেড়া ?" আগুনের ফুলঝুরি চিকিয়ে উঠল ফের "তার কোম্পানীর লোকের চেয়ে আমরা কি কম কাজ করি ?"

* * * *

রাত গভীর।

সেইমাত্র বীণাকর উষা ফ্যাক্টরীর সাদা দেওয়ালে আলকাৎরার বড় বড় হরফে ইউনিয়নের বাচ্যটা লিখে শেষ করেছে। দরোয়ান এবং পুলিশের চোখ এড়িয়ে লেখাটা দ্রুত সারতে হয়েছে তার, তাই অক্ষরগুলো হয়েছে প্রথম শিক্ষার্থীর মত। একবার সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করল হাতের কাজ। পশ্চিমে হেলা একফালি চাঁদের আলো দেওয়ালে এসে পড়েছে। দক্ষিণে হারিয়ে যাওয়া গাঁয়ের একটু আভাস ভেসে আসে, আর মজা নদী, আর বাদার হাওয়া। স্তব্ধ পুকুরে ঢিল ফেলা ঢেউয়ের চাকার মত শহর বিস্তৃতি লাভ করছে। লেখাটা পড়া যায় পরিষ্কার।

বিড়ি একটা ধরিয়ে নিল বীণাকর, তারপরে ঈষৎ বাঁয় ঝুঁকে হাঁটতে সুরু করে দিল উত্তর শহর পানে। এক জায়গায় ট্রামের লাইন ওয়েল্ড করা হচ্ছিল, একটুখানি দাঁড়িয়ে গেল সে। তীব্র নীল আলোর চকিত দ্যুতি আর রাত ছেঁড়া হঠাৎ আলোয় ঠুলি আঁকা কারিগর গুলো যেন ময়দানবের বাচ্ছা। ময়দানবের বাচ্ছা—কয়েকজন প্লীহা-স্ফীত, মূঢ় চাষা। ওই উঁচু আকাশ ছোঁয়া পোলটার রিভেটগুলোয় আছে ওদেরই মুঠোর ছাপ।

প্রভুদাস বীণাকর আবার বাঁয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতে পা চালিয়ে দিল।

* * * *

ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে নামতে গিয়ে পালোয়ান মোড়ল প্রায় একটা লরী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। ডান হাতের কনুইটায় তার একটু ছড়ে গিয়েছিল। উপুড় হয়ে পড়ায় কপালেও পথের ধুলো ফুটো রক্ততিলক এঁকে দিল। ধাবমান লরীটার পৃষ্ঠদেশে কয়েকটা চোখা চোখা বান ছেড়ে কপাল মুছে ফেলল পালোয়ান। কারখানার ডে-শিফ্‌ট ভেঙ্গে গেছে, একটা গুঞ্জন চলেছে গেটের সামনে। পালোয়ানকে দেখে বোলতার ঝাঁক গুমগুমিয়ে উঠল বেশী করে।

"এই পালোয়ান" হরিমোহন কেলে হেঁকে বলল "আমরা বাবুর বাড়ী যাচ্ছি।"

"কেন ?"

"জগদেবকে বড়সাহেব মেরেছে। আধঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।" জনতা গুমিয়ে উঠল একমুহূর্ত্ত আবার।

"অ্যা !" জগদেবের দিকে তাকাল পালোয়ান। ইয়া জাঁদরেল চেহারা বেহারী কুলী।

"প্রভুদাস বাবু বলেছে আগে মালিককে জানাতে, কিছু না হলে আমরা ধর্মঘট করব।"

উষা কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় বংশানুক্রমিক জমিদার। দীর্ঘ, গৌর, আর্য্যসুলভ গঠন, ক্ষুরধার মন। প্রথম যৌবনে সম্পদের ক্ষমতা আমাদের ধনিক-শ্রেণীকে যে পথেচালনা করে, হরিহর বাবুকে কেন যে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করায়নি ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় তাঁর অনুসন্ধিৎসাই তাঁর মনের ওপর কঠিন খোলস পড়তে দেয়নি। কিন্তু সাগরের তরল ঢেউ সমুদ্র সৈকতে পাথরেরও ওপরি চিহ্ন রেখে যায়। ব্যবসায় বুদ্ধি নিয়ে তাঁর এ কারখানার ভিত্তি স্থাপিত নয়। গঠনের চেষ্টা নিয়ে পেয়েছিল তাঁর আত্মপ্রকাশ।

অনেক অর্থ তাঁর নষ্ট হয়েছে অনেক পরীক্ষায়, অগঠিত শ্রমের মূঢ়তার প্রাচীরে বার বার মাথা খুঁড়ে মরেছে তাঁর চেষ্টা। লোকটা ভাবুক, দেশপ্রেমিক, কিন্তু যুগে যুগে চিন্তাধারারও সীমানা আছে।

যখন শ্রমিকদের সম্মিলিত কণ্ঠের কলরব তাঁর কানে এল তখন তিনি পণ্ডিত মশায়ের কাছে বেদান্ত পড়ছিলেন। দরোয়ান এসে খবর দিল—কারখানা থেকে একদল লোক এসেছে দেখা করতে চায়।

"নিয়ে এসো।" হরিহর মুখার্জী উষা কোম্পানীর মালিক পণ্ডিত মশাইয়ের মুখে তাকালেন। পণ্ডিত মশাই উঠে চলে গেলেন।

"কি হয়েছে?"

ওরা এগিয়ে এল।

"নিতাই!" হরিহরবাবু চাকরের উদ্দেশে হাঁক দিলেন "আমার নখকাটা যন্ত্রটা নিয়ে আয়।"

"বল!"

"হুজুর" গৌর বাগই সুরু করল "এমন করেও আর কাজকম্মো করা যাবে না। সাহেব যদি এমন করে মারধোর করে…"

হরিহরবাবু একমনে নখ কাটছেন।

"হুজুরের মাল আমরা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছি। বলনা রে পালোয়ান, দিচ্ছি না?" গৌর বাগ খেঁকিয়ে উঠল।

"এই মাগ্গি গণ্ডার দিন হুজুর", "কাল্লু বলে ওঠে "তার কোম্পানী আঠারো টাকা…"

"মেরেছে? কেন?" হরিহর বাবু হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন।

"শুধু মেরেছে হুজুর?" একেবারে বেহুঁশ। আমাদের কি একটা মান ইজ্জত নেই? আমরা যদি সবাই," গৌর বাগ একেবার চোখ ঘুরিয়ে দলের পৃষ্ঠপোষকতা দেখে নিল, "সাহেবের গায়ে হাত দিতাম……"

"কাকে মেরেছে?"

"ওই জগদেবকে।"

"আর আমাকেও হুজুর।" পালোয়ান বেমালুম এগিয়ে এসে তার ট্রাম থেকে পড়া ক্ষতগুলো এগিয়ে দিল।

আবার নখ কাটতে কাটতে মৃদুস্বরে হরিহরবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে নয় হুজুর।"

এবারে হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন হরিহরবাবু "মিথ্যে কথা!"

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। বেলুন থেকে গ্যাস বেরোচ্ছে।

"আর কিছু বলবে?"

সংঘ নিরুত্তর। চুপ্‌সে গেল বেলুন।

"যাও।"

নিতাই চাকর অ্যালকোহলের শিশিটা দিয়ে গেল। হরিহরবাবু একমনে কাটা নখ ডিস্‌ইনফেক্ট করছেন।

* * * *

"ওরা একদল শয়তান, মিঃ মুখার্জী...এ বাঞ্চ্ অফ্ রোগ্স্!" মিঃ আলেকজাণ্ডার বলে উঠলেন "আমি দেখেছি কুলীটা ঘুমোচ্ছিল, আই জাস্ট্ পুশ্ড্ হিম অন টু ওয়ার্ক অ্যাণ্ড্ সি দি ফ্যাব্রিকেশন অফ্ লাইজ্।"

"আমি জানি," হরিহরবাবু বললেন, "যার ভেতর সত্যি থাকে ধমকে তা পেছিয়ে যায় না।"

"আমার ওয়ার্কাররা এরকম ছিল না মিঃ মুখার্জী, দোজ্ ড্যাম্ কমিউনিস্টস্ আর এগিং দেম অন।"

"তুমি বীণাকরের কথা বলছ? কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ মিঃ আলেকজাণ্ডার? যে এতগুলো লোকের মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে।"

সাহেব প্রতিবাদ করে ওঠে "ক্ষমতা না রাবিশ! আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি লোকটার কোন আয়ের সংস্থান নেই। লোকটা মূর্খ কারিগরদের এক্সপ্লয়েট করছে......হি ইজ্ এ প্যারাসাইট, নিশ্চয় ইউনিয়নের চাঁদায় ও নিজের খরচ চালায়। তাছাড়া লোকটা জেল ফেরৎ দাগী কিনা এখনও ঠিক জানতে পারিনি। আমি ওর পেছনে পুলিশ লাগিয়েছি!"

* * * *

মিথ্যার সুযোগটুকুর অজুহাতে ইউনিয়নের চাঁই কয়েকজন শ্রমিকের কাজ গেল।

সেদিন সকাল বেলা হরিহরবাবু সবেমাত্র ওপর থেকে নেমে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েছেন, দরোয়ান এসে খবর দিল "বাবু একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"কে লোক?"

দরোয়ানের পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বীণাকর হাত দুটো কপালে ঠেকাল, "আমার নাম প্রভুদাস বীণাকর। কিছু মনে করবেন না বাবু, সাধারণত আমার পক্ষে আপনাদের দেখা পাওয়া প্রায় দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এই পথ।"

"কি পথ? চোরের?" হরিহরবাবুর তীক্ষ্ণ উৎসুক দৃষ্টি প্রভুদাসের সর্বাঙ্গ বুলিয়ে গেল।

"আজ্ঞে না। মানুষ যখন ভগবান হয়ে ওঠে তখন তাঁকে আবেদন জানাবার জন্যে বাধা অতিক্রম করতে হয়।"

"কি আবেদন?"

"আপনার কারখানার কয়েকজন লোককে বিনা দোষে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনার ম্যানেজার। তাদের হয়ে আমি বিচার চাইতে এসেছি।"

"তুমি আমার কারখানায় কাজ কর?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তোমার মাথা ব্যথা কেন? অনধিকার চর্চা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন অনধিকার চর্চ্চা ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের, বুদ্ধদেবের, লেনিনের।"

"কথাত খুব জান দেখছি।"

"আর যে কোন অস্ত্র নেই বাবু।"

"তুমি হিন্দু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হিন্দু হয়ে তুমি মুসলমানের দোকানে খাও, লজ্জা করে না ?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার চলে কি করে ? কারিগরদের চাঁদায় নাকি ?" হরিহর বাবুর গলায় শ্লেষ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হরিহর বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত। "জেলও খেটেছ বোধ হয় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দশবছর আন্দামান।"

"তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"থাকতে আমি আসিনি বাবু, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতেও আসিনি। আমি এসেছিলাম কারিগরদের পক্ষ থেকে একটা দাবী জানাতে। কিন্তু পটভূমি না থাকলে বোধহয় বস্তু পরিষ্কার হবে না তাই নিজের সম্বন্ধে একটু না বলে পারছি না। হ্যাঁ, কারিগরদের চাঁদাতেই আমার চলে। কিন্তু লজ্জা করে না, কারণ প্রত্যেক শ্রমের একটা দাম আছে। ইস্কুলের মাস্টারদের বেতন আপনাদের চাঁদায় চলে, গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের চাঁদায় চলে। কারও কি লজ্জা করে বাবু ? আর জেল খেটেছি নিজের সমাজের সম্পদের ব্যবস্থায় নয়, সম্পদের প্রকৃত বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায়। প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় হয়ত ভুল করেছি, কিন্তু মতের ভিত্তিতে ভুল নেই বাবু।"

প্রভুদাস স্থির দৃষ্টিতে তাকাল হরিহর বাবুর মুখে।

"কিন্তু তুমি বোধহয় জান না যে লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আমার কারখানা গড়িনি। আমি চেয়েছি যত সামান্তই হোক দেশের একটা অভাব আমি মেটাব।"

"জানি বলেইত আপনার কাছে এসেছি বাবু।"

"কিন্তু তা করছ না। তোমরা জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রী নষ্ট করছ মুর্খগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে। না। আমি চাই না যে অন্ধ ভেড়ার পাল ক্ষ্যাপার মত খাদে পড়ে। ওরা প্রাণ হারাক। তোমরা ওদের কি শেখাচ্ছ ? গঠন কই তোমাদের ? ওদের জন্তে রাত ইস্কুল করেছ ? শিখিয়েছ ওদের যে ওরা সমাজের সাবালক একজন হিসাবে ওদের দায়িত্ব আছে, ওরা ভাল কাজ দেবে, পুরো কাজ দেবে ?

"সব জানি কিন্তু জেনেও কিছু বলতে পারিনি কারণ প্রথম ওরা দল বাঁধতে শিখুক আর শিখুক যে মানুষ ভগবান নয়। আপনারা ইউনিয়নকে যদি স্বীকার করে নেন সবই হতে পারে।"

"ছাখো, আমার ডিসিপ্লিন ভাঙতে যেও না। আমার আদর্শ আমি বদলাতে পারি না।"—বেশ ধমক দিয়েই বললেন হরিহর বাবু। কতক্ষণ বাড়াবাড়ি সইবেন লোকটার।

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে প্রভুদাস বলল "তাহলে ধর্মঘট করবে ওরা।"

একই বিরক্ত কণ্ঠে হরিহর বাবু জবাব দিলেন "আমি ভাঙব সে ধর্মঘট।"

*　　*　　*

উষার কারখানায় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় পালোয়ান মোড়ল মারা গেল। তার স্ত্রী ছেলেটাকে বুকে নিয়ে এসে বাবুর পায়ে পড়েছিল। আইন অনুসারে খেসারত সে পেয়েছে তার ওপর বাবুর বাড়ী ঝিয়ের কাজ করছে সে। ছেলেটাকেও দুবেলা দুমুঠো খেতে দেওয়া

হয়। গৌরবাগ নাকে খৎ আর লেখা খৎ দিয়ে কাজ ফিরে পেয়েছে। দক্ষিণা চাটুজ্জের চার আনা রোজ বৃদ্ধি হোল। মহম্মদ কাল্লু নবাবের বংশধর, মাথা হেঁট করেনি, গাঁট কাটছে সে আজকাল। মিঃ আলেকজাণ্ডার প্রভাবী লোক—প্রভুদাস বীণাকর আবার জেলে। উদ্বৃত্ত মুনাফাকর নেই—মুনাফা আছে। ঊষা কোম্পানি প্রসারিত হচ্ছে—মেশিনের অভাব, কিন্তু মুনাফার অভাব হয়নি।

সুকুমার দে সরকার

পুস্তক-পরিচয়

জাতীয় নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—মূল্য দেড়টাকা।

জাতি-বৈর—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—মূল্য তিন টাকা।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—শ্রীযোগানন্দ দাস—মূল্য আড়াই টাকা।

রামমোহন প্রসঙ্গ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—মূল্য পাঁচ সিকা।

কিছুদিন ধরে উনিশ শতকের বাঙলা নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা সুরু হোয়েছে। মোটামুটি বলা চলে এই গবেষকদের মধ্যে দুটি দল। একটি দলের নেতৃত্ব করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠির মারফৎ সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি। সংগঠন হিসাবে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'শনিবারের চিঠি'র মারফৎ এঁরা নিজেদের মতের প্রচার চালান। অপর দলের নেতৃত্ব করেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লেখক-সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম লেখকদের মধ্যে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগানন্দ দাসের নাম উল্লেখ করা চলে। এঁদের মুখপত্র হোলো 'তত্ত্বকৌমুদী', 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত দুটি দলের দুটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ আছে। বিভিন্ন কাগজে ব্রজেনবাবুর প্রবন্ধ ও 'শনিবারের চিঠি'র এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পড়লেই বোঝা যায় লেখকদের প্রত্যেকটি লেখার পিছনে একটি পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্য রয়েছে। লেখকদের গোঁড়ামি ও ধূর্তামি মূল বিষয় বস্তুকে বিকৃত করেছে, বাংলার জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রগতির সম্বন্ধে বহু ভুল ধারণার অবতারণা করেছে। ব্রজেনবাবু-সজনীবাবুর দৃষ্টিকোণ সনাতনী হিন্দুর দৃষ্টিকোণ, তাই তাঁদের চোখে সামন্ততন্ত্র বিশ্বাসী, কুসংস্কার-প্রিয় ও সরকার-আশ্রিত বাঙালী পণ্ডিতেরা স্বদেশপ্রেমের কাণ্ডারী। ইউরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়া-সভ্যতার ভক্ত রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুক্তিপ্রবণ, জীবন্ত দেশপ্রেম তাঁদের চোখে বিদেশী সভ্যতার দাস-অনুকরণ বলে অবহেলিত। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐতিহ্য বলতে তাঁরা দেশের গোঁড়ামী, জাতির কুসংস্কারকেও বাদ দিতে চান না। হিন্দুদের অপেক্ষাও 'হিঁদুয়ানীকে' আঁকড়ে ধরে থাকাই তাঁদের চোখে দেশাত্মবোধের লক্ষণ। অন্যদিকে ব্রাহ্ম দলের লেখায় অতিশয়োক্তি দোষ পুরোমাত্রায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে ইউরোপিয়ান সোশ্যালিজম্, কমিউনিজম্—সব কিছুরই উৎস রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—এই ধরনের উক্তি লেখকের আত্মপ্রসাদ আনতে পারে, কিন্তু ইতিহাস বোধের মারাত্মক অভাব সূচনা করে।

শ্রীযুত যোগেশ বাগল ব্রজেনবাবুর অনুগামী। ব্রজেনবাবুর মত তিনিও উনিশ শতকের বাঙলা নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা সুরু করেছেন। সেদিনের সাময়িক পত্র, চিঠি-পত্র ও জীবন-স্মৃতি থেকে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ ক'রে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হোয়ে উঠেছেন। কিন্তু ইতিহাস-বোধের দারিদ্র্য তাঁর গবেষণাকেও অধিকাংশই নিষ্ফল করে তুলেছে। "জাতীয়তার নবমন্ত্রে" হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলার ইতিবৃত্ত সংকলিত হোয়েছে। হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য, বিভিন্ন অধিবেশন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য লেখক সেদিনের এই আন্দোলনের মুখপত্র 'ন্যাশনাল পেপার' থেকে উদ্ধৃত ক'রেছেন। হিন্দু মেলার কার্যক্রম সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য বইখানিকে রাজনীতির ছাত্রের কাছে প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। কিন্তু হিন্দু মেলার "স্বদেশীয়ানার" রূপ কি, এর নেতারা কোন শ্রেণীর লোক, হিন্দু মেলার নেতাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতিবাদ, অহিন্দুদের সম্বন্ধে উদাসীনতা ঐ আন্দোলনের এইসব বিভিন্ন দিক স্বভাবতঃ প্রশ্ন তোলে পাঠকের মনে। কিন্তু বইখানিতে এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর মিলবে না। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলে ইংরেজ প্রভাব-পুষ্ট একদল মধ্যবিত্ত (এঁরা প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমানরা এই সময়ে ব্রিটিশকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করতে রাজী হন নি ; তাদের চোখে ব্রিটিশ শাসন ছিল 'শক্রর শাসন') যে ক্রমশঃ স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও স্বাদেশিকতার পথে জয়যাত্রা সুরু করেন তাই ধাপে ধাপে হিন্দু মেলার স্বদেশীয়ানাকে রূপ দিয়েছিল। এই মধ্যবিত্তের অধিকাংশ ছিলেন সরকারী চাকুরে, অথবা সরকারের উপর নির্ভরশীল সম্পত্তিশালী লোক। তাই রামমোহন থেকে হিন্দু মেলা পর্যন্ত এই আন্দোলনের স্বদেশীয়ানা ছিল ভীরু, সরকারের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৎপর। বাঙলার সমগ্র রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু মেলার যোগসূত্র বইখানিতে কোথাও স্পষ্ট হোয়ে ফুটে ওঠেনি। একদিকে মুসলমানের ব্রিটিশ বিরোধিতা, ওহাবী আন্দোলনের বিদ্রোহী সুর, অন্যদিকে রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল ও তত্ত্ববোধিনী সভার স্বদেশীয়ানার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মেলার বিচার না করায় হিন্দু মেলার হিঁদুয়ানীর গন্ধটা বড় উৎকট হোয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী সভা যে বাঙলার জাতীয় চেতনার উন্মেষে একই ধারার (আধা ঔপনিবেশিক স্বদেশী বুর্জোয়া ধারা) বাহক এবং এই ধারারই পরিবর্তক হিন্দু মেলা—একথা রামমোহন-বিরাগী ও ব্রজেন্দ্রবাবুর সহকারী যোগেশবাবু গোপন করেছেন।

"জাতি-বৈর" যোগেশবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ, তার ভূমিকা লিখেছেন হিন্দু মহাসভা আন্দোলনের নেতা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জাতি-বৈর পড়েও মনে হয় যোগেশ বাবুর মনের সব চেয়ে প্রিয় বৃত্তি ভারতীয় বা বাঙালী জাতীয়তাবাদ নয়, হিন্দু শৌভিনিজম্ (Hindu Chauvinism)। এই বৃত্তিটি লেখককে হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত লিখতে উৎসাহ দিয়েছে, 'জাতি-বৈরে' তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সামগ্রিকভাবে বাঙলার জাতীয়তাবোধের এক মনগড়া সংজ্ঞা দিতে। হিন্দু মেলার কোন কোন নেতার কথায় বর্তমানের 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের বীজ সন্ধান ক'রেছেন লেখক—তাঁর মনের উপরোক্ত বৃত্তিটির চরম তাগিদে। যোগেশবাবুব বিষয়-বিন্যাস থেকে মনে হয় তাঁর চোখে 'হিঁদুয়ানীই' দেশপ্রেম, 'হিঁদুয়ানী' রক্ষাতেই জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের পরাকাষ্ঠা। তাই তাঁর বর্ণিত উনিশ শতকের বাঙলায় কোম্পানীর শাসনের চেয়েও বড় দুশমন খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টান পাদরীরা। সেদিনের

গোঁড়া হিন্দুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি কোম্পানীর আমলের পাশ কাটিয়ে তাঁর আক্রমণের সঙ্গীন ধরেছেন পাদরীদের লক্ষ্য করে। তাঁর চোখে সাহেবদের মাস্টার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের স্বদেশপ্রেম প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু বাঙলার গর্ব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে কটাক্ষের পাত্র। উনিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের যা মূল কথা —যেমন বাঙালী মধ্যবিত্তের গণতন্ত্রবোধ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবতাবোধ এবং বাঙালীর মনে ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়া সাহিত্য যে নতুন জীবনবোধের প্রেরণা এনেছিল—তা হোলো এই দৃষ্টিতে অবহেলার কথা। তাই রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের দলভুক্ত বাঙালী মধ্যবিত্তের নতুন যুক্তিবাদী মন বা তাদের জাতীয় কুসংস্কার বিরোধী, বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী দৃষ্টি লেখকের মনে কোন সাড়া আনতে পারেনি। রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের ঘাড়ের উপর দিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের যে নির্যাতন চলেছে তা লেখক গোপন করেছেন। রামমোহন যে পাশ্চাত্য কলা-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শারীরবিদ্যা প্রভৃতির চর্চার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাঙলাকে আহ্বান জানান, লেখকের সঙ্কীর্ণ মন তার সারবত্তাকে প্রশ্ন করেছে। ইয়ং বেঙ্গলের আধুনিকতা তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি ও দুর্বার স্বাধীন মননবৃত্তিতে বিশ্বাস—বিশেষতঃ তাঁদের হিন্দু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা—লেখককে এতই বিব্রত করে তুলেছে যে তিনি এই বিরাট জীবন্ত আন্দোলনের ভালোর দিকটা একেবারে চেপে গিয়ে এই আন্দোলনকে কতকগুলো অনুকরণপ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল লোকের কাণ্ড বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই আন্দোলনের ভীরু রাজনৈতিক দিকটার প্রতি লেখক অন্যায় করেননি, কিন্তু এর বিপ্লবী সমাজ-আদর্শ বিকৃত ক'রে দেখান হোয়েছে। ইংরেজ আমলের আঘাতে বাঙলার পুরাণো সামাজিক শক্তিগুলি কিভাবে ওলোট-পালোট হোয়েছে ও এই শাসনের আওতায় কিভাবে একদল নতুন মধ্যবিত্ত মাথা চারা দিয়ে উঠেছে তা নিয়ে লেখক মাথা ঘামাননি। যোগেশবাবুর হীরো হোলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত সমাজ—যাঁরা টাকার জন্য কোম্পানীর আমলের অধীনে চাকুরী নিতে পিছপা হননি ও যাদের সব রাগ বর্ষিত হোয়েছিল সেদিনের বিধর্মী পাদরীদের উপর, লেখকের মনের সংরক্ষণশীলতা ইউরোপের জাতীয়তার আদর্শ মুগ্ধ করতে পারেনি, মুগ্ধ করেছে গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতদের হিঁদুয়ানী রক্ষা করার জিদ। তত্ত্ববোধিনী সভা ও হিন্দু মেলার আচার অনুষ্ঠানে, রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়—বক্তৃতায় হিন্দু জাতীয়তার যে প্রভাব প'ড়েছে তা লেখককে স্বস্তি দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন জাতি-বৈরের সমতার সম্ভাবনা নাই—অত্যন্ত দূরদর্শিতার কথা। কিন্তু যেদিন এই কথা যেমন বঙ্কিমবাবুর জীবনে তেমনি অন্য সকল নেতার জীবনে কাল্পনিক আদর্শই ছিল—ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের বাস্তব রাজনীতি-জীবনে সেদিন শাসক-শাসিতের সংঘাত কখনই চরমে ওঠেনি। সেই সংঘাত চরমে উঠেছিল বাঙলার কৃষক-জীবনে। বাঙলার সাঁওতালী কৃষক, নীল কৃষক, ওহাবী কৃষক, হিন্দু-মুসলমান সিপাহী কোনদিন ইংরেজ আমলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের জাতি-বৈর ছিল স্বাভাবিক ও সার্থক। তাদের রাগের লক্ষ্য শুধু পাদরীরা ছিল না, তাদের বিক্ষোভ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, তার রাজস্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তার নতুন জমিদারদের বিরুদ্ধে, তার করভারের বিরুদ্ধে, তার বিদেশী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কিন্তু যোগেশবাবুর পুস্তকে এই বিদ্রোহের বাণী পাল্টা রাজনীতিক

আন্দোলনের সম্মান পায় নি। তিনি নীল-আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে একেবারেই কিছু বলেন নি তা না। তবে তাঁর লেখায় ঐ সব বিদ্রোহের চেয়ে ঐ সব বিদ্রোহের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীদের যোগসূত্র যেন বড় কথা। অথচ শিক্ষিত বাঙালীরা ঐ সব আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা পেলেও একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, এই বিদ্রোহী আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা প্রাণপণ পার্থক্য বজায় রেখে চলতেন। নীল-বিদ্রোহের সম্বন্ধে যোগেশবাবু যে সব খবর দিয়েছেন তার সম্বন্ধে বলা চলে যে, নীল-চাষীর দাবীর থেকেও বাঙালী ভদ্রলোক ও মহানুভব সাহেবদের সহানুভূতি যেন বড় কথা। বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবেদন নিবেদনের পাশে বাঙলার হিন্দুমুসলমান কৃষকের রাজনৈতিক বিক্ষোভ যোগেশবাবুর সংরক্ষণশীল মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বর্তমানের 'কুইট ইণ্ডিয়া' শ্লোগানের বীজ সেদিনের ভীরু হিন্দু মধ্যবিত্তের জাতীয় আন্দোলনে না খুঁজে এই দেশজোড়া কৃষক ও সিপাহী বিক্ষোভের মধ্যে খুঁজলে যথার্থ হোতো। কিন্তু ভুললে চলবে না যে হিন্দু মহাসভা মার্কা নির্জলা হিন্দু জাতীয়তাবাদ লেখকের লক্ষ্য; কাজেই উনিশ শতকের বাঙলার বিপ্লববাদ লেখকের মনে সাড়া আনবে কি করে? বাঙলার গৌরবময় জাতীয় আন্দোলন বর্তমানের গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের পিতা বলে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

যোগেশবাবুর চোখে হিঁদুয়ানীতেই যেমন দেশাত্মবোধ, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাসের কাছে তেমনি ব্রাহ্ম আন্দোলনই বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের সব কথা। অবশ্য যোগানন্দবাবু যদি বলেন যে প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্ম আন্দোলন অনেক দিক থেকে পথ-প্রদর্শক তবে তাতে কারোর আপত্তি করার কিছু নাই। তবে আমাদের বলার কথা হোলো এই যে, ব্রাহ্ম-আন্দোলন-নিরপেক্ষ যে সব শক্তি জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ এনেছিল যোগানন্দবাবুর ব্রাহ্ম পক্ষপাতিত্ব সেদিকে তাঁকে গুরুত্ব দিতে বাধা দিয়েছে। যোগানন্দবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল। বাঙলার সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের চোরা গলিতে যে বাঙলার মুক্তি আসবে না এবং সেদিনের ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে ইউরোপীয় বিজ্ঞানী আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন জীবনবোধের তাগিদ এসেছিল সেটাই যে জাতীয় আন্দোলনে প্রগতির ধারা—এ বিষয়ে লেখক স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে রামমোহন সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে চললে রণজিৎ সিংএর মত একজন প্রধান ব্যক্তি হয়তো হোতে পারতেন, কিন্তু তাতে বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতির মোড় ফিরতো না। লেখকের বক্তব্য এই যে, রামমোহন নতুন যুগের স্রষ্টা এবং তিনি যে নতুন জীবনবোধ বাঙালীর মনে একবার চাপিয়ে দিলেন তা ক্রমশ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হোতে লাগলো। মানুষের মনে একদিকে যেমন স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠলো, তেমনি অন্যদিকে সংযমনের পরাকাষ্ঠাও দেখা দিল। জন-সেবা ও জন-কল্যাণেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হোলো ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতৃত্বে। এতদিন জন-কল্যাণ ছিল বড়লোকের সখ অথবা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের অস্ত্র। এখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্বে অনাথাশ্রম, দানাশ্রম, র‍্যাগেড্ স্কুল, হরিজন আন্দোলন প্রভৃতিতে মানবতাবোধের নতুন আদর্শ দেখা দিল। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রগতিশীলতার উৎস কোথায় লেখক তার অনুসন্ধান দেন নি। কোম্পানীর শাসনের আওতায় যে নতুন মধ্যবিত্ত

শ্রেণী ইউরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়া সভ্যতার মাপকাঠিতে আত্মপ্রস্তুতির চেষ্টা করছিল তাই দোষ-গুণে বাঙলার রেনেসাঁস আন্দোলন। এই নতুন জীবনদৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ, রুচি ও প্রকৃতির প্রকাশে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সার্থকতা। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হোয়েও যে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল হোতে চেষ্টা করেছে—তার প্রধান প্রমাণ ইয়ং বেঙ্গল। কিন্তু যোগানন্দবাবু বাঙলার জাতীয় আন্দোলনকে এই নতুন মধ্যবিত্তের জীবনবোধের দৃষ্টিতে না দেখায় ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সব উন্নতির উৎস বলে ধরে নিয়েছেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যোগ না রেখে কোন আন্দোলন যে এই সময়ে প্রগতিশীল হোতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন না। বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা ব্রাহ্ম আন্দোলন নয়, নতুন মধ্যবিত্তের জন্ম ও নতুন জীবনদৃষ্টি। কাজেই ব্রাহ্ম আন্দোলন এই নতুন মধ্যবিত্তের যুক্তি-প্রবণ, সত্যানুসন্ধানী মনের এক ধরনের পরিচয়। তাছাড়া, ব্রাহ্ম-পক্ষপাতিত্বের চাপে লেখক সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজকে যেমন ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সহজাত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিরোধ সিপাহী-বিদ্রোহী, ওহাবী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছিল তাদের উপর লেখক অত্যন্ত অন্যায়ভাবে গুরুত্ব দিতে কার্পণ্য করেছেন। কাজেই বইখানির মূল নামটি বেশ বিভ্রান্তিকর; বরং মূল নাম 'রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন' হোলে বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিভ্রান্তির অবকাশ কম ঘটতো।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি উদ্দেশ্য-মূলকভাবে রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি প্রচার ক'রে চ'লেছেন 'রামমোহন প্রসঙ্গ' তারই উত্তর। রামমোহনের অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন, রামমোহনের পিতা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, রাজারামের পরিচয় নিয়ে রামমোহনের চরিত্রের সম্বন্ধে অশিষ্ট ইঙ্গিত, রামমোহনের শিক্ষা-প্রসারে নগণ্য দান ইত্যাদি অভিযোগ এনে যাঁরা রামমোহনকে হেয় করতে চান—প্রভাতবাবু তাঁদের উত্তর দিয়েছেন এই বইখানিতে। অভিযোগকারীরা দুষ্টবুদ্ধি ও ছলের আশ্রয় নিয়ে যে সব ভুল ধারণার সৃষ্টি ক'রে চ'লেছেন পাঠকদের মনে, প্রভাতবাবু মূল তথ্যগুলি উদ্ধার করে ঐ সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেখকের মিশনারী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ বিচারের পথে বাধার সৃষ্টি ক'রেছে। রামমোহন নিয়ে ক্রমশ যে বিতর্ক-সাহিত্য গ'ড়ে উঠছে তার মধ্যে এই পুস্তকখানির বিশেষ স্থান থাকবে।

নরহরি কবিরাজ

History of Western Philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day. By Bertrand Russell (George Allen and Unwin Ltd. 1946)

গতানুগতিক দর্শনের ইতিহাস সাধারণত কোন বিশেষ সংজ্ঞায় দার্শনিক আখ্যাধারী পণ্ডিতদের চিন্তাধারার বা মতবাদের সংকলন গ্রন্থ; যেন ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এই ভাব-ধারার বা মতামতের কাহিনী কালানুক্রমিক একই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মনে হয় যেন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও বা শেষের অধ্যায় আগে এনে জুড়ে দিলেও

ব্যবহারিক অসুবিধা ছাড়া আর বিশেষ কোন ক্ষতি হ'তই না। বড় জোর একটা যৌক্তিক সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা হয়। দর্শনের ইতিহাসও যে একপ্রকার দর্শন ; স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে যে দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধ আছে ; সামাজিক পরিবর্তন ও নূতন নূতন মতবাদ প্রচার যে একই প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তন নিয়মের প্রকাশ,—এইসবের স্বীকৃতি মামুলী দর্শনের ইতিহাসে মেলে না।

শুধু দর্শনের ইতিহাস কেন, যাকে সাধারণত ইতিহাস বলা হয় সেই ইতিহাস বিজ্ঞানও যে ঘটনার বা সংবাদের নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাখ্যা-দৃষ্টিভঙ্গিনিরপেক্ষ কালানুক্রমিক পুনরাবৃত্তি নয়, এই ধারণা খুব পুরান নয়। ঐতিহাসিকরা ভুলে যান যে বিভিন্ন ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ঘটনাবলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ই 'ইতিহাসকে' ইতিহাস করে তোলে। তা ছাড়া, ঘটনানিচয়কে যথাযথভাবে প্যাটার্ন-মাফিক্ প্রতিফলিত করাই যদি ইতিহাস হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে : কেন বিশেষ কোন সংবাদ ইতিহাসের পাতায় মর্যাদা পায়, কেনই বা সংবাদ বিশেষের স্থান সংবাদপত্রের তথা বিস্মৃতির পৃষ্ঠায় ? আসল কথা মানুষ সাধারণত কোন না কোন পারিপার্শ্বিক-প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গির দাস ; জগতকে সে তার সামাজিক চেতনার রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে দেখতে বাধ্য ; এমন কি তার সুখদুঃখ আশা-আশঙ্কা ও জীবনাদর্শও তাব স্বরচিত 'বিশুদ্ধ' ঐতিহাসিক চিত্রতে প্রতিফলিত হয় (This notion of 'pure history', of history devoid of aesthetic prejudice, of history devoid of metaphysical principles and cosmological generalisations is a figment of inaguration—Whitehead ; Adventures of Ideas)। তা বলে, তার ব্যক্তিত্বের তথা সমাজ মনের ছোঁয়ায় ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত ও কলুষিত হয় এমন নয়। কারণ, প্রথমত মানুষ প্রথমে ব্যক্তিমানব পরে সমাজমানব হয় না, মানুষ মানেই সামাজিক চৈতন্য বিশিষ্ট মানুষ ; সমাজপূর্ব ব্যক্তিমানবের ধারণা অলীক ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত শাশ্বত মানস নিরপেক্ষ ও দেশকালাতীত কোন সত্য অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সত্য এবং সত্তা চির-প্রবাহমান, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলায়। প্রকৃতি মানুষের ব্যক্তিতে ও গোষ্ঠীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে ও শ্রেণীতে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নূতন নূতন সত্য উন্মীলিত হয়।

যদি মেনে নেওয়া যায় ইতিহাস এরকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে : কিসের ব্যাখ্যা। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা ? উত্তরে বলা যায় ; মানবজীবনের। তার মানে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবনসত্তার। অর্থাৎ অর্থনীতিক, সমাজনীতি, ইতিহাসের (বৈজ্ঞানিক কারণে) স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজনীয় হলেও তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। আরও একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক কারণে ইতিহাসের চারিধারে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানার প্রয়োজন থাকলেও আবার বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই আমাদের এইসব কৃত্রিম পরিধী-প্রাচীর ভেঙে আরও এক ধাপ, তারপর আরও আরও এগিয়ে যেতে হয়। কারণ, সমাজজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রভাবশালী গতিশীল ব্যবস্থার মধ্যে (যথা উৎপাদন, বণ্টন-ব্যবস্থা) মানসলোকের (আংশিক) তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া গেলেও সমাজব্যবস্থাতেই তার নিজস্ব অর্থ মেলে না অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা নিজেই তার কারণ ক্ষেত্র হতে পারে না। কেন না

সে সয়ম্ভূ নয়। সুতরাং প্রাণী ও অপ্রাণী জগতকেও ইতিহাসের মধ্যে টেনে আনতে হয়—এক কথায় আনতে হয় সমস্ত সত্তাকে। তা· ছাড়া আর এক দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, বিশেষ কোন বিষয়বস্তুর বা বিশেষ কোন দেশ-কালের বিচ্ছিন্ন কাহিনী কখনও সত্যিকারের ইতিহাসের পর্যায়ে উঠতে পারে না। কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত, সংহত ও গতিশীল সামগ্রীক বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জের একাংশরূপে কেটে নিয়ে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিচার করলে সত্যিকার ঘটনাধারার বিকৃতি ও কল্পনামূলক ব্যাখ্যাই প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। চিত্রাংশে বা পরিপূর্ণ কোন কবিতার ভগ্নাংশে যেমন ভ্রমের অবকাশ থাকে, তেমনি দেশ-কালের আংশিক ইতিহাস শুধু যে অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হতে পারে তা নয়; অবাস্তব ও সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে। পরিমাণের তারতম্যে যে গুণগত পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ মেলে বিশেষ কোন অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা ও ব্যবহারের সঙ্গে সেই একই পরিস্থিতিতে জন-সমষ্টির চিন্তা ও ব্যবহারের তুলনা করলে।

বলা যায়, সত্যিকার দর্শনে ও ইতিহাসে খুব বেশী পার্থক্য নেই; পার্থক্য তথ্য ও তত্ত্বের উপর কমবেশী জোর দেওয়ার উপর। দর্শন অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কতগুলি মনগড়া বুলি নয়; সত্য ও সত্তার স্বরূপ নির্নয়ের বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানোত্তর (তা বলে অবৈজ্ঞানিক নয়) প্রচেষ্টা। বস্তুত দর্শন ও ইতিহাস উভয়েই জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চায় এবং এজন্য উভয়কেই জাগতিক বস্তু বা ঘটনা প্রবাহের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য 'দার্শনিকরা' দর্শনকে এইভাবে পঙ্কিল পার্থিব আবহাওয়ায় টেনে নামাতে চান না। তাঁদের মতে ভূলোকের ধূলিমালিন্যে ও গ্লানির ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত সত্যলোকের সন্ধান করাই দর্শনের কাজ। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে মানসলোকের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে, ভাবধারার সঙ্গে কার্যাবলির যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এক কথায় দর্শনের সঙ্গে যে ইতিহাসের যোগসূত্র আছে, তথাকথিত দার্শনিকরা তা স্বীকার করে দর্শনের হাত নষ্ট করতে চাননি। যথা প্লেটোর দর্শনে শাশ্বত ও বিশুদ্ধ ভাবরাজ্য আর তার প্রতিচ্ছবি বস্তুলোক কেন সম্পর্কহীন দুই মেরুতে বিভক্ত, কেন প্লেটোর মতে একমাত্র বিশুদ্ধ ভাবচর্যাকারী দার্শনিকই রাষ্ট্রনায়ক হবে; এবং এ্যারিস্টট্‌ল্ কেন ভাবলোক ও বস্তুলোকের মধ্যে এতটা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা আনেননি;—তথাকথিত দর্শনের ইতিহাসে এসবের কোন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা দূরে থাক, সেই সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাও নেই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নবপ্রকাশিত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থখানি এর ব্যতিক্রম। বস্তুত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক্, গণিতশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ববীদ রাসেলের পরিণত বয়সের ফল এই ৯০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থখানির প্রকাশ দার্শনিক দিনপঞ্জীতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে যে জীবন দর্শনের সম্বন্ধ আছে গ্রন্থের শিরোনামার শেষাংশে তার স্বীকৃতি রয়েছে। মুখবন্ধে একথা আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। (Philosophers are both effects and causes : effects of their social circumstances and of the politics and institutions of their time, causes...of the beliefs which mould the politics and institutions of later ages...Philosophy from the earliest times has been an integral part of the life of the community—Preface), এ প্রসঙ্গে একথা মনে না হয়ে পারেনা যে, রাসেল্ যেন অর্থনৈতিক পরিবেশের

প্রভাবের কথা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ গ্রন্থের শেষের দিকে এক জায়গায় তিনি বলেছেন (৮১৩ পৃঃ) যে যদিও তিনি মার্কসীয় (বস্তুবাদী) ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না তবু ইতিহাসের সেই বস্তুবাদী ধারণার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে এবং মার্কস-এর (যাঁর নাম দর্শনের ইতিহাসের পাতায় এনে সনাতন দার্শনিকরা দর্শনের পবিত্রতাকে কলুষিত করতে চান না; কারণ অর্থসম্পত্তির কথা বস্তু নোংরা ও ভুক্কারজনক, "their notions of property lookingly") বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তাঁর নিজের (রাসেলের) দার্শনিক তত্ত্বের গতির ধারণাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে।

দর্শনের ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের সম্বন্ধ নির্ণয়ে রাসেল কতখানি সফলকাম হয়েছেন সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু রাসেলের প্রচেষ্টা যে অকৃত্রিম সে কথা অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। যথা, প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি গ্রীক্-সভ্যতার বিস্তার, স্পার্টার প্রভাব আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করেছেন। মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক্ দর্শনের ব্যাখ্যার অজুহাতে পোপের প্রভাব, খৃষ্টধর্মের বিস্তার, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করেছেন, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ইতালীয় নবজাগরণ; মেকিয়াভেলির কূটনীতি, রুশোর রোমাণ্টিক্ দর্শন, উনবিংশ শতকের চল্‌তি ইতিহাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। সনাতনী দার্শনিকরা এই পুঁথিখানির পাতা উল্‌টিয়ে আঁৎকে উঠে—দেখবেন যে লক্ (John Locke) এর দর্শনের ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ আছে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের রাজা পার্লামেণ্টের বিবাদ, ক্রমোয়েল্, ২য় চার্লস্, ২য় জেমস্ এমন কি ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডও। শুধু এখানেই শেষ হয়নি; যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের—যা রুশোর নেতৃত্বে রোমাণ্টিক্ আন্দোলনে রূপ পায়—ঐতিহাসিক ধারা ও দর্শনের উপর প্রভাব দেখাতে গিয়ে রাসেল্ অপ্রত্যাশিতভাবে হেগেলের অব্যবহিত পরেই বায়রন্‌কে এনে সম্পূর্ণ এক অধ্যায়ে তাঁর দর্শন আলোচনা করেছেন। এমন কি সাম্যবাদীরা যে রাসেলের মতবাদের উপর তাঁর বৃটিশ অভিজাত কুলের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রভাব লক্ষ্য করেন, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাসেলের দর্শনের যে বিচার ও ব্যাখ্যা করেন, তিনি তাও অস্বীকার করেন নি (৮৫৫ পৃঃ)

এখন দেখা যাক রাসেল্ এই প্রচেষ্টায় কতখানি সাফল্য লাভ করেছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, চলতি অর্থে দর্শনের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় সে আদর্শ নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, রাসেলের আলোচনা মোটেই "জ্ঞানগর্ভ" হয়নি, অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এতে রয়ে গেছে, কাজেই এই বই পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নয়। রাসেলের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জীবনে ও দর্শনে সম্বন্ধ নির্ণয়ের দিক থেকে বিচার করলে মোটামুটি বলা যায় যে অকৃত্রিম চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সর্বত্র সফলকাম হননি। মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু 'ইতিহাস' পড়ছি; দর্শন-ইতিহাসও নয় ইতিহাস-দর্শনও নয় (এই শব্দ দুটি আমাদের মতে পারিভাষিক)। মামুলি ইতিহাসের কয়েকটা ছিন্নপত্র যেন এই গ্রন্থে জোর করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। প্লেটো এ্যারিসটট্‌লের দর্শনের ভূমিকা স্বরূপ যদিও রাসেল্ অনেক তথ্যের আমদানী করেছেন তবু তাঁর গ্রন্থে এই পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না তাদের দর্শনের বিভিন্নতার জন্য, সমাজ বিন্যাসে তাদের স্ব স্ব স্থান, পারিবারিক অবস্থা ও মর্যাদা কিভাবে এবং কতখানি দায়ী। দেখানো যায় যে প্লেটোর ভাব জগৎ এবং কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি বস্তুজগৎ এইরূপ দুই কংক্রীট কঠিন কামরায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার

কারণ আসলে সমাজেও তখন গ্রীক্ সভ্যতার বনিয়াদ দাস ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য নিখুঁতভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অভিজাত-বংশোদ্ভূত প্লেটো দাস ব্যবস্থার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন না এবং অভিজাত সমাজ ব্যবস্থাকে সভ্যতার চরম বিকাশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটোর দর্শন ঐ পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। ক্রমবর্ধমান শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির মধ্যে প্লেটো তাঁর এবং স্ববংশের সর্বনাশ দেখেছিলেন, কাজেই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে একমাত্র বিশুদ্ধ ভাববিলাসী দার্শনিকই রাষ্ট্র নায়ক হতে পারে, অপর পক্ষে এ্যারিসটট্‌লের জন্ম সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে এবং দাস ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর দর্শনেও ভাব এবং বস্তুর কিছুটা সম্বন্ধ দেখতে পাই। আবার উভয়ের দর্শনে যে ঐক্য দেখা যায় তার কারণ দাস ব্যবস্থাকে উভয়ই সহজ ও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিলেন। দাস ব্যবস্থা যে কৃত্রিম ও মানুষের গড়া এই ধারণা গ্রীক যুগে ছিল না। (Slavery was the presupposition of political theorists then...A comparatively barbarous substraction had to be interwoven in the social structure so as to sustain the civilised apex...It was universally assumed.—Whitehead, "Adventures of Ideas".)

এই গ্রন্থের একাধিক স্থানে একই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে রাশিয়া ও জার্মানীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে, যেন ওরা স্বগোত্রীয়। অথচ একথা স্বীকার করা হয়েছে—রাশিয়ায় বর্তমানে মার্কস্‌বাদীরাই রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং মার্কস্‌বাদ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত আর ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ যুক্তিবিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক (৮১৮ পৃঃ)। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি রাসেলের ঘৃণা স্পষ্ট। বিজ্ঞানসম্মত একটি মতবাদের সঙ্গে তাঁর মত একটি বৈজ্ঞানিক মনের কেন এতটা মতবিরোধ তা বোঝা সহজসাধ্য নয়। যদি কেউ তাঁর যুক্তিবিহীন অন্ধ সংস্কারকেই এইজন্য দায়ী করে তা হলে দোষারোপ করা যায় না। ব্যবহারবাদী (pragmatists) জন্ ডিউইর মত রাসেলও নাকি রাশিয়া ভ্রমণে বিফল মনোরথ হয়েছেন এবং ডিউইর মত তিনিও যে দার্শনিক উদারনীতির উপাসক হয়েও মার্কস্‌বাদী বনে যাননি একথা সগর্বে ঘোষণা করেন (৮৪৮ পৃঃ)।

দার্শনিক উদারনীতি (philosophical liberalism)—যাতে সমষ্টির চাইতে ব্যক্তিরই প্রাধান্য বেশি—তা হতে কি করে পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদ : মার্কসীয় দর্শন ও রুশো বাইরনের রোমান্টিক দর্শন (ফিক্‌টে, নিট্‌শের মধ্য দিয়ে যার পরিণতি ফ্যাসীবাদ) জন্ম লাভ করল, রাসেল্ তার যুক্তিসঙ্গত কোন উত্তর দিতে পারেননি। মার্কস্‌বাদ আর উদারনীতিতে রাসেলের মতে পার্থক্য খুব বেশি নয়, উভয়েই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাকৃতিক তথ্যে বিশ্বাসী এবং অপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী (philosophically not very widely separated, both are rationalistic and both in intention are scientific and empirical. ৮১৭ পৃঃ) তাহলে উদারনৈতিকদের (রাসেল নিজেও তার একজন) মার্কসীয় দর্শনের প্রতি এত বিজাতীয় ঘৃণা কেন? তার উত্তরে রাসেল্ বলেন: যদিও পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই তবু ব্যবহারিক রাজনীতিতে তারা পরস্পর-বিরোধী (from the point of view of practical politics the diction is sharp. ৮১৮ পৃঃ)। ভাবধারায় যদি সামঞ্জস্য থাকে তাহলে হঠাৎ কর্ম ক্ষেত্রে—ব্যবহারিক রাজনীতিতে বিরোধ এল কেমন করে এবং কেন? রাসেল্ না

ভাব লোকের সঙ্গে পরিবেশের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে? ৬২০ পৃষ্ঠায় তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, বস্তুলোক ও ভাবলোক পারস্পরিক কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত (between ideas and practical life there is a reciprocal relation) অথচ বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি সুবিধা মত এই সত্য ভুলে গেছেন। আর ভুলে গেছেন কেন? তাঁর এই ভাবলোকের সঙ্গে তাঁর বস্তুলোকেরও একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে।

রাসেলের মতামতের অসঙ্গতি ও ব্যক্তিত্বের অসংহতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখি একদিকে তিনি নিজেকে উদারনৈতিক বৈজ্ঞানিক, সংশয়ী, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় অন্তত আংশিক বিশ্বাসী ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারী বলে জাহির করেন; অথচ অন্যদিকে সমস্ত জগৎকে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ (logical analysis) করে (অপ্রাকৃত) কতগুলি ভাসমান ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা সংবেদ্যতে (Sensa) পরিণত করেন, নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদ (Neutral monism) প্রচার করেন এবং বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে "ঘটনার" (event) অবতারণা করেন (Matter is not a part of the ultimate of the universe, but merely convenient way of collecting events into bundles ৮৬১ পৃঃ)। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমাজ ও উদারনীতি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতে হলে যে অনুরূপ দর্শনের প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক রাসেল্ কি একথা ভাবেন নি? বৈজ্ঞানিক মনের এই সংহতির অভাব হয়ত যুগসন্ধি প্রসূত।

তারপর মার্কস্‌বাদ। মার্কসের তিনটি দিক রাসেল উল্লেখ করেছেন: দার্শনিক উগ্রনীতি (philosophical radicalism) বস্তুবাদের পুনরুজ্জীবন, ও হেগেলের মত পরিবর্তন ধারার মধ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি আবিষ্কার। পূর্বেই বলা হয়েছে এই যে, দার্শনিক উগ্রনীতি ও বিরোধী রোমান্টিসিজিম কি করে একই উদারনীতির বিভিন্ন পরিণতি রাসেল তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন নি। তারপর, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে মার্কস্ নিজের দর্শনে ব্যবহার করেছেন সত্য; কিন্তু যে বিষয়ে মার্কসীয় ও হেগেলীয় পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক রাসেল তার উল্লেখও করেন নি। হেগেল যে কালনিরপেক্ষ যৌক্তিক বিবর্তন বিশ্বাস করেন আর মার্কস্ কালসাপেক্ষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাহায্যে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করেন একথা ভুললে চলবে না। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি নতুন নতুন সত্তা জন্ম দেয়, নতুন নতুন সৃষ্টি করে (Emergent Evolution)। হেগেলের সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ সত্তার (Absolute) মধ্যে সমস্ত বিভিন্নতা ও নতুনত্ব যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিবর্তিত হয়ে রয়েছে।

মার্কসের বিরুদ্ধে রাসেল অসঙ্গতির অভিযোগ এনেছেন এই বলে—মার্কসের বিবর্তনবাদে অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবিতা এবং তাঁর দর্শনে বিশ্বজনীন আশাবাদ পরিলক্ষিত হয়; আর এই আশাবাদ (রাসেলের মতে) নাস্তিকদের পক্ষে অযৌক্তিক (৮১৬ পৃঃ)। ঈশ্বর-বিশ্বাস হয়ত যুক্তিহীন আশার মরীচিকা সৃষ্টি করতে পারে, তা বলে আশাবাদ বা প্রগতি শুধু যে ভগবৎ-বিশ্বাসীদের একচেটিয়া অধিকার এ কেমন যুক্তি? বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই মার্কস আশাবাদী এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের নিয়মানুসারেই সাম্যবাদ অবশ্যম্ভাবী। সাম্যবাদ আসছে কোন অপ্রাকৃত শক্তির আজ্ঞায় নয়, বা কারও অন্ধ আরাধনায় নয়। মার্কসবাদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, ধনতন্ত্রবাদেই তার মৃত্যুর ইঙ্গিত ও সাম্যবাদের বীজ লুকায়িত রয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং বলা যায়, ন্যায়সঙ্গত

আশাবাদে শুধু বৈজ্ঞানিকদেরই অধিকার, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যই বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠি। কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে বলেই বৈজ্ঞানিক তার বিষয়বস্তুর ভবিষ্যত কর্মধারা ও ব্যবহার পূর্ব-নির্ধারণ করতে পারে। ঈশ্বর-বিশ্বাস যে আশাবাদ দেয় তা আকিংৎ সেবকদের যুক্তিবিহীন আশাবাদ।

রাসেল মার্কসবাদের আরও দুটি ত্রুটি দেখেছেন। প্রথমত, সামাজিক পরিবেশ শুধু অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিকও বটে (৮১৩ পৃঃ)। খুব সত্যি কথা। কিন্তু মার্কস কি তা অস্বীকার করেছেন অথবা শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন ? মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এটা একটা অত্যন্ত সস্তা ও মামুলি অভিযোগ। রাসেল একটু কষ্ট স্বীকার করলেই "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে (মার্কস ও এঙ্গেলসের) চিঠি" হতে পুস্তিকার ষষ্ঠ চিঠিতে দেখতে পেতেন যে এঙ্গেলস্ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে অর্থনৈতিক কারণ অধিকতর প্রভাবশালী হলেও একমাত্র কারণ নয় ; রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারণের পরিষ্কার উল্লেখ আছে। (The economic situation is the basis but...political, juristic, philosophical theories, religious views...also excercise their influence upon the course of historical struggles...This is an interaction of all these elements.—Engels, from "Leters on Historical Materialism." Marx : Collected Works vol I, p.321)

দ্বিতীয়ত, সামাজিক কারণাবলী সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে না, বিশেষত যখন কোন সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করা যায় তখন খুঁটিনাটি "টেকনিকেল্" বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না ; শুধু তাই নয়, সম্বন্ধই নেই (৮১৩ পৃঃ) অর্থাৎ গ্রন্থের শিরোনামায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের কথা যে জোর গলায় প্রচার করা হয়েছে কার্য-ক্ষেত্রে রাসেল তা সুবিধামত গ্রহণ করেছেন বা বর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্যের প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ভাবই-সত্তার-প্রমাণ এই যুক্তি (ontological arguement)। তাঁর মতে সামাজিক কারণ যদি এই যুক্তির জন্য অংশ ও দায়ী হত তা হলে একই যুক্তি কি করে বিভিন্ন যুগে বারবার গৃহীত ও বর্জিত হয় ? যথা উপরোক্ত যুক্তি এন্‌সেল্‌ম্ আবিষ্কার করেন, টমাস্ একুইনাস্ বর্জন করেন, ডাকার্তে সমর্থন করেন, কাণ্ট আবার মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন এবং পুনরায় হেগেল্ গ্রহণ করেন। এই সব সমস্যা ও সমাধান রাসেলের মতে শাশ্বত এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন, "টেকনিকেল" ব্যাপার (This is not a matter of social system, it is a purely technical matter—৮১৪ পৃঃ)। এই "টেকনিকেল" কথার আড়ালে রাসেল সমাজ ও দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় নিজের অক্ষমতাকে লুকিয়ে রেখেছেন। মনীষী রাসেলকে জিজ্ঞাসা করা যায় : উপরোক্ত যুক্তি মধ্যযুগীয় এন্‌সেল্‌ম্ ও বর্তমান যুগের হেগেল কি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন ? বস্তুত নামে এক হলেও এই দুই যুগের দুই দার্শনিক সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ও পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন ; আসলে নামে বা শব্দে ছাড়া এই সব যুক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে খুব বেশি মিল নেই। মধ্যযুগের এনসেল্‌ম্ হঠাৎ এযুগে এসে পড়লে হেগেলের যুক্তি তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে কি বিপক্ষে বা হেগেল্ কি বলতে চান, কিছুই বুঝতে পারতেন না হয়ত।

আমরা কোন দার্শনিক মতের খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে

পারি না (আমাদের অক্ষমতার জন্য)—এ এক কথা, আর সম্পর্কই নেই এ স্বতন্ত্র কথা। উদাহরণ স্বরূপ, গণিতশাস্ত্রের কথা ধরা যাক্। রাসেল্ বলবেন, গাণিতিক সংখ্যা কতকগুলি বস্তু-সম্পর্কহীন অপ্রাকৃত প্রতীক মাত্র। গাণিতিক জ্ঞান যে প্রকৃতিজাত এ কথা তিনি স্বীকার করেন না। এই জ্ঞানের উৎস কি তারও কোন হদিস্ তিনি দিতে পারেন নি, শুধু ভাষার মার প্যাঁচ দিয়ে একটা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান (not empirical,...also not a-priori...merely verbal ৮৬০ পৃঃ)। সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন এ ভাষাগত সংখ্যাগুলি আসলে যে অন্যান্য ভাবনা ধারণার মতই সামাজিক প্রয়োজনেই প্রকৃতি থেকে আবিষ্কৃত ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে পরিবর্তিত তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক হগ্‌বেন্ তাঁর Mathematics for the Million গ্রন্থে। যে সংখ্যাগুলি নিয়ে অঙ্কশাস্ত্র প্রথম কারবার আরম্ভ করে সেগুলি কতকগুলি সম্পূর্ণ সংখ্যা—গবাদি গণনার কাজে প্রথম ব্যবহৃত হত। সেজন্য দেখি রহস্যময় সংখ্যা, শুভ সংখ্যা বা অপয়াসংখ্যা, ও মন্ত্রে ব্যবহৃত সংখ্যা—প্রত্যেকটি পরিপূর্ণ সংখ্যা—তখনও ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয় নি। হগবেন দেখিয়েছেন কি করে পশ্বাদির প্রজনন, নীল নদীর প্লাবন প্রভৃতির গতিবিধি জানার প্রয়োজনে জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব হয়। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশে যে সম্ভাবনা-তত্ত্বের (theory of probability) চর্চা আরম্ভ হয় তার আসল কারণ যে জীবন-বীমা ও তাস-পাশা প্রভৃতি সামাজিক প্রয়োজন সে কথা ভুললে চলবে না। রাসেল দেখতে পারেন কিভাবে তাঁরই একজন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস্. হল্‌ডেন্ গণিত, ভূতত্ত্ব জীববিদ্যা, রসায়ন, মনোবিদ্যা প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গে সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন (Haldane : Marxist Philosophy and the Sciences) এর দ্বারা শুধু কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে সামাজিক কারণাবলী অনেক জটিল, ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল বলে এবং দর্শন অখণ্ড সত্তা নিয়ে কারবার করে বলে, দর্শনে ও ইতিহাসে কার্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় খুব সহজসাধ্য নয়। দর্শনের ও ইতিহাসের বা সামাজিক জীবনের কোন কোন বিষয়ে সম্বন্ধ নেই বলা আমাদের অক্ষমতাকে অস্বীকার করারই অবিনয়ী প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

রমাপ্রসাদ দাস

গুড্ আর্থ—পার্ল বাক্। অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু, (র‍্যাডিকাল বুক্ ক্লাব, দাম ৫৲)।

নতুন দিনের আলো—লিও কিয়াচেলী, অনুবাদ : সত্য গুপ্ত (ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশিং হাউস্, দাম ৪৷৷৹)।

কয়েক বৎসর আগেও দুঃখের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হত, বাঙালী পাঠককে দেশ-বিদেশের সাহিত্যের খোঁজ নিতে হলে ইংরেজি ভাষায় শরণ নিতে হবে, তা ছাড়া পথ নেই। কথাটা এখনো অনেকাংশে সত্য। বাঙলা সাহিত্যিক প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেই তাঁর বারো আনি প্রেরণা সংগ্রহ করেন ইংরেজি ভাষায় মারফৎ বিদেশ থেকে; কিন্তু তাঁর স্বদেশীয় পাঠককে সেই বহুস্রোতা সাহিত্য-ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ছোট বড় বাঙালী সাহিত্যিক কেউ ততটা মনোযোগী নন। সবার স্পর্শে পবিত্র করা সেই তীর্থবারি বাঙালীর ঘরে এখনো পৌঁছে না। পৌঁছলে তা ঋণ হবে না, হবে আমাদেব নতুন আনন্দের উৎস, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। যতদূর জানি, এদিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য

ভাষায় মধ্যে হিন্দী ভাষারই দৃষ্টি বেশি; অবশ্য ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে উর্দু পাঠ্য গ্রন্থে বেশি পুষ্ট হয়েছে। হিন্দীর অনুবাদ-সাহিত্যে যতটা উদ্যম আছে ততটা দায়িত্বজ্ঞান আছে কিনা জানি না। কিন্তু বাঙালী এদিকে অল্পদিন আগেও উদ্যমেরও পরিচয় দিত না, দায়িত্ব জ্ঞানেরও পরিচয় দিত না, সাধারণ ভাবে একথা বলা চলে। উনবিংশশতকে ববং এদিকে কোন কোন দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের পুষ্ট করেছেন। বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্য তবু দরিদ্র থেকে গিয়েছে; ফলে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ-শক্তি সম্বন্ধেও সত্যন্দ্রনাথের কাব্যানুবাদে কৃতিত্ব সত্ত্বেও আমরা অনেকে সন্দিহান হয়ে ছিলাম।

আজ কয় বছরের মধ্যে কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে এদিকে বিশেষ সুলক্ষণ দেখা দিয়েছে। অবশ্য এখনো বিশ্ব-সাহিত্যের কোনো মূল রস-সম্পদই আমরা পাইনি। তবু বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য এবার অগ্রসর হয়ে যাবে, আশা করা যায়। রাজনৈতিক সাহিত্যে ছাড়া রস-সাহিত্যেও তার চিহ্ন দেখ্‌ছি। আর তার অর্থ পরিষ্কার—তাতে বাঙালী পাঠকের মনের দুয়ার আরও খুলে যাবে; এবং অনুবাদের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষারও প্রকাশ-শক্তি আরও প্রসারিত হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানা অনুবাদ গ্রন্থ দেখে আমাদের মনে এই আশা জন্মেছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এই উপন্যাস দু'খানিও সে পর্যায়ের—যাকে বল্‌তে পারি সার্থক অনুবাদ।

শ্রীযুক্তা পুষ্পময়ী বসু অনুবাদ করেছেন পার্ল বাক্‌-এর 'গুড্‌ আর্থ্‌'-এর। পার্ল-বাক্‌ ও তাঁর এই রচনা 'নোবেল পুরস্কারের' জন্য না হোক্‌, অন্তত সার্থক ফিল্‌ম্‌ হয়েও পৃথিবীর সকলের থেকে যশ ও খ্যাতি লাভ করেছে। কাজেই মূল গ্রন্থের সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। একটা কথা বলা যেতে পারত, পার্ল-বাক্‌ চীনের (এবং ভারতেরও) যত বন্ধু হোন্‌, আর তাঁর রস-সৃষ্টির ক্ষমতা যতই অনস্বীকার্য হোক্‌, তিনি বা লিন ইয়ু তাং-এর মত লেখকেরা নতুন চীনের গণ-চেতনাকে ঠিক মত ধরতে পারেন নি। চীনের "নব্য গণতন্ত্রের" সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন চীনা নর-নারী জন্মগ্রহণ করছে তাঁদের চরিত্র ও জীবনাদর্শের প্রতি এঁদের সজাগ দৃষ্টি নেই। এঁদের দৃষ্টি সে চীনের দিকেই যে চীন ইউরোপীয়রা জানে, চেনে,—এবং মনে করে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সেকথা আলোচ্য নয়। এ প্রসঙ্গে যা আমরা অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করব তা এই যে, প্রথমত, অনুবাদে কেন, এমন খাঁটি প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষা বাঙালী মূল লেখকেরও কলমে জোগায় না। বিশেষ করে, প্রাকৃতিক চিত্রের এমন প্রাণময় প্রতিফলন দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, পার্ল-বাকের মূল গ্রন্থকে ভাবে ও কথায় ছেড়ে যাওয়া হয়নি, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেও তার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। বাঙালী পাঠক এ অনুবাদের জন্য সানন্দে ধন্যবাদ দেবে অনুবাদিকাকে।

লিও কিয়াচেলীর নাম অবশ্য আমাদের কাছে পার্লবাকের মত সুপরিচিত নয়। জাতিতে তিনি গুর্জী বা "জর্জিয়ান্‌"; গ্রন্থও তার লেখা বর্তমান সোভিয়েট গুর্জী জীবন নিয়ে, মূল গুর্জীতে। এ গ্রন্থের জন্য তিনি সোভিয়েট ভূমির 'স্টালিন পারিতোষিক' পান। কাজেই গ্রন্থখানা যে সোভিয়েট জীবনে স্বীকৃত ও সমাদর লাভ করেছে, তা বোঝা যায়। কিয়াচেলীর দক্ষতাও সুস্পষ্ট—নতুন সোভিয়েট জীবনে যৌথ খামার এসেছে; এসেছে নতুন সমাজ সম্পর্ক, জীবনযাত্রায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। পুরনো

দিনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, কিন্তু গভ্রাদি তার ঠগ্‌বাজি ছাড়তে চায় না। দুনিয়াকে তো সে দেখেছে; ঠগ্‌বাজিরই জায়গা তা; যে যত ধূর্ত সে তত সুবিধা করে নেয়। গভ্রাদিও ফিকির ফন্দি করেই টেক্কা দেবে। কিন্তু বাধা পায় নানাথান থেকে—ছেলেরা, মেয়েরা, প্রতিবেশীরা, যৌথ খামারের মানুষ, নানা শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী একালের, এরা তার চারিদিকে এ কেমন ভাবে চলে, বলে, কথা কয়, হাসে, খেলে, বাঁচে! পাকা ঠগ গভ্রাদি যেন এদের দিশেই পায় না; দিশে পায় না এই পৃথিবীর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে, শিখ্‌তে শিখ্‌তে, বুঝ্‌তে বুঝ্‌তে কেমন নতুন মানুষ হয়ে চলল যেন গভ্রাদি নিজেই। বলা বাহুল্য এ জাতীয় কাহিনী সোভিয়েট সমাজে আদর পাবেই; আর বিশেষ করে আদর পেয়েছে স্টালিনের জাতি গুর্জীদের নিকটে। লেখকের কৃতিত্ব এই নতুন জীবনযাত্রার চিত্রণে; বিশেষ করে নতুন পুরোনো মানুষদের চরিত্র চিত্রণে। শ্রীযুক্ত সত্য গুপ্তের কৃতিত্ব সেই জিনিসটিকে মসৃণ, স্বচ্ছতোয়া ভাষায় বাঙালী পাঠকদের সাম্‌নে উপস্থিত করায়। এ কাজে তিনি আশ্চর্য রকম সার্থক হয়েছেন।

একটি কথা তাই এ প্রসঙ্গে আমাদের ভাব্‌তে হবে,—ইংরেজি থেকেই আমরা সাধারণত অনুবাদ করি। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে মূলের শ্রী ও সত্য কতটা রক্ষিত হয়েছে? আমরা ভাবি যথেষ্ট হয়। কিন্তু রুশ-রসিকদের নিকট শুনেছি—ইংরেজি অনেক অনুবাদে মূল রুশ গ্রন্থের যথার্থ সৌন্দর্য নাকি নেই। আজ বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যের যখন পাঠক সমাজ তৈরী হচ্ছে তখন আশা করব, যথাসম্ভব মূল ভাষা থেকে অনুবাদের চেষ্টাও ক্রমে দেখা দেবে।

আরও দু'একটি ছোট কথা আছে। অনুবাদে অন্তত বই'র নামে ইংরেজি শব্দ যেমন 'স্মোক্,' 'রেন্‌বো' প্রভৃতি না রাখাই বাঞ্ছনীয়, বিশেষত মূল গ্রন্থের নামও যেখানে ইংরেজিতে রাখা নয়। যেখানে তা ইংরেজি যেমন 'গুড্ আর্থ্', সেখানেও বাঙলা নামই দেওয়া উচিত। বাঙলায় কি নাম হবে, তা অনুবাদ-কুশলী লেখক নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারবেন। অবশ্যই, যথাসম্ভব গ্রন্থের মূলনামের প্রতিশব্দ রাখাও বাঞ্ছনীয়, এ কথাও স্মরণীয়।

বাঙালী পাঠকের নিকট এসব গ্রন্থের দাম কি বেশি ঠেকছে? তাঁরাই এরূপ বই'র দাম ৬ শিলিং ছেড়ে ১০৷৷০ শিলিং দেখলেও মনে করেন তা ন্যায্য। প্রকাশকেরা তবু মনে রাখবেন বাঙালী পাঠক প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্তের লোক, বড় দুরবস্থা আমাদের। বাঙলা বইএর বহুল প্রচার চাই বলেই, চাই সস্তায় বই।

গোপাল হালদার

নিবেদন

অনিবার্য কারণ বশত বর্তমান সংখ্যায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত' প্রকাশ করা সম্ভব হল না। বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'জীয়ন্ত' নিয়মিত প্রকাশিত হবে। সম্পাদক, পরিচয়।

সম্পাদক

হিরণকুমার সান্যাল

গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং

৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৫৪

ভারতীয় শিক্ষা সমস্যা

খবরে প্রকাশ, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী সাধারণ ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষার একটা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে ছোটখাট আরো কয়েকটা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত আছে। পরিকল্পনাতে বলা আছে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও পরিবর্ধন ছাড়া কতকগুলি বিশিষ্ট Training School বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে—যেমন সাধারণ বিদ্যালয়, শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র, ডাক্তারী, কৃষি ও জীবিকাশিক্ষার (vocational) কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। পরিকল্পনা কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য তালিকাতে কতকগুলি নূতন বিষয় প্রবর্তন করা হবে।

এর পূর্বে ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) নিউ দিল্লীতে তদানীন্তন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সাহ্‌ফত্‌ আহম্মদ খাঁ শিক্ষা-বিভাগের এক সভায় বলেন—বহুদিন উপেক্ষিত সাধারণ লোকের উন্নতিই তাঁর প্রধান কর্তব্য। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের অগ্রণী কেন্দ্রীয় উপদেশক বোর্ডের দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উপদেশ দেন—যার প্রতিনিধি ছিলেন শিক্ষা বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা। বিশেষ করে তিনি মিঃ সার্জেন্টকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, সার্জেন্ট-পরিকল্পনাকে অতঃপর আরম্ভের সূত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছেন তার মধ্যে সার্জেন্ট-পবিকল্পনাকে যে মূলভিত্তি বলে গ্রহণ করা হবে তার উল্লেখ নেই; তবে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষকদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার কথা লিখিত আছে। অবশ্য আমরা বাংলার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী মিঃ সৈয়দ মুয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেনের শিক্ষা বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাবের সময় বনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারের উল্লেখ বক্তৃতায় পাই। তিনি বলেন, গভর্নমেণ্ট আশা করেন যে আগামী জানুয়ারী মাসেই (১৯৪৭) বাংলার কয়েকটি প্রদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পত্তন করতে পারবেন—তিনি আরও আশা করেন যে, 'বাজেটে' প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য যে বাইশ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা আছে সেটাও অদূর ভবিষ্যতে অন্তত তিন গুণ বর্ধিত করা হবে।

বিহারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও (পাটনা, ৬ই জানুয়ারীতে প্রকাশ) আমরা সার্জেণ্ট রিপোর্টের মূল ভিত্তির কথা দেখতে পাই না বরং এতে বনিয়াদী শিক্ষা ও ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষকদের বিশেষ ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা আছে এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারের বিষয় চেষ্টা করা হবে, সে কথা উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকীতে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—তার মূল সূত্র হচ্ছে বনিয়াদী শিক্ষার গোড়াপত্তনের চেষ্টা ও পরীক্ষা করা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সামান্য কিছু কাট্‌ছাঁট্‌ দিয়ে পূর্ব চলিত শিক্ষাব পদ্ধতিটাকেই পুরোপুরি গ্রহণ করা।

বনিয়াদী শিক্ষা

প্রগতি হিসাবে যেটা পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই বনিয়াদী শিক্ষার সমাবর্তনের প্রয়াস। এই ধরনের ব্যাপার—অর্থাৎ কিছু পরিবর্তন যে নিতান্ত উচিত—এটা জাতীয়তাবাদী নেতাদের ১৯৩৯ সাল থেকেই নজরে পড়ে। ২২শে অক্টোবর (১৯৩৭) মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ধাতে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান ব্যাপার হোলো যে শিক্ষা অতঃপর সর্বপ্রসারিত ও উদ্দেশ্যমূলক হবে। প্রধান প্রধান্ এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :

১। এই সভার মতানুসারে সাত বৎসর ব্যাপী সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক (বনিয়াদী) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ;

২। এই সভা মহাত্মা গান্ধীর মতানুযারী স্থির করছে যে এই শিক্ষা শারীরিক ও উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হবে, এবং যে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে বা যার বিশিষ্ট গুণাবলী লক্ষ্য করা যাবে, তা বা তাকে সম্পূর্ণভাবে কোনো বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত করা হবে ; বিভিন্ন বা পারম্পরিক আবহাওয়া অনুসারে অবশ্য প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষা বিভিন্ন হবে।

শিক্ষা ও জীবিকা

এই পরিকল্পনার প্রধান ব্যাখ্যা হোলো—শিক্ষা এবাব আর্থিক সমস্যা, বিশেষ করে কৃষকের আর্থিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়াবে ; অর্থাৎ শিক্ষা এবার জীবন বা জীবিকা থেকে পৃথক হয়ে থাকবে না। একযোগে জীবন ধারণের উপযোগী মাল এ উৎপাদন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতিবিধান করবে। এই হিসাবে পরিকল্পনাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) প্রথমত শিক্ষা হবে শিল্প কেন্দ্রীভূত, (২) দ্বিতীয়ত উপজাত শিল্প আর্থিক আমদানী করবে—আর তা থেকেই শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল করা যেতে পারবে—অর্থাৎ শিক্ষক প্রভৃতির বেতন এই শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকেই পাওয়া যেতে পারবে।

এব সঙ্গে এর আরো বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রের অন্নসংস্থান। পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন :

"সমস্ত শিক্ষা নিযুক্ত করা হবে যে শিল্পটা বাছাই করা হোলো সেই শিক্ষাটাকে সুষ্ঠুরূপে শেখানোর জন্য। যে শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থির করা হোলো সেটাকে

নিয়মিত ভাবে শিক্ষা করতে হবে যাতে তাকে সুচারুরূপে বাস্তব অর্থকরী ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটাকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারও করা হবে না; আর শুধু মাত্র আর্থিক সমাধানের উপায়ও করা হবে না; দুটি জিনিসের সংমিশ্রণই হবে এর উদ্দেশ্য।"

গভর্নমেন্টের শিক্ষা নীতি

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী বা বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলী যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ওয়ার্ধা নীতির খানিকটা থাকলেও পুরোপুরি তাকে পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি। তাঁদের নীতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের পরিচালিত নীতিরই গা-ঘেঁষা দাঁড়িয়েছে, অবশ্য সার্জেন্ট রিপোর্টও অনেকটা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ঘেঁষা হয়েছে। তার পেছনে অবশ্য ইতিহাস ও উদ্দেশ্য আছে। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে যেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাঁদের পুঁজিবাদী শাসনভার কায়েমী ও পাকাপোক্ত রকম স্থির করেন, খানিকটা নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা শিক্ষার দিকে নজর দেন। একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করেন। পরিকল্পনাটিকে বলা যায় "Downward infiltration" অর্থাৎ নিম্নগতি শুদ্ধি। পরিকল্পনার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় উপরের শ্রেণীগুলিতে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা আপনিই সহজে প্রবেশ করবে। এদেশের উপরের শ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলানোতে কয়েকটা জিনিস আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ে যেমন, প্রথমত এদেশের উপরের শ্রেণীকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলা আর দ্বিতীয়ত শাসনতন্ত্রের কাঠামোতে এদের প্রবেশ করিয়ে তাদের দ্বারাই বৃটিশ ধনতন্ত্র কায়েমী ভাবে পরিচালিত করা।

পরিকল্পনার এই গোঁড়ামিটা অনেকেই লক্ষ্য করে খানিকটা অদল-বদল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। এমনকি মিষ্টার এলফিনষ্টোন পর্যন্ত একটা উদারনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা কানেও তোলা হয়নি।

বরং ১৮৩৫ সনে প্রতিক্রিয়াশীলদের অগ্রগণ্য মেকলে সাহেবের পরিকল্পনা লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক যখন অনুমোদন করেন তখন শিক্ষার ধারা আরো সেই 'নিম্নগতি শুদ্ধির' দিকে গতি করে। মেকলে সাহেব পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি দেখান—"ইংলণ্ডের কর্তব্য হচ্ছে যা ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় তাই তাদের শেখানো; যা তাদের ভাল লাগবে তা শেখানো চলবে না।" তাঁরই উদ্যোগে আর মধ্যবর্তীতায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন এদেশের কয়েক সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধাচরণ করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এদেশের উপরের পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্রে তা বিফল হয়। ইংরাজি শিক্ষা ভারযুক্ত হয়ে পড়ে, পুঁজিবাদীরা তা কেবল নিজেদের মধ্যে একচেটিয়া করে রাখতে প্রাণপণ করেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের শিক্ষানীতিতে উপরের শ্রেণীর সুবিধা একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে বসে। লর্ড হার্ডিঞ্জ শিক্ষিত লোকদেরই শাসন বিভাগে গ্রহণ করবেন, এই মর্মে প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে বলা আছে:

"গভর্নর জেনারেল বাংলাদেশের প্রচলিত অবস্থা বিবেচনা করে এবং যারা এই শিক্ষার

সুযোগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সরকারী পদগুলিতে বহাল করে তাঁদের যে উৎসাহ বর্ধন করেছেন এবং ব্যক্তি বিশেষের মেধাকে পুরস্কৃত করেছেন শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টও যতদূর এবং যত শীঘ্র সম্ভব লাভ করতে সুযোগ পেয়েছেন—"

উড্-এর 'এডুকেশন্ ডেস্প্যাচ'

গভর্নমেণ্টের ভেতরকার উদ্দেশ্য এর থেকেই ধরা পড়ে যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রসার যে সরকারী জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা, প্রতিপালিত ও বর্ধিত করা—এর পর সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। শিক্ষার মূলনীতি যে সর্বহারাদেরও শিক্ষায় উৎসুক করে তোলা বা বিরাট একটা আদর্শের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া সে বিষয় একেবারে চেপে যাওয়া হয়।

সর্বহারা, কৃষক প্রভৃতিদের যে কেমন ভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয় তার ইতিহাস উড্-এর 'এডুকেশন্ ডেস্প্যাচে'র আরম্ভেই বলা হয়েছে, যেমন—"এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য কিছু করা হয়নি—বিশেষ ভাবে, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তাদের শিক্ষার জন্য কিছুই করা হয়নি।"

কিন্তু ১৮৮০-৮৪র মধ্যে ঘটনা এমন ঘটতে থাকে যার দ্বারা পরিকল্পনার গণ্ডী খানিকটা বাড়াতেই হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুধীবর্গ স্বায়ত্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ করেন—যার উদ্যোক্তা ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ। আন্দোলনের ফলে শিক্ষাকে ব্যাপক করার নামে Downward infiltration পদ্ধতিতে মধ্যবিত্ত-গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় যা সৃষ্ট হয় তা পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় গিয়ে পড়ে। শিক্ষা আত্ম-নির্ভরশীলতার নামে সুবিধাবাদী পুঁজিপতিদের পাল্লায় গিয়ে পড়ে। গর্ভনমেণ্ট যে এই সুবিধাবাদী-দের জগিয়ে রেখে আর সৃষ্টি করে নিজেদের সর্বেসর্বা করে রাখেন তা এই প্রস্তাবে ধরা পড়ে, যেমন:

"আমাদের সর্বকালীন মত এই যে, ভারতে শিক্ষা বিস্তার সর্বদা আমাদের শাসন বিভাগে কৃতিত্ব বা উৎকর্ষ এনে দেবে—যেহেতু আমরা গভর্নমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগে বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করতে পারব। অপরপক্ষে গভর্নমেণ্টের যে সমস্ত নানারকম চাকরী খালি হবে তাতে শিক্ষা বিস্তার আরো বর্ধিত হারে হবে।"

সার্জেণ্ট রিপোর্ট

অর্থাৎ শিক্ষার ধারা বা গভর্নমেণ্ট তৈরী করলো তাকে কাজে লাগানো হবে গভর্নমেণ্টের ব্যবহারে; শিক্ষার অন্য কোন উদ্দেশ্য রইল না। শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শের নামে রাজ্য চালানোর ব্যাপারে হাতিয়ার হয়ে থাকাই হোলো উদ্দেশ্য।

জিনিসটার মধ্যে অবশ্য অন্তর্নিহিত দ্বৈধ ভাব শিগ্গির দেখা দিল—বেকার সমস্যায়, আর্থিক অবনতিতে; মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত আরো সুবিধা পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে থাকে—বাংলা-বিভাগের গোলযোগে, মিণ্টো-মরলের সংস্কারে, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিতে।

গভর্নমেণ্ট এবার এই অর্থনৈতিক সমস্যা এড়াবার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাকে তাঁদের সৃষ্ট

আর সেই পরিধি অন্তর্গত সংস্কারকদের হাতে তুলে দেন। ১৯৩৫ সনে প্রভিনসিয়াল অটোনমি বা স্বরাষ্ট্রতন্ত্রে গভর্নমেণ্ট শিক্ষা-ব্যাপার মন্ত্রীদের হাতে তুলে দেন। ১৯৩৬ সনে কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের সীমাবদ্ধ নূতন পরিকল্পনায় প্রবেশ করেন ; ১৯৩৭-এ বাইশে অক্টোবর ওয়ার্ধাতে সার্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক (বনিয়াদী) শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

গলদ কোথায়

এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে প্রকাশ (২৩শে জানুয়ারী) বোম্বাই গভর্নমেণ্ট দশবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী খানিকটা টানতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আদৎ গলদ হচ্ছে যাঁরা মন্ত্রীপদে আসীন হচ্ছেন তাঁরা উপরের দুই শ্রেণীর লোক—অর্থাৎ পূর্বের খতিয়ান এখনও বজায় রইলো—যেটুকু হবে সেটা দরিদ্রদের খানিকটা খয়রাত দেখানো—সমতা আনা নয়। গভর্নমেণ্ট এ ধারাটা ভাল করেই বুঝেছেন তাই ১৯৪৪ সনে সর্বভারতীয়, প্রধানত, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত যুদ্ধোত্তর শিক্ষার পরিকল্পনা (সার্জেণ্ট পরিকল্পনা) গ্রহণ করে পুরোনো স্বার্থের দিকটা আঁট করে রাখলেন। নামে সর্বজনীনের দৃশ্যমান করে এমন একটা জিনিসের সৃষ্টি করা হোলো যার সাফাই অনেকদিন ধরে চালানো যায়। পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান ব্যাপার প্রস্তাব করা হয়েছে :

(১) ৬ হতে ১৪ বছরের মধ্যে সমস্ত বালক-বালিকার বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যত শীঘ্র পারা যায় প্রবর্তন করানোর চেষ্টা করা হবে যদিও আপাতত যথাযথ শিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হতে চল্লিশ বছর লাগবে।

(২) যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা (Middle School) অধিকাংশ লোকের শেষ শিক্ষা হবে, সেই হেতু এই শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

(৩) উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশের জন্য বাছাই করার নিয়ম প্রবর্তন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলিতে যারা কৃতিত্ব দেখাতে পারবে তাদেরই শুধু এই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার থাকবে।

(৪) দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের জন্য বৃত্তি ও থাকার স্থান দেওয়া হবে।

(৫) পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় হবে দু'শো কোটি টাকা।

পরিকল্পনার সবচেয়ে যে দুটো বড় জিনিস যেটা নজরে পড়ে সেটা শিক্ষিত শিক্ষকের অভাবের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হতে লাগবে ৪০ বছর—আর অর্থব্যয় যা হবে তা হবে দু'শো কোটি। একটাতে বলা হোলো উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা পর্যন্ত গড়িমসি করা চলবে আর দ্বিতীয় দফায় বলা হোলো পরিকল্পনা অনুযায়ী যা ব্যয় হবে তা কুলানো সম্ভব নয়। সুতরাং পরিকল্পনার সফলতা আপেক্ষিক হয়ে রইলো।

পাছে এই দু'টি ব্যাপারে বিশেষ জোর না দেওয়া হয় সেই জন্য স্যার জন সার্জেণ্ট ১১ই জানুয়ারী বোম্বাইতে আবার এর উপর সকলের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি বললেন—ভারতে এখন প্রয়োজন পনেরো বছরের মধ্যে দুই-চতুর্থ মিলিয়ন শিক্ষকের, যার দ্বারা সবচেয়ে বেশি ছাত্রদের সর্বনিম্ন (প্রাথমিক) শিক্ষা দেওয়া যেতে পারবে। তাঁর মতে, "এদেশে যেকোন শিক্ষার পরিকল্পনা তখনই সফল হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব না মেটানো হয়" (এ. পি. জানুয়ারী ১১)।

একটু লক্ষ করলেই মিঃ সার্জেন্টের উক্তির কারণগুলি সহজে ধরা পড়ে। পরিকল্পনার অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, পরিকল্পনায় অন্যান্য যা অংশ তার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। এখনকার প্রচলিত Downward infiltration-এর ভিন্ন সংস্করণ। যেটা নূতন, সেটা হচ্ছে সর্বজনীন প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা। এটা সহজে আর সংক্ষেপে সফল হলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হতে পাবে, সেজন্য সেটাকে টালবাহানা করে কাটানোর চেষ্টা।

মালিক ও মজুরের তফাৎ

বাংলার, বিহারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বোম্বাই দশবার্ষিকী পরিকল্পনা—সবগুলিতে সার্জেন্টের পরিকল্পনায় শিক্ষকদের তৈরীর প্রশ্নটিই সবচেয়ে বেশি জোর পেয়েছে। অন্য ব্যাপারের বিষয় বলা হয়েছে—(উদাহরণ স্বরূপ বাংলা-পরিকল্পনায়) "শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা বিস্তৃতির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে কতকগুলি নূতন বিষয় প্রবর্তন করা হবে।" অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যবস্থা সেটা পবিবর্তিত বা রূপান্তরিত হবে পাঠ্যতালিকায় আরো কতকগুলি বিষয় প্রবর্তিত করে। কিন্তু এছাড়া সার্জেন্ট পরিকল্পনায় যে কারিগরী বা শিল্প-শিক্ষার কথা আছে সেগুলো এতে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বলা হয়েছে—"দেশের শিল্পের বিস্তার হেতু এবং যুদ্ধোত্তর ভারতে শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা থাকায় প্রধান দুটো নিয়ম প্রবর্তন করা হবে :

(১) শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদার জন্য বিভিন্ন স্তরের শিল্প-শিক্ষিত লোককে গ্রহণ করা হবে ;

(২) সাধারণ বালক-বালিকার যদি কোন শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক দক্ষতা থাকে, তাহলে তাদের হাতে কলমে তা'ই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।"

এই পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের এখনও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ও শিল্পের যোগাযোগ মিলিয়ে দেখলে পবিকল্পনার গলদ কোথায় ধরা যায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত বিজ্ঞান কংগ্রেসে (এ. পি. ৩রা জানুয়ারী) স্পষ্টই বলে দিয়েছেন : "বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য গভর্ণমেন্টের উপর ভরসা করা অন্যায় ও এতে লাভ নেই। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যদি কিছু করতে হয় গভর্ণমেন্টকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না। এর জন্য ব্যক্তিগত বা অনুষ্ঠানিক চেষ্টা করতে হবে।" কিন্তু অনুষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত চেষ্টা কতদূর কাজে এসেছে তাব পরিকল্পনা আমরা এখনকার বিজ্ঞান ও শিল্পের অবস্থা থেকেই বুঝতে পারব। যেমন :

"কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র ; এই কলেজের কোনো গবেষণা দ্বারা কৃষক সাধারণ বা কুটিরশিল্পজীবীরা আজ পর্যন্ত উপকৃত হইল না। কাগজ, দেশলাই, ষ্টোভ প্রভৃতি বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্প বড় বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ ও অসহায়তা বঞ্চিত হইয়াই রহিল। বিজ্ঞানকলেজের কোন অধ্যাপকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায়ের ফল দেশের আপামর জনসাধারণের কাজে লাগিয়াছে—আমরা তাহা জানি না...।

গত কয়েক বৎসর ইম্পিরিয়েল কৃষি গবেষণাগার, ইম্পিরিয়েল পশু গবেষণাগার, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণাগার, কি ফল প্রসব করিয়াছে, তাঁহাদের সাধনা দেশবাসীর

কোন কাজে লাগিয়াছে ?...পূর্ববঙ্গের ও দক্ষিণ বঙ্গের গবাদি পশু বর্ষাকালে পায়ে ও মুখে ঘা হইয়া কেন মারা যায়, তাব কোন কিনারা ইম্পিরিয়েল পশু গবেষণাগার কি করিতে পারিয়াছেন ?" (ভারত, ৫ই জানুয়ারী)

বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের যে যোগাযোগ তা যে কতদুর কার্যকরী করা হয়ে উঠবে এর থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। সুতোর কলের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের, কৃষি ও চাকুরী সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যপার পরিকল্পনায় (বাংলা পরিকল্পনা) গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ চরকা বা মাষ্টার সম্বন্ধে শিক্ষাতেই এ পর্যবসিত হবে।

তবে অনেক বড় বড় ব্যবসাক্ষেত্র হতে কয়েকজন শিক্ষককে শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। আর এইখান থেকেই সার্জেণ্ট পরিকল্পনার সূত্র ধরা যেতে পারবে। শিক্ষার্থীরা সহজ উৎপাদন ব্যাপার জেনে মালিকদের লাভের সহাযতা করবেন, তাই বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা বাদ দিলেও পরিকল্পনায়, মালিক ও মজুরের তফাতটা সহজেই ধরা পড়ে।

অর্থাৎ যাঁরা সার্জেণ্ট-পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন তাঁরাই কেবল এই সুবিধার অধিকারী হবেন। প্রাথমিক শিল্প অথবা বাণিজ্য (ট্রেড স্কুল) বিষযক বিদ্যালয়গুলিতে স্থান পাবে কেবলমাত্র সেই ছাত্রছাত্রীরা যারা মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডী পার হয়েছে। নিম্ন প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য ছয় বৎসরের এই ধরনের একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু মজুরদের জন্যে কি হোলো ? শিক্ষার ব্যবস্থা অনুযায়ী মজুরেরা প্রতিযোগিতা থেকে আরো তফাতে পড়ে থাকবে।

কয়েকটি প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের জন্য বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত সর্বহারাদের অবৈতনিক এই শিল্প বা বিভিন্ন স্তরের বাণিজ্য শিক্ষার ব্যাপারকে কেবলমাত্র 'প্রতিভাবান' ভাঁওতা দিয়ে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে।

সর্বহারার দৈন্য বৃদ্ধি

অবশ্য সার্জেণ্টের পরিকল্পনাকে চালু রাখার চেষ্টা এখনও হয়নি। গভর্নমেণ্ট পুরোনো পরিকল্পনাতেই কতকগুলি নূতন বিষয় যোগ দিয়ে "বিপ্লবের" জয়গান শুরু করেছেন। তবুও, এমনকি সার্জেণ্ট পরিকল্পনার মূল ভিত্তিকে ধরলে মালিক মজুরের তফাৎ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, উচ্চস্তরের, মধ্যস্তরের বা নিম্নস্তরের শিল্প-শিক্ষানবীশদের সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণী কোন কালেই প্রতিযোগিতা করে উঠতে পারবে না। তার কারণ দৈনন্দিন উত্তরোত্তর অভাব তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। যাঁরা শুধু সুবিধা পাবেন তাঁরা ঠিক এখনকার মতই সেই উঁচুস্তরের লোক; শিক্ষার নামে উঁচুস্তরের লোকদের আবার গলাগলি হবে। সর্বহারারা তেমনি আগের মত মজুরী রোজা মাত্র পাবে।

কিন্তু আসল দৈন্য এই মাত্র নয়। শিল্প শিক্ষা লাভ করে একজন যখন পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তারা নিজেরাই পূরণ করতে পারবে, আর যদি মালিকদের সংগঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প নিজেদের কয়েকজনের মধ্যে বর্তিয়ে থাকে তবে শিল্প-শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়বে কিন্তু সে পরিমাণে চাহিদা বাড়বে না। বিদেশী পুঁজিবাদীদের সহায়ক বখরায় নিযুক্ত এদেশী মালিকদের শিল্পপত্তনেও পুঁজিবাদীরা এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা

বাড়ানোর দিকে ঝোঁক দেবেন যাতে প্রতিযোগিতাব বাজারে সর্বহারারা দরকষাকষি করতে না পারে।

অবশ্য পরিকল্পনায় তো বলাই আছে—সর্বহারাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা কি তাদের অবস্থা পরিবর্তনের সহায়ক হবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সর্বহারাদের দৈন্য দূর ও সকলের সমগোত্র না করতে পারে, বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে তখন সকলে সন্দেহের চক্ষে দেখবে। যেমন ঘটেছিল ১৯৪০-৪১ সনে সমগ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার পরিকল্পনায়। ১৯৪০-৪১ সনে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল ১৯৪টি শহরে, আর ৩,২৯৭টি গ্রামে। এই পরিকল্পনায় পড়েছিল পাঞ্জাবের ৬৬টি শহর এবং ২,৯০৮টি গ্রাম। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিকল্পনা এখানে ব্যর্থ হয়েছিল; অবশ্য অজুহাত দেখানো হয়েছিল যে ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে বাধ্য করানোর মত একটা সংগঠন এখনও করা হয়নি, আর শাস্তি দেওয়ার জন্য বিচারালয়ও তৈরী হয়নি।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

জনসাধারণের এই নিরুৎসাহের নিকট ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সময়ও নেতাদের নজর এড়ায়নি; তবে সেখানে বলা হয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব আর শিক্ষকদের অনুপযুক্ততা। সার্জেণ্ট রিপোর্টে আর মিঃ সার্জেণ্টের বক্তৃতায়ও এর জের টানা হয়েছে।

কিন্তু হিসেব করে দেখতে গেলে প্রশ্ন দাঁড়ায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেই কি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পায়? বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আসাম গভর্নমেণ্টের পরামর্শদাতা মিঃ জি. এ. স্মল এক সার্কুলারে বলেছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিম্নতম বনিয়াদী বিদ্যালয় রূপে পরিবর্তিত করা হবে, মধ্য বাংলা বিদ্যালয়গুলি উচ্চতম বনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু প্রাথমিক ও মধ্য বাংলা বিদ্যালয়গুলি যে এককালে ধ্বসে গিয়েছিল আর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি ক্রমেই ছাত্রে ভরে উঠেছিল—এর কাবণ কি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব? এর কারণ ছিল এবং এখনও হবে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ভাল পসারের ঈশারা করে, নিম্নগুলিতে শুধু মহান্ আদর্শবাদের কাঠামো থাকে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও আগের মত উচ্চস্তরেব লোকেরাই উচ্চ শিক্ষা একচেটিয়া করে রাখবে—যাতে দেশের সমস্ত সুবিধা তারাই পেতে পারে। সর্বহারাদের জন্যে যেটুকু করা হবে সেটুকু হবে এই এখনকার মত দয়া—যা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সার্জেণ্টের পবিকল্পনাতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকাংশ ছেলেমেয়ের শেষ শিক্ষার সোপান বলে গণনা করা হয়েছে। এর পর যারা উপরে উঠবে তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই কম হবে। সর্বহারারা সে সুবিধা পাবে কি? বৃত্তি পেলেও তাদের সংসার চালানোর কি ব্যবস্থা হবে? এই উদ্দেশ্যে কাঠামোটাকে এমনিভাবে সাজানো হয়েছে যে উপস্থিত রাজনৈতিক পবিস্থিতিতে উচ্চস্তরের লোকদের জন্যই শুধু কয়েকটি চাকরীর দ্বার খোলা থাকবে—আর সকলের পথ আগের মতই থাকবে চিরদিনের জন্য বন্ধ।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অবশ্য এর একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করেছে। শিক্ষাকে এখানে শিল্পের কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে—যার দ্বারা শিক্ষা নিজের বাহন হতে পারবে। কিন্তু এব পরে?

উচ্চ শিক্ষা ? যাতে লাভালাভের অংশ থাকে বেশি ? মহাত্মা গান্ধী পরিষ্কার বলেছেন—এর জন্য আমাদের দায়িত্ব নেই, আমরাও এর খরচ বহন করব না—"Those who want the luxury must pay for it" কিন্তু সেই উচ্চ শিক্ষাই যে সমস্ত সুবিধা আগলে থাকবে ; মহাত্মা গান্ধী বলেন—"We must not oblige the toiling and half starved mass to foot the bill for them."—অর্থাৎ দরিদ্রেরা এর জন্য কিছু দেবেও না এবং পাবেও না।

জাতীয় পরিকল্পনা

আর দরিদ্রদের জন্য যে সমান সুবিধা এবং সুযোগ সর্বভূতে দেওয়া হবে না, তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা আছে—"Congress has not in any way accepted socialism."—অর্থাৎ সমাজতন্ত্র কংগ্রেসের পরিকল্পনা নয়। সুতরাং ব্যাপার ঠিক আগের মতই দাঁড়ায়—সুখসুবিধা যদি বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্যই কল্পিত, তবে এই বিরাট অর্থব্যয় আর পরিকল্পনা নিছক ব্যর্থতাতেই কি পর্যবসিত হয় না ? বাংলা বিহার আর বোম্বাইর পরিকল্পনাতেও শুধু বনিয়াদী শিক্ষার দিকটা দেখা হয়েছে, আর্থিক দুরবস্থার কথা তোলা হয়নি। সার্জেন্টের রিপোর্টে ভয়াবহ অর্থের ব্যয়টা দেখিয়ে আর ৪০ বছরের সময় দেখিয়ে একটা ভীতির রেখা টানা হয়েছে ; কিন্তু তথাপি দেশহিতৈষিতার নামে বোম্বাই, বিহার প্রভৃতিতে ঝাপ্সা পরিকল্পনার সুরে বনিয়াদীর সূত্র ধরা হয়েছে। তার কারণটাও অবশ্য ১৯৩৬এ মে মাসের 'সোসিয়েল ফ্রন্টিয়ার' G. W. Beiswanger-এর বক্তৃতায় ধরা যায়। তিনি বলেছেন : Those in economic control capitulate to the demand for universal education only to the extent that they find education amenable to their economic purposes. The elementary school system is supported because it teaches the common people to read directions, to calculate simple sums, to devour propaganda and to vote the right ticket."

রুচি বনাম ব্যক্তিত্ব

নূতন পরিকল্পনাগুলিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের নামে সেই পুরোনো সূত্র টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত ৩১শে অক্টোবর বিহারের শাসনকর্তা প্রাথমিক শিক্ষার আইন সংশোধনে (প্রাইমারী এমেডমেণ্ট এক্ট, ১৯৪৬) মত দিয়েছেন। এর ফলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে শিক্ষা চালু করা হবে। ২৪শে অক্টোবর আসাম সরকার প্রচার করেন যে—'সমগ্র আসামে এই বৎসরে আটটি বনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০টি হাইস্কুল, ২০০টি জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিদ্যালয় খুলিবেন। ওয়ার্ধা ও দিল্লীতে ২৬ জন শিক্ষক এ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।" কিন্তু এর সঙ্গে ৭ই নভেম্বরে প্রকাশ—মনিপুর স্টেটে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকেরা রুজি ও রোজার জন্য ধর্মঘট করেছেন। ছাত্ররাও তাঁদের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

বিরাট পরিকল্পনাগুলি আরম্ভ হবার মুখে ; অথচ তার দিকে জনসাধারণের সাড়া নেই।

তার কারণ পুরোনো Downward Infiltration policy এর কবর রচনা করেনি। ত্রুটির ব্যাপারে এ সুবিধাবাদীদেব আরো খানিকটা সুবিধা দিচ্ছে। তাই লোকের মনে উৎসাহও নেই, বিশ্বাসও নেই। ব্যক্তিত্ব যে আবার সেই সুবিধাবাদী উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই বর্তিয়ে থাকবে তা বুঝতে আর কারুর বাকী নেই।

শিক্ষার আদর্শ

আমাদের দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮৮ জন। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা জানেন শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের উপকার নয়—নিজের সুবিধা। অশিক্ষিতদের—সর্বহারাদের থেকে এদের দল তাই পৃথক। বিরাট দেশে শিক্ষার পরিকল্পনা তাই স্পন্দন জাগায় না। শিক্ষার এই আদর্শ ছাত্র ও শিক্ষককে তাই কোন মহান আদর্শের দিকে ঠেলে না। শিক্ষার আদর্শ আমাদের ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

সৈয়দ মুয়াজ্জিম প্রাথমিক শিক্ষকদের বরাদ্দ মাহিনা অদূর ভবিষ্যতে বাড়াবেন বলে ভরসা দিয়েছেন; কিন্তু সামান্য মাহিনা বাড়ানো পরিকল্পনার মূল সূত্রকে ভাঙতে পারে না। এ সূত্র, এ ধারা সকলেব আন্দোলনে ভাঙতে হবে। পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীন আদর্শ তুলে ধরতে হবে। শিক্ষিত হলে যে তারা দেশের চাকা ঘুরাতে পাববে এটা বুঝিয়ে আর বাস্তবে দেখিয়ে দিতে হবে। যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার যে ভাল মিস্ত্রী বা চাষী সে-ই কেন্দ্রে সম্পাদক বা সভাপতি। সে দিন হবার আগে অন্তত এই দাবীগুলোর জন্য সর্বসাধারণে অন্দোলন করতে হবে :

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও যাতে অবৈতনিক শিক্ষা চালু হতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

বনিয়াদী স্কুল পরিত্যাগের বয়স ষোল করতে হবে—যার দ্বারা পুরোনো কারিগরেরা নতুন লোকের আমদানীতে অসুবিধায় না পড়ে।

শিল্প বিদ্যালয়গুলি হতেই স্টেটের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈবী হওবা আরম্ভ করতে হবে। যার মূল্যে কারিগর ও শিক্ষার ব্যয় দুইই চলতে পারবে।

শিক্ষকদের দৈনিক চাব ঘণ্টার কার্যের তালিকা করতে হবে, যার দ্বারা তাদেব ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হবার সময় ও সুবিধা পায়।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে, আর 'প্রাইভেট' বা 'গ্রাণ্ট-ইন-এইড্' প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে—যাব দ্বারা সুবিধাবাদীরা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট সুবিধা না পেতে পারে।

ছাত্রেরা বোর্ডিংএ বাস কববে এবং একাহার করবে।

প্রত্যেক ছাত্রকেই দৈনিক কয়েক ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রম করে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করতে হবে যার পরিবর্তে তার আহার ও বাসস্থান চলতে পারবে। এই শিক্ষাটাকে ভবিষ্যতের গঠনমূলক শিক্ষা হিসাবে পরিকল্পিত করতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রতিভার জন্য বৃত্তি নির্ধারিত না হয়ে দরিদ্র নির্বিশেষে বৃত্তি দিতে হবে। ছাত্র অবস্থায় সংসারের অভাব যেন পাঠের প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষা ও জাতীয়তা

১৯৪০ সনে যখন জাতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখনই উন্নততর জীবনের আদর্শ সংগঠন গ্রহণ করা হয়েছিল। সমিতির সভাপতি স্পষ্টই বলেছিলেন : "আমরা এটা ভাল-ভাবেই জানি ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে, এমন কি পরিবর্তনশীল বর্তমান হতেও, ভিন্ন হবে। এর মধ্যেই আমরা অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির ভবিষ্যতের বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।" লোকে নেতাদের কাছে সেই পরিবর্তনের ধারাটাই দেখতে এখন আশা করে। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে Downward infiltration বা নিম্ন পরিশুদ্ধি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল—আজ তাব পুনরাবৃত্তি নিবৃত্ত হউক; লোকে এইটাই নেতাদের কাছে আশা করে। ১৯৩৯ সনে ৪ঠা জুন চেয়ারম্যান্ জোর গলায় বলেন—"জাতীয় উন্নতির জন্ত যে পরিকল্পনা আমরা তৈরী করব তা হবে মুক্ত এবং স্বাধীন ভারতের জন্ত... এখনকার অবস্থার মধ্যেও আমরা সমস্ত উপায় এবং সূত্র গ্রহণ করব যার দ্বারা দেশের সর্ববিষয়ে উৎপাদন সমৃদ্ধ হতে পারে এবং সর্বসাধারণের উন্নততর জীবন যাত্রা সম্ভব হতে পারে।"

রাষ্ট্রের অনেক ক্ষমতা এখন নেতাদের হাতে; আমরা এখন স্বাধীনতার পথে; আমরা তাই চেয়ে আছি—শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড করে সর্বপ্রকারে উন্নততর জীবনের প্রতি অভিযান নেতারা কবে থেকে শুরু করবেন।

মনোজ রায

তবু

যেদিন ভোরবেলার সোনা মুঠো-মুঠোয় উজাড়
সোনা ধানের ঢেউয়েই, ধান-ঢেউয়েই চোখ ধাঁধায়,
পথিক-চোখ পথের, ঘরকুনো এ মন ঘরের—
যেদিন তুমি ঘরের বউ আমি মরদ জোয়ান

মাঠের। ভোরবেলার মাঠ শিশিরসেঁচা, সাঁঝের
গোরুর খুরে ধুলোওড়ানো মাঠ। মধ্যে দুপুর
বুক ফাটায় মাটির, মন হাঁফায় মন ঘরের—
যেদিন তুমি ঘরের বউ আমি মরদ জোয়ান

মাঠের। ক্ষেত-গৃহস্থির সুখ কানায় কানায়।
অচিন জন পথে-বিপথে এলে : সুজন দাঁড়াও
পেরিয়ে এসো উঠোন, ওঠো দাওয়ায়, বোসো পিঁড়েয়,
এঘরে আছি আমরা—বউ আর মরদ জোয়ান।

এমনি সুখ। এত কি সুখ সয় কপালে ?—কখন
আকাশ ভেঙে বুলবুলিরা মাটিতে নেমে মাঠের
ধান মুড়ুলো, গান ফুরুলো, ঘুঘু চরালো ভিটেয়।
ঘর খুইয়ে ঘরের বউ আর মরদ জোয়ান

দু'টো দু'ঠাঁই। শড়ক। সোজা পার হয়েছি নরক।
পঞ্চাশের মড়ক ফেলে পিছনে মাথা গোঁজার
ছাউনি তুলে ঝড়জলেও সেধেছি : মনপবন
ফের চালাও নাও : সেধেছি বউ মরদ জোয়ান।

মাঠে আমন ফসল ; ঘরে ওঠার আগে আগেই
যুক্তি করি দু'জনে : দেশজোড়া এ বুলবুলির
বংশগত দায় বাতিল। ঘরপোড়া এ গরুর
একটি কথা : বাঁচবো ফের বউ, মরদ জোয়ান।

আবার পোড়ো ভিটেয় প্রতি সাঁঝেই দীপ দেখাও
তুলসীতলা নিকোও বউ ; ধানভানার আওয়াজ
মিঠে শোনাক কানে ; ধানের সোঁদাগন্ধ-হাওয়ায়
মনের জাল বুনি আবাব বউ, মরদ জোয়ান।

এবার তাই বর্গী এলো সঙ্গে বুলবুলির।
পাইক এলো পেয়াদা এলো ভাগাড় থেকে শকুন,
নন্দী এলো ভৃঙ্গী এলো, গাঁয়ে উঠলো শ্মশান,
এবারও বুঝি রেহাই নেই—বউ, মরদ জোয়ান।

যেদিকে যায় দু'চোখ, যাবো? ফের নামবো পথেই?
নাকি থাকবো ঘরে, বাঁধবো মন, সাধবো কঠিন
পণ—যখন বর্গী এলো দেশে—দেশটা উজাড়?
তবু থাকবো ঘরে ঘরের বউ, মরদ জোয়ান?

বর্গী এলো দেশে। আসুক। তবু দেশটা সজাগ।
তবু পাতায় কচি ঘাসেই ঘোর ধাঁধা এ সবুজ,
তবু সকালবেলার ধানীরঙের মন-কেমন,
তবু থাকবো ঘরে ঘরের বউ, মরদ জোয়ান।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

চিঠি

এসেছি অধুনা নির্জন এক ইষ্টিশনে
ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূমের সীমান্তে
ভীড়-ভীরু আর শহরশ্রান্ত আমার মনে
একাকিত্বের আশীষ নামলো একান্তে।
থামলো শহুরে দ্রুত ও ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
এখানে এসেই, উপোসী মনটা কলকাতার
মাঠের সবুজ পাহাড়ের ঘননীল প্রলেপ
মাখলো অঢেল, নাগরিক আঁখিপ্রান্ততে
চারিদিকে শুধু ধুধু প্রান্তর অহল্যা
রাঙামাটি আর কাঁকরে তৈরী একটি পথ
বুক চিরে তার চলে গেছে দূর গ্রামান্তে
এখানে চিহ্ন আঁকে কদাচিৎ মোটর রথ,
ধ্যাননিমগ্ন বাবলার ঝোপ পথের পাশে;
গেরুয়া ধুলোয় হলদে রেণুতে গান আঁকা
মহুয়ার ডালে ঝরে গেছে যত মহুল ফুল
রিক্ত শাখারা নিঃশ্বাস ফেলে অজান্তে

লাগলো ভালো এ ইষ্টিশনের নিঝুম ঘুম
বিশ্রাম লোভী ভীড়-ভীরু মনে দিনান্তে
লাগলো ভালো এ দীর্ঘপ্রসারী রেলের লাইন
ক্ষণিক ভীড়ের বাহক ট্রেনের চকিত রোল।
সামনে পাহাড় আকাশেব গায় নীলকে ছোঁয়
রোদ জ্যোৎস্নায় কখনো ধূসর, কখনো নীল
পাহাড়ের নিচে প্রাণ ছলো ছলো ঝর্ণা বয়
সাঁওতাল মেয়ে লঘুপায়ে আসে জল আনতে,
সাঁওতাল মেয়ে মাটির কলসে ভরেছে জল
আমায় দেখেই মেলেছে অবাক নিলাজ চোখ
খসে পড়ে গেছে খোঁপায় জড়ানো পলাশদল
খসে পড়া নীবি ভুলেছে বক্ষে সে টানতে,
টেরাকোট্টাব শিল্পের মতো সে অঙ্গে
স্বচ্ছল দিনে উচ্ছল ছিল তরুণ প্রাণ
অধুনা বক্ষ ভেঙে দিয়ে গেছে চালের দাম
কঙ্কাল জাগা আর এক আকাল-উপান্তে,
কনখল নয় কঙ্কাল-ছায়া ক্লান্ত চোখ
নাড়া দিয়ে গেল বিশ্রামলোভী মনটাকে
কেঁপে কেঁপে ওঠা রেলেব বাঁশীতে ভাঙলো ধ্যান
ময়ুরভঞ্জ্ ও সিংহভূমেব সীমান্তে।

অমলেন্দু গুহ

পৌষ—১৩৫৩

অরণ্যের পৃষ্ঠপটে একফালি মাটির মায়াকে
সত্তায় স্নায়ুর মত করে আমি জড়িয়ে নিলাম,
কবে আমি নিবাবেগ মজে বাওয়া নদীব মতন
সমুদ্রের ডাক শুনে মনে মনে হলাম আকুল,
মেঘল মেদুর দিনে আকাশের আবেগে উদ্বেল
কবে আমি চেয়েছি যে জীবনের পিপাসা মেটাব !

আজ এই পত্রঝবা পউষের কবোষ্ণ বেলায়
কাদের সোনালি চুল সারামাঠে নাচে অগোছাল,
পৃথিবীর খরস্রোতে সে চুলের সাদর ইঙ্গিত
আমাকে ডেকেছে আজ—আমাকে ডেকেছে আজ বুঝি !

মৃত্যুকে চযেছি আমি প্রাণ দিয়ে প্রাণের মায়ায়
ভঙ্গুর ছলনা ছিঁড়ে জীবনের অঙ্কুর জাগিয়ে
প্রতিষ্ঠা চেযেছি আমি পৃথিবীর বক্ষে মমতায়।

অরণ্যের পৃষ্ঠপটে একফালি মাটির কঠিনে
মৃত্যুকে চয়েছি আমি জীবনের মায়া ছেড়ে নয়॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পক্ষীরাজ

উধাও উধাও সুদূর আকাশে, পক্ষীরাজ,
উধাও মেঘের চূড়ায় চূড়ায় ক্লান্তিহীন,
ঝলমল করে জোছনায় পাখা, পক্ষীরাজ,
একিগো তোমার শূন্য-ধাবন স্বপ্নলীন!

কোথা উড়ে যাও, বিহঙ্গ মোর, বিরামহারা
প্রতি মুহূর্তে দেশ হতে ছোটো দেশান্তরে
শ্বেত দেহে তব চির নবীনের জাগে যে সাড়া
স্বর্ণ-দ্বীপের ছায়া জমে ওঠে পাখার ’পরে।

কোথা যাও ওগো কোথা যাও পাখী— বারেক থামো
ক্ষণতরে এই সমুদ্র-তীরে গুটাও পাখা
এই বালুচরে স্তব্ধ নিশীথে নামো গো নামো
চেয়ে দেখ মোর অশান্ত মনে কি ছবি আঁকা।

হীরার লাগাম হাতে নিয়ে আছি রাত্রিদিন
ঊর্ধ্বে আকাশে অপলক চেয়ে এখানে একা
চিত্ত-সাগরে ফুঁসিছে বাসনা অন্তহীন—
শুধু তো মাটিতে পড়ে না তোমার চরণ-রেখা

তৃষা কি গো নেই রাজবিহঙ্গ?— বায়ুস্তরে
দেহ ঢেলে দিয়ে ভেসে ভেসে যাও নিরুদ্দেশ
উধাও উধাও দেশ হতে শুধু দেশান্তরে
কবে হবে এই চিরধাবমান যাত্রা শেষ?

আমি যে এখানে ক্ষোভে মরে যাই—মরি ব্যথায়
শূন্য মনের আসর ক্রমেই লাগে যে ভারী
দূর জনালয়ে কঠিন আঁধার শুধু ঘনায়
জীবনের সাথে চলে মরণের কি কাড়াকাড়ি !

শোণিতে শোণিতে রাজপথ হল শিমুল-রাঙা
চরণে চরণে জাগে আতঙ্ক কাঁটার মতো
কামনা-মুকুল পথের ধুলায় বৃন্তভাঙা
লুটায় যেন রে শীতের নাগিনী আত্মগত।

প্রেমের প্রাসাদে ঘুণ ধরে গেছে অনেক দিন
সুধাসাগরের লহরে লহরে মৃত্যু বিষ
গ্রামে ও নগরে শবের পাহাড় অন্তহীন
শিব-সুন্দর নিজেরে কাঁদায় অহর্নিশ।

গানের আসরে চীৎকার করে শকুন যত
বিবাহ-বাসরে চাম্‌চিকে ওড়ে পেঁচার সাথে,
পূজার আঙিনা রাতের কবরখানার মত
অশরীরি যত পিশাচী লীলার নেশায় মাতে।

তুমি কি দেখেছ বিশ্বে কোথাও এমন দেশ—
দেখেছ কি কোথা প্রতিবাদহীন হত্যালীলা ?
মাথা কুটে কুটে লাখো নরনারী হল নিশেষ—
তবুও গলেনি লুব্ধ মনের নিকষ শিলা।

বিলাস-ভোজের মুকুরোজ্জ্বল পাত্র পরে
মুমূর্ষু কত ভুখা ভিখারীর পড়েছে ছায়া,—
রূপার গেলাসে সোনার থালায় ক্ষণিক তরে
তবু ত' জাগেনি এতটুকু দ্বিধা, একটু মায়া !

তুমি কি দেখেছ অস্থিচিমুর, পক্ষীরাজ ?
তুমি কি দেখেছ অক্ষম বুকে বিঁধতে গুলি ?
দৈন্য যখন পুরুষকারেরে দিয়েছে লাজ,
তুমি কি শুনেছ রাজপ্রাসাদের ফাঁকির বুলি ?

গৃহবিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দানব হাসে,
ভাই মারে ছুরি ভায়ের বক্ষে দ্বিধাবিহীন,
মন্দির আর মসজিদে বসে লুঠের আশে
গুণ্ডারাজেরা মন্ত্রণা করে রাত্রিদিন।

পক্ষীরাজ গো, ক্ষীণপ্রাণ মোরা মিলায়ে হাত
শান্তি-চেষ্টা করেছি অনেক—পেয়েছি বাধা,
বুকের পাঁজরে মরণ-গুলির দৃঢ় আঘাত
শেখাল কেবল রাত্রিদিবস নীরবে কাঁদা।

তাইত এখানে লোকালয় ছেড়ে এসেছি চলে'—
সঙ্গীবিহীন শূন্যতাভরা সাগরতীরে,
আর্ত মনের ছায়া ফেলে ফেলে ফেনিল জলে
গোপন বেদনা মিলাই সুদূর মেঘের ভীড়ে।

তুমি কি কখনো তৃষার্ত হয়ে নামবে হেথা ?
আমার হাতের হীরার লাগাম ধরবে মুখে ?
পৃষ্ঠে তোমার বইবে কি মোরে, উদারচেতা ?
একটু আশারও জ্বালবে কি আলো আঁধার বুকে ?

এস নেমে এস, পক্ষীরাজ গো, - রাত্রি বাড়ে,
ঘুমায় সিন্ধু মৃতের মতন,—ঝিমাই আমি,
এস বিহঙ্গ, সঙ্গী আমার সাগরপারে,
তুলে নিতে মোরে অসীম শূন্যে এসগো নামি।

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

বিষাক্ত দেওয়াল

জানি
আমাদের সমাজের ফাটলের ফাঁকে
কালো কালো কেউটে আর সাদা সাদা গোখ্‌রোরা থাকে।
আমি জানি তুমি জান জানে সে সবাই
তবু হায় আমাদের আজো হুঁশ নাই।

জানি
ওদের বিষের তাপে জীর্ণ সমাজেব
ভস্মশেষ পড়ে আছে অস্থিপাঁজরের,
আজো তবু হয়নি চেতন,
সব জেনে বসে আছি তুমি আমি আরো পাঁচজন ;
গা সহা হইয়া গেছে বিষাক্তমরণ
বেশ লাগে মৃত্যুনীল হিমার্ত দংশন।

শুধু
এক একবার কেউ কেউ বিষের জ্বালায়
'ধোঁয়া দাও, রোজা ডাকো'— শুনি কাতরায়।

তবু
প্রাণধরে দৃঢ় কণ্ঠে পারে না বলিতে
সমভূমি করে দিতে
বিষাক্ত দেওয়াল,
ঝুলভরা কড়িকাঠ, ঘুনধরা ভিৎ আর সমস্ত জঞ্জাল।

তাই
প্রতীক্ষায় আছি তারি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে
যেই জন স্পর্ধাভরে পারিবে বলিতে
লাঙ্গল চষিয়া দিয়া বিষাক্ত মাটিতে
ফলাইতে
নকুল ময়ুর আর বিনতা-নন্দন।
যজ্ঞানল জ্বালি পুনঃ হলে প্রয়োজন
তক্ষকে আহুতি দিতে পারিবে যে জন
ভীষণ শপথ নিয়া নির্ভীক হৃদয়ে ;
বসে আছি তারি লাগি—শ্রদ্ধা দিতে নবাগত সেই জন্মেজয়ে॥

রঘুনাথ ঘোষ

ওয়ার-কোয়ালিটি

১৯৪৯ সালের মহেঞ্জোদরো ইয়ারবুকের পাতা উল্টাইতেছিলাম। 'হু ইজ হু' পরিচ্ছেদে একটি পাতায় হঠাৎ নজর পড়িল :

"ডক্টর নরেশ ভদ্র। জন্ম ১৯০৫ সেপ্টেম্বর ; কুড়ুলহাটী, জেলা বর্ধমান, বাংলা। শিক্ষা—কুড়ুলহাটী হাই ইংলিশ স্কুল ; বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ; ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয়, উইসকন্‌সিন্‌। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডিগ্রী লইবার পর নানাপ্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ব্যবসায়িক কাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও অসীম কর্মপ্রেরণা তাঁহাকে গভীর অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি হইতে বিরত থাকিতে দেয় নাই। ইহারই ফল তাঁহার ডক্টরেট ডিগ্রী। যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে জর্নালিজ্‌ম ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কলা সম্বন্ধে যে জাতীয় গবেষণাগার খোলা হইয়াছে, তিনি তাহার অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।"

আমাদের সেই নরেশ ভদ্র। আজকালকার দুনিয়ার কিছুই খবর রাখি না। তিন বৎসর হইতে আজ পাড়াগাঁয়ে আছি। তবুও ইয়ার বুক দেখিয়া আপটুডেট থাকিবার চেষ্টা করি। সেই মেসের রুমমেট নরেশ ভদ্র। ভাগ্যিস সে ভদ্র, তাইতো মনে পড়িল। একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া দেখিয়াছিলাম আমার ধোপদস্ত বিছানার চাদরের কোণ দিয়ে ডিজ লণ্ঠনের চিমনী মুছিতেছে। ভদ্র না হইলে কি আর কেহ অপরের অসাক্ষাতে, তাহার চাদরের নিচের দিক দিয়া লণ্ঠনের কাচ মোছে ; চাদরের উপরের পিঠ দিয়া মোছা যে যায় না, তাহা তো নয়।

সেই নরেশ। বড়ই সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছে ইয়ারবুকে। আরও বড় করিয়া লেখা উচিত ছিল। অত বড় একজন মনস্বী লোকের জীবনী ; এই দুই কথায় সারিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের সময় না হয় কাগজের অভাব ছিল। এখন তো আর তা নয়।

সারা দিন পান আর শুপ্তি চিবাইত। প্রায় টেব্‌ল্‌ টেনিসের ব্যাটের মতন চওড়া চিবুকটিতে, দু'কষ বহিয়া পানের রস গড়াইয়া পড়িত। আমরা তাহাকে বলিতাম অভদ্র।

ব্যবসায়ে ঝোঁক তাহার ছোটবেলা হইতেই। বহুদিন আগের কথা। পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা হইতে দুই পয়সা হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছে। নরেশ তাহার পূজার পার্বণীর সঞ্চয় সাড়ে চার আনা দিয়া পোস্টকার্ড কিনিয়া রাখিয়াছিল—পরে দাম বাড়িলে বেশি দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া।

বারকয়েক বি. এস. সি ফেল করিবার পর সে পড়া ছাড়িয়া দেয়। কোন্‌ বিষয়ে পাস করিত জানি না ; কিন্তু প্রতিবার পরীক্ষার পর বলিত 'প্র্যাক্টিকাল' খারাপ হইয়া গিয়াছে, বোধহয় পাস করিতে পারিব না।

মেসে আমার ঘরে থাকিয়াই সে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে। বলিয়াছিল সায়েন্সের স্টুডেন্ট, সায়েন্সের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন ব্যবসা করা আমার দ্বারা পোষাইবে না।

কত রকমের ব্যবসা তাহাকে করিতে দেখিলাম। ধোপার কালি, স্নো, ক্রীম, জুতোর কালি, গন্ধ তেল, আরও কত কি মনে পড়িতেছে না। কোনোটাই পোষাইল না। কিছুদিন ধরিয়া এক একটি জিনিসের ব্যবসা চলে। তাহার পর দেখি নরেশ দুই দিন বিছানায় পড়িয়া থাকে। খায়ও না দায়ও না। কাহারও সহিত কথাও বলে না। তাহার পর হয়ত শুনি ধোপার কালিটি চলিতেছে না। তিন শ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে। ধোপা এবং লণ্ড্রি গুলি নাকি বড় বড় মাড়োয়ারীদের কাছে বাঁধা;—না হইলে কি বলিলেই হইল যে, তাহার ধোপার কালি দিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। বের করুক না দেখি, এ রকম ভায়লেট রং। গরীব লোকের ব্যবসা করিবার দিন আর নাই! বাড়িতে আছে তো সবাই। কিন্তু বাবা ব্যবসায় টাকা দিতে চান না।...আরও কত কি কথা সে পৃথিবী শুদ্ধ লোকের উপর বিরূপ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিত। বুঝিতাম সে এইবার টাকা চাহিবে। বলিবে পৃথিবীতে যদি লোক থাকে, বন্ধু থাকে, তাহা হইলে সে আমি।

বেশি কথা বাড়াইতে না দিয়া, নিজের চা জলখাবার বন্ধ করিয়া ভদ্রককে কিছু দিই। সে তাহাতেই খুশি। আবার কিছুকাল চলে অন্য জিনিসের ব্যবসা।

কাগজ পত্র, গঁদের শিশি, ব্যুরেট, কাঁচি, ওষুধের বোতল, লিট্‌মাস্ পেপার, ষ্টোভ, আর মেজার গ্লাসে ঘর ভরিয়া উঠে। স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে বসিয়া সে দিনরাত পানের পিচ ফেলে, আর একখানি মোটা নীল মলাটের ইংরাজী বই হইতে ফর্মুলা দেখিয়া নূতন উদ্যমে নূতন জিনিস তৈরী করিতে বসে। বিজ্ঞানের কিছু বুঝিতাম না। ভাবিতাম হয়ত বা এডিসন কি কুরীর মত একটা কিছু করিয়াও ফেলিতে পারে। তখন হয়ত ভদ্রক আমারই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারিব। কতবার আমার এই সুপ্ত বাসনা সফল হইতে হইতে একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

'মনকুসুম' সুগন্ধী তেলটি বাজারে বাহির করিবার পর তাহার কি আনন্দ, কি উৎসাহ। বিস্রস্তকেশা সুন্দরীর ছবি সমন্বিত শিশিটি হইতে সবুজ চট্‌চটে তেল, স্নানের আগে আমার হাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিল। বলিল, এতেই হবে। এ তেল বেশির দরকার হয় না। ফাইন গন্ধটা! না?

বলিলাম, হাঁ। আর দিস্ না। বালিসের ওয়াড়ে সবুজ রং হয়ে যাবে।

সে দেখি দুঃখিত হইল।

বলিল কখনই না। কে বললে পাকা রং!

ছুটীর দিন। খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়াইব মনে করিলাম। নোংরা ঘরে ময়দার লেই-এর বাটিতে দিনরাত মাছি ভন ভন করিত। মাছির ভয়ে মশারীটি ফেলিয়া শুইব মনে করিতেছি। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ঘরে একটিও মাছি নাই। লেই-এর বাটির পাশেই বিরাট কাঁচের বোতলটিতে, ফিল্টার কাগজযুক্ত কাঁচের ফানেল হইতে, টপ্ টপ্ করিয়া সবুজ তেল পড়িতেছে।

সেদিন, শুইবার পর মুখে একটিও মাছি বসে নাই। রাতে ঘরে একটিও মশা ছিল না।

'মনকুসুম' তেল সুকেশা রমনীদের মনঃপূত হয় নাই নিশ্চয়ই—কেন না তাহা বাজারে চলিল না।

কিছুদিন পরে ভয়ে ভয়ে, নেহাৎ সঙ্কোচের সহিত ভদ্রককে 'মনকুসুমের' মশামাছি বিতাড়নী ক্ষমতার কথা বলিয়াছিলাম। নোবেল হঠাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এবার হয়ত ভদ্রকের কপাল খুলিল।

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ শিশিতেই নূতন লেবেল আঁটিয়াছিল।

কিন্তু প্রতিবার যেরূপ হইয়া আসিতেছিল, এবারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। বাজার জিনিস না লইলে বৈজ্ঞানিক কি করিতে পারে?

এইরূপই চলিয়া আসিতেছিল।

যুদ্ধ লাগিবার বছর তিনেক পরের কথা। সকলেই রাতারাতি বড়লোক হইয়া যাইতেছে। "ভদ্রক-স্নো" মাখিবার পর মুখে এক পোঁচ ময়দা গোলা লাগিয়া থাকিলেও তাহা বাজারে পড়িয়া থাকিতে পায় নাই। ভদ্রক ইহা হইতেই কিছু টাকা পাইয়াছিল। বেশি আর কি! তবে তাহার পুঁজির অনুপাতে মন্দ রোজগার সে করে নাই।

আমি তাহাকে বিজ্ঞানের পথের রোজগার ছাড়িয়া অন্তরূপ ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জনের কথা বলি। মাড়োয়ারীদেব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, বুঝাইয়া শুঝাইয়া, বকিয়া ঝকিয়া, তাহাকে অন্ত ব্যবসা করিতে সম্মত করাই। তাহাকে দেখাইয়া দিই যে, সেসময় জিনিসের দাম বাড়িতেছে। চড়তি দাম—যাহা কেবল ফুলিয়া ফলিয়া উঠিবে। সে একদিন দেখি একগাড়ি কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটে কিনিয়া আনিয়াছে। আমারই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ঘরে শুইবার স্থানের সঙ্কুলান কঠিন হইয়া উঠে। ভদ্রক বলে যে চিঠির প্যাড তৈয়ারী করিবে। তাহাতে নাকি অনেক লাভ।

তাহার কথা ভাবিয়া নিজের অসুবিধার কথা ভুলি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখি যে তাহার বৈজ্ঞানিক মন প্যাড তৈয়ারীর মত মাড়োয়ারী ব্যবসার উপর বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। বুঝাইতে গেলে জবাব দেয়, সায়েন্স শিখেছিলাম, কিসের জন্যে?

হঠাৎ দেখিলাম কয়েক পিপা কডলিভার তেল কিনিয়া আনিয়াছে। বলিল, খুব সস্তা পেলাম।

বলিলাম, কিছুদিন চেপে রেখে, তারপর ঝেড়ে দে।

সে হাসিতে লাগিল। ভাবিলাম তাহারও ঐ মত। কিছুদিন পরে দেখি, সে আবার অসময়ে শুইয়া পড়িয়াছে। একদিন খাইল না, কাহারও সহিত কথাও বলিল না।

দুই দিন পরে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, বড্ড ঠকে গিয়েছি। শালা আমেরিকানরা জোচ্চোর।

পরে সব শুনিলাম। আমেরিকান গ্যালন নাকি ব্রিটিশ-গ্যালন অপেক্ষা পরিমাণে কম। সে গ্যালনের দাম শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে, দাঁওয়ে কডলিভার তেল পাইয়াছে। বিক্রয়ের সময় দেখে যে খরিদদাররা ব্রিটিশ গ্যালনের হিসাব না হইলে কেনে না। বাজার দর বলিতে ব্রিটিশ গ্যালনের দরই বুঝায়। বেচারী প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়িয়াছে।

আবার এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাহার মাথায় খেলে। আমিই আবার কিছু টাকা দিই। কডলিভার তেলের সহিত চন্দনের তেল মিলাইয়া, সে একটি তেল বাজারে বাহির করিবে।

নাম হইবে "আন্ট্রা ভায়লেট অয়েল"। ছেলে বুড়ো সকলকে মাখিয়া একঘণ্টা রৌদ্রে বসিতে হইবে মাত্র। তাহার পরই নূতন ভারতের নূতন মানব জয়যাত্রার পথে দৌড়াইবে। কেহই আর তাহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। বৃদ্ধ লুপ্তযৌবন ফিরিয়া পাইবে। রিকেটি শিশু দাদামশায়ের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিবে,—গ্ল্যাক্সোবালক তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পালাইবে। হ্যাণ্ডবিল, বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, চিঠিতে দেশ ছাইয়া যাইবে।

আন্ট্রা ভায়লেট তেল বাহির হইল। অর্থের অভাব বিজ্ঞাপন কি করিয়া দেওয়া যাইবে। দৈনিক কাগজগুলিও আবার যুদ্ধের বাজারে বিজ্ঞাপনের দর লইয়া এমন নীচতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাদের নিকটে যাওয়া শক্ত। সম্বলের মধ্যে প্যাড তৈয়ারী করিবার কাগজগুলি। তাহা বিক্রয় করিয়া বিজ্ঞাপনের খরচ চলিতে পারে।

আমিই তাহা করিতে বারণ করি। টাকা ধার করিয়া তাহাকে দিই—ঐ কাগজগুলিতে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইতে।

তাহার পর কিছুদিন চলে হ্যাণ্ডবিল ছাপানো ও ডাকে সারাভারতের নানা স্থানে পাঠানোর কাজ। দিন নাই, রাত নাই, কেবল পার্সেল, প্যাকেট, ডাকটিকিট, আর গঁদের আঠার সমারোহ।

ফলাফলের জন্য মাস দুয়েক অপেক্ষা করি। সুপ্ত ভারতের কোনো স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। হইল কি? একশো হ্যাণ্ডবিলের মধ্যে একটিও যদি লোকে পড়িত, তাহা হইলে চিঠির বোঝায় আমার ঘর ভরিয়া ওঠা উচিত ছিল। না কিনুক, কিন্তু ওষুধের অভাবের বাজারে, লোকে জিজ্ঞাসা কবিবার জন্যও তো চিঠি লিখিত। খোঁজ লইবার জন্যও তো লোক আসিত। আসার মধ্যে তো এক দেখি, প্রেসের আরদালী আসে বাকি পয়সার তাগাদা করিতে, আর মেসের লেসী আসে অনুযোগ করিতে।

ভদ্রকের সন্ধানী মন হতাশা অপেক্ষা, কৌতূহলেই বেশি ভরিয়া উঠে।

হঠাৎ একদিন দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এতদিনে বুঝলাম। লোকাল ট্রেনে দুটো ছেলে গাড়িতে উঠতে পারছিলো না। ট্রেন ছেড়ে দিল। উঠতে আর পারে না। দৌড়ে হাতল ধরলো। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে টড়ে না যায়, এই ভেবে তাদের হাত থেকে খাতা বইগুলো জানালা দিয়ে নিলাম। হাতে নিয়ে দেখি, দুজনেরই রাফখাতা আমার হ্যাণ্ডবিলগুলো দিয়ে তৈরী। হ্যাণ্ডবিলের এক পিঠ সাদা ছিল। যুদ্ধের বাজারে এক পিঠ সাদা হ্যাণ্ডবিল কি আর লোকে বিলোয়। সকলে বাড়ির ছেলেদের খাতা তৈয়ের করে দিয়েছে।...তুই প'ড়েছিলি হ্যাণ্ডবিলটা? অপ্রস্তুত হইয়া জবাব দিই, না ঠিক পড়িনি। তবে তুইতো অনেকদিন পড়ে শুনিয়েছিস।

যাক, তাহলে ও হ্যাণ্ডবিল আমি ছাড়া আর কেউই পড়েনি—প্রেসের কম্পোজিটার-টাও বোধ হয় না।

তাহার পর ভদ্রক ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

বছর দুয়েক পর দেখা। বলিল, ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি—সায়েন্স-টায়েন্স সব।

কি করছিস এখন?

জবাব দিল, ডক্টর ভদ্র, ডক্টর ভদ্র হে এখন আমি। সুট পরা দেখিয়া বুঝিতে পাবি

নাই। যুদ্ধের সময় খাঁকীর স্যুট তো সকলেই পরিতে শিখিয়াছে। এখন বুঝিলাম যে সে হোমিওপ্যাথী ডাক্তার হইয়াছে।—বোধহয় নিজের গ্রামে প্র্যাক্টিস করিতেছে।

সে নিজেই ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া দিল—থিসিস্ দিয়ে ডক্টরেট—আমেরিকার।

অনেক গল্প-সল্প হইল। কথায় কথায় জানিলাম তাহার থিসিসের বিষয় "যুদ্ধকালীন এক পিঠে লেখা ইস্তেহার"। আরও শুনিলাম, ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয় নাকি পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের স্নাতকোত্তর গবেষণার একমাত্র স্থান। নিজের অজ্ঞতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। পৃথিবীর একমাত্র ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনকে আমার সম্মুখে পাইয়া, ঐ বিদ্যাপীঠের উপর শ্রদ্ধায় আমাব মন ভরিয়া উঠিল।...

ইয়ারবুকে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিবার বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিব মনে করিতেছি।

সতীনাথ ভাদুড়ী

ভাইয়ের মুখ

[মহম্মদ আলি আজম আমেরিকা প্রবাসী ভারতীব মুসলমান। আমেরিকায় প্লাসটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি বহু সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভারতের হিন্দু মুসলমানের সৌভ্রাত্র প্রচারের উদ্দেশে তৎকালীন 'এশিয়া' পত্রিকায় তিনি নিচের লেখাটি প্রকাশ করেন। মহম্মদ আলি বর্তমানে কর্মস্থল কালিফোর্নিয়ায়। —সম্পাদক]

ভারতের কোন সুদূর গ্রাম প্রান্তে এক মোল্লা পরিবারে আমার জন্ম। আমার ঠাকুরদা ও তাঁর বাবা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মোল্লা হিসাবে আমাদের সম্প্রদায়ে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। ঠাকুবদার বাবা হজ গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামখানি সম্পূর্ণভাবে মুসলমান-অধ্যুষিত। বলতে গেলে, সমস্ত এলাকার অধিবাসীরাই মুসলিম। সব চাইতে কাছে যে হিন্দু পরিবার ছিল, আমাদের বাড়ি থেকে তার দূরত্ব এক মাইল। আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য, তার সামাজিক পরিবেশ আর আমার ছেলেবেলার শিক্ষা—সব কিছু যেন আমায় গোঁড়া মুসলমান তৈরী করার এক ষড়যন্ত্র। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তাম, কোরান আবৃত্তি করতে হোত প্রত্যেকদিন ভোরে, রমজান মাসে রোজা করতে হোত—সত্যিসত্যিই পুরো নিষ্ঠা আর আনুগত্য নিয়ে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলতাম। আমার দাদামশায়, মা আব কাকাদের ধর্মে অত্যন্ত মতি ছিল। সপ্তাহে একবার করে হিন্দু নাপিত আর ধোপানী আসত আমাদের বাড়িতে। বৎসরান্তে তাদের কাজের মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হোত। আমার যখন প্রায় বারো বছর, ধোপানীর বয়স তখন পঞ্চাশ; সে আমায় 'বর' বলে ডাকত; তখন আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, কেন আমায় ওকথা বলে। কিন্তু বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হইনি কোনদিনও: খালি একটু হেসে পালিয়ে যেতাম। আমাদের পরিবারের প্রতি নাপিতের বেশ শ্রদ্ধা ছিল।

আমার বিশ্বাস, আমাদের মাথার ওপর বিশেষ নজর ছিল তার, কারণ পাইকারী হারে একটাকায় সে প্রায় ডজন দুয়েক মাথার চুল ছাঁটত। হিন্দুদের মধ্যে নাপিত আর ধোপানীই আমার প্রথম পরিচিত লোক। ওরা অচ্ছুৎ, এ কথা কেউ কোনদিনও আমায় শেখায়নি। নাপিত তো সব সময়ই আমায় ছুঁয়েছে—আমার হাত ছুঁয়েছে, এমনকি আলতোভাবে আমার কান পর্যন্ত ছুঁয়েছে। ধোপানী আরও এগুতো—আমাদের কাল্পনিক বৈবাহিক সম্বন্ধ নিয়ে হাসি ঠাট্টার মাত্রা বেড়েই চলত সমানে। মাঝে মাঝে তাদের মুড়ি চিঁড়ে ইত্যাদি খেতে দিতাম। তাদের খাবার সময় ঘর ছেড়ে চলে আসার কথা ছিল আমাদের, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে টুক করে ঢুকে পড়ে নাপিতের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম, এতটুকুও আপত্তি করত না সে। দেখতাম, গপ্ গপ্ করে সে গিলত, আর চোখ দুটো চক্ চক্ করত তৃপ্তিতে। খড়ের চাল, আর ছেঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যের ছিটে ফোঁটা আলোয়—সেই আলোয় প্রথম চোখে পড়ল আমার ভাইয়ের মুখ।

বছরে দু'বার ঈদ্ উৎসবে গো কোরবানী করতাম, বিরাট ভোজ হোত, মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধরে চলত এই ভোজ। গরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও যে আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মনে এতে আঘাত লাগতে পারে, সে কথা কোনদিনও আমাদের মনে হয়নি। উৎসবের মাঝে, বিশেষ করে চন্দ্রালোকিত রাতে দূর গ্রামগুলি থেকে কিছু কিছু হিন্দু ছেলে মেয়ে মজা দেখতে আসত। এদের মধ্যে একজন আমার খুব প্রিয় ছিল, প্রাথমিক স্কুলে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রায় সমবয়সী ছিলাম আমরা, কিন্তু আমার চাইতে এক ক্লাশ নিচুতে পড়ত সে। অদ্ভুত, এমন কি উদ্ভটও শোনাতে পারে, আমরা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। আমাদের দু'জনের মা বাবাও এই বন্ধুত্বের কথা জানতেন, এবং এ নিয়ে স্নেহার্দ্র কথাবার্তা বলতেন। আমাদের পরস্পরের ধর্ম কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। শৈশবের এই বন্ধুর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আনন্দ ও দুঃখের অংশ নিতে শিখি প্রথম তার সঙ্গেই। তার সুখ্যাতি আর ভালবাসা পাবার জন্য পড়াশুনায় আরও ভাল হবার চেষ্টা করতাম। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখতে পেতাম এক অবিমিশ্র গর্বে আমার ভাইয়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কতদিন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে একসাথে খেয়েছি, একদিনের জন্যও ভাবিনি কোন অধর্ম করছি আমরা। বরঞ্চ ইসলামের তাৎপর্য যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। ধর্মের বই পড়তে লাগলাম, মনকে সংযত করবার জন্য এবং সর্বত্যাগী ও প্রেমময় জীবনের জন্য নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশে কঠিন আচার পালন করতে লাগলাম। আমার স্বাভাবিক কাজকর্ম এতটুকুও ব্যাহত হয়নি এতে, অন্যদের মনেও আমার সম্বন্ধে কোন বিস্ময়ের উদ্রেক করেনি।

প্রাথমিক স্কুলে, পরে হাই স্কুল ও কলেজে অনেক হিন্দু ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু তাদের কারও সঙ্গে কখনও ঝগড়া করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। হিন্দু শিক্ষক ও হিন্দু সতীর্থদের এক অদ্ভুত আনন্দময় স্মৃতিতে আমার সমস্ত হৃদয় শুধু ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে বরঞ্চ কোন হিন্দু শিক্ষকদের আমার প্রতি পক্ষপাত একটু বেশি বলেই মনে হোত। একবার শুধু একজন শিক্ষককে আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল। আমার এক সতীর্থ এক সাপ্তাহিক পরীক্ষায় হুবহু আমার উত্তর টুকে আমার চাইতে বেশি নম্বর পেয়ে গেল। এটাকে যদি পক্ষপাতিত্ব বলিও, তাহলেও সেটা হিন্দু ছেলে বলে করা হয়নি। আর একবার

এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অত্যন্ত অসতর্ক হয়ে প্রকাশ করে ফেললেন যে, আমার খাতা সকলের চাইতে অনেক বেশি শক্ত করে পরীক্ষা করা হয়েছে, তা না হলে, যে হিন্দু ছেলেটি সেদিন প্রথম হয়েছিল, আমার অর্ধেক নম্বরও সে পেত না। একজন গোঁড়া হিন্দু অধ্যাপকের কাছ থেকে একজন মুস্লিম ছাত্র সম্বন্ধে এর চাইতে ভাল প্রশংসা আর হতে পারে কি? ক্লাশ ছেড়ে যাবার সময় আমার দিকে তাকালেন না তিনি, কিন্তু আমি জানি, এক পবিত্র হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—হ্যাঁ, আমাব ভাইয়ের মুখের এ হাসি একটুকুও নজর এড়ায়নি।

কলেজের স্মৃতি

ঐ কলেজে আর একজন হিন্দু অধ্যাপক ছিলেন—বুড়ো, কথা বলতেন খুব কম; ঠিক প্রায় তাঁরই মত তাঁর এক মুসলমান বন্ধু ছিল। কাছাকাছিই থাকতেন তাঁরা। হিন্দু অধ্যাপক তাঁর মুসলমান বন্ধুটিকে বলতেন, ‘চল সাহেব, বেড়িয়ে আসি।’ মুসলমান বন্ধুটিও সানন্দে রাজী হতেন—প্রায় মাইল ছয়েক তাঁরা বেড়িয়ে আসতেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বলতেন না, পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁরা, প্রতিটি ছাত্রই তাঁদের মুখে বন্ধুত্বের অভ্রান্ত স্বাক্ষর পড়তে পেতো, বয়সেব সঙ্গে কোমল হয়ে উঠেছে সে বন্ধুত্ব। অধ্যাপকটি সামনা সামনি কোন ছাত্রের প্রশংসা করতেন না। আমার পরীক্ষার ফল যখনই তাঁর আশানুরূপ না হোত, তিনি আমাকে এই বিশেষ কয়টি কথা বলে ধমকাতেন, ‘যদি ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ না করতে পার, আমি কোন সাহায্য তোমায় করতে পারবো না।’ একদিন ক্লাসে যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল আমার। কি খাতাপত্র ছেলেদের মধ্যে বিলি করছিলেন তিনি, আমায় না দেখতে পেয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সেই চালাক ছেলেটি কই, সেই যে—’ চারদিকে তাকাতে লাগলেন তিনি; ঠিক তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে তাঁর করুণ অবস্থা উপভোগ করতে দেখে কী ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলেন তিনি। প্রাথমিক স্কুল, হাই স্কুল এবং কলেজে—সব জায়গায়ই মুসলমান ছাত্রদের চাইতে হিন্দু ছাত্ররা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান এবং ভাল দেখতে। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরা বেশী অবস্থাপন্ন, তাই তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নততর। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান সমান, কিন্তু শিক্ষালাভের প্রচেষ্টায় সাধারণ হিন্দুর ধৈর্য অনেক বেশী। এ রকম হাজার উদাহরণ আছে যে স্কুল জীবনে একজন তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু ছেলে তার পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল, আর তারই কোন মুসলিম সতীর্থ যে তাকে প্রথম জীবনে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভাবে অপরিচয়ের কোন অতলে মিলিয়ে গেল। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সত্যিকারের দান হিন্দুদের অনেক বেশী। একেবারে সম্পূর্ণ মুসলমান ছাত্রদেব নিয়ে কোন স্কুল আমি দেখিনি। কোন কোন স্কুলে মুসলমান ছাত্ররা হয়ত সংখ্যায় বেশী, আবার কোন কোন স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা বেশী। শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন (কয়েকজন ইংরেজ শিক্ষকও ছিলেন)। আমাদের ক্লাসে মাঝে মাঝে হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, কিন্তু একটুকুও তিক্ততার সৃষ্টি হত না এতে। ছাত্রদের অভ্যাস অনুযায়ী মাঝে মাঝে আমরা শিক্ষকদের সমালোচনা করতাম, এমন

কি আমাদের অপ্রিয় যে সমস্ত শিক্ষক ছিলেন তাঁদের ক্লাসে ক্রমাগত মেঝেয় জুতো দিয়ে ঘষতাম। শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে ধর্মের কোন প্রশ্নই উঠত না। তবুও এ সব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল। পরাজয়মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক এই সমস্ত ব্যাপারের সুবিধা নিত, এবং নিজেদের অক্ষমতাকে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সাম্প্র-দায়িকভাবে ব্যাখ্যা করত। কিন্তু এ রকম ঘটনাও কদাচিৎ ঘটত। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের পোষাক সাধারণত সব সময়েই প্রায় ভিন্ন। আবার স্কুল ও কলেজ জীবনে আমি খাঁটি মুসলমানী পোষাক পরেছি। হিন্দু পোষাকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে অস্বীকার করেছি আমি। বিছানার কোন দিকে মাথা রাখব, কি ধরনে প্রসাধন কোরবো ইত্যাদি তুচ্ছ খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও খাঁটি মুসলমানী আচার-ব্যবহারই আমি পছন্দ করেছি। সোজাসুজি বা ইঙ্গিত করেও কোন হিন্দু কোনদিন তাদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেনি আমায়। কোনদিনও ভাবিনি যে আমার মুসলমানী পোষাক আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার সমাদরের পক্ষে ক্ষতিকর। মনে আছে, একবার আমার এক বন্ধুর তার পছন্দমত কোন একটা রেস্তোর‍াঁয় আমাকে খাওয়াবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমার পোষাক, বিশেষ করে আমার ফেজ টুপীর জন্য একটু দ্বিধা করছিল—কিন্তু আমায় তা বলল না। ইয়ার্কি করে সে ফেজটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় পড়ল, তারপর আমার সাথে বেশ উৎসাহজনক এক আলোচনা জুড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ফেজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে যাচ্ছিল এমন সময় আমি ফেজটা চেয়ে বসলাম ; না দিয়ে পারল না সে। টুপীটা মাথায় পরতে পরতে তাকে বললাম, ‘জানি ওরা সবাই হিন্দু , কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে ওদের শ্রদ্ধা পাবার চাইতে আমি যা, তাই থেকে তাদের ঘৃণাই পেতে চাই।’ আমার মাথায় ফেজ সত্বেও বেশ আনন্দেই কাটল রেস্তর‍াঁয়।

একবার আমাদের টেস্ট পরীক্ষার আগে আমাদের এক হিন্দু অধ্যাপকের স্ত্রী মারা গেলেন। ক্লাশে খবর পেয়েই অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের আসার খবর পেয়ে অধ্যাপক বেরিয়ে এলেন—কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। ‘ওকে রাখতে পারলাম না’ বলেই আমাকে ছোট ছেলের মত তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। স্বভাবতই অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি, অন্যেরাও তাই। অনেক হিন্দু ছাত্রই সমবেদনা জানাতে এসেছিল, কিন্তু একজন মুসলমান ছাত্রের ঘাড়েই তাঁর দুঃখের কিছুটা বোঝা তিনি লাঘব করতে চাইলেন।

ফিরে এলাম আমি ; দেশে চলে যাবার আগে সান্ত্বনা জানিয়ে তাঁকে একটা চিঠি দিলাম। সে চিঠির যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তা কখনই ভুলব না।

‘প্রিয় বন্ধু,

প্রায় অসম্ভবকে সাধন করতে অনুরোধ করছো তুমি। জানোনা কি, কতটুকু শক্তি আর আমার আছে ? তবু তোমার ইচ্ছাকেই মেনে চলব। তুমিই আমার পথপ্রদর্শক। তোমার ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছি, তুমি শহরে নেই, নইলে একটু শান্তি, একটু সান্ত্বনার জন্য তোমার কাছে ছুটে যেতাম আমি। বলতে পারবো না, কতবার তোমার চিঠি পড়ে কেঁদেছি আমি। স্বর্গীয় সে চিঠি—কিন্তু তোমার আদেশ ভারী নির্মম।’

বিদেশীর কানে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাবে হয়ত। যদি অন্য কারও চিঠি হোত, আমার

ভাইয়ের মুখমণ্ডলে অশ্রুধারা যদি না দেখতাম আমি, তাহলে হয়ত ব্যাপারটা মাত্রাতিরিক্ত বলেই ধরতাম।

বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা

বছরের পর বছর কেটে গেল, আর আমিও আমার ধর্মের মর্ম আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করে নিজেকে আরও বেশি করে মুসলমান বলে ভাবতে লাগলাম। কোরাণ বলে, ধর্মে জবরদস্তি নেই; তাই ধর্ম-অভিযানকে ঘৃণা করতাম আমি। কোরাণের অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, চিরকালই প্রতিটি জাতির কাছে ভগবানের দূত প্রেরিত হয়েছে। তাই আমার বিশ্বাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি ভারতের মহাঋষিরা ভগবানের দূত ছিলেন। হিন্দু-শাস্ত্র, গীতা ও স্তোত্রাদি পড়েছি আমি। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, মনুসংহিতা, বেদান্ত-দর্শন, রামকৃষ্ণ-উপদেশামৃত পড়ে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করেছি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমার নিজের ধর্ম ইসলাম পরিপূর্ণভাবে আমার ঐহিক, মানসিক ও পারলৌকিক আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে, মুহূর্তের জন্যও ধর্মান্তরের কোন প্রয়োজন আমি অনুভব করব না। আমার নিজের মা এবং আমার নিজের দেশের মতই আমার ধর্মকে ভালবাসি আমি এবং তাদের কারও পরিবর্তন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। একটা জিনিষ কিন্তু আমি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তীব্রভাবে অনুভব করেছি; তা হচ্ছে, যতই আমি আমার ধর্মকে ভালবেসেছি এবং খাঁটি মন নিয়ে তাকে অনুসরণ করেছি ততই আমি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সহিষ্ণু হতে পেরেছি। বিনীত ও ভক্তিপরায়ণ ছেলেরই শুধু অন্যের মা-বাবাকে সম্মান করার জ্ঞান ও অধিকার থাকে।

স্থানীয় একটা স্টিমারে করে একদিন আমি গঙ্গা পার হচ্ছিলাম। ডেকে তৃতীয় শ্রেণীতে আমার বিছানায় বসে মনোযোগ দিয়ে জনৈক প্রাচীন হিন্দু ঋষির লেখা পড়ছিলাম, অত্যন্ত হাস্যকর রূপে ঋষিটি বলেছেন যে মেয়েমানুষের আত্মা নেই, তারা দুর্বল ইত্যাদি। আনন্দিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ঐ স্টিমারেরই ডেকে একজন হিন্দু সন্ন্যাসিনী রয়েছেন। আমার পরনে মুসলমান পোষাক, তবুও তাঁর কাছে গিয়ে যে প্রশ্নটি আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সোজাসুজি কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে সেই প্রশ্নটি তাঁকে করলাম, 'নারী হিসাবে স্বভাবতই কি আপনি দুর্বল এবং সেই কারণেই কি আপনার পারমার্থিক প্রতিবন্ধকতা আছে?' একটু হেসে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে তিনি উত্তর দিলেন, 'পারমার্থিক হিসেবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন দৈহিক প্রভেদ নেই। পারমার্থিকভাবে আপনি আমার চাইতে যদি দুর্বল হন, তাহলে আপনিই নারী। এটা কোন কথা নয় যে, নারী দুর্বল; যে দুর্বল সেই নারী।' কয়েকটি কথায় এত সংক্ষেপে গভীর অর্থবোধক এই রকম স্পষ্ট উত্তর আমি এর আগে আর কখনও শুনিনি। যত যোগী দেখেছি এ পর্যন্ত তার মধ্যে তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী! প্রমাণ? প্রমাণ হচ্ছে তাঁর মুখ, তাঁর চোখ, তাঁর হাসি—এগুলো স্বর্গীয় বলে চিনে নিতে কখনও ভুল হবে না।

আর একবার এক বর্ষীয়সী হিন্দু মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি আমায় আরও তিনটি আমারই বয়সী হিন্দু যুবকের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা হোল, কিন্তু বুঝব কেমন করে যে তিনি

এত অভিভূত হয়ে পড়বেন। অন্যেরা সবাই চলে গেলে তিনি আমায় আরও একটু থাকতে বললেন। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীর অন্দর মহল, ঠাকুরঘর ইত্যাদি দেখাতে চাইলেন, এই ঠাকুরঘরে কোন মুসলমান সাধারণত ঢুকতে পায় না। তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য, পায়ের জুতো জোড়া খুলে নিয়ে এই গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর চারদিকে ঘুরলাম। বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও ঘুরলো আমার সঙ্গে। পরে একদিন এক সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম ; তিনি এক প্লেট মিষ্টি আমার সামনে রেখে বললেন, 'যখন থেকে তোমায় দেখেছি আমি, মনে হয়েছে তুমি যেন আমার ছেলে, তোমরা মুসলমানরা তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করোনা, সুতরাং এর কি কারণ আমি দেখাতে পারি ? আগের জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে ছিলে।' কি রকম মনের ভাব হতে পারে এতে ? এই অপরিচিতাকে মা ছাড়া আর কিছু বলে আমি কল্পনা করতে পারলাম না। তাঁর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও স্নেহের অধিকারেই আমার মা হলেন তিনি।

বেকার সমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা

ভারতের বেকার সমস্যা এক সাংঘাতিক সমস্যা। হাজার হাজার ভারতীয় তরুণের মত আমাকেও এই অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে সাংঘাতিক সময় কাটাতে হয়েছে। আমার সামান্য পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেলে উপবাস ছাড়া আর উপায় রইল না। বন্ধুদের মধ্যে হাসিমুখ রাখতেই চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ টাকাটি যখন আমার পকেটে তখন সত্যিই আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বিজ্ঞাপনের উত্তর দেবার জন্য ডাকটিকিট কিনবার পয়সা বা ট্রামে বাসে চড়ে বিলাসিতা করার পয়সা আমার নেই। আমার এই দুঃসহতম দারিদ্র্যে আমি আমার ধর্মের সুযোগ নিলাম, সরকারের সুনজরের জন্য আমার আবেদন-পত্রগুলিতে উল্লেখ করলাম, যে, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। আরও বেশী এগোলাম আমি। আবেদন-পত্রে উল্লেখ করলাম যে কোন সরকারী দপ্তরে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হিন্দু কর্মচারীদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়েছে ; একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি আমার দাবী উপস্থাপিত করলাম, বিদ্যাবুদ্ধির জোরে নয়, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জোরে। অবশ্য, এগুলি অস্তিত্ব রক্ষার যে সংগ্রাম তারই লক্ষণ—দারিদ্র্য ও অনাহারের পরিণতি যে অবনতি, তারই লক্ষণ। আমি জানতাম, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কাছে আমার যে আবেদন, তা আমার পরাজয় ও আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই স্বীকারোক্তি। কিন্তু মানুষ আমি, তার চাইতে বেশী কিছু নই। আমার ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলাম বলে আমি আনন্দিত ; কারণ মানুষই তো আমি, তার চাইতে খারাপ কিছু তো নই। যে সব হাজার হাজার হিন্দুমুসলমান তরুণ দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ণে হতাশার মধ্যে সাময়িক মুক্তি খোঁজে, তাদের সাম্প্রদায়িক রোগের লক্ষণগুলি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারি আমি এখন। সুতরাং যা ধর্মের কৃত নয়, তার জন্য তাকে অন্ধভাবে ও ভুল করে দোষারোপ করা হয়েছে এবং এইসব অনিষ্টকর ভেদ শক্তি গুলিকে খুঁজে বের না করে বৃথাই এই রোগ মুক্তির কামনা করা হয়েছে। এবার নিজের কথায় আসা যাক : কাজ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম আমি।

একরাত্রে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে শুতে গেলাম—ঘুম নেই চোখে। আমার শত শত আবেদন-পত্রের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি যেন আমি। পরদিন সকাল আটটায় কিছু

খাবার জন্য সবেমাত্র বেরোবার উপক্রম করছি ; মনে মনে একটা হিসাব করছি, সারাদিনের সম্বল চার আনা থেকে কয় পয়সা খরচ করতে পারি আমি, এমন সময় কে যেন আমার দরজায় আওয়াজ করল ; একজন গোঁড়া হিন্দু এবং একটি টেকনিকাল স্কুলের অধ্যক্ষ বলে পরিচয় দিলেন তিনি ; মাস ছয়েক আগে একটা চাকরীর জন্য আমি তাঁর কাছে আবেদন করি। এই স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম ; এবং আমি নিযুক্ত হবার আগে কোন মুসলমান শিক্ষক ছিল না। এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আমার একটা গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

হিন্দু মনিব

পরে বিভিন্ন হিন্দু মালিকের অধীনে বহু অস্থায়ী কাজ আমি নিয়েছিলাম। তাঁদের অধিকাংশই দয়ালু এবং ভদ্র। একজনকে শুধু আমি পছন্দ করতাম না। একটু রূঢ় ও বিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছিল তাকে। অবশ্য, তার যথেষ্ট কারণও আছে : বৃদ্ধ তিনি, শরীর ভেঙে পড়েছে, তার ওপর আবার এ পর্যন্ত কোন ছেলেপুলেও হয় নি। আর একজন বৃদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোক স্কুল কমিটির সভ্য নির্বাচনে আমাকে ভোট দেবেন বলে কথা দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা দেন না। যখন জানতে পারলাম আমি, সোজাসুজিই তাঁকে বললাম যে, যে-অন্যায় তিনি আমার ওপর করেছেন, তার চাইতেও হীন অন্যায় তিনি নিজের ওপর করেছেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'আপনার বয়স ও শিক্ষাকে যাতে আরও বেশী শ্রদ্ধা করতে পারি, সেজন্য আপনি আমায় সাহায্য করবেন বলে কামনা করি।' আহত হয়েছিলাম আমি, কিন্তু এটা যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি, কারণ মোটেই এটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়।

একবার তাড়াতাড়িতে আমার ব্যক্তিগত চিঠিতে 'সরকারী সার্ভিস স্ট্যাম্প' ব্যবহার করে ফেলি। চিঠিটা ডাকে ফেলার পরেই আমি পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে এ দামেরই ডাক টিকিট সহ একটা চিঠি লিখে পাঠাই। আমার হিন্দু মালিককে দেখে তাঁকে সব কথা খুলে বলি। উত্তরে তিনি বলেন, 'ভুল হয়ই, কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ হল এই ভুলের স্বীকারোক্তি ও তা শোধরাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। এই রকম ভুল আরও অনেক হবে। মনে রেখো—ভুল না করে কেউ কোন কিছু করতে পারেনি।' তাঁর কথায় কি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পেয়েছিল ?

একবার আমার এক হিন্দু মালিক অভিযোগ আনেন, আমার কাজে পূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়নি। ব্যাপারটি বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। আমার সাক্ষ্যের ওপর একজন নিম্নতন হিন্দু কর্মচারীর ভাগ্য নির্ভর করছিল। দোষের কিছুটা যদি আমি নিজের ঘাড়ে না নেই, তাহলে তার কিছু পরিমাণ নির্দোষিতাও প্রতিপন্ন করা যাবেনা। এ হলেও তার চাকরীটা শুধু বেঁচে যাবে। কোন রকম মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে ঘটনাটা এ রকম নতুনভাবে উপস্থাপিত করলাম যে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হল আর আমার কাজের একটু নিন্দা করা হোল শুধু। আমার বিশ্বাস, মালিক পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন আমার মন ; যতখানি গর্ব নিয়ে তিনি আমায় ভর্ৎসনা করলেন, ঠিক ততখানি গর্ব নিয়েই আমি সে ভর্ৎসনা মাথা পেতে নিলাম।

সমস্ত হিন্দুরাই দেবদূত, এই কি প্রতিপন্ন করতে চাইছি আমি? না, নিশ্চই নয়। সমস্ত মুসলমানরাও নয়। কিন্তু তারা উভয়েই মানুষ। তাঁদের মিলন, আত্মীয়তা ও সৌভ্রাত্রের পক্ষে এটাই হোল সব চাইতে জোরালো যুক্তি। আমাদের এই একই মাটি, একই পূর্বপুরুষ থেকে মূলত একই রকম উত্তরাধিকাব আমরা পেয়েছি। তবুও মারামারি কাটাকাটি করেছি আমরা। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত একটি মুসলমান ছেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুর ছোরার ঘায়ে প্রাণ দিয়েছে। তারা কেউ কাউকে জানতনা। বেশীদিনের কথা নয়, এক মুসলিম তরুণ কলকাতার এক বইয়ের দোকানে ঢুকে হিন্দু প্রকাশককে খুন করেছে, কারণ পয়গম্বর মহম্মদের ছবিয়ালা এক বই তিনি বিক্রি করেছিলেন। প্রায়ই মনে হয়েছে আমার, এই সব শহীদদের আত্মা ভারতের দুর্ভাগা মাটিতে ঘুরে বেরিয়ে যেন একই নালিশ জানায়—কোন হিন্দু বা মুসলমানের বিরুদ্ধে সে নালিশ নয়—সে নালিশ সেই সব সন্তানদের বিরুদ্ধে যাবা পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্যসমাজকে কলঙ্কিত করে। নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তুলবার জন্য হিন্দু বা মুসলমান হবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন্ কি তার ভাই অ্যাবেলকে হত্যা করেনি? জোসেফ কি তার অন্যান্য ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়নি? আমাদের এই পৃথিবীতে এই রকম ভ্রাতৃহত্যা ও নৃশংস ঘৃণার অজস্র উদাহরণ আছে—এবং এর কারণ শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে খুঁজে বের করা যাবে না, যদিও ছুতো হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের অবস্থা জার্মানীর মতই দুর্নীতিরই পরিণতি। একদিকে জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং আর একদিকে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শাসকশক্তি।

হিন্দুদের তথাকথিত দাবীর অনেক কিছুই আমি পছন্দ করিনা, সে রকম আবার অনেক কিছুই আছে যা মুসলমান হিসাবে আমি হিন্দুদের কাছ থেকে কখনই দাবী করতামনা। মুসলমানদের গোমাংস আহারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিবাদের এবং ঠিক নামাজের সময় মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার 'অধিকার' সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ মত পোষণ করি। তবুও মানুষ হিসাবে আমাদের মূল সুবিধাগুলি ত্যাগ না করেও আমাদের ভিন্ন মনোভাবকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি।

পারস্পরিক সংস্কৃতি-বোধ

আমাদের ঐসলামিক সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আমরা মুসলমানরা কি হিন্দুদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ নই? যে আরবী কোরাণ শতকরা নিরানব্বুই জন ভারতীয় মুসলমানের কাছে দুর্বোধ্য, এক হিন্দু অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষায় তা প্রথম অনুবাদ করেন; এই ভাষা সেই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথ্যভাষা। এই একই লেখক মূল আরবী থেকে 'মুসলমান পীরদের জীবনী' অনুবাদ করেন। উভয় কাজেই দারুণ শ্রম ও বছরের পর বছর ধরে অধ্যয়ন-নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু যে দীপবর্তিকা তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, আজও তা অনির্বাণ; সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে হাজার হাজার হিন্দু ভায়ের মুখ।

ভারতের শেষ মোঘল সম্রাট ঔরংজীব বা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার

মত অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক চরিত্রকে কোন কোন ইংরেজ লেখক অত্যন্ত নির্মম ও হৃদয়হীনভাবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু দুইজন প্রতিভাবান হিন্দু ইতিহাসকার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং স্যর যদুনাথ সরকার সমস্ত মূল তথ্য সংগ্রহ করে মুসলিম শাসকদের সমর্থনে নির্ভুলপ্রমাণসহ সমস্ত ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ইরানের মুসলিম কবি হাফিজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার নামে আর একজন হিন্দু কবি হাফিজের কবিতাবলী অনুবাদ করেন। অন্যদিকে হিন্দুর ধর্মসাহিত্য শুধু মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদেরই কুক্ষিগত ছিল। এই ব্রাহ্মণদের মতে নীচুজাতের হিন্দুদের গীতা, বেদ ইত্যাদি পড়াও পাপ বলে পরিগণিত হোত; মুসলমানদের নিষ্ঠা ও বদান্যতায়ই এই ধর্মসাহিত্য প্রথম জনসাধারণের ভাষায় অনূদিত হয়। এমন হিন্দু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যারা আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল বা দিল্লীর কুতুবমিনারের মত মুসলিম সংস্কৃতি, শিল্প বা সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে সম্মান দেবেনা। মুসলমানই সঙ্গীতের পথ প্রদর্শক, আজও আকবরের সভাসদ সঙ্গীতগুরু তানসেনের নামে সঙ্গীতপ্রিয় গোঁড়া হিন্দু শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। প্রায়ই বলা হয় মুসলমানরা সামরিক জাত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি ছাত্রই ভাল করে জানে যে রাজপুত ক্ষত্রিয়দের সমর কৌশল অদ্বিতীয়।

শ্রম-বিভাগ নীতির ভিত্তিতেই হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার সর্ব প্রথম উদ্ভব, ক্রমে তা সংকীর্ণ বিভেদে পর্যবসিত হয়। কোন বুদ্ধিমান হিন্দুই প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করেনা; কেননা এ রকম অনেক নিদর্শন আছে যে তাঁদের নিজেদেরই মুনিঋষিরা, এমন কি দেবদেবীরা পর্যন্ত অস্পৃশ্যতাকে অন্যায় বলেছেন। প্রায়ই আলোচনা হয়—হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু খৃস্টিয়ধর্মের ত্রয়ীর (Trinity) মতনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পরিণতি 'একমেবদ্বিতীয়ম্'-এ। ইসলামের 'তৌহিদের' মত 'অদ্বৈতবাদ' হিন্দু দর্শনের একটি বিশিষ্ট শাখা। এক মহাপ্রাণ মুসলিম দরবেশ স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হবার আনন্দে ঘোষণা করেছিলেন, 'আনল্ হক'—আমিই সত্য। একই ভাবে হিন্দুঋষির কণ্ঠেও উৎসারিত হয়েছিল,—'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমিই স্রষ্টা।

কেউ কাউকে জানতেন না তাঁরা, কেউ কারও নাম শোনেননি। যুগ যুগান্তরের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে। কিন্তু কত ঘনিষ্ঠ তাঁরা,—কারণ সমান করে, ভাই করেই যে তাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট কথা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বাধা প্রায় সব সময়েই দেখানো হয়ে থাকে তা হচ্ছে কৃত্রিম ও বাহ্যিক। ঠিক মত বিশ্লেষণ করলে ভ্রান্ত ধারণার পাতলা এক আবরণই শুধু চোখে পড়বে; একই মায়ের সন্তানদের মধ্যেও এ আবরণ থাকতে পারতো।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া নেই একথা অবশ্য আমি প্রমাণ করতে চাইনি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া আছে—অসীম লজ্জা ও কলঙ্কের কথা এটা। রুদ্ধ প্রেম ও পথভ্রষ্ট শক্তির দরুণ ভারতীয় জীবনের প্রচণ্ড অপচয় ঘটেছে। আমরা হিন্দু এবং মুসলমান প্রাচীন উত্তরাধিকারের গর্ব করি, কিন্তু সে উত্তরাধিকার প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল বর্তমানের সৃষ্টি করতে পারেনি। হিন্দুরা জেগে উঠেছে, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানেরই ঘুম ভাঙেনি এখনও।

মহম্মদ আলি আজম

সওয়াল

শীতের সকাল। মহকুমা শহর থেকে একটি ট্যাক্‌সি এসে অবনীমোহনকে ভোর ভোর খেয়াঘাটে পৌঁছে দিয়ে গেল। সঙ্গে দু-জন সহযাত্রী—তাদের সাধারণ বেশবাস আর শীতের পোশাকে সমৃদ্ধির চিহ্ন, পাকা বয়সের লোক প্রায় সবাই। দূরবিসারী শূন্য মাঠের শেষে তখন ঘোলাটে কুয়াশার মধ্যে ছাব্বিশে জানুয়ারীর সূর্য সবে উঠছে। উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল।

অবনীমোহন গাড়ী থেকে নেমে সামনে তাকালেন। কিসের যেন একটা অভাব অনুভব ক'রলেন। খেয়াঘাটের কাছে অপেক্ষমান ছোটখাট একটি ভিড় আশা করেছিলেন তিনি: গ্রামের কৌতূহলী কৃষক, কাচ্চাবাচ্চা, স্ত্রীলোক—যেমন বহু বছর ঠিক এমনি দিনে, এমনি সকালে দেখেছেন। তারপর খেয়া পেরিয়ে গিয়েছেন ওপারে গ্রামের পথে, সদলে। রাজার হাট। সেখানে পতাকা তুলেছেন—নিয়েছেন স্বাধীনতা দিবসের শপথ।

সামনে কিন্তু জন কয়েক মাত্র লোকের জটলা—অবনীমোহনের সহযাত্রী দুটির মতো কয়েকজন ভদ্রলোক। তাদের ভেতর থেকে একটি পুলিস অফিসার এগিয়ে এলো অবনীমোহনের দিকে—পেছনে জন তিনেক বন্দুকধারী সেপাই, আর কয়েকজন নীল কোর্তা পরা চৌকিদার।

পুলিস অফিসারটি হেসে নমস্কার ক'রলো। ব'ললো, চলুন তা হ'লে খেয়া পেরোই।

অবনীমোহন নীরবে তাঁর দু-জন সহযাত্রীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। এমন দিনে এমনিভাবে এই লোকটিকে তিনি যেন আশা করেননি।

একজন পরিচয় করিয়ে দিল, উনি আমাদের থানা অফিসার।

তারপর ছোট দলটি চললো খেয়া পেরোতে। টুক্‌টাক্ কথা কইছে সকলে। দারোগাটি ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে বলে চলেছে একটি ডিঙি নৌকো জোগাড় করার আশ্চর্য কাহিনী: নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি গ্রামের চাষাভুসো—তারা কেমন ক'রে নৌকো লুকিয়েছে, কেমন ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে আর কেমন ক'রে সেপাই ফৌজ দিয়ে দারোগাটি তাদের পাকড়াও ক'রেছে। অবনীমোহন নীরব। তাঁর মনে হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে গতকাল সন্ধ্যের একটি ব্যাপার—অমলের কয়েক ছত্র চিঠির তীক্ষ্ণ তীব্র কয়েকটি কথা।

অমল ফেরার—বহুদিন কোনো খবর ছিল না তার। উদ্যত হ'য়ে আছে পুলিসের হুলিয়া। হঠাৎ কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে চৌকিদারের পোশাক পরা একটি লোক ঘরে এসে সাবিত্রীর হাতে এক টুকরো চিঠি তুলে দিল। অমলের ফেরার হওয়ার পর এ বাড়ীতে থানা-পুলিসের অনেক হাংগামা গেছে। কম্পিত হাতে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন সাবিত্রী। তারপর চিঠিখানি অবনীমোহনের হাতে তুলে দিয়ে পত্রবাহকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ব'লেছিলেন:

—তুমি তা হ'লে চৌকিদার নও!

—না মা, এ আমার ভাইয়ের পোশাক—লুকিয়ে পরে এসেছি। এমনি এলে ধরে গারদে পুরে দেবে যে! ...

লোকটি তারপর চলে গেল তক্ষুনি।

কয়েক ছত্রে অমল তার মাকে লিখেছিল :

"শুনলাম, আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারী বাবাকে এখানে নিয়ে আসবার মতলব আঁটছে মালিকের দল। ভালোই হবে। গ্রামের চাষাভুসো ফসলের লড়াইয়ে ভালো ক'রে চিনেছে তাদের মালিকদের, চিনেছে পুলিসকে। তাদের সারিতে দরকার এখন একজন বুড়ো নেতার। বাবাকে ব'লো, বন্দুকের গুলি একটা হাতে এসে লেগেছে—তাছাড়া ভালোই আছি।"

কাল সন্ধ্যের ঘটনা হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে অবনীমোহনের মনে।

খেয়া পেরিয়ে যেতে হবে ক্রোশ তিনেক নৌকোয়। খালের মুখে নৌকো আছে। সেই দিকে এগিয়ে চললো ছোট দলটি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সবাই। অবনীমোহন অবাক হ'য়ে তাকালেন দারোগার দিকে। লোকটা খেজুর রস খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো, হঠাৎ।

পথের পাশের একটা খেজুর গাছ থেকে বছর পনেরোর একটি ছেলে খেজুর রসের কলসী নামিয়েছে। একটি আধা বয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল ছেলেটির পাশে। দারোগার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ রসের ভরা কলসীটা উপুড় ক'রে দিল মাটিতে।

দারোগা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এই পাকড়ো মাগীকে।

সঙীন তুলে দু-জন সেপাই এগিয়ে গেল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইলো নির্বিকার। শান্ত সহজ গলায় ব'ললো :

—পড়িয়া গেল তো কি করব।—

দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো দারোগা, নিজেই তো ফেলে দিলি খানকি মাগী। তোর স্বামী কোথায় ?

—সে এ দেশে নাই।

—এ দেশে নাই না ধান লুঠ ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে! দাঁতে দাঁত চেপে দারোগা ব'ললো, সব ঝুঁটি ধরে এনে ঢোকাব গারদে—বুঝবি তখন মাগী।

মেয়েটি চেয়ে আছে শান্ত—অবিচলিত, কঠিন চোখে।

দল এগোলো।

আর একটি মেয়েকে মনে পড়ে যায় অবনীমোহনের—ওইরকম শান্ত—অবিচলিত, কঠিন। লবণ-আইন ভঙ্গের আন্দোলন—তাকে দমন ক'রবার জন্যে চলেছে ব্যাপক ধরপাকড় আর উৎপীড়ন। হাটের ওপরের বাজে মেয়েমানুষ পদ্মা—কয়েকজন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবককে আশ্রয় দিয়েছিল ব'লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। তারপর সওয়াল আর পীড়ন।

—কেন থাকতে দিয়েছিস ?

—ঘর আছে তাই ভাড়া নিয়েছে।

—ভাড়া নিয়েছে!...ভাড়া খাটাচ্ছি তোকে মাগী।—

পরের দিন পদ্মাকে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায় এক মাঠের পাশে : গালে আর বুকে খ্যাপা পশুর দাঁতের ছোবল—সারা কাপড়ে রক্তের দাগ। আজ বহুদিন পরে চাষীর ঘরের শান্ত একটি বৌয়ের চোখে পদ্মাকে দেখলেন অবনীমোহন। বহুদিন হ'লো পদ্মা মারা গেছে—প্রতাপদীঘির পদ্মা।

খালের মুখে এসে পড়েছে দলটি।

অবনীমোহনের পুরানো কথার খেই হারিয়ে গেল দারোগার চেঁচামেচিতে। লোকটা পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠেছে :

আভি পাকাড়কে লাও শালাদের।—

—কি হ'লো! অবনীমোহন অবাক হলেন।

দাঁড়ি-মাঝি ডিঙিটাকে ফেলে পালিয়েছে।

এখন খুঁজে আর লাভ কী! দলের ভেতর থেকে একজন ব'লে উঠলো, তার চেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক—বেলা হ'লো। আপনার চৌকিদাররা গুন টানতে পারবে না?

—পারবে না কেন? টান শালারা। ডাকাত ব্যাটাদের বেঁধে রেখে গেলি না কেন?

চৌকিদারগুলো সভয়ে তাকিয়ে ছিল দারোগার দিকে—কাজের হুকুম পেয়ে দড়াদড়ি নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে দারোগা ব'লে উঠলো, দেখলেন তো শালাদের কাণ্ড! আজ সভা—কাল ঢেঁটরা পিটে ব'লে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আসছেন। দেখুন শয়তান শালাদের কাণ্ড! ওরা ডাকাত মশায়—স্রেফ ডাকাত।

অবনীমোহন শান্ত কণ্ঠে ব'ললেন, গ্রাম থেকে লোক পাওয়া যাবে না?

—পাবেন? ওই সবগুলো সেপাই চৌকিদার পাঠিয়ে সারা গ্রাম চুঁড়ে ফেললেও একটা লোককে খুঁজে পাবেন না আপনি। গিয়ে দেখবেন—শুধু মেয়েমানুষ আর মেয়েমানুষ।

অবনীমোহন শোনেন আর মনে পড়ে যায় নিঃশব্দ প্রতিরোধের আরও কতকগুলি দিন: ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন। এমনি গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গা ঢাকা দিয়েছে সবাই। পিটুনী পুলিসের দল এসে রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম ঘিরে ফেলেছে—ছেলেমেয়ের হাত ধরে কুকুর-বেড়ালের মতো বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সবাই।

শুধু ধরা পড়ে গিয়েছিল বছর বারো বয়সের একটি ছেলে—চিন্তামনিপুরের পচা।

—তোদের লোকজন কোথায়?

—জানিনি।

—তোর গ্রামের বড়লোক কে?

—শশীবাবু।

—সে কোথায়?

—জানিনি।

—জানিসনি শালা!—

তলপেটে ভারী পায়ের বুটের লাথি খেয়ে পচা চিৎ হ'য়ে উল্টে পড়েছিল—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল এক ঝলক। সে অনেক দিনের কথা।

তারপর ...

এই—লাগলো, লাগলো। শালারা দেখে টান! দারোগা চিৎকার ক'রে উঠেছে আবার।

মাথা বেঁকে নৌকোটা উঠেছে গিয়ে একেবারে খাল পাড়ের ওপরে। ঠেলাঠেলি ক'রে চৌকিদারগুলো নৌকোটাকে ঠেলে আবার জলে ভাসিয়ে দিল।

নৌকো চললো আবার।

খালের দু-ধারে শূন্য মাঠের পর মাঠ। ফসল উঠে গেছে। অবনীমোহন সেইদিকে চেয়েছিলেন নীরবে। মনের মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে অসংখ্য ভাবনা—একটি বুড়ো নেতার জীবনের অনেক দিনের কথা। 'বুড়ো নেতা'—অমলের তীক্ষ্ণ কথাটা বারবার খোঁচা মারে মনে।

কে একটি লোক আসছে এগিয়ে। গ্রামের কিসান মনে হয়—শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কান মাথা ঢেকে নোনা জলের কষধরা একটা গামছা জড়িয়েছে কয়েক ফেরতা। লোকটাকে দূর থেকে দেখে হঠাৎ মনে মনে খুশি হ'য়ে ওঠেন অবনীমোহন। এতক্ষণ যেন এই রকম একটি লোককেই খুঁজছিলেন তিনি। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তাঁর—অনেক দিনকার চেনা গ্রামের লোকগুলি সবাই অমলের মতো লুকিয়ে গেছে কোথায় নিঃশব্দ, অদৃশ্য প্রতিরোধের একটা দেয়াল তুলে দিয়ে।

দূরে হঠাৎ লোকটি থমকে দাঁড়ালো নৌকোটার দিকে চেয়ে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর পেছন ফিরলো লোকটি—ঝুপ্‌সি একটা কেয়াবনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

—ওই এক শালা ডাকু-ভাগতা হ্যায়। একটা সেপাইয়ের চোখে পড়ে গেছে।

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন অবনীমোহন।

তারপর প্রশান্ত শীতের সকালে রোদে পিঠ দেওয়া নিস্তব্ধ প্রান্তরের ধ্যান ভেঙে বন্দুকের শব্দ হ'লো—একটি। দুটি।...

লোকটাকে আর দেখা গেল না। শুধু নিঃশব্দ শূন্যতা ভবে বায় নিরবচ্ছিন্ন শাঁখের শব্দে—সারা দিগন্ত জুড়ে, আকাশ জুড়ে, চারিদিকের প্রান্তর জুড়ে।

দারোগা দাঁতে দাঁত চেপে ব'ললো, শালাদের সাইরেন। কত বাজে দেখবো রে শালা। তারপর অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, দেখলেন কাণ্ডটা! হাড় বজ্জাত এই গ্রামের ডাকাত শালারা। সেদিন দুজন ফৌজ গিয়েছিল মশায়—তাকে ঘিরে এক ঘরে পুরে আগুন লাগিয়ে দিল। আমিও এর পাল্টা শোধ নেবো—শুধু গোটা তিনেক ঘর পুড়েছে, এবার গ্রামকে গ্রাম জ্বলবে।

গ্রাম, জ্বলেছে। অবনীমোহন তাকিয়ে দেখলেন—গাছপালার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে পোড়া কুটিরের সারি। সবুজ গাছ-পালাগুলো কেমন কাল্‌চে মেরে গেছে, ঝলসে গেছে।

প্রান্তরের শূন্যতায় শাঁখের রোল কাঁপছে তখনো। অবাক হ'য়ে চেয়ে আছেন অবনী মোহন: তাঁর নির্বাচন এলাকা। মনে হয় যেন উনিশ শো বিয়াল্লিশের উন্মত্ত আগস্টের দিনগুলো ফিরে এলো হঠাৎ আজ সকালে। নিঃশব্দ প্রতিরোধ নয়—এবার আঘাত। গ্রামের চাষাভুসোরা উদ্দাম আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে থানার ওপরে, পোস্ট অফিসে—প্রত্যেকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপরে। তারপব ধীরে ধীরে আবার খাড়া হ'য়ে উঠেছে জনপীড়নের বিপর্যস্ত ক্ষমতা, শয়তান। গ্রাম জ্বলছে—দেশ জ্বলছে। পুড়ছে গ্রামের অসহায় কুটিরগুলি। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আবার আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে বনেজঙ্গলে।

শুধু বগার চরের অন্ধ হরিদাস আগুন-লাগা কুঁড়ের মধ্যে পথ হাতড়ে হাতড়ে মরে গেল—দরজা খুঁজে পেল না।

তারপর ...

নৌকো চলেছে। জলের প্রবহমান ঘোলা স্রোত ছল্ ছল্ ক'রে উঠছে নৌকোয় বাধা পেয়ে।

—দেখুন ডাকাত শালাদের আর এক কাণ্ড! অগাধ নিস্তব্ধতার মাঝখানে দারোগার রুক্ষ কণ্ঠ চম্‌কে দিল অবনীমোহনকে।

অবনীমোহন আত্মস্থ হ'য়ে দারোগার দিকে তাকালেন।

দারোগা এক দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'ললো, ওই যে ওইখানে।

গত দুর্ভিক্ষের চিহ্ন: মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় জড়ো করা রয়েছে মড়ার মাথা, হাড় কঙ্কাল।

দারোগা ব'ললো, ওই সব কোথা থেকে খুঁজে পেতে এনে গ্রাম সুদ্ধ লোক ডেকে দেখিয়েছে। ওইসব ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে—ওই রকম ক'রে আর মরবে না। তারপর এই দিনে ডাকাতি—জবরদস্তি ক'রে মাঠের ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া।—

অবনীমোহন তাঁর একটি সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, তোমার সব ধান কি তুলে নিয়ে গেছে জান?

—না, প্রায় দুশো বিঘে পড়ে আছে এখনও। একটা লোক পাচ্ছিনে যে কেটে ঘরে তুলি। সব শালা একজোট হয়ে গেছে। কিন্তু একি ভালো? এই জেল-গারদ, গুলি-বন্দুকের মুখে খামাখা মাথা খারাপ ক'রে মরা! সেইটে ভালো ক'রে বুঝিয়ে ব'লবেন আপনি।

—হ্যাঁ। দারোগা ব'ললো, আরে দেশ তো স্বাধীন হ'য়ে গেছে! যত সব উদো চাষার কাণ্ড। শালা ঘরের শত্রু বিভীষণ—ফ্যাকড়া বের ক'রেছে দেখুন। গৃহবিবাদ—একি ভালো? দেবো—একে একে কল্ দেবো ব্যাটারা ঠাণ্ডা না হ'লে।

রাজার হাট। নৌকো এসে গেছে। দলবল উঠলো ডাঙায়।

তিনটি আধা বয়সী কিসান মেয়ে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে—যেন এই দলটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রছিল। এগিয়ে এলো তারা। তাদের মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি অবনীমোহনের মুখের দিকে একবার চেয়ে নীরবে একটি চিঠি ও একটি কাগজের মোড়ক তুলে দিল হাতে।

চিঠিটা খুলতে সাহস হ'লো না অবনীমোহনের: হঠাৎ অমলের কথা মনে পড়ে যায়। দারোগা তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মেয়েগুলির দিকে চেয়ে কড়া গলায় ব'ললো:

কি আছে ওতে?

—কি জানি।

—জানিসনি? দিল কে?

—জানিনি। অউ বাবুকে দিতে কইল।

—বটে! দেখুন তো অবনীবাবু।

দলটি চলেছে ধীরে ধীরে একটি ক্যাম্পের দিকে। পুলিসের অস্থায়ী ক্যাম্প। দলটিকে অনুসরণ ক'রে চলেছে কিসান মেয়ে তিনটি।

চলতে চলতে চিঠি পড়ছেন অবনীমোহন। মুখটা কঠিন পাথর হ'য়ে গেছে। চিঠিতে স্বাক্ষর নেই—কিন্তু হাতের লেখা দেখে হঠাৎ হাতটা কেঁপে ওঠে একটু। অমলের লেখা:

এ অঞ্চলের প্রাচীন এক নেতার কাছে আমাদের এক সহকর্মীর শেষ চিহ্ন পাঠালাম।

কাল সে মারা গেছে। বুকে তার গুলি লেগেছিল। তার স্ত্রীকে আজ দিন তিনেক হ'লো পুলিস ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে সওয়ালের জন্তে—তাদের খোঁজ নেবেন। আর আমাদের বিশ্বাস, একজন বিদ্রোহী কিসানের শেষ চিহ্নটুকু বহু সংগ্রামের সৈনিক একজন প্রাচীন নেতা নিশানের মতো ক'রে ওড়াতে আজকের দিনে ভয় পাবে না।

ক্যাম্পের কাছে এসে পড়েছে সবাই।

দারোগা ব'ললো, কি চিঠি অবনীবাবু।

অবনীমোহন শুধু মোড়কটা তুলে দিলেন দারোগার হাতে।

মোড়কটা খুলে দারোগা আঁৎকে উঠলো : একি মশায়!

বুকে বাঁধা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ—রক্তে ভেসে গেছে।

অবনীমোহন কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চারদিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছেন। তারপর হঠাৎ চোখ আটকে গেল তাঁর ক্যাম্পের পেছনে—একটা গাছের তলায়।

গাছের সঙ্গে পেছনে হাত বাঁধা একটি মেয়ে—নগ্নপ্রায়, পরনে ছেঁড়া ময়লা একটা কাপড়। একটা গণ্ডারের মতো কুঁদো সেপাই সামনে থেকে সঙীন লক্ষ্য ক'রেছে মেয়েটির তলপেটের নিচে। বীভৎস এক হাসিতে ভরে উঠেছে সেপাইটার মুখ। মেয়েটি নিস্পন্দ—মাথাটা ঝুলে পড়েছে একদিকে। তিন দিনের বহু-নিপীড়িত, ক্লান্ত, ধর্ষিত একটি মুখ।

ভিড়ের ভেতর থেকে সেইদিকে হঠাৎ ছুটে গেলেন অবনীমোহন :

এই উল্লুক!—জানোয়ার!—

কয়েকজন সেপাই গিয়ে ধরে ফেলেছে অবনীমোহনকে।

হঠাৎ একটা হট্টগোল। মেয়েটি ক্লান্ত চোখ তুলে চেয়েছে।

দারোগা এগিয়ে এসে ব'ললো, মাথা খারাপ ক'রবেন না অবনীবাবু।

ছেড়ে দিন ওকে। অবনীমোহন বুড়োটে কম্পিত গলায় ব'ললো, ওর স্বামী মরে গেছে কাল।

মরে গেছে! চিঠিটা কই দেখি।

দারোগা এগিয়ে আসছে অবনীমোহনের দিকে—এগিয়ে আসছে। অমল কি ধরা পড়বে এবার—অমল! ... অবনীমোহনের মুখটা পাণ্ডুর হ'য়ে উঠছে ধীরে ধীরে। হাতের মুঠোয় পাকানো চিঠিটা পায়ের তলায় ফেলে চেপে দাঁড়িয়েছেন অবনীমোহন। নিঃশব্দে তিনি চোখের ইসারা ক'রলেন কিসান মেয়ে তিনটিকে—পালাক তারা, হয়তো ধরা পড়ে যাবে তাদের নেতা। ...

মেয়ে তিনটি এগিয়ে এলো আরও কাছে—এক সঙ্গে। তাদের মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি ব'ললো, আমরা তবে যাই বাবু। বলে সে অবনীমোহনের পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলো আর পায়ের তলা থেকে পাকানো চিঠিটা নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মুখে পুরে চিবোতে লাগলো।

—কই চিঠিটা—

—চিঠিটা কোথায় ফেলে দিয়েছি। অবনীমোহন কম্পিত কণ্ঠে ব'ললেন।

—ফেলে দিলেন? এই স্থাথ পকেট।

মুহূর্তে ছুজন সেপাই এগিয়ে এসে খানাতল্লাশ ক'রতে লাগলো অবনীমোহনের কাপড়-জামা। কিন্তু কোথাও নেই। দারোগা ঘুরে দাঁড়ালো তিনটি কিসান মেয়ের দিকে। তারা তখন ভিড় ছেড়ে সরে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে।

দারোগা পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো :

এই পাকড়ো শালীদের—লে যাও উধার গাছমে, সওয়াল কর।

সেই গাছ—সেই গাছ···জিজ্ঞাসাবাদের পালা।...

কাঁপছেন অবনীমোহন : বুড়ো হয়ে গেছেন—বহুদিন ধরে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছেন তিনি। নিজের ওপরে তাঁর রাগ হয় হঠাৎ : কিছুই করবার নেই যেন তাঁর ঠিক এই মুহূর্তে।

ছু-জোড়া শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে শুধু তিনি ছটফট ক'রতে লাগলেন।

সুশীল জানা

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

বড় অফিসার ও অতিশয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি ক'জন বেশিক্ষণ থাকে না, প্রায় কিছুই খায় না, সন্দেশের কোণা ভেঙ্গে মুখে দেওয়া তাদের সাধারণ নিমন্ত্রণ রাখার রীতি। মুসলমান নিমন্ত্রিত ছিল মোট পাঁচজন তার মধ্যে চারজনেই অফিসার, তিনজন বড় আর একজন সুরেনের সমান দরের মুনসেফ। তার নাম সিরাজুল আলম, অল্প বয়স, হাসিখুশি, মিশুক, কবি ও সাহিত্য যশপ্রার্থী। অন্তজন একেবারে বাড়ী-ঘেঁষা প্রতিবেশী উকিল মীজানুর রহমান। আর যে ছু'চারজন মুসলমান এসেছে, আর্দালি পিয়ন বাজি-পুড়ানেওলা, আসলে তারা নিমন্ত্রিতই নয়। সিরাজুল ও মীজানুর অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকে, সুরেনের কীর্তন শোনে। বড় অফিসার না হলে অন্ত তিনজনও হয় তো থাকত।

দশটা নাগাদ সুরেন সত্যই কীর্তন আরম্ভ করেছিল, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। সরকারী বেসরকারী উঁচু লোক ক'জন যতক্ষণ উপস্থিত ছিল, নিজেকে সামলে রাখতে পেরেছিল সুরেন, তারা চলে যাবার পর আর তার ধৈর্য থাকে না। এতগুলি মানুষের এত বড় আসরকে মুগ্ধ করার সাধটা তার বহুদিনের, কে জানে জীবনে এ সুযোগ আর আসবে কিনা। যেন আরও যে ছুটি মেয়ে আছে সুরেনের, চোদ্দ বছরের ছায়া আর দেড় বছরের খুকী, এর চেয়ে ঘটা করে আরও বড় আসর জমিয়ে তাদের বিয়ে দিতে কেউ তাকে বারণ করবে।

আসরের একপাশে কীর্তন আরম্ভ করেছিল রাধাদাস বাবাজী। শুনতে শুনতে হৃদয় আকুল হয়ে উঠল মেয়ের বিয়ের আসরে কীর্তন গাইতে যেটুকু বাধা নিজের মধ্যে সুরেনের ছিল তাও গেল ভেসে। সে আসরে নামতে রাধাদাস তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, ঝুপ করে বসে পড়ে নয়ানচাঁদের হাত থেকে কল্কিটা কেড়ে নিয়ে সাঁ করে মারল টান।

তা, কীর্তন গায় বটে সুরেন, মধুর, মোহকর। দেখতে দেখতে আসর জমে ওঠে, মজে যায়। বাড়ির ভিতরের লোক বেরিয়ে আসে, মেয়েরা এসে জমাট হয়ে বসে, বিয়ে বাড়ির কাজে যারা ছুটোছুটি করছিল এদিক ওদিক, তারাও দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য, সব তাগিদ ভুলে যায়। ওদিকে অন্দরে ঘনিয়ে আসে বিয়ের লগ্ন, এদিকে বাইরে মেয়ে পুরুষ কাতর হয় রাধার বিরহে, রাখাল কৃষ্ণ রাজা হয়ে রাধাকে ভুলে গেছে। রাধার অবস্থা খারাপ, সখিবা চিন্তাকুলা, কৃষ্ণবিরহে তাদের রাধারানী কি বাঁচবে? আবেগে উৎকণ্ঠায় হৃদয়গুলি টনটনিয়ে তোলে সুরেন সখি পরিবৃতা বিরহিনী রাধার বর্ণনায়, যার জগৎ কৃষ্ণময়, জীবনমরণ বিরহ মিলন সবই যার কৃষ্ণ, বিরহে কেন তার জীবন থাকে না, কৃষ্ণের জন্য মরতে বসেও কেন সে বলে দেয় তার দেহটি না পুড়িয়ে জলে না ভাসিয়ে তমালের ডালে তুলে রাখতে, তার ব্যাখ্যায়। তার সাথে মনোহর দাসের খোল যেন কথা কয় অস্ফুট বেদনায়, সনাতনের করতাল যেন বাজে সুদূর চরণের নুপুরধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত, নয়নচাঁদের বেহালার তারে সুর যেন থাকে কি থাকে না রাধার দেহে নিশ্বাসের মত।

হরেন অন্দরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, এমন জানলে এ পাগলের মেয়ে বিয়ের দায় এড়িয়ে চেঞ্জে যেতাম।

অনুরাধা বলে, এমনি ধারা চিরদিন। আমার মরণ নেই!

বিয়ের কনেকে নিয়ে এদিকে আবার আরেক বিপদ! বর নাকি ভীষণ রোগা, একটু বেশ কালোও বটে। মায়ার দু'তিনটি সখি চুপি চুপি উঁকি দিয়ে দেখে এসে ম্লান মুখে বলাবলি করেছিল, ইকি ভাই, মায়ার জন্য এই কালো একটা কাঠি।

তাই, একবার ফিট হয়েছে মায়ার। মাসীর হাত কামড়ে সে রক্ত বার করে দিয়েছে। একটা সংকে সে বিয়ে করবে না, মরে গেলেও নয়। হোক কেলেঙ্কারি, চুন-কালি পড়ুক তার বাপ দাদা খুড়ো জ্যাঠার মুখে, তার কি! এখুনি সে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। জোর করে ধরে রাখলে, বিয়ের আসরে টেনে নিয়ে গেলে, নিজের মাথা ফাটিয়ে দেবে। সে তো মরতেই চায়, বাপ-জ্যাঠা বলুক না গিয়ে যে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মেয়ে মরে গেছে।

বাইরে কীর্তন চলে, বিয়ের লগ্ন ঘনিয়ে আসে, ভয়ে ভাবনায় মাথা ঘুরতে থাকে মেয়ের মা মাসী আপন জনের।

তখন কুব্জা নাপ্তানী বলে, এত অস্থির হচ্ছ কেনে গো মায়েরা বলো দিকি? বিয়ের রাতে এক একটা মেয়ে এমনধারা করে। তাও জান না? থামো না, আমি ঠিক করে দিচ্ছি সব। একটা লোট কিন্তু চাই দশটাকার।

বিড় বিড় করে মায়াকে কি সব বলে কুব্জা, কাঁসার গ্লাসে খানিকটা কি খাইয়ে দেয় সেই জানে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে মায়া, তার বিদ্রোহ ঝিমিয়ে পড়ে। ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে আধবোজা চোখ দুটি। ডাকামাত্র বিনা প্রতিবাদে কলের পুতুলের মত সে গিয়ে বসে পিঁড়িতে, মাসী তাকে ধরে নিয়ে যায়।

কীর্তন এবং বিয়ে তখনও চলছে, মাঝরাতে প্রতিমা বলে অমিতাভকে, এবার যাই চলো। আর ভাল লাগছে না।

তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি প্রতিমা, অমিতাভ সোজাসুজি জানায়, তুমি পাকাদের সঙ্গে যাবে। সুধাদি গাড়ি এনেছেন, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

আমি হেঁটে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আসছ, পৌঁছে দিতে।

নিরুপায় অমিতাভ হার মানে, আমি তাহলে আগে রাস্তায় নেমে যাই, তুমি একটু পরে এসো। অনেকে তাকিয়ে আছে, এত লোকের চোখের সামনে—

ছি! আহত সাপিনীর মত হিস্ করে ওঠে প্রতিমা, ভীরু, কাপুরুষ! কোন মুখে স্বদেশী কর? বিপ্লবের বই পড়?

পথের প্রথম অংশটা জানবাজারের ভিতর দিয়ে, এদিকে মুসলমানের বসতি বেশি। বাড়িগুলি অতি পুরানো, অতিশয় জীর্ণ, মধ্যবিত্তের বাস নেই, একেবারে বস্তি অঞ্চল ছাড়া শহরের অনাদৃত গরীব এলাকাতেও দুচারটি ছোটখাট বাড়িতে বা পথঘাটের সামান্য সংস্কারে বা মানুষের বেশভূষা চালচলনে একটু যে ঘষামাজার চিহ্ন চোখে পড়ে, এদিকে তার ছাপটুকুও পড়েনি। শুকনো খালের পুলটা পেরিয়ে যেতে হয়। খালটা প্রাচীন, পুলটা নতুন, বছর দশেক আগে একটা বোঝাই গাড়ির ভারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল পুরানো পুলটা। মাস ছয়েক পরে নতুন পুলটি তৈরী হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের মোটর একদিন আটকে গিয়েছিল, তার দুর্সম্পাতের মধ্যে। সহরের বহু নালা নর্দমা নিজেদের ঢেলে দেয় এই খালে, গেঁজলা-ওঠা ঘন সবুজ পদার্থে খালের অর্ধেক এখন ভরাট হয়ে গন্ধ ছড়ায়, বর্ষা নামলে ধুয়ে যাবে, কাংসী নদী জীবন পেলে জলও হবে খালে। রাত্রির আজ অসাধারণ উদারতা, জ্যোৎস্না আর ঘুমন্ত শান্তি ছড়িয়ে রেখেছে চারিদিকে, শিশুর কান্নায়, কুকুরের ডাকে, দু'একটি মানুষের পথ চলায় জীবনের সাড়া। আর কে যেন এই পুরানো পচা খালের কাছেই কোথায় টিনের বাঁশী বাজাচ্ছে।

কলহের মধ্যেই শুরু হল তাদের বোঝাপড়া। অমিতাভ বিরক্ত হয়েছিল, চটে গিয়েছিল।

তুমি কি বুঝবে? সে ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তোমার সে দায়িত্ববোধ জন্মায়নি। অন্য মেয়ে হলে বুঝতে পারত ভিতরে গুরুতর কিছু আছে,ছ্যাবলামি করে উড়িয়ে দিত না,জিদ করত না।

তোমার লাটসাহেবী দায়িত্ববোধে আমার কাজ নেই। এত বেশি বুদ্ধিও চাই না। ছ্যাবলামি দেখলে আমার, কি চোখ! অন্য মেয়ে বুঝতে পারত, আমি বুঝিনি গুরুতর কিছু আছে। না বুঝেই অস্থির হয়েছি, সকাল পর্যন্ত থাকতে পারব না বলে ছোট হয়ে অপমান তুচ্ছ করে পায়ে ধরে তোমায় রাস্তায় টেনে এনেছি।

প্রতিমার সঙ্গে কথায় পারা দায়। এ বয়সে কিই বা সে জানে বোঝে জীবনের, কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা, তবু নিজের মধ্যে সে অস্পষ্টতাকে তোয়াক্ক করে না, যতটা জানে না বোঝে না তা বোধ হয় সরিয়ে রাখে কিশোরী মনের সাধ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা আর রহস্য অনুভবের কাজে লাগাতে, বাকীটুকু করে রাখে স্বচ্ছ, পরিস্কার। তার কাছে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। সবটা আয়ত্ত করতে না পারে, একটা টুকরো কেটে নিয়ে মীমাংসা করেই সন্তুষ্ট থাকে, তার পরে আর কথা নেই।

তা নয়, নরম সুরে নামতে হয় অমিতাভকে, আমি যে চাই না আমায় নিয়ে তোমার নামে কিছু রটুক, এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

বুঝি নি ? বুঝেছি বলেই তো।

তার পাকামিতে আবার একটু রাগে অমিতাভ, তা হলে এটাও বুঝেছ তো আমি মন বদলেছি ?

হাঁটতে হাঁটতে কি এসব কথা হয় ? তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে খালের পুলে উঠে লোহার রেলিঙে হাত রেখে। এবার বুঝি দম বা কান্না আটকে রাখায় কাঁপা কাঁপা কথাগুলি অদ্ভুত শোনায় প্রতিমার, তার কথার ব্যাকুলতায় প্রাচীন খালের নতুন পুলের রংচটা রেলিঙের লোহাটা অমিতাভের গরম মনে হয় জোরে চেপে ধরার বেদনায়।

একটা কথা বলো, সত্যি বলবে, প্রতিমা বলে, তারপর তুমি চলে যেও। আমি কোন দোষ করেছি ? না আমায় তোমার ভাল লাগছে না বলে ?

তা নয়, তাড়াতাড়ি বলে অমিতাভ, ওসব নয়। আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব না। আমার বিয়ে করা চলবে না। আমি এমন একটা কাজ নিয়েছি জীবনে, ব্রত নিয়েছি—

ওঃ তাই বলো। —আটকানো দম আর কান্না দুটোই প্রতিমা নিশ্বাসে ঝেড়ে ফেলে। কত কি ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল। ঢাখো, হাত দিয়ে ঢাখো, এখনো বুকটা ধড়ফড় করছে। কিন্তু তুমি কি, অ্যাঁ! এই কথা বলার জন্যে এত কাণ্ড ? আমি কি ছটফট করে মরে যাচ্ছি বিয়ের জন্যে ? তুমি কি ভাবছিলে জানি। প্রতিমা সহজে ছাড়বে না, একবার যখন বলেছি বিয়ে করব, প্রতিমা কেঁদে কেটে ঘাড়ে ধরে বিয়ে করাবেই। ছেলেরা এমনি ভাবে মেয়েদের। প্রতিমা সে মেয়ে নয়, প্রতিমাকে চিনতে তোমার বাকী আছে।

ক্ষুব্ধ অমিতাভ বলে, তাই দেখছি। শুনে তোমার মনে খুব কষ্ট হবে ভেবেছিলাম।

কষ্ট হচ্ছে না ? প্রতিমা আশ্চর্য হয়ে যায়, তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তেমনি। কিন্তু তুমি যদি পিছিয়ে দিতে চাও, কষ্ট সইতে পার, আমিও পারব।

তুমি বুঝতে পারনি পিতু। পিছিয়ে দেবার কথা নয়।

এবার অমিতাভ স্পষ্ট করে বলে প্রতিমা ও আদর্শের মধ্যে একটিকে চিরজীবনের জন্য তার বেছে নিতে হবার কথা, যার মধ্যে আপোষ নেই, ভবিষ্যতে অদল বদল নেই। সে স্পষ্ট করে শুধু বলে না কি তার আদর্শ, ব্রতটা কি। তবে মোটামুটি অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না প্রতিমার।

তুমি শেষ এই ঠিক করলে ? এই পথ বেছে নিলে ? দেশের কাজ তো অন্যভাবে করা যায়।

সে আমার কাছে ফাঁকি। আমি যা ঠিক বলে জেনেছি তাই আমার পথ।

তারপর তারা ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করে। চলতে চলতে এক সময়ে প্রতিমা বলে, আমরা দু'জনে মিলেও তো পারি ?

মিলে করার কাজ নয়। এ শুধু কাজ।

কয়েক পা হেঁটে আবার বলে প্রতিমা, আমিও তো নিতে পারি এ কাজ।

মেয়েদের কাজ নয়।

কি করে জানলে মেয়েদের কাজ নয় ? মেয়েরা মরতে জানে না ?

শুধু মরতে জানলেই কি সব কাজ হয় ?

কোন কাজটা পারে না মেয়েরা ? মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে, মারতে পারে, মরতেও পারে। কেন তোমরা এত অশ্রদ্ধা কর মেয়েদের !

এ তিরস্কার কিছুক্ষণ মূক করে রাখে অমিতাভকে। তার নিজের কাছে এ সমস্যা তেমন স্পষ্ট নয়। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চায়, এখন চায়, আগেও চেয়ে এসেছে যে মেয়েদের সাথে নিলে কাজের তাদের ক্ষতি হবার কথা নয়।

তোমাদের অশ্রদ্ধা করে বোধ হয় নয় পিতু। বোধ হয় তোমাদেরি দরকার বলে। আমরা দুর্বল বলে ঠিক নয়, ও ভয় আমরা করি না, তবে মনটা শক্ত করতেও তো কষ্ট আছে। তোমার সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে মিছামিছি আমায় এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না।

এ কি একটা কথা হল ? মৃদু প্রতিবাদের সুরে প্রতিমা বলে।

কে জানে। ঠিক জানে না অমিতাভ। ব্রত ছাড়া কিছুই তো ছিল না কচের। মেয়েরাও তো সবাই দেবযানী নয়। তবু যেন কি একটা অভিশাপ আছে তাদের, বাংলার ছেলেমেয়েদের, অস্পষ্ট অনুভব করে অমিতাভ। মাঝরাত্রির বিদায়-বেদনায় কথা ও চলা দুই তাদের থেমে গেছে পথের মাঝে প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায়। তার শুধু মনে পড়ছে যে কত দেশে ছেলে মেয়েরা পাশাপাশি এগিয়ে গেছে মরণের ব্রত পালনে, তাদের হয়তো ভাববারও দরকার হয় নি হৃদয়ের এই কোমলতার কথা, অকারণ বেদনাভোগের কথা। কেন ভাবা যায় না বাঙালী মেয়ে লোহার মত কঠিন হতে পারে, কেন এত মায়া ? এত সাড়া, এমন সান্নিধ্য-সচেতনতা বাঙালী ছেলেমেয়ের ?

তাদের দোষ নেই। তারা এমন হয়ে জন্মায় নি, সাধ করে এ রকম হয়নি। অমিতাভ জানে। জন্ম জন্ম ধরে এই ভয়ঙ্কর মমতায় উর্বর করা হয়েছে তাদের বুক। আজ তাই তাদের এই শাস্তি, তার আর মায়ার।

পিছন থেকে মোটরের আওয়াজ আসছিল, তাদের কাছে এসে গাড়িটা থামে। গাড়িতে সুধা, তার ছোট ননদ আর পাকা।

সুধা অনুযোগ দিয়ে বলে, আমায় বলে কয়ে রাখলে প্রতিমাকে পৌঁছে দিতে হবে, আর তোমাদের খোঁজ নেই। বলে তো আসতে হয় ? আমি এদিকে ভেবে মরি কোথায় গেল মেয়েটা, কার সঙ্গে গেল, একলাই রওনা দিল নাকি রাত দুপুরে ? যা বেপরোয়া মেয়ে।

চার

পাঁচুর বাবা আটুলিগাঁর ধনদাসের অবস্থা চাষীসমাজের মাপকাটিতে ভালই বলা যায়। জমির আয়ে খোরপোষটা এক রকম চলে, অজন্মার বছরে টানাটানি হয়। একজোড়া বলদ আছে, চাষের কাজেও লাগে, অন্য সময় গাড়ীও টানে। দু'টি গাই, দুধ বেচে কিছু আয় হয়। আগে অর্ধেক দুধ রাখা হত বাড়ীর ছেলেপুলের জন্য, এখন পাঁচুর পড়ার খরচ যোগাবার দায়ে প্রায় সবটাই বেচে দিতে হয়। বাগানের ফলমূল তরী-তরকারিও হাটে যায়। ছোটখাট একটি বাঁশ ঝাড় আছে। চৈত্রমাসে একবার ডোবাটি ছেঁচে সের দশ বারো

মাছ পাওয়া যায়, তবে তাতে ভাগীদার আছে ধনদাসের খুড়াতো ভাই যাদব, মাছের ভাগাভাগি নিয়ে প্রতি বছর একবার দুটি পরিবারে মারামারির উপক্রম হয়। গোটা চারেক আম গাছ, তার দুটিতে সুন্দর সুস্বাদু আম হয়। প্রকাণ্ড সতেজ কাঁঠাল গাছটায় অজস্র ফলে কিন্তু কি যেন ফাঁকি আছে গাছটায়, বড় হয়ে পাকবার আগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় কাঁঠালগুলি, এঁচড়েই তাই খেতে আর বেচে ফেলতে হয়।

এক শনিবার পাঁচুর সঙ্গে পাকা বেড়াতে এল ধনদাসের বাড়ী। শনিবার এলেই বাড়ীর জন্ম পাঁচু উতলা হয়ে ওঠে। পাকা ভেবে পায় না বাড়ীতে কি এমন আকর্ষণ থাকতে পারে যে বাড়ীর জন্ম ছটফট করবে মানুষ, এক শনিবার যেতে না পারলে মনমরা হয়ে থাকবে। বড় ভাল লাগে তার আটুলিগাঁ, আরেকটি অজানা গাঁয়ে এসে আরেকবার ভাল লাগা। ধনদাসের গেঁয়ো চাষাড়ে পরিবারটি তার মনপ্রাণ দখল করে রাখে, উদ্বেল করে রাখে সোমবার সকাল পর্যন্ত, আরেকবার আরেকটি সাদামাটা সংসারে মস্‌গুল হওয়া। কিন্তু তার মধ্যে পাঁচুর অদ্ভুত ঘরটানের সন্ধান নেই।

শ্যামাকে দুইছিল ধনদাস, বাছুর ধরে দাঁড়িয়েছিল পাঁচুর পিসী সুভদ্রা। এমন সময় সাইকেল চেপে দুই বন্ধুর আবির্ভাব। বিছানা পত্র জামা কাপড় কিছুই সঙ্গে আনে নি, এক কাপড়ে রায় বাহাদুর ভৈরবচন্দ্রের ভাগ্নে এসেছে তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে, সোমবার পর্যন্ত থাকবে। ভৎর্সনার চোখে ছেলের দিকে তাকায় ধনদাস। স্কুলে পড়ে কি বিদ্যালাভ হচ্ছে ছেলেটার ভগবান জানে, বুদ্ধি মোটে হয় নি। আগে থেকে একটা যে খপর দেবে বাড়ীতে সে কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই।

কত দুধ হয় দুবেলায়? পাকা জিজ্ঞেস করে।

শ্যামা ছোটখাটো গাই, সে অনুপাতে দুধ দেয় অনেক, গাঢ় মিষ্টি দুধ, কাঁচাতেই হলুদ আভা। জ্বাল দিতে তলায় লেগে যায়। পাকা সায় দিয়ে বলে সে ঠিক কথা, দেশী গরুর মত দুধ হয় না, পশ্চিমা গাই দুধ বেশী দেয় বটে কিন্তু সে পাতলা দুধ, এমন স্বাদ নেই। দেশী গরুর জন্ম তার গর্ববোধ ধনদাসের অন্তর স্পর্শ করে।

গরুর দুধ মুখে, ধনদাস বলে, যেমন খাবে, সেবা যত্ন পাবে, দুধ দেবে তেমনি।

বাছুরটি বড় আকারের, অন্য ধাঁচের, কিন্তু রোগা কঙ্কালসার।

মিশেল বাছুর, না? ষাঁড় পেলেন কোথা?

হাঁ, মিশেল। বিশেষ উৎসাহী মনে হয় না ধনদাসকে, মোদের বড়কত্তা এনেছিলেন একটা ষাঁড়, বসন্তবাবু। জানাচেনা রইতে পারে, আজ কাল শহরে থাকেন বেশীর ভাগ। সেবার মেতে গেলেন চাষবাস গাইগরু নিয়ে, ইস্কুল টিস্কুল করলেন, চরকা টবকা কাটালেন মোদের, তখন এনেছিলেন ষাঁড়টা। বুড়ো ষাঁড়, বাঁচবে নি দু'এক বছরের বেশী।

বাছুরটির শোচনীয় অবস্থা দেখে পাকা বলে, বাঁটে বেশী দুধ ছাড়তে হয় এ বাছুরের জন্যে, গাই ছোট, বাছুর বড় কিনা।

ছাড়ি না দুধ? আর কত ছাড়ব! বাছুর যদি সব দুধ খাবে তো কি করে পোষায়? মিশেল বাছুরে সুবিধে নেই।

এর জবাব জানে পাকা, আজ এ বাছুরকে বেশী দুধ খেতে দিলে বড় হয়ে সে সুদে আসলে তা ফিরে দেবে, কিন্তু কিছু সে বলে না। ভবিষ্যতের ভরসায় থাকার সাধ্য যার নেই,

একটা বছর টিঁকে থাকলে তবে যে আরেকটা বছর বাঁচার কথা ভাবে, তাকে ওসব কথা বলা মিছে।

সুভদ্রা বলে, একটা পিঁড়ি এনে বসতে দেনা পাঁচু, হাঁ করে দেঁড়িয়ে রইলি ?

এখন বসব না, পাকা বলে, গাঁ টা একটু ঘুরে দেখে আসি সন্ধ্যার আগে।

তবে খেতে দি, সুভদ্রা বলে, ও শাঁখা, আয় দিকিন, ধর দিকিন এঁড়েটাকে, বেরিয়ে আয়, লজ্জা নেই। রাজুর মা, দুটো চিড়ে ধোও।

ছোট ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসেছিল আগেই, হাঁ করে চেয়েছিল আগন্তুকের দিকে। বৌ-ঝিরা জানালায় দরজায় উঁকি দেয়। গ্রামের ঘরে ঘরে পুঞ্জ পুঞ্জ এই কৌতুহল, এ একটা ভাষার মত। শালবন থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এসে গ্রামে বেড়িয়ে যাক, কেউ হয় তো চোখ তুলে তাকাবে কেউ হয় তো তাকাবে না, বিদেশী মানুষ এলে, হোক সে সাপুড়ে সন্ন্যাসী ফিরিওয়ালা সায়েব বা ভদ্র একটা কিশোর ছেলে, পরম আগ্রহে গ্রাম তাকে সামনে থেকে আড়াল থেকে চোখ বড় বড় করে দেখবে। যেন বলতে চায়, আমরা জানি একটা বিরাট অদ্ভুত জগত আছে গাঁয়ের সীমার বাইরে, দেখি তো বিদেশী তুমি কি পরিচয় নিয়ে এলে সেথাকার ?

নাইবি ? পাঁচু বলে, ভাল পুকুর আছে।

ঘাটে কাপড় খুলে রেখে গামছা জড়িয়ে পাকা ঝাঁপ দেয় নন্দীদের দীঘিতে। অপর পাড়ে আরও বড় একটি ঘাট দীঘির, শুধু নন্দীদের বাড়ীর লোকের ব্যবহারের জন্য, গ্রামের ব্রাহ্মণদেরও অনুমতি আছে। ঘাটের ওপরে নন্দীদের মস্ত দালান বাড়ী। চারিদিকে ঘর তোলা ফটকওলা চারকোণা ছোটখাট ইঁটের দুর্গের মত, বহুদিন রঙ বা চুনকাম না হওয়ায় কালচে মেরে এসেছে বাইরেটা। পাঁচুর সঙ্গে দীঘি তোল পাড় করে পাকা, যেখানে মাচায় বসে চার দেয়া জলে ছিপ ফেলে বসে আছে বেঁটে মোটা বড় নন্দী বসন্ত, সেখানে ডুবে ডুবে পদ্ম তুলতে গিয়ে মাছ ভাগিয়ে দেয়। লাল চোখে গর্জে ওঠে বসন্ত, হুকুম দেয়, কান ধরে টেনে নিয়ে আয় তো ছোঁড়া দুটোকে, কে আছিস !

ঘাটে দাঁড়িয়ে বসন্তের লোক বলে, এই ছোঁড়া আয়, উঠে আয়, বড়বাবু চিড়ে ভাজা করবে তোদের।

জল থেকে পাঁচু বলে, যা যা, ভাগ্। এ কে জানিস ? বলগে' যা ভৈরববাবুর ভাগ্নে নাইছে।

খপর শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় বসন্ত।—রায়বাহাদুরের ভাগ্নে ? সত্যি নাকি ? বলগে যা বাবু ডাকছেন, আলাপ করবেন। ভালভাবে বলিস, সম্মান করে।

পাকা এলে ভৈরবের কুশল জিজ্ঞাসা করে বসন্ত, পাকার নাম বয়স স্কুল ক্লাশ বাপের পরিচয় এবং হঠাৎ আটুলিগাঁয়ে পদার্পণের কারণ।

বেড়াতে এসেছ ? তা বেশ, তা বেশ। গাঁ দেখবার সখ হয়েছে বুঝি ? তা বেশ, তা বেশ। গাড়ীটা রেখেছ কোথায় ? ড্রাইভারকে বলেছ তো গাড়ীর কাছে থাকতে ? চাদ্দিকে চোর এ গাঁয়ে, একটু ফাঁক পেলেই যা পাবে সরিয়ে নেবে। চোর বদমাস এ গাঁয়ের লোক। সাইকেলে এসেছ ? মোটর সাইকেল নয়, প্যাডেল সাইকেল ? বাহাদুর ছেলেতো ! বসন্ত সংশয়ভরে তাকায়, লোমশ গায়ে হাত বুলায়, শেষ ফাল্গুনের বৈকালিক

বাতাসে তার গা কুট কুট করে, জামা গায়ে দিলে আরও কষ্ট, আরও জ্বালা। কবিরাজ বলে পিত্তের আধিক্য, বসন্ত স্থানে রক্ত নোংরা হয়ে গেছে, সংশোধন দরকার।

রাত করে সাইকেলে ফিরে যাবে এতদূর? বসন্ত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে, তা হয় না বাবা। আমি যেতে দিতে পারি না। না যদি জানতাম, এসেছিলে চলে যেতে, সে হত আলাদা কথা। জেনে তো যেতে দিতে পারি না বাবা, পাশানির জঙ্গলটায় নাকি বাঘ বেরিয়েছে। আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যাও, কাল সকালে চা'টা' খেয়ে রওনা দিও। রায়বাহাদুর ভাববেন না, আমি খবর পাঠাচ্ছি। ঈশ্বর, অর্জুনকে তলব দে, ঘোড়া নিয়ে আসতে বলবি।

আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পাকা সবিনয়ে বলে, আমি এদের বাড়ী থাকব। এদের বাড়ীতেই এসেছি আমি।

ধনদাসের বাড়ীতে থাকবে? গাম্ভীর্যের আড়ালে বসন্ত যেন বোমার আওয়াজ শুনে চমকে গেছে।

পাঁচু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বলে, ও আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড, একসাথে পড়ি।

নেয়ে এসে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে ধনদাসের বাপের আমলের প্রকাণ্ড এক কাঁসার জাম বাটিতে দুধ কলা দিয়ে চিড়ে মেখে খায় পাকা। বাড়ীতে দুটো গরু থাকলেও দুধ খাওয়া চাষীর ঘরে বিলাসিতা। চাষীর ঘরের ছেলে এলে হয় তো তাকে শুকনো করে চিড়ে কলা মাখার মত দুধ দিয়ে সুভদ্রারা ভাবত যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। পাকাকে দিয়েছে অনেক বেশী, পাতলা করে চিড়ে কলা মাখতে পেরেছে পাকা। বাড়ীতে বাটিভরা দুধ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখার কথা এখন পাকা ভুলে গেছে। ভুলে না গেলে কি তার এত খিদে পেত, বাটি চেঁছে পুছে খেতে পারত আবাত্তি পাকানো টক-টক চাঁপা কলা দিয়ে মাথা মোটা চিড়ে, গুড়ে এত পিঁপড়ে থাকা সত্ত্বেও?

পাকার কথাবার্তা চাল চলন আশ্চর্য লাগে ধনদাসের, যেমন হবে ভেবে প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল মোটে তেমন নয়। এ ছেলে হাওয়ায় কথা কয় না, দেখায় না যে অনেক উঁচু থেকে নেমে এসেছি তোমাদের নীচু ঘরে, মায়া করি ভালবাসি তোমাদের, তোমরা কেমন জানতে বুঝতে এলাম। নিজে থেকে কিছু করে না বা বলে না, উচিত মত ঘরোয়া কথা কয়, নয়তো খালি চকচকে দু'পাটি দাঁত বার করে গালভরা হাসি হাসে।

বড় ভাল লাগে পাকাকে ধনদাসের।

বলতে চায় অনেক কথা, তার বদলে শুধোয়, পাঁচুর লেখাপড়া হবে কিছু?—

কিছু হবে না। ও একটা গোমুখ্যু।

ধনদাস কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে হাসে। উঁহুঁক, অত মুখ্যু লয়। তুমি কেনে মিশবে উয়ার সাথে গোমুখ্যু হলে?

আশে পাশের চাষীরা দু'চারজন আসে, জানতে চায় সদর থেকে কে এল ধনদাসের বাড়ী। বসতে বলা নেই, নিজেরাই বসে, বসে নিজেরাই কথাবার্তা বলে নিজেদের মধ্যে, হাত বদল করে তামাক খায়। পাকা স্পষ্ট অনুভব করে ওদের অনেক জিজ্ঞাসা আছে, অনেক কিছু বলবার সাধ, হোক সে ছেলেমানুষ, তারই কাছে। ছেলেমানুষ বলেই বোধ হয় আগ্রহটা বেশী,

তাকে অতটা ভয় করার সমীহ করার দরকার নেই। তাছাড়া সে পাঁচুর বন্ধু, সহপাঠী। কিন্তু কিছু বলতে পারে না কেউ, কথা খুঁজে পায় না, ভাষা জানা নেই। মামুলি আলাপের মধ্যেই হঠাৎ সোৎসাহে কি যেন নতুন কথা বলতে যায় একজন, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায় তার, গলার কাছ পর্যন্ত বুঝি উঠেও আসে দু'চারটি শব্দ, কিন্তু বলা আর হয় না, খেই হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে। ওদের উদ্বেগ আর অস্বস্তি ব্যাকুলতা জাগায় পাকার মধ্যে, ওদেরি মত যেন কত কি প্রশ্ন আর কত কিছু বলার সাধ চাপ দেয় ভেতরে। কিন্তু মুখ ফোটে না তারও, ধরতে গেলেই পিছলে যায় জিজ্ঞাসা, স্পষ্ট হয় না, শুধু একটা এলোমেলো আকুলি বিকুলি হয়ে থাকে যত কিছু যা কিছু সে বলতে চায়। অশিক্ষিত বোকা সোকা গেঁয়ো চাষা ওরা যেমন, ইংরেজী স্কুলের পড়ুয়া চালাক চতুর শহুরে ছেলে সেও যেন তেমনি বোবা।

ধনদাসের ভাই জ্ঞানদাসের খবর জিজ্ঞেস করে প্রত্যেকে দুয়ারে পা দিয়েই। বলে, ডেকে নিযে গেছে শুনলাম নাকি ?

ধনদাস বিমর্ষ ভাবে বলে, ধরে নিয়ে গেছে। শুনে আপশোষের একটা আওয়াজ করে আগন্তুক। বসে বলে, ডাকলে পরে না যেয়ে উপায় কি।

গোঁয়ার যে, বাঘা গোঁয়ার, মাথা গরম।—ধনদাস বলে ক্ষোভে দুঃখে, বেগারে না যাবি যদি, বললে হয় ব্যারামের কথা, বললে হয় পেট ছেড়েছে নয় জ্বর এয়েছে কাঁপিয়ে। চোটপাট করিস কেনে তুই, গাল দিস কেনে বোকার মত ?

হাঁ, তা বটে। তবে কিনা তেজী বড়।

জম্মো তেজী। জনক জানার ছেলে ছিল মইযাখালির ইন্দ্র জানা, উয়ার ছিল জম্মো তেজ, কিবা বয়েস উঁা ? মরল সেবার তিনটো মেরে জবর লেটেল নাঙ্গিপুতার ব্যাপারটাতে।

মরার কথা, মরার কথা রাখো।

আরে বালাই, মরার কথা কিসের কার, তেজের কথা বলি। জানার আয়ু শত বছর।

মেয়েরা শনি পুজার আয়োজন করেছে, সাদাসিদে ব্যাপার, পুরুতও ডাকেনি। নাকে চশমা এঁটে বুড়ো রামকালী পাঁচালী পড়ে, প্রদীপের আলোয় চশমার মোটা কাঁচের ফাঁকে বটতলার পুঁথির মস্ত হরফও সে দেখতে পায কিনা সন্দেহ, গড় গড় করে মুখস্ত বলে যায়।

সারদা উন্মনা অস্থির হয়ে আছে সন্ধ্যার পর থেকে, বার বার গিয়ে সে দেখে আসে বাইরের দাওয়ায় কে কে আছে। পাঁচুর মাকে সে বলে, এখন তক্ যে এল না দিদি ? পাঁচুর মা কি জবাব দেবে, পাঁচুকে দিয়ে ওই কথাই সে জিজ্ঞাসা করে পাঠায় ধনদাসকে।

ধনদাস বলে, বলগে' যা আসবে। এখুনি আসবে।

বোবা হয়ে ঘরে থাকা অসহ্য হওয়ায় পাকা বাইরে যায়। পাঁচু সঙ্গে সঙ্গে আসে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা রাত্রি, চাঁদ উঠবে সেই মাঝ রাত্রে, গাঢ় অন্ধকারে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে, একটা গাছে লাখ খানেক জোনাকি। চারিদিকে নজর করে দেখলে হয়তো দু'একটা জোনাকি দেখা যায়, ডোবার পাশের এই একটি শ্যাওড়া গাছে জোনাকির যেন দীপালি। রাজ্যের জোনাকিরা ভিড় করেছে একটি গাছে। পাঁচু বলে, এ রকম রোজ বছর হয়। বৈশাখে চাদ্দিকে দেখবি, এখন এ রকম একট গাছে ভিড় করে।

তাবার আলোর অন্ধকারে পাকা সারা গ্রামে পাক খেয়ে বেড়ায় প্রায় মাঝ রাত্রি পর্যন্ত। এটা তার নিজের অস্থিরতা। গ্রাম ঘুমিয়ে গেছে তার হৃদয়েব জোয়ার ভাঁটার তোয়াক্কা না রেখে।

পাঁচু বলে, আজকাল কিন্তু সাপ বেরোয় খুব।

দারুণ ক্ষোভে পাকা বলে, কই সাপ? তোদের গেঁয়ো সাপ বেরোয় না, গর্তে লুকিয়ে থাকে।

পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল দুপুরে, বিকেলে থমকে ছিল, এখন দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেশী দূরে নয় সমুদ্র, বিশ ক্রোশও হবে না। বাতাসে গা জুড়িয়ে যায়, মন কেমন করে! চারিদিকে ছড়ানো গাঁয়ের ঘরগুলি, কালি পড়া লণ্ঠন আর বাতাস থেকে আড়াল করা ডিবরির উলঙ্গ শিখা চোখে পড়ে কাছে ও দূরে, এ দিকে মাথা উঁচু করে আছে নন্দীদের দোতলা দালান, দু'তিনটে ডে লাইটের সাদা আলো শ্বেতকুষ্ঠের মত মাথা হয়ে আছে অন্ধকারের গায়ে।

শালবনের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে তারা ফিরে আসে। ধনদাসের বাড়ীর প্রায় কাছে এসে নাগাল ধরে জ্ঞানদাসের, অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে সে হাঁটছিল বাড়ীর দিকে।

পাঁচু বলে, কাকা? অ্যাতখণ আটকে রাখলে?

জ্ঞানদাস কথা কয় না। বাড়ী গিয়ে জ্ঞানদাস মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। মাথাও ঠেস দেয় দেয়ালে। তাব গামছা ও কাপড়ে রক্তের দাগ, নাকে মুখে রক্ত জমে আছে।

নিশ্বাস ফেলে ধনদাস বলে, মারধোর করেছে?

জ্ঞানদাস বলে, হাঁ। বেঁধে রেখেছিল, কাল থানায় পাঠাত চুরির দায়ে।

ছাড়লে যে?

কে নাকি এয়েছে সদর থে তোমার বাড়ী।

চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে পরিবারটি, স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

জল আর মাটির গামলা নিয়ে আসে সারদা। সে রক্ত মুছিয়ে দিতে থাকে, হাত বাড়িয়ে দেড় বছরের ছেলেটাকে জ্ঞানদাস কোলে টেনে নেয়। ছেলেটা কাঁদছিল।

খুব ভোরে পাকার ঘুম ভাঙে, প্রায় শেষ রাত্রে। আধখানা চাঁদ তখনও অস্ত যায়নি। অনেক রাত্রে শুয়েছিল, মশারি খাটিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল ধনদাস, মশারির মধ্যেও মশার কামড়ে এপাশ ওপাশ করেছে পাকা, জেগে জেগে উঠে বসেছে। ঘুঁটের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস আটকে এসেছে তার। মশারি কিনে মশা রুখবার সাধ্য নেই এদের, ঘুঁটের সঙ্গে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ পান্‌সে গাছের শিকড় পুড়িয়ে এরা ঘুমোয়।

সত্যই ঘুমোয়। মশারা শুষে নেয় অল্প জলো রক্ত, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করে উপোসী হাড়মাসে ব্যথা আর অস্বস্তিতে, ভগবান অথবা মশাকে গাল দেয় অস্ফুট অশ্লীল শব্দে, তবু প্রাণান্তিক ক্লান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমোয়।

অথচ বাইরে সমুদ্রের মধুর শীতল হাওয়া বইছে জোরে। ঘরে না শুয়ে বাইরে শুলে মশা কামড়ায় না, চৈত্রের দখিনা বাতাস মশা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তবে বাইরে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে মশার হাত থেকে বাঁচলেও ঘুমানো যায় না। পোষা কুকুরটা বার বার শুঁকে দেখতে এসে মুখে গালে চেটে দেয়, পাগাড়ের পচা গন্ধ নাকে লাগে, অজস্র পোকা মাকড় দল বেঁধে এসে কুট কুট করে কামড়ায়, গায়ে হেঁটে বেরিয়ে সুরসুরি দেয়।

উঠে বসে থাকে পাকা। নিজেকে সে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে আটুলিগাঁকে। সোনার বাংলায় সোনার গ্রাম। পূবের গাঁয়ে পশ্চিমের গাঁয়ে অতিথি হয়ে এমনি রাত সে কাটিয়েছে। এমন সে অসহায় নিরুপায় যে এ গাঁগুলিকে শুধু ভালবাসা ছাড়া কিছুই তার করার নেই। এ ভালবাসা পাপ, মহাপাপ। এ ভালবাসার মানে যেন এই রোগে জীর্ণ খিদেয় শীর্ণ শান্তি-হীন নিদ্রাহীন হাড়গোড় পিষে-গুঁড়ো-করা গাঁকে বলা যে তুমি নতুন মামীর মত হৃষ্টপুষ্ট সুগন্ধি সুন্দরী প্রিয়া, তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো, তোমায় ভালবাসি।

ভোর হবার আগেই জামাটি গায়ে দিয়ে পাকা বেরিয়ে যায়, বাড়ীর কেউ তখনো ওঠেনি। রাত্রে শালবনের প্রান্ত থেকে ফিরে গেছে, আজ ভেতরে ঢুকবে। ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম থেকে অনেক তফাতে চলে যায় পাকা, দেখতে পায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় পুরনো একটি ফোর্ড গাড়ী। কাছেই দূরে সরকারী রাস্তা, আটুলিগাঁর গা ঘেঁষে এসে এখানে বন ভেদ করে চলে গেছে। গাড়ীটা পাকা চেনে, কালীনাথের শিষ্য শঙ্করের বাবার গাড়ী, শঙ্করও চালায়। খানিক আগে গুলি ছোঁড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ কাণে এসেছিল পাকার, অতটা খেয়ালও করে নি বুঝতেও পারে নি। এবার সে কাণ পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। বনের নিজস্ব স্তব্ধতার মত তার হৃদয়মনও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কালীদার ছেলেরা গুলি চালানো শিখতে এসেছে সহর থেকে এত দূরে আটুলিগাঁর জঙ্গলে, রাস্তা থেকে নামিয়ে গাছের আড়ালে গাড়ী রেখে এগিয়ে গেছে বনের ভেতরে। কে জানে কে কে আছে ওদের মধ্যে। কানাই আছে কি? হয়তো আছে, হয়তো তার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতায় কালীনাথ খুশি হচ্ছে মনে মনে।

কালীদা জানে না তাকে নিলে বন্দুক ছোঁড়া শেখাতে হত না, অর্জুনের মত সে ডান হাতে বাঁ হাতে বন্দুক চালাতে পারে। তার বাবার তিনটে বন্দুক আছে, রিভলবার আছে, অন্য ছেলেরা যখন এয়ার গান নিয়ে খেলা করে সে তখন আসল বন্দুক চালিয়েছে, বাবার সঙ্গে শিকার করেছে রাঁচির জঙ্গলে। তাকে ঠেকানো যাবে না, লুকিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে হয়তো বিপদ বাধাবে, বাবা তাই নিজে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। হাত নিসপিস করে পাকার। যাবে ওখানে? গিয়ে বলবে কালীদাকে, আমায় একটা দাও, বন্দুক রিভলবার যা তোমার খুশি, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ, শেখাও নি, কিন্তু তোমার শেখানো ছেলেদের চেয়ে আমি ভাল পারি কিনা ছাখো?

কে জানে কি ভাববে কালীদা, অন্য ছেলেরা। কালীদা হয়তো বলবে, তা নয় হল, আমি তো জানিই তোমার অনেক গুণ আছে, কিন্তু তোমার স্বভাব যে খারাপ পাকা। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পাকা। পকেটে পেন ছিল, বরাবর থাকে, কালি ছিল না। মুখের থুতু দিয়ে পেনের নিব ভিজিয়ে একটুকরো কাগজে সে লেখে: 'রাস্তা থেকে আওয়াজ শোনা যায়'। তলায় নিজের নামটা লিখবার লোভের সঙ্গে খানিকক্ষণ রীতিমত যুদ্ধ চলে তার। কাপড়ের সুতো বার করে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলে কাগজটি বেঁধে রেখে রাস্তায় নেমে গাঁর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। হঠাৎ মন অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে।

শহরে স্কুলে পড়ে, পাকাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তবু পাঁচুর মধ্যে তার চাষী বাপ-খুড়োর জন্ত বিশেষভাবে আর সাধারণভাবে আটুলিগাঁর জন্ত গর্ববোধ টিঁকে আছে, আজকাল একটু স্তিমিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে। জ্ঞানদাসের জন্তই তার অহংকার বেশী, কাকাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। খাজনা বন্ধের ডাকে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছিল আটুলিগাঁ, সবার আগে ছিল তার বাবা আর কাকা, সকলের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছিল জ্ঞানদাস। আজও তার গায়ে পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন আছে, মাথায় লাঠির ক্ষত, বাঁ উরুতে গুলির ক্ষতের দাগ, হাতের তিনটি আঙুল তার ভাঙা, লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একটু খুঁড়িয়ে চলে। ধনদাস ধীর শান্ত মানুষ, ধীর শান্ত ভাবেই সে বিলাতী বর্জন, চরকা কাটা এসব গ্রহণ করেছিল, গায়ের জোরে খাজনা বন্ধের ব্যাপারে তার ছিল দ্বিধা, বিশেষত বসন্ত নন্দী যখন এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল, প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা আরম্ভ করল, বলতে লাগল, খাজনা বন্ধের হুকুম কংগ্রেসের নেই। বসন্ত এদিকে কংগ্রেসের পাণ্ডাস্থানীয় ব্যক্তি, যেরকম কাজ বা বক্তৃতায় জেল হয় সেগুলি বাদ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করে, খদ্দর পরে, নেতাদের সঙ্গে মেশে, সভায় সভাপতিত্ব করে, চরকা প্রচারে, নাইট স্কুল চালানোয়, ডোবা পুকুর সাফ করানোর কাজে, কুইনিন বিলানোয়, ভাল বীজের নমুনা আনিয়ে বিঘাখানেক জমিতে ভাল চাষের নমুনা দেখানোয়, ষাঁড় আনায় সাহায্য ও সহযোগিতা করে। সারা জেলায় আর তার আটুলিগাঁয়ে খাজনা বন্ধের তোড়জোড় দেখে বসন্ত ও তার অনুগত কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী ভড়কে গিয়েছিল। তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহ ছিল আরেকটা ভয়ের কারণ, আগে কখনো তারা এভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। আর এমন আশ্চর্য ব্যাপার, বড় লোক নয়, নামকরা লোক নয়, গেরস্ত চাষী ধীর সংযত ধনদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল আটুলিগাঁর খাজনা বন্ধের নিয়ন্তা। সে যোগ না দিলে ভাগ হয়ে যেত আটুলিগাঁর চাষী সমাজ, অত প্রচণ্ড হত না আন্দোলন, মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ফেঁসে যেত। জ্ঞানদাসের জন্ত ধনদাসকে খাজনা বন্ধে যোগ দিতে হয়। লোকটার ভাই অন্ত প্রাণ।

অদ্ভুত আশ্চর্য সেই দিনগুলি, ভয়ানক দিনগুলি, মনে গাঁথা হয়ে আছে পাঁচুর। পাকাকে যে ছাড়া ছাড়া ঘটনার গল্প বলে, কোন বাড়ী পুড়েছিল, কার ঘরের লোক মরেছিল, দেখিয়ে দেয়। জ্ঞানদাস ও ধনদাস পাঁচুর মতই উল্টোপাল্টা এলোমেলো টুকরো টুকরো বর্ণনা শোনায়। শুনতে শুনতে কল্পনায় সাজিয়ে গুছিয়ে এক বিরাট অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থানের, এক আশ্চর্য সংগ্রামের কাহিনী গড়ে তোলে পাকা, শনখড় মাটির কুঁড়ে ঘরের এই আটুলিগাঁ ছিল যার আস্তানা, খালি গা খালি পা এই শান্ত নিরীহ মূক চাষীরা ছিল যার অংশীদার। জীবনে আর এমন কাহিনী শোনে নি পাকা। আটুলিগাঁ তার চোখে বদলে যায়।

হয়নি কিছু, ধনদাস বলে নারকেল ছোবরা পিজতে পিজতে, তবে হ্যাঁ, মিছে মন কষা-কষিটা কমতি দেখা যায়। অতটা কথায় কথায় বিবাদ করা মামলা করা নাই। আর, অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বলে, মেজাজ খানিক গরম হয়েছে সবার, তেজ বেড়েছে। দু'টা চড় চুপচাপ সয়ে যাবে তো তিনটে চড় সইবে নি। মোদের চাষীবাসীর মস্তি গায়ের জ্বালা কম ছিল, শোকতাপে মরি তো গা জ্বলবে কিসে? জ্বালাটা বেড়েছে ইদানীং, ইদিকে ফের শোকতাপে ঝাঁঝ কম, দুঃখু কম।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে মুখ তুলে সে তাকায় ভাই-এর দিকে। এ ভাষা ভাল বোঝে

না পাকা। তবে জানে যে তাব অভিধানে শব্দ আর সংজ্ঞাগুলির যে মানে, ধনদাসের মানে তার চেয়ে আলাদা। মোটামুটি বক্তব্যের তাৎপর্যটা সে ধরতে পারে, গভীরতা এড়িয়ে যায় তাকে। জ্ঞানদাসের কথারও অনেকখানি মর্মার্থ দুর্বোধ্য থেকে যায়। বড় ভায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে অথবা সমর্থনে সে ফসলের কথা তোলে সেটাই ধরতে পারে না পাকা!

জ্ঞানদাস বলে, কদিন হল ধান ঘরে তুলেছি মোরা? এর মন্থি যেন ঢুকে বুকে গেছে সব কিছু, যেন বাছুর মরা গাই, বাস্, আর কি রইতে পারে? তা কি করবে মানুষ বলতে পার? পেটের তাপে গা জ্বালায় তা শোকতাপ কি, অদেষ্ট কি। ভিতরে ঘা, তো বাইরে মলম দিলি জুড়ায়? ও শাস্তির কাজ না।

বটে তো, বটে তো, ধনদাস বলে, তবে কিনা না হক ঘাঁটায়ে লাভটা কি, তাই বলি। হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না তা সে পয়সা বল, বীরপনা বল। অন্যায় তো ছিল আছে রইবে জগতে, না কি কি স্বগ্গ হবে পিথিমী? সইবে না তো হিসেব কর লাভ কি লোকসান কত, না তো দশটা সইবে আর একটার বেলা সইবো না বলে ক্ষেপে উঠে ক্ষেতি করবে আপনার, উয়া বোকার কাজ, গোঁয়ার্তুমি। যুধিষ্ঠির লড়ে নি, মারেনি শত্তুর কুরুক্ষেত্রে? তা ফের গাল অপমান সয়েও ছিল দুয্যধনের ঠাঁই ঘাড়টি হেঁট করে।

পাকার মুখের দিকে চেয়ে বলে, ধরনা কেনে, মিত্যু ভয় নাই, মস্ত সাহসী পুরুষ একজনা— তাই বলে কি খালি হাতে লড়তে যাবে বাঘের সাথে যেচে যেচে?

না তো কি বাঘে ধরলে নাক কান বুঁজে মরবে চুপচাপ? জ্ঞানদাস বলে গরম হয়ে।

কথা বোঝে না, রাগে শুধু! ধনদাস হাসে, বললাম না যেচে যেচে যাবে? বাঘে ধরলে কথা কি, এমনিও মরবে, ওমনিও মরবে, মর বাঁচো লড়ো তখন, বাস্। থামকা বাঘ ঘাঁটাতে যেয়ে মোর কাজ, বাঘ মারার কলকাটি না জেনে?

অতিথির জন্য ভগা জেলেকে কিছু মাছ দিতে বলেছিল ধনদাস, দাম দেবে, তবে পয়সায় নয়, মাছে। ধনদাসের ডোবাটা কয়েকদিন পরে আরও খানিক শুকোলে যখন ছাঁকা হবে তখন। দু'গণ্ডা বড় বড় কই আর মস্ত একটা শোল মাছ দিয়ে গেল ভগা। তার সারা গায়ে চুলকানি। একটু তেল চেয়ে নিয়ে সে গায়ে মাখে। গায়ে তেল মাখার বড় সখ ভগার। তার বিশ্বাস, দুটো দিন সারা গায়ে ঘষে ঘষে ভাল করে তেল মাখতে পেলে চুলকানি সেরে যেত।

মাছ নিয়ে যেন ভোজের সমারোহ আজ ধনদাসের ঘরে, অতিথির কল্যাণে প্রাণ ভরে মাছ খাওয়া। মাছখাওয়া বিলাসিতা চাষীর ঘরে। সুজলা বাংলার নদীময় জলময় পূর্বাঞ্চলেই ভারি মাছ খায় চাষী, এ অঞ্চলে তো তেমন নদীনালাই নেই, জলাভাব। পাকা খাবে কই, বাড়ীর লোক শোলমাছ। ওবেলার জন্যে জীয়ানো থাকবে কই মাছ, অতিথির কল্যাণে আজ দুবেলাই রান্না। চাষীর ঘরে দুবেলা রান্না হয় কদাচিৎ, দুবেলাই যারা খায় টেনেটুনে, তাদেরও নয়। এত শালগাছ গাঁয়ের পাশে বনে, এত কাঠ চালান দেয় পত্তনিদার জানকীরাম, অথচ জ্বালানির অভাব আটুলিগাঁর মাটির ঘরে। বনের পাতা পর্যন্ত কুড়িয়ে এনে জ্বালানো বারণ। কাঠি দিয়ে গোল করে গাঁথা শালপাতা যে চালান যায় রাশি রাশি তাতে ঝরা শুকনো পাতা দরকার হয় না, পরিপক্ক সবুজ পাতাই লাগে, তবু সে তার শ্রীশ্রীভগবানের সৃষ্টি বনটির ঝরা পাতা গাঁয়ের গরীবদের কুড়িয়ে নিতে দেবে না। পাতা কুড়ুনিরা অবশ্য পাতা কুড়িয়ে আনে, তাদের

ঠেকাবার জন্ত পাহারা রাখেনি জানকীরাম, মাঝে মাঝে তার লোক ধরে পিটিয়ে দেয়। রামুর মা আর রামুকে ধরে কাপড় কেড়ে নিয়ে উলঙ্গ করে বনে ছেড়ে দিয়েছিল, পাতা ঝেঁটিয়ে ভরে আনার ছালাটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। সারাদিন বনে কাটিয়ে রাত্রে তারা গাঁয়ে আসে।

নিছক বজ্জাতি নয়, মানে একটা আছে, অধিকার জাহির করা। কয়েকঘর সাঁওতাল বাস করে গাঁয়ে, সামান্ত কিছু জমি আছে, চাষ করে শিকারে যায় কুলিও খাটে। বিনামূল্যে কাঠের দাবী তুলে ওরা বরাবর গোলমাল করে এসেছে। গত আন্দোলনের সময় সমস্ত আটুলির্গাঁ সে দাবী আপন করে নেয়, আপন ইচ্ছায় আপনা থেকে বনে গজিয়েছে গাছ, তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন, আর কিছু না হোক অন্তত জ্বালানি কাঠ তাদের চাই। জোর করে কাঠ কেটে নিয়ে যেত সকলে, ঘরের সামনে এই প্রকাশ্ত রোদে শুকোতে দিত, মানুষের এই সামান্ত আদিম অধিকারটুকু আদায় করে যেন বড় অহঙ্কার হয়েছে! আসল আন্দোলন বন্ধ হবার পরেও এই হাঙ্গামার জের চলেছিল অনেকদিন।

অত সাধের শোল মাছটি নিয়ে এক হাস্তকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বিকালেও পিসী খাড়া ছিল, হেঁটে বেড়িয়েছে, সংসারের কাজকর্ম করেছে, সকালে হু হু করে কাঁপিয়ে তার এসেছে জ্বর। কাঁথা চাপা দিয়ে পিসীকে চেপে ধরে আছে পাঁকা, এ ম্যালেরিয়া আসবার সময় এমন কাঁপায় যে প্রথম দিকে একজন ধরে না রাখলে রোগীর যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে মনে হয়। পাঁচুর মা র াধছে। মাছ নিয়ে উঠোনে কাটতে গেল সারদা, শোল মাছটা বড় দাপড়াচ্ছিল, গলাটা কেটে রেখে সে ছাই আনতে গেছে রান্নাঘরে, দু'দণ্ড বুঝি দেরী হয়েছে আখা থেকে সত্ত টেনে তোলা ছাইয়ের জ্বলন্ত কয়লাগুলি জলের ছিটা দিয়ে নিভিয়ে নিতে, এই অবসরে দিনের বেলা খিড়কি দিয়ে শেয়াল এসে মাছটা মুখে করে নিয়ে গেল!

পাঁচুর ছোট ভাই নাচু চেঁচাল : শ্যালে মাছ নে গ্যালো গো!

একটা হৈ চৈ হয়। লাঠি হাতে শেয়ালের পিছনে ছুটবার আগে জ্ঞানদাস একটা ছোটখাট চড় বসিয়ে দেয় সারদার গালে। পাকা নির্বিকার মুখে তাকিয়ে থাকে। পাঁচু কিন্তু লজ্জায় মরে যায়।

ধনদাস সংক্ষেপে বলে, বীরপুরুষ!

মোর কি দোষ? ভাসুরের দিকে পিছন ফিরে পাঁচুর মাকে উদ্দেশ করে গলা ছেড়ে চেঁচায় সারদা, হাঁ দিদি, মোর কি দোষ? ছাই আনতে রসুই ঘরে গেছি—

খানিক পরে মাছটা ফিরিয়ে আনে জ্ঞানদাস। শেয়ালটি কাছেই বাঁশঝাড়ের অধিবাসী, ভাইপো ভাগ্নে সমেত সদলবলে জ্ঞানদাসকে হৈ হৈ করে তেড়ে আসতে দেখে বাঁশঝাড়ে মাছটা ফেলে পালিয়ে গেছে।

হাঁঃ, সারদার সামনে মাছটা ফেলে দিয়ে সগর্বে হেসে বলে জ্ঞানদাস, কার ঘরে মাছ চুরি করতে এয়েছিল শালার শ্যাল জানবে কি!

ধনদাস বলে, অঃ, বীরপুরুষ!

মুখখানা খুশিতে ভরে গেছে সারদার, চাপা গলায় সে জ্ঞানদাসকে শুধোয়, দু'ঘা লাগিয়েছো?

মাছ যখন রান্না চড়িয়েছে পাঁচুর মা, বসন্তের লোক অর্জুন একটা পাঁচসের রুই এনে দাওয়ায় ফেলে দেয়। বসন্ত পাঠিয়েছে পাকার জন্য।

ছেলেমেয়েরা কলরব করে ওঠে মাছ দেখে, জ্ঞানদাসের ধমক খেয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। বিপন্নের মত ঘাড় চুলকায় ধনদাস, চোখ তুলে তুলে তাকায় জ্ঞানদাসের দিকে। অর্জুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসে। ধনদাসের বাড়ীতে বসন্তের মাছ পাঠানোর মধ্যে যেন তার নিজেরও রসিকতা আছে। তার ভৈরবমামার প্রভাব প্রতিপত্তির বহরে একটু যে গর্ব অনুভব করে না পাকা তা নয়, তবে ঠিক যেন সুখী হতে পারে না। তাকে নিজের বাড়ীতে একবেলা খেতে বলতে পারত বসন্ত, বলে নি। ধনদাসের বাড়ীর অতিথিকে নিজের বাড়ীতে ডেকে খাওয়ালে গাঁয়ের লোকের কাছে মান থাকবে না। তবে মাছ পাঠানো চলে, চাকর দিয়ে একটা মাছ পাঠিয়ে দেওয়া চলে। কাল যে জ্ঞানদাসকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে মারা হয়েছিল সেটা বোধ হয় এসব গণনায় আসে না? পাকা জানত না যে শুধু মানের কথা নয়, তাকে ঘরে ডেকে খাওয়ানোর মধ্যে জাতের প্রশ্নটাও এসে পড়েছে। তার ধনদাসের বাড়ীর মেয়েদের রান্না ভাত খাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে ভদ্রাভদ্র সমাজে। শহুরে বাবুর ঘরের ছেলে সে জাত বিচার মানে না ধরে নিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে চাষীরা, ওপর জাতের কেউ যদি নিজের জাত না বাঁচিয়ে চলে তো ধর্মের কাছে অপরাধের ভয়ে যেচে তার জাত বাঁচাতে তেমন আর তাদের মাথাব্যথা নেই। ওপর জাতেরা কিন্তু চটেছে গাঁয়ের, সে ভৈরবের ভাগ্নে বলে মনে মনে বেশী চটেছে। শহরে ফিরে গিয়ে কদিন পরে আবার ঘুরে এলে পাকার সঙ্গে খেতে সেরা বামুনও আপত্তি করবে না আটুলিগাঁর, ধনদাসের বাড়ীতে তার এবারের জাত নষ্ট হওয়াটা ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী হয়ে চাপা পড়বে, কিন্তু এখন সদ্য সদ্য ধনদাসের বাড়ী থেকে ডেকে এনে তাকে ভোজন করালে নিন্দা হবে বসন্তের! ধনদাসের চেয়ে জাতে বসন্ত উঁচু নয়, তবু! পাঁচুর কাছে পরে এসব জটিল বিবরণ শুনেছিল পাকা।

জ্ঞানদাসের সংযমও আছে। পাকার দিকে চেয়ে সে সশব্দে তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ে, হঠাৎ কিছু বলে না। দু'ভায়ের ভাব দেখে হাসিটা মিলিয়ে যায় অর্জুনের, রসিক রসিক কথাও বন্ধ হয়।

অর্জুন বলে, দোমনা ভাব দেখি? ও বুদ্ধি কোরো না বাবু, চাপান দাও, কত্তা নিজে দাঁড়িয়ে মাছ ধরিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। শোন বলি কথা, মন করে যে সামলে সুমলে চল যদি দুভাই, কত্তা আর পিছে লাগবেন না গায়ে পড়ে। কত্তার মন ভাল।

অর্জুন চলে যাবে, জ্ঞানদাস ডেকে বলে, মাছ নিয়ে যা অর্জুন।

ধনদাস বলে, আঃ থাম না। মাছ মোদের নয়। মোদের পাঠায় নি মাছ।

যাকে পাঠিয়েছে সে তবে নিক। যা খুশি করুক নিয়ে!

জ্ঞানদাস গটগট করে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়।

অপমান বোধ করে বৈকি পাকা। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে না। ধনদাস ঠিক কথাই বলে, ভাইটা তার গোঁয়ার। ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে মার দিয়ে রক্তপাত করে ছেড়ে দিলেও যার কিছু করার ক্ষমতা নেই, কথায় কথায় তার কেন এত তেজ? মার সয়ে নিঃশব্দে ফিরে এল, মাছ পাঠানোতে তার অপমান হয়েছে!

অর্জুন, মাছটা ফিরে নিয়ে যাও। দাঁড়াও, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

পাকা লেখে যে সে আজ শহরে ফিরে যাবে না, কাল যাবে, তাই মাছটা রাখল না। আজ ফিরে গেলে মাছটা নিয়ে যেত। বসন্ত মাছ পাঠিয়েছিল শুনে তার মামা খুব খুসী হবে!

চিঠি পড়ে একটু ভেবে বসন্ত সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে শহরে ভৈরবের বাড়ীর উদ্দেশে মাছটা রওনা করিয়ে দিল।

দুপুরে পাশাপাশি খেতে বসেছে পাঁচু ও পাকা, একটু তফাতে উবু হয়ে বসে ধনদাস তাদের খাওয়া দেখছে, জ্ঞানদাস কোথা থেকে এসে কাছের খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে বসে। হঠাৎ মুখ তুলে লজ্জিত হাসির সঙ্গে বলে, তুমি কিছু মনে কোরো না পাকাবাবু!

পাকার মনে ছিল না। সে বলে, কিসের?

মাছটা নিয়ে মোর চটা উচিত হয়নি কো। ঘাট মানছি, দোষ টোষ মনে রেখোনি। যে মোদের পাঁচু, সে তুমি, ঘবেব ছেলে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধনদাসের মুখ, ভাই-এর দিকে সগর্বে চেয়ে চেয়ে চোখে তার পলক পড়ে না।

পাকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, কাল তোমায় মেরেছিল কেন? পাঁচুব কাছে জেনে নেবে ভেবেছিল, জিজ্ঞাসা করতে খেয়াল হয়নি এপর্যন্ত।

জ্ঞানদাস মুখ খোলার আগেই তার হয়ে ধনদাস বলে, ভোটাভুটি আসছে না? মোরা পাত্রসা'র জগৎ পাণ্ডাকে ভোট লাগাব ইবারে, তাইতে কত্তার রাগ। ফের, এ গোঁয়ারটা সমিতিতে ঢুকে গেছে বারণ না মেনে, তাতেও রাগ। আগে থেকেও রাগ ছিল। বেগারের ছুতা করে মারলে কাল ছোঁড়াটাকে। তোমাকে বলি, তুমি বামুনের ছেলে, ভদ্দর ঘরের ছেলে তুমি, ও পাপীটা উচ্ছন্ন যাবে। উযার গতি নাই। বদ ঘা হয়েছে পায়ে, সর্বা খসে যাবে উয়ার।

ধীর শান্ত ধনদাসের আকস্মিক রূপান্তর চমকে দেয় পাকাকে। তার উগ্র ভঙ্গি, কথার হল্‌কা কল্পনারও অতীত ছিল। তুচ্ছ হয়ে যায় পাকা। তার লজ্জা করে!

ক্রমশঃ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-বিভাগের ছক

২০শে ফেব্রুয়ারির এটলী-ঘোষণার পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। লীগের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বও প্রদেশভাগেব প্রস্তাব আনিয়া চূড়ান্ত ভাগাভাগি দাবী করিয়াছেন। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা বড়লাট মাউন্টব্যাটেন নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথাবার্তা চালাইয়া তাঁহার মন্ত্রণাদাতা লর্ড ইস্‌মে-কে আগামী ঘোষণা

করিবার জন্ত বিলাতে মন্ত্রিদের কাছে পাঠাইয়াছেন। মে মাসের মধ্যেই নূতন ঘোষণা হইবে শুনা যাইতেছে।

ভারতের জনসাধারণের কাছে মূল প্রশ্ন হইতেছে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভ। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদেব কাছে প্রশ্ন হইতেছে ভাগাভাগিতে বৃহত্তম ভাগ পাওয়া, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রশ্ন হইতেছে নিজের ঘোষণা ও যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ভারতকে হাতে রাখা। বৃটিশের এক একটি ঘোষণার সঙ্গে থাপ খাওয়াইয়া নেতারা চলেন এবং নিজেদের বৃহত্তম সুবিধার জন্ত পাঁয়তাড়া করেন। ১৬ই মে, ৬ই ডিসেম্বর, ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বারই ইহাই ঘটিতেছে। ফলে দেশে বিরোধ বাড়িয়াছে, বৃটিশের উপর নির্ভরশীলতা পাকা হইয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণা সবচাইতে সেরা ঘোষণা। দুইতরফের নেতারাই ইহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। যেমন ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণা, তেমনই ভালো (!) লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। একটি সংবাদপত্র লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সুদর্শন চেহারার তারিফ করিয়া মন্তব্য করেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের মুখের কার্টুন হয় না। ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণা প্রথমত ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট তারিখ দিয়া দিল। দ্বিতীয়ত ইহা একদিকে যেমন লীগকে পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও আসামের মন্ত্রিসভা দখলের প্রেরণা দিয়াছে, তেমনি অপরদিকে কংগ্রেসকে পাঞ্জাব বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গে প্রবৃত্ত করিয়াছে। তৃতীয়ত ইহা দেশীয় রাজন্যবর্গকে পৃথক থাকিবার উৎসাহ যোগাইয়াছে। এটলী-ঘোষণা ভারতে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রতিযোগিতা মারফৎ কংগেস, লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রত্যেককেই ভারতব্যবচ্ছেদের পথে অনিবার্যভাবে টানিয়া আনিতেছে।

কংগ্রেসনেতৃত্ব অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতবর্ষের যতখানি এলাকায় ক্ষমতা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা ভাল। পরে আরও অগ্রসর হওয়া চলিবে। বারো আনা পরিমাণ ভারতবর্ষ যদি এখন হাতে পাওয়া যায়, বাকী কয়েক আনা পরে আয়ত্ব করা তত মুস্কিল হইবে না। লীগনেতৃত্ব ভাবিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের মন্ত্রিত্ব যদি, দখল করা যায় এবং সীমান্ত ও আসামে যদি কমপক্ষে অচল অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে পাকিস্তান চৌদ্দ আনা হাসিল হইয়া যায়। দেশী রাজারা সুযোগ বুঝিয়া গণতান্ত্রিক সংস্কার বন্ধ করিয়া গ্যাট হইয়া বসিয়াছে।

কংগ্রেসনেতাদের সর্বাপেক্ষা বড়ো ভুল হইল যে, তাঁহারা লীগকেই একমাত্র ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ধরিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা তাঁহাদের নজরে থাকে নাই। ভারত সম্পর্কে বৃটিশেরও যে একটা প্ল্যান আছে এবং তাহা যে এটলীর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী, সে কথা তাঁহারা খেয়াল করিতেছেন না।

পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতনের পেছনে লর্ড জেন্‌কিন্সের হাত যে ছিল, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কংগ্রেস নেতারা অনেকেই বলিয়াছেন কিন্তু পহেলা শ্রেণীর নেতারা সে বিষয় উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাঁহারা সম্ভবত এখন বৃটিশকে ঘাঁটাইতে চান না। এইবার বড়লাট যখন সীমান্ত প্রদেশে গেলেন, তখন কংগ্রেস নেতারা খুব আশা করিয়াছিলেন যে ইহাতে লীগ অপদস্থ হইবে এবং সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সুরাহা হইবে। বড়লাটের আচরণে এই সর্বপ্রথম দিল্লীর কংগ্রেসী সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমস' সন্দেহ করিবার

কারণ দেখিতেছেন। কংগ্রেস নেতাদের এমন সন্দেহও হইয়াছে যে এত ভালো বড়লাটেরও মনে ও মুখে গরমিল আছে। হয়ত তিনি সীমান্তে কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া লীগের প্রার্থনা মাফিক ৯৩-তন্ত্র ও পুনর্নির্বাচনের পথ লইবেন। সীমান্তের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সন্দেহজনক ভাবগতিক ছাড়াও বড়লাট এবার আফ্রিদি প্রভৃতি উপজাতিদের তোয়াজ করিয়া আসিয়াছেন এবং এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সরাসরি বৃটিশের স্থায়ী কর্তৃত্বেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বৃটিশের উপর নির্ভর করা যায় কি না সে বিষয়ে যেমন সন্দেহ আসিয়াছে (এবার বোধ হয় ওয়াভেলের মত মাউন্টব্যাটেনেরও কার্টুন করা সম্ভব হইবে) তেমনই প্রস্তাবিত পাঞ্জাব বিভাগ লইয়াও গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। মূলত শিখদের উপর নির্ভর করিয়াই পাঞ্জাব বিভাগের আন্দোলন হয়। পাঞ্জাবের যে বারোটি জেলা লইয়া অমুসলিম পাঞ্জাব গঠনের কথা চলিতেছে, তাহাতে অধিকাংশ শিখই বাহিরে থাকিয়া যায়। শিখনেতারা এরকম পাঞ্জাব বিভাগে মোটেই সন্তুষ্ট নহেন। কেহ কেহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ না করিয়া সম্পত্তির পরিমাপ করিয়া সুবিধামত পাঞ্জাব ভাগের অসম্ভব দাবী তুলিতেছেন। কারণ তা না হইলে শিখ-সমস্যার সমাধান হয় না। এই দিক দিয়া তাঁহারা বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল দাবী করিতেছেন।

বঙ্গবিভাগের ব্যাপাটাও বেশ জটিল। কোন কোন হিন্দু নেতা যেভাবে বাংলাভাগ করিতে চাহিতেছেন, তাহা পাঞ্জাবের আকালী নেতাদের মতই অসম্ভব দাবী। একটু স্থূলভাবে বর্ণনা করিলে তাহা নিম্নরূপ দাঁড়ায়। প্রথমে হিন্দুগরিষ্ঠ বিভাগ হিসাব করিয়া তাঁহারা বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ চাহিতেছেন। তারপর তাঁহারা বলিতেছেন যে ইহা তো হইল, এবার বাকী বাংলার মধ্যে জেলাগুলি ভাগ করা যাক। সেই দিক দিয়া তাঁহারা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং দাবী করিতেছেন। ইহার পর বাদবাকী বাংলা হইতে হয়ত তাঁহারা হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ মহকুমাগুলি চাহিবেন।

এই দাবী করা যেমন অসঙ্গত এবং অসম্ভব, তাহা অপেক্ষাও ইহাতে বৃটিশ প্ল্যান সম্পর্কে অজ্ঞতা নিতান্ত শোচনীয়। কারণ বাংলাভাগের কর্তা আসলে বৃটিশ, তাহার প্রয়োজন ও মর্জির উপর বাংলাভাগ আদপেই হইবে কিনা এবং হইলে কিভাবে হইবে তাহা নির্ভর করে।

লীগ নেতৃত্ব বৃটিশ প্লান সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশী সচেতন। বৃটিশ প্লানের সহিত না মিলিলে যে লীগের দাবী উপলব্ধি করা অসম্ভব একথা লীগনেতৃত্ব জানেন। এবং বৃটিশ প্লানের সঙ্গে লীগনেতৃত্বের প্লানের মূল জায়গায় মিল আছে। তাহা হইতেছে, হয় অতি দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন হোক, অথবা ভারত বিভাগ করিয়া বৃটিশ মধ্যস্থতায় যোগাযোগ রক্ষা করা হোক। সেই দিক দিয়া কংগ্রেসের লক্ষ্যের সহিত বৃটিশ প্লানের আগাগোড়া গরমিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য ভারত ব্যবচ্ছেদ না করিয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

যেমন কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে বৃটিশের প্লান আছে, তেমনই বাংলা ও আসাম লইয়া এবং বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত লইয়া বৃটিশের প্লান আছে। ১৬ই মে-র ঘোষণায় দুর্বল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপশাসনের প্রস্তাব আছে।

বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ে ১৬ই মে-র পরিকল্পনার পরিবর্তনের দাবী উঠিয়াছে। প্রথমত, সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্র না রাখিয়া সম্পূর্ণ ভারত বিভাগ। দ্বিতীয়ত, বাংলা-আসাম গ্রুপের স্থানে হিন্দুবঙ্গ, মুসলিমবঙ্গ ও আসাম তিনটি পৃথক প্রদেশ করা। তৃতীয়ত, পাঞ্জাব-সিন্ধু-সীমান্ত ও বেলুচিস্তান গ্রুপের স্থানে পাঁচটি পৃথক প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

ইহা অত্যন্ত পরিস্কার যে সি-গ্রুপের জায়গায় তিনটি পৃথক প্রদেশ করিলে বৃটিশ পুঁজির মূল ঘাঁটি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বাংলা-আসাম অঞ্চলে বৃটিশের পথে জটিলতা ও অসুবিধা বাড়ে। পাঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কেও সেই একই কথা *। তাই যাহা বৃটিশের পক্ষে বেশী সমীচিন ও সম্ভবপর মনে হয়, তাহা হইতেছে (১) কেন্দ্রীয় শাসন না রাখিয়া ভারত বিভাগ, (২) বৃটিশের হাতে কেন্দ্রীয় যোগাযোগের দায়িত্ব, (৩) বঙ্গভঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভাগ না করিয়া 'সি' ও 'বি' গ্রুপে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক অটোনমির কাছাকাছি কোন ব্যবস্থা এবং শিখদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। এইরকম ব্যবস্থাই বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সম্ভবত এইদিকে লক্ষ রাখিয়াই মিঃ জিন্না আবার জোরগলায় ছয়টি প্রদেশ দাবী করিয়াছেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদী সর্বসাধারণের কাছে মূল সমস্যা ভারত বিভাগ বন্ধ করা। প্রদেশ বিভাগ দাবী করিয়া তাঁহারা বৃটিশ কুটনীতির কাছে এই দফায় পরাস্ত হইয়াছেন। বৃটিশ কুটনীতির স্বরূপ সম্পর্কে নূতন শিক্ষালাভ করিয়া আবার তাঁহাদিগকে ভারত ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতে হইবে। বৃটিশ প্লানের ভারতবিভাগের ছকে খেলিতে গিয়া বাজী জিতিবার বদলে কংগ্রেসের আজ প্রায় চালমাৎ অবস্থা।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

সংস্কৃতি-সংবাদ

'ধরতি-কে লাল'

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের এবারকার বার্ষিক সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল 'ধরতি-কে লাল' ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী। এই ছবির রচনা, প্রযোজনা, চিত্রগ্রহণ ও অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই গণনাট্য সংঘের কর্মী এবং ঘনিষ্ঠ দরদী; সুতরাং 'ধরতি-কে লাল' একান্তভাবে গণনাট্য সংঘেরই ছবি। অভিনয় ও ব্যবহারিক শিল্পকলাকে তাদের সামাজিক প্রয়োজনে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার কাজে এই সংঘ যে

* বঙ্গ বিভাগে মূল সমস্যা কলিকাতা, পাঞ্জাব বিভাগে মূল সমস্যা শিখ। প্রদেশ বিভাগ করিয়া বৃটিশ কোনদিকই রক্ষা করিতে পারিবে না।

শুধু মঞ্চেই নয়, চলচ্চিত্রেও আর সকলের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী—'ধরতি-কে লাল' তার প্রমাণ। এদেশের সিনেমা জগতে এরকম ছবির আবির্ভাব নানা কারণে অভিনন্দনযোগ্য। বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে আর তার বাস্তব রূপদানে অতি-নাটকীয়তা বর্জন করেও নাটকীয় সংগতি রক্ষার কৃতিত্বে এই ফিল্ম্‌খানা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'ধরতি-কে লাল' সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবি নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন পথের প্রদর্শক হিসেবে তার দাবী অনস্বীকার্য।

তেরশ পঞ্চাশের বাংলার মহামন্বন্তর এই ছবির বিষয়বস্তু। বুভুক্ষু দুস্থ কৃষক জনতা এর পাত্রপাত্রী। মাটি যাদের মা, আর মাঠ যাদের মিতা, বাংলার সেই সরল জোয়ান চাষীদের আর শ্যামলী গ্রামবধূদের পিদীমজ্বলা সংসারের আঙিনা, লাঙল-চষা ক্ষেত, দুর্ভিক্ষের আগুনে পুড়ে-খাক-হওয়া কুঁড়েঘর এই কাহিনীর অবলম্বন। গ্রামবাংলার সেই কাব্যরসাশ্রয়ী জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-শান্তি, হতাশা আর সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনায়, প্রযোজনায়, অভিনয়ে 'ধরতি-কে লাল' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাব্যরস পরিবেশন করেছে। বলা বাহুল্য, গল্পের দিক থেকে 'ধরতি-কে লাল' 'নবান্ন'-নাটকেরই অল্পবিস্তর রকমফের। বিজন ভট্টাচার্যেরই 'জবানবন্দী' ও উর্দু-লেখক কৃষণ চন্দরের 'অন্নদাতা' থেকেও কয়েকটি দৃশ্য নেওয়া হয়েছে। বাংলার গ্রাম্য চাষীজীবনে অতিবৃষ্টি আর বন্যার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহামারী, গ্রাম ছেড়ে শহরের ফুটপাথে এসে ফ্যান ভিক্ষার মর্মান্তিক বৃত্তান্ত, ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে নারী দেহ ক্রয়ের হৃদয়হীনতা, সাম্প্রদায়িক রিলিফ কিচেনের পরিহাস, ইত্যাদি, ঘটনা পরম্পরার এই বিরাট তালিকা—যা তেরশ পঞ্চাশের বাংলার ইতিহাস—সেই ইতিহাসই এই গল্পের ভিত্তি। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ইতিহাসের সঙ্গে এই শিল্পগত যোগাযোগ থাকার ফলে 'ধরতি-কে লাল' একটা 'এপিক্ কোয়ালিটি' অর্জন করেছে, যা প্রায় 'গুড্ আর্থ'-এর মত ছবির সঙ্গে তুলনীয়। সবচেয়ে বড় কথা—দেশের জনতার বাস্তব জীবন সিনেমায় এই প্রথম প্রতিফলিত হল। প্রযোজনায় খাঁটি সমাজবোধটুকু আছে বলেই প্রধান, রমজান, রাধিকা, নিরঞ্জন—এরা সবাই ব্যক্তি-চরিত্র থেকেও অগণ্য চাষী সাধারণের প্রতিভূ আর প্রতীক হয়ে উঠেছে। তেরশ পঞ্চাশের নিদারুণ ইতিহাস সার্থকভাবে সিনেমায় এই প্রথম ব্যবহৃত হল।

গল্পের যোগসূত্রটা অনেক জায়গায় শিথিল মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে—সেই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপকতাকে সুদৃঢ় গল্পের গাঁথুনীতে আগাগোড়া সমানভাবে নাটকাশ্রয়ী করে রাখা কত কঠিন। এই খানেই গণনাট্য সংঘের শিল্পী-গোষ্ঠীর কৃতিত্ব আরো বেশী লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আশ্চর্য অভিনয়ের গুণে কাহিনীর ত্রুটি প্রায় সবই ঢাকা পড়েছে। বাঙালী চাষীঘরের লজ্জাশীলা, গুরুজনভীতা, মাধুর্যময়ী ছোট-বৌ রাধিকার ভূমিকায় তৃপ্তি ভাদুড়ী, নিঃসন্তান বড়-বৌয়ের হিংসা আর স্নেহের মানসিক দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিতে দময়ন্তী সাহ্নী, লম্পট শহুরে বাবুর ভূমিকায় ডেভিড্ কিংবা শান্ত, সংহত, দৃঢ়স্বভাব বড় ভাইয়ের খাঁটি বাঙালী চরিত্রে বলরাজ সাহ্নীর অভিনয় অনবদ্য। শম্ভু মিত্র (প্রধান), আর প্রধানের স্ত্রীর ভূমিকায় উষা দত্তের অভিনয় যে কোন পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনে ঈর্ষা জাগাতে পারে। দময়ন্তী সাহ্নীর অভিনয়ে যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা আর তৃপ্তি ভাদুড়ীর অভিনয়ে যে সংযত, মধুর একটি ব্যক্তিত্বের লিরিক্যাল গুণটুকু ফুটে উঠেছে, তা বোধ হয় একমাত্র গণনাট্য সংঘের শিল্পীর পক্ষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব; দেশের জনতার দৈনন্দিন জীবনের থেকেই তাঁরা শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পান, দেশের মানুষকে চেনেন বলেই তার চরিত্রকে তাঁরা এমন ভাবে মূর্ত

করে তোলেন। গভীর বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে, দময়ন্তী সাহ্‌নী আর বেঁচে নেই ; সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রের এই অক্লান্ত কর্মী ও প্রতিভাময়ী আর্টিস্টকে আমরা অত্যন্ত অকালে হারিয়েছি ; তাঁর মৃত্যুতে গণনাট্য সংঘের কর্মজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি থেকে গেল।

'নবান্নের' সঙ্গে তুলনায় অবশ্য 'ধরতি-কে লাল'-এর কয়েকটা ত্রুটি লক্ষণীয়। পঞ্চাশের সেই 'মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষের' পেছনে চোরাকারবারী আর মজুতদারের ভূমিকাটুকু এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। জমিদার আর মহাজনের লোভের আগুনে আমলাতন্ত্র যে ইন্ধন জুগিয়েছে সেই ষড়যন্ত্রের প্রতি ঘৃণাটাও তত জোরালো হয়নি। আর, চাষী দুস্থেরা গাঁয়ে ফিরে এল কি কেবল প্রধান মণ্ডলের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী শুনেই ? তাদের প্রত্যাবর্তনের উপলব্ধিটা যেন নির্মম সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না এসে, এল কয়েকটি ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য পরিচালনার আরো অনেক দোষ চোখে পড়বে। যেমন—অতি দুঃখের মুহূর্তে চাষী-বউ রাধিকাকে দিয়ে ঠুংরী ঢঙের মার্গ সঙ্গীত গাওয়ানো, নেপথ্যে 'আওরৎ লাও' ধ্বনির পুনরাবৃত্তির সিকোয়েন্সে রামু আর তার স্ত্রীর পুনর্মিলনের মেলোড্রামা, 'ভূখা হায় বাঙ্গাল' গানের একঘেয়ে উচ্চকিত সুর, ইত্যাদি। এই গানের দৃশ্যটি ছবির গতিকে এত বাহুল্য-ভারাক্রান্ত করে তুলেছে এবং এর পরিকল্পনাটা এত কাঁচা যে শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে দৃশ্যটা অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে। টেক্‌নিক্যাল ত্রুটিও আছে : বহির্দৃশ্যের ফটোগ্রাফিতে আলোক-সম্পাত রীতিমত অসমান এবং চক্ষু পীড়াদায়ক ; লং শট্‌ থেকে ক্রমান্বয়ে না এসে একেবারে হঠাৎ ক্লোজ আপ্‌-এ আসার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকায় কয়েক জায়গায় চোখকে হোঁচট খেতে হয় ; প্রধান মণ্ডলের মৃত্যুদৃশ্যে ক্যামেরার দৃষ্টি-কোণ এবং শেষ দৃশ্যে অতি-উল্লসিত নাচের কম্পোজিশনে সঙ্গতির অভাব বেশ একটু পীড়াদায়ক। সঙ্গীত-পরিচালনা তো একেবারেই হতাশ করেছে।

কিন্তু এসব ত্রুটি দর্শক উপেক্ষা করে যাবেন। নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'নবান্ন' যে সব কারণে রঙ্গমঞ্চে অভিনন্দিত হয়েছিল, 'ধরতি-কে লাল'ও সেই একই কারণে চলচ্চিত্র জগতে অভিনন্দনীয়। 'ধরতি-কে লাল'-এর বিষয়বস্তু আমাদের সিনেমায় এত নতুন, তার পাত্রপাত্রী এত বাস্তব, তার ঘটনা এত ইতিহাসাশ্রয়ী, তার আবেদন এত মানবিক, এবং দোষগুণ সব মিলিয়ে মোটের ওপর তার বক্তব্য এমন একটি উচ্চাঙ্গের আর্টের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, যে এই ছবি আমাদের সাম্প্রতিক ছায়াছবির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট শিল্পকীর্তি হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্র মজুমদার

গণনাট্য সঙ্ঘের সম্মেলন

বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ২৬শে এপ্রিল থেকে) কলকাতায় শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দের মূল সভাপতিত্বে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ('আই. পি. টি.-এ') সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে। কলকাতায় তখন নতুন করে 'গৃহযুদ্ধের' আগুন জ্বলছে। সঙ্ঘের উৎসব তাই সমোচিতভাবে অনুষ্ঠিত হবার কোনো সুযোগ নেই। দেশ-বিদেশের শিল্পী ও শিল্পীসঙ্ঘের বহু শুভাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ; প্রধানত তিন দিনের প্রতিনিধি সম্মেলনেই এবারকার অধিবেশন শেষ হয়। তা শেষ হলে সঙ্ঘের সাধারণ সদস্যদের পক্ষে একদিন 'ধরতি কে লাল' নামে এ সঙ্ঘের অভিনীত

বিখ্যাত বাকৃচিত্রখানা দেখবার সৌভাগ্য ঘটে। প্রতিনিধি সম্মেলনেও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল; গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছেন। মহারাষ্ট্র, গুজ্‌রাট, হিন্দুস্তান, বিহার, আসাম, অন্ধ্রের এসব প্রতিনিধিরা কেহ বা হিন্দু, কেহ মুসলমান। আজকের কলিকাতায় তাদের অবাধ গতায়াত, স্বচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়। নির্বিঘ্নে যে অধিবেশন হতে পেরেছে তাই যথেষ্ট।

গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখার সাধারণ কার্যবিবরণী থেকে জানা গেল—তাঁদের আশ্চর্য সাফল্য ও প্রকাশ কীভাবে এই দুর্যোগের দিনে ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে এসেছে 'গৃহযুদ্ধের' ভয়ংকর বাধা, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সুযোগ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়াশীলদের দুরন্ত বাধা। বোম্বাইতে সেখানকার কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় শিল্পীদলের অভিনীত কাশ্মীরের গণ-সংগ্রামের কয়েকটি সঙ্গীত বন্ধ করে দিয়েছেন, এসংবাদ আমরা দেখেছি। নৌ সেনাদের বিদ্রোহের কথা তাঁরা সাধারণকে মনে করতে দিতেও চান না, তা তো জানা কথাই। অবশ্য একদিকে গৃহযুদ্ধ যেমন চলেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রদেশে প্রদেশে চলেছে আজ জনতার সংগ্রামও। আর গণ নাট্যসঙ্ঘের জন্ম এই জনতার প্রাণ থেকে, তার নাড়ীর যোগ এই সংগ্রামের সঙ্গে। গৃহযুদ্ধে যেমন আমাদের সংস্কৃতি ও শিল্পসৃষ্টির বহু ঐতিহ্য বিপন্ন, প্রতিক্রিয়ার দমননীতিতে যেমন সুস্থ গণপ্রগতি ও সুস্থ জন-সংস্কৃতি বিপর্যস্ত, তেমনি সংস্কৃতি ও শিল্পের বাঁচবার পথও হল আমাদের মহান্‌ ও মিলিত ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখা, গণ-আন্দোলনের সম্মিলিত সংগ্রাম ও সম্মিলিত বিকাশ থেকে সেই সৃষ্টিধারার জন্য নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করা; সমস্ত দুর্যোগের মধ্যেও সৃষ্টির এই সুস্থ মিলনের বাণীকে সাধারণের সামনে শিল্পরূপ দান করা।

এবারকার অধিবেশনে এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছেন গণনাট্য সঙ্ঘ—আমাদের বিরাট দেশের মিলিত জীবনযাত্রা, তার অতীতের মিলিত সংগ্রামের কাহিনী এবং বর্তমানের জীবন্ত মিলিত সংগ্রামের সত্যকে দেশের সাধারণ লোকের চক্ষে তুলে ধরাই তাঁরা সম্প্রতিকার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

দুর্দিনের উল্লিখিত বাধা-বিপত্তির ফলেই 'গণনাট্য সঙ্ঘের' 'কেন্দ্রীয় শিল্পীদলের' প্রতিষ্ঠানও ভেঙে দেওয়া স্থির হয়েছে। কারণ, ওসব বাধায় তার ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হচ্ছিল না; আবার জনগণের জীবন্ত সংগ্রামের সত্য থেকে দূরে পড়ে গেলে এ শিল্পীদলের সাধনাও তার আসল প্রাণ-উৎস হারাত। তাই কেন্দ্রীয় দলের শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সুপরিণত কলাকৌশল নিয়ে এবার ফিরে যাবেন নিজ নিজ প্রদেশে—সেখানকার লোকশিল্পীদের সঙ্গে মিশে তাদের শিল্পধারাকে করবেন উন্নত, আর সেখানকার জীবন্ত গণ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে নিজেদের শিল্পবোধকে করবেন প্রাণবন্ত।

বাঙলার অনেক শিল্পীকে এবার আমরা তাই ফিরে পাব। এ মুহূর্তে বাঙলার শিল্প প্রতিষ্ঠানদের ভাগ্যে যে কি আর্থিক সংকট জুটেছে তা জানি। কিন্তু এই দুর্দিনকে বুঝে নিয়ে তা ছাড়িয়ে উঠবার মত শিল্পপথও আবিষ্কৃত হবে, এও আমরা আশা করি বাঙালী জনতার জীবনে এখনো আছে মিলিত সংগ্রামের উৎসাহ।

গোপাল হালদার

‘পথের দাবী’

শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ সম্প্রতি চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। ‘পথের দাবী’ ভারতবর্ষের এক বিশেষ রাজনৈতিক যুগের প্রতিনিধি – সে যুগ সন্ত্রাসবাদের যুগ, অগ্নিনালিকার মুখে, ফাঁসিকাঠে, দ্বীপান্তরে সে যুগের দাবী তার রক্তাক্ত স্বাক্ষর রচনা করেছিল। তারপর বহুকাল গত হয়েছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন পর্যায়ে এসে পৌছেচে, নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে—সে রূপ গণ-আন্দোলনের রূপ। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়, গণ অভ্যুত্থানের ব্যাপকতায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নিহিত—বর্তমান আন্দোলনের এই বিশ্বাস, এই উপলব্ধিই অভ্রান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ‘পথের দাবী’র বিচার নিরপেক্ষ না হবার সম্ভাবনাই বেশী, তার উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা তাই নিরর্থক নয়। কিন্তু সে যুগের আন্দোলনের এবং ‘পথের দাবী’র সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতাকে সর্বতোভাবে মেনে নিয়ে আলোচনা করাই সঙ্গত। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে আন্দোলন সংকীর্ণ ও মৃত, ব্যর্থতায় যা পর্যবসিত, আজকের দিনে তাকে চিত্রে রূপান্তরিত করে জনসাধারণের সামনে হাজির করার সার্থকতা কোথায়?

সেদিনকার আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে কি না, সে আলোচনার স্থান আলাদা। সেই মুষ্টিমেয় দধীচিদের পথ ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু পরাধীন জাতির যে সুতীব্র মুক্তিকামনা আর বিদেশী শাসকের প্রতি অসহনীয় ও জ্বালাময় বিদ্বেষ সেদিন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছিল, আজও সে কামনা ও বিদ্বেষের সমাপ্তি হয়নি, বরঞ্চ সেদিনের মুষ্টিমেয় হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পরে কোটি কোটি হৃদযে তা আজ পরিব্যাপ্ত, সে কামনা ও বিদ্বেষ আজ লক্ষ গুণ তীব্র।

তাই, মুক্তির সেই সুতীব্র কামনা ও বিজাতীয় শাসনের প্রতি জ্বালাময় বিদ্বেষকে চিত্রে রূপান্তরিত করার সার্থকতা অপরিসীম। এই দিক থেকে বিচারে ‘পথের দাবী’র চিত্ররূপ সার্থক হয়েছে। বর্তমানের জাতীয় নেতৃত্ব আজ বিভ্রান্ত, বিদেশী শাসকের ছলনায় ভুলে প্রায় দুশো বছরের অকথ্য নির্যাতনের কথা বিস্মৃত হয়ে আপোষের পথে পা বাড়িয়েছে, হাত পেতে দিয়েছে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দান হিসাবে ‘স্বাধীনতা’ পাবার জন্য। আজকের এই পটভূমিতে ‘পথের দাবী’র সব্যসাচী শুধু মৃত মতবাদের প্রতীক নয়, নিঃসন্দেহে আপোষহীন অগণিত জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস। বিদেশীর বুটের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী সব্যসাচী আওড়াতে চায়নি, সংস্কারকে উচ্ছেদ বলে মেনে নিতে চায়নি, কারাগারে আবদ্ধ থেকে সেই কারাগারেরই পরিসর বাড়িয়ে দেবার আবেদনের হীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি।

চিত্রে ‘পথের দাবী’কে যথাযথ রাখবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চিত্রনাট্যকার যে সংযম ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য। গল্পের গতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য প্রশংসনীয় ও শিল্পোচিত ইঙ্গিতের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছেন। গল্পাংশ আগাগোড়া দর্শক-মনকে টেনে রাখে, অভিভূত করে। ‘পথের দাবী’র মত বড় উপন্যাসের এই রকম সংযত ও সুষ্ঠু চিত্ররূপ রীতিমত কৃতিত্বের দাবী রাখে। ‘সুমিত্রা’ চরিত্রে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয়েছে। এই

স্বাধীনতাটুকু না নেয়াই শোভন ও সঙ্গত ছিল। উপন্যাসে সুমিত্রা শেষকালটায় তার স্বদেশ সুমাত্রায় ফিরে যাওয়া স্থির করেছিল; কিন্তু ছবিতে সুমিত্রা বর্মায় থাকাই ঠিক করল ভাঙা 'পথের দাবী'কে জোড়া লাগাবার জন্য। শরৎচন্দ্রের সুমিত্রার স্বদেশে ফিরে যাওয়ার মধ্যে নারীত্বের যে প্রচণ্ড ব্যর্থতাবোধ ফুটে উঠেছে, ছবিতে তা ক্ষুন্ন হয়েছে বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্রের সুমিত্রা শুধু বিপ্লবীর সহধর্মিনীই নয়, সে নারীও।

অভিনয়ের দিক থেকে সব্যসাচীর ভূমিকায় দেবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আশানুরূপ হয়নি। তলোয়ারকরের ভূমিকায় কমল মিত্র প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন; তাঁর সংযত অভিনয়ের গুণে তলোয়ারকরের চরিত্র যথাযথ ফুটে উঠেছে। ভারতীর ভূমিকায় সুমিত্রাদেবীর নিপুণ ও স্বাভাবিক অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয়ে শশীচরিত্র বিকৃত হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।

গান সম্বন্ধে যথেষ্ঠ অভিযোগ আছে। চিত্রে যে কয়টি গান জুড়ে দেয়া হয়েছে তা মোটেই স্থানোপযোগী হয়নি। বিশেষ করে নদীর ওপর নৌকোয় ভারতীকে দিয়ে গানটি না গাওয়ালেই সুবিবেচনার কাজ হোত।

জনসাধারণের স্বাদেশিকতার সুযোগ নিয়ে সাধারণ চলতি ছবিগুলির মত ফাঁকা বুলির সস্তা চটকে আসর জমাবার চেষ্টা না করে, 'পথের দাবী'র মত উপন্যাসকে চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রশংসার্হ।

নীহার দাশগুপ্ত

বিয়োগ-পঞ্জী : সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্যিক মাত্রেই আত্মীয়-বেদনার গভীর শোক অনুভব করেছেন। অনেক দিন ধরেই সুকান্ত ঘুরে ঘুরে অসুখে ভুগছিলেন। মাত্র চার মাস পূর্বে ধরা পড়ল—তাঁর যক্ষ্মা। বাঙলার প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের বন্ধুরা ঠিক করেছিলেন যে-করেই হোক্ সুকান্তকে বাঁচাবেন। 'পরিচয়-গোষ্ঠী'ও প্রাণ-মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সৌভাগ্য ও সুযোগ আর হল না। গত ২৯শে বৈশাখ, মঙ্গলবার (১৩ই মে, '৪৭) সুকান্ত যাদবপুর হাসপাতালে মারা গেলেন। মাত্র বছর উনিশের তরুণ সে তখনো!

সুকান্ত 'পরিচয়ের' লেখক ছিলেন এবং 'পরিচয়ের' সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তা ছাড়াও সুকান্ত তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির জন্য তাঁর এই স্বল্প জীবনেই সাহিত্যিকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বাঙলার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর জন-জীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার বলে। অথচ সুকান্ত বিশেষ করে ছিলেন আবার কিশোরদের বন্ধু, তাদের নেতা, তাদের কবিও। প্রতিভা ও তাঁর সরস লাজুক প্রকৃতিতে মিলে তাঁর ব্যক্তিত্বে একটি আশ্চর্য শ্রী দান করেছিল। সুকান্তের সম্বন্ধে তাই আরও কথা আমরা 'পরিচয়ে' জান্‌তে পারব, এই আশায় এখনকার মত শুধু বাঙলার এই সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কবির বিয়োগে বাঙলা সাহিত্যের ও বাঙালী সাধারণের মর্মান্তিক ক্ষতির কথা স্মরণ করি।

গোপাল হালদার

পুস্তক-পরিচয়

English Social History: G. M. Trevelyan. Longmans Green & Co. 21s.

Man's Worldly Goods: Leo Huberman. People's Publishing House. Rs. 3/-

ট্রিভেলিয়ানের বইটি চসারের সময় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ছয় শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস। ইংলণ্ডের বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অনেক লিখিত হয়েছে। সামাজিক ইতিহাসেরও বিশেষ কোনো যুগ নিয়ে বা দিক নিয়েও বহু গবেষক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস খুব বেশী লিখিত হয়নি। ট্রিভেলিয়ানের বইটি এই ধরনের ইতিহাসের মধ্যে আধুনিকতম ও সব চেয়ে প্রামাণ্য। যে-সব অর্থনৈতিক শক্তি আধুনিক যুগকে জন্ম দিয়েছে ও রূপান্তরিত করেছে তার পরিপূর্ণ প্রভাব ইংলণ্ডের ইতিহাসেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক ইংলণ্ডের ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অসম বিবর্তনের একটা মাপকাঠি। ট্রিভেলিয়ানের বইটি তাই ইতিহাসের ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের নিকট অবশ্যপাঠ্য বলে পরিগণিত হবে।

সামাজিক ইতিহাসে ব্যাপকতার ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত। আহার, বিহার, দৈনন্দিন জীবন, উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পারিবারিক ও যৌনজীবন, শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ক্রীড়া, বিলাস ও ব্যসন, কিছুই বাদ যায় না। মানুষের জীবন যতদূর ব্যাপ্ত ও যতখানি গভীর সামাজিক ইতিহাসও ততটাই। এই ব্যাপ্তি ও গভীরতার ছাপ ট্রিভেলিয়ানের বইটিতে আছে। ট্রিভেলিয়ানের লিপি কুশলতায় যদিও বইটি উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক হয়েছে, তথাপি বইটিকে হাল্কা সাহিত্যের পর্যায়ে নিশ্চয়ই ফেলা যায় না। জীবনের অসংখ্য দিক সম্বন্ধে নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে ছয়শত বৎসরব্যাপী ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন কাহিনী রচনা করার মতো কঠোর বৈজ্ঞানিক কাজ খুব কমই আছে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদম্য ঐতিহাসিক নিষ্ঠা না থাকলে এ কাজে সফল হওয়া কঠিন। তার উপর এই ইতিহাস লেখার কতটুকু মাল মশলাই বা পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনীর কতটুকুই বা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাজেই জাতির আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে সামাজিক

ইতিহাস উদ্ধার করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু ইংলণ্ডের ঐতিহাসিককে ভাগ্যবান বলতে হবে। তাঁর হাতে যেটুকু উপাদান আছে তার পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর নয়।

সামাজিক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর-সাপেক্ষ। উভয়ের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে ঘটনাগুলিকে পর পর সাজিয়ে গেলেই সামাজিক ইতিহাস রচিত হয় না। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা শুধু কালপ্রবাহের ধাপ বেয়েই চলে না। কার্যকারণ সম্বন্ধের ঐক্যই সামাজিক ইতিহাসকে একসূত্রে ধারণ করে। ইতিহাস তখনই dry-as-dust হয় যখন ঐতিহাসিক জীবনের সমস্ত অন্তঃসম্পর্ককে অবজ্ঞা করেন ও তথাকথিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শুধু বহিরঙ্গ আবর্তে পাক খেতে থাকেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান করেন। জ্ঞান ও কর্মের যুগল মিলনের ঘটকালি ক'রে ঐতিহাসিক মানুষের সার্বভৌমত্বের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ট্রিভেলিয়নের মতে রাজনৈতিক ইতিহাসটা উপরকার স্তরে আবদ্ধ। সামাজিক পরিবর্তন থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাস উদ্ভূত হয়। সামাজিক পরিবর্তন নিজের নিয়ম মেনে চলে। সামাজিক পরিবর্তন উদ্ভূত হয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনই যে সামাজিক পরিবর্তনের মূলগত কারণ এ কথা তিনি ভূমিকায় স্বীকার করলেও বইয়ের মধ্যে বারংবার এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে ঐতিহাসিক বিকাশের কার্যকারণ সম্বন্ধ বহু জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক পরিবর্তন নিজের নিয়মেই সংসাধিত হয়, রাজারাজড়ার খেয়ালে বা আদেশে হয় না একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে মানুষের ইচ্ছা বা কর্ম ব্যতিরেকেই সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের মতে সামাজিক পরিবর্তনের মানবিক প্রচেষ্টা শ্রেণীসংগ্রামের রূপ ধারণ করে। পুরাতন সামাজিক সম্পর্কের কাঠামো ভাঙবার চেষ্টা করে শোষিত শ্রেণী এবং সেই সংগ্রামের ফলেই নূতন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের অনুকূল।

ট্রিভেলিয়ন শ্রেণীসংগ্রামকে একেবারে অস্বীকার করতে না পারলেও সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকরী শক্তি হিসাবে এর প্রাধান্য বা গুরুত্ব কোথাও মানতে প্রস্তুত নন। তার ফলে আমাদের বুঝতে রীতিমত অসুবিধা হয়, কেন একটা পরিবর্তন সাধিত হলো। মানুষের সাধারণ শুভবুদ্ধি বা সহজাত প্রজ্ঞা ইংরেজ জাতির একটা বিশেষ প্রতিভা—ইত্যাদি হাইপথেসিস্ ট্রিভেলিয়ানের যুক্তিতে অন্তর্নিহিত রয়েছে, বহুস্থলে এই সন্দেহ জাগে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও কোথাও পরিষ্কার কোনো আলোচনা নেই। পরবর্তী কালের পরিবর্তনের বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুদিন পূর্বেই পরিলক্ষিত হয় এই কথা বলে ট্রিভেলিয়ান নূতনকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বহুস্থলে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য, স্থাপত্য, ক্রীড়া ইত্যাদির পরিবর্তন যে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলেছে এ সম্বন্ধে বহু—মূল্যবান তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন অথচ কোথাও চেষ্টা করেননি এই সমস্ত পরিবর্তনের অন্তঃসম্পর্ককে বোঝাবার। এ বিষয়ে তিনি সুবিধাবাদী ও প্লুরালিস্ট অর্থাৎ বহুকারণ-বাদী। বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এই প্লুরালিজম্‌টা বেশী করে চোখে পড়ে। ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের মধ্যে যে শ্রেণীবিরোধ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রতিফলিত

হচ্ছে ঐতিহাসিক হিসাবে এটা তিনি অস্বীকার করেননি এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রসঙ্গেই তিনি আগাগোড়া ধর্মান্দোলনের আলোচনা করেছেন। ধর্ম যে শ্রেণীসংগ্রামের বা শ্রেণীসম্পর্কেরই একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশ, ট্রিভেলিয়ানের বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ ট্রিভেলিয়ান নিজে ধর্মান্দোলনের পিছনে একটা ধর্মগত সামাজিক আবেগের অবতারণা করেছেন এবং ধর্মবিশ্বাসকে সামাজিক পরিবর্তনের একটা স্বতন্ত্র শক্তি বা কারণ রূপে কল্পনা করেছেন। এর ফলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন Homo Sapiens-এর ধর্মপিপাসা নামে সুপারঅরগ্যানিক উত্তেজনাটা ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সময়ে ফিউড্যাল অভিজাতবর্গের স্বার্থরক্ষায়, বা বণিকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কামনায়, বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বণিকশ্রেণীর তথাকথিত উদারতায় বা উৎপীড়িত জনসাধারণকে রবিবারের স্কুলে নীতিশিক্ষা দেওয়ায় নিযুক্ত হয়।

ট্রিভেলিযানের লিবারাল প্লুরালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী বহু জায়গাতেই মনে ধোঁকা এনে দেয় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপিপাসাকে অতৃপ্ত রাখে। ইংলণ্ডের ভূমিদাসপ্রথা অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ভাঙতে আরম্ভ করছিল একথা সত্য বটে, তবু সামন্ত প্রভুগণ যে এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধা দিচ্ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের এই প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে ভাঙবার জন্য ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে কৃষক-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ঘটেছিল একথা সহজেই বোঝা যায়। ট্রিভেলিয়ানও এই বিপ্লবকে সামাজিক সম্পর্কের সংঘর্ষ রূপেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষকালে তিনি বলেছেন, এই বিদ্রোহ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদকে সাহায্য করেছে না পিছিয়ে দিয়েছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ ধরনের মন্তব্যে সমস্ত ইতিহাসটাই ঘুলিয়ে যায়।

মধ্যযুগের শেষ টিউডর-রাজত্বকালে হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে ট্রিভেলিয়ান যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে দেখি তাঁর সুন্দর ঐতিহাসিক দৃষ্টি। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ বহু শতাব্দী ধরে হয়েছিল। পণ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার, মুদ্রার ক্রমবর্ধমান প্রচলন, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসিত শহরের আবির্ভাব, এই সব কারণে ফিউড্যাল সমাজ ভেঙে পড়ল এবং রাষ্ট্রের, আইনের, ধর্মের ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সংঘটিত হলো। বহু শতাব্দী ধরে এই সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কিন্তু টিউডর রাজত্বকালে সমস্ত পরিবর্তনের মূল কারণ যে বুর্জোয়া শ্রেণীব অভ্যুদয়, একথাকে ট্রিভেলিয়ান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। টিউডর রাজত্বকালে ধর্মের ক্ষেত্রে যে রেফরমেশান হয়েছিল তার মূলকারণ স্বরূপে ট্রিভেলিয়ান ধর্মযাজকবিরোধী জনমতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে-সব র‍্যাডিক্যাল ধর্মান্দোলন শোষিত জনগণের দ্বারা আরো ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছিল সেগুলি তো সফল হয়নি। রেফরমেশান সফল হলো কেন? তার কারণ রেফরমেশান নবোত্থিত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় পরিকল্পিত হয়েছিল এবং তাদের সমর্থন পেয়েছিল। ধর্মযাজকবিরোধী মনোভাব যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না বলে অষ্টম হেনরি আপোসের ভিত্তিতে একটা নূতন জাতীয় চার্চের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন, ট্রিভেলিয়ানের এই যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হয়। খৃষ্টীয় মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যে ফিউড্যাল সমাজের ধ্বংসেরই একটা অঙ্গ এটা না বলে ট্রিভেলিয়ান ইরাসমাস-এর শিক্ষার ও প্রচারের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন।

এলিজাবেথীয় যুগে ইংলণ্ডের জাতীয় সমৃদ্ধির ও গৌরবের ভিত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এব অর্থনৈতিক ভিত্তিটা ট্রিভেলিয়ান সুন্দর বুঝিয়েছেন। নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কার, আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ও ইণ্ডিয়ায় নাবিকদের অভিযান, হকিনস্-এর দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন ধরণেব জাহাজ নির্মাণ, তাব ফলে বৃটীশ নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, ফ্ল্যাণ্ডার্স্ বাণিজ্যের স্বল্প পবিসর কাঠামোর কারাগার থেকে বৃটীশ অর্থনৈতিক জীবনের মুক্তিলাভ, ইত্যাদি তথ্যের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। ইংলণ্ডের বণিক অভিযাত্রীদের ব্যক্তিগত উদ্যমের ফলেই এই আশু উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। তাই রাজকীয় স্বৈরাচারের ভিত্তিটা ইংলণ্ডে টিউডব-উত্তব যুগ থেকেই দুর্বল ছিল। ইংলণ্ডের ডেমোক্রাটিক স্বাধীনতার এই শ্রেণীগত কারণকে উপেক্ষা করে ট্রিভেলিয়ান এক জায়গায় ইংলিস নৌবাহিনীকেই ইংলিশ স্বাধীনতার প্রধান কারণ বলেছেন। কিন্তু কেন ইংলিশ নৌবাহিনী গণতন্ত্রের সৃষ্টি করলো এবং স্পেনিশ নৌবাহিনী সামন্ততন্ত্রকেই কায়েম করলো তার কোনো সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না।

ক্রমওয়েল্-এর যুগে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করার সময় যে ট্রিভেলিয়ান রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে থাকায় একথা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি যে রাজার স্বপক্ষে ছিল প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং বিরুদ্ধে ছিল নবোত্থিত বুর্জোয়া বণিক্ সম্প্রদায়, এবং বুর্জোয়া জমিদারেরা। কিন্তু শ্রেণীবিরোধকে ঐতিহাসিক শক্তি হিসাবে স্বীকার করলে পাছে ইতিহাস জাতিচ্যুত হয় এই আশংকায় তিনি এই বিপ্লবকে সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মবিভেদ মূলক, ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়ে নিজের প্লুরালিস্ট বিবেককে আশ্বস্ত করেছেন। প্লুরালিজ্‌ম্-এ অবশ্য কোন আপত্তি নেই যদি মূল কারণটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা না থাকে।

যত আধুনিক কালের দিকে ট্রিভেলিয়ান এগুচ্ছেন ততই দেখতে পাওয়া যায় তিনি শ্রেণীবিরোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উত্তরোত্তর আইডিয়ালিস্ট লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন। ইংলিশ দ্বৈপায়নিকতা ক্রমশই তাঁকে পেয়ে বসেছে। ভারতবর্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শান্তিপ্রিয়তায় তিনি মুগ্ধ। এনক্লোজার অ্যাক্ট-এর ফলে কৃষকদের যে বলপূর্বক জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এটা তাঁব চোখ পড়ে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এন্‌লাইটেন-মেণ্ট্-এর প্রশংসা তিনি অত্যন্ত যথার্থভাবে করেছেন বটে, কিন্তু ওই শতাব্দীর তথাকথিত মানব প্রেমিকতা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ যে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের একটা রূপ একথা কবেট বুঝতে পারলেও ট্রিভেলিয়ান পারেন নি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ও নেপোলিয়নিক যুগে ইংলণ্ডের উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াকে তিনি জ্যাকোবিন-বিরোধী আতংক নামে অভিহিত করে সমস্ত দোষটা যেন দুষ্ট ফরাসীদের উপরই চাপিয়েছেন। এবং এই জ্যাকোবিন-বিরোধী মনোভাব অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ইংলণ্ডের বিখ্যাত মানব-প্রেমিকতা ফিরে এসে ইংলণ্ডের সর্বত্র আলোক ও সুষমা ছড়িয়ে দিল এই কথা বলে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটিকে তিনি জায়গায় জায়গায় প্রায় শিশুপাঠ্য ইতিহাসের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। চার্টিস্ট আন্দোলনের তিনি নামও উল্লেখ করেন নি।

ইংলণ্ডের মাস্টার অফ্ ট্রিনিটির জীবনভোর ঐতিহাসিক সাধনা ও তাঁর লেখনীর অপূর্ব

ইন্দ্রজাল যে গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয়েছে তাকে কোনো মতেই অবজ্ঞা করা যায় না। দুঃখ হয়, এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণীর নূতন ঐতিহাসিক ভূমিকাটা ট্রেভেলিয়ানের আদৌ চোখে পড়ল না। ভিক্টোরীয় যুগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাসচারের তিরোধানে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি গভীর বিবাগ প্রকাশ করেছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর স্বাধীন চাষীর জন্য নস্‌টাল্‌জিয়া অনুভব করেছেন। সুতরাং সমস্ত ইতিহাসটি পাঠ করে যখন বিংশ শতাব্দীর কথা ভাবা যায় তখন ট্রেভেলিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে ইংলিশ জাতির বিশেষ কোনো ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয় না। এইখানেই বুর্জোয়া ইতিহাসের চরম ব্যর্থতা।

লিও হুবারম্যানের বইটি পুরনো। নূতন করে ভারতবর্ষে ছাপা হয়েছে। বইটি যখন প্রথম পড়ি তখন মনে হয়েছিল, এতদিনে ইতিহাস ও অর্থনীতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করলুম। আধুনিক ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এমন তথ্যপূর্ণ, সবল ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ আর একটিও লেখা হয় নি। অনেক পাঠকের ধারণা, মার্ক্‌সীয় লেখকগণ বড় বেশী একঘেয়ে ও তত্ত্বঘেঁষা। হুবারম্যান সম্বন্ধে তাঁদের প্রচুর ভরসা দেওয়া যেতে পারে। ট্রেভেলিয়ানের বইটির মতো হুবারম্যানের লেখাটিকেও এক নিশ্বাসে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মতো পড়ে ফেলা যায়। প্রত্যেক অধ্যায়েই নূতন একটা চমক মিলবে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের লেখা যদি পড়া থাকে। নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয়ে ও বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে কি করে নূতন আইডিয়ার ও থিওরির উদ্ভব হয়, প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ ও সুদক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা হুবারম্যান তা দেখিয়েছেন। বইটি শুধু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নয়, অর্থনীতিরও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। আধুনিক ইতিহাসের জটিল অরণ্যে পথ খুঁজে পেতে হুবারম্যান অনেককে সাহায্য করবেন, অবশ্য যদি তাঁরা সাহায্য চান। বইটির শেষে যে অমূল্য **bibliography** ছিল সেটি ছাপা না হওয়ায় বইটির অঙ্গহানি ঘটেছে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

মধ্যবিত্ত কোন পথে? নরহরি কবিরাজ। ঈগল পাবলিশার্স। মূল্য ১॥০।

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ এই বইটিতে বিভিন্ন দিক থেকে মধ্যবিত্তের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যুগ হতে যুগান্তরে যাত্রাপথে এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে, ফলে মধ্যবিত্তের গৌরবময় ঐতিহ্য আজ অত্যন্ত দুর্বল। লেখক এই বইর দশটি প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই দুর্গতির কারণ ও তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেছেন। আজকের দিনে পৃথিবীর কোনো দেশেরই সমস্যা অন্যান্য দেশের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। লেখক তাই স্বভাবতই ভারতীয় মধ্যবিত্তের অবস্থার আলোচনা করেছেন ইওরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পটভূমিতে। আমাদের দেশের তুলনায় ইওরোপের মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক বেশি মননশীল, আত্মসচেতন, সক্রিয়। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ে ইওরোপীয় সভ্যতা প্রায় মরতে বসেছিল। ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম্ যে ফ্যাশিবাদেরই সগোত্র ও এই বিদেশী শত্রুর সঙ্গে স্বদেশের জমিদার ও

মজুতদারদের স্বার্থের যোগ কী নিবিড় লেখক তা নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এই বলে সাবধান করেছেন যে আজ দেশের সামনে প্রগতির একমাত্র পথ সংগ্রামের পথ—ইম্পিরিয়ালিজম্‌-এর বিরুদ্ধে। মধ্যবিত্তের কাজ একদিকে জমিদার ও মজুতদার ও অপর দিকে মজুর কৃষক শ্রেণীকে এই সংগ্রামের জন্ম সম্মিলিত করা। স্বাধীন চিন্তার মোহে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই কর্তব্য অবহেলা করে দাসখৎ লিখে দিয়েছে বিদেশী ও স্বদেশী বণিক-ধনিকের হাতে। এরই ফলে হয়েছে বিভেদের সৃষ্টি ও দেশময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃতি। রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী যেই হোক, দেশের অর্থভাণ্ডারের চাবি যারই হাতে থাকুক, চিন্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত রয়েছে মধ্যবিত্তের জন্যে। এখনও ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ তার যোগ্য ভূমিকা—চিন্তানায়কত্ব সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে, মজুর ও কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করতে পাবে। এই হোলো বইটির মোটামুটি বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে লেখক সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যার আলোচনা করেছেন বহু তথ্যের সাহায্যে। পুরোপুরি মার্কসবাদী বলে তাঁর খ্যাতি আছে। অনেকের বিশ্বাস মার্কসীয় দর্শন আনকোরা বিদেশী পণ্য, এদেশের আবহাওয়ায় তা অচল। এই মত যাঁরা পোষণ করেন নরহরি কবিরাজের রচনা পড়লে তাঁরা বুঝবেন মার্কসীয় দর্শন দেশের জল বায়ুতে কী ভাবে জারিত করা সম্ভব।

নরহরি বাবুর মতামত যাই হোক—তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে একটু অভিযোগ আছে। উষ্ণতা ও উগ্রতা যে এক জিনিষ নয় এই জ্ঞান তাঁর একটু কম। শুধু যারা নিজের মতাবলম্বী তাদের বিনোদনের জন্যে এই জাতীয় বই লিখে কোনো লাভ নেই। সকলের মন জুগিযে প্রচার সাহিত্য রচনা অসম্ভব, কিন্তু অপ্রিয় সত্যকে যতদূর সম্ভব প্রীতিকর আকারে পরিবেশণ করার জন্ম অসীম ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন আছে।

হিরণকুমার সান্যাল

বিশ্বরহস্য—জেমস্‌ জীন্‌স্‌। অনুবাদক: প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সিগ্‌নেট প্রেস। তিন টাকা।
সোভিয়েট বিজ্ঞান—ডাইসন কার্টার। অনুবাদক: চিন্মোহন সেহানবীশ। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। দু-টাকা চার আনা।

বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকশ্রেণীর জন্যে বাংলা বই যথেষ্ট নেই। এ যুগে যখন জীবনের সর্ববিভাগে বিজ্ঞানের প্রভাব অপ্রতিহত, তখন বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ প্রয়োজন আছে বুদ্ধিকে মোহমুক্ত রাখবার জন্যে, মনকে সতর্ক করে তুলবার জন্যে। ইংরেজী-না-জানা বাঙালী পাঠকের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক যুগশিক্ষায় শিক্ষিত হবার পথে অনেক বাধা; প্রধান বাধা হচ্ছে—দুরূহ তত্ত্বগুলো লঘুপাক আর 'অতি-সহজ' করে পরিবেশনের চেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর দৈন্ত থেকে যায়। এর বিপরীত ব্যাপারটাও বহুক্ষেত্রে ঘটে—পরিভাষা-কণ্টকিত দুর্গম বিজ্ঞান-প্রস্তাবের দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের মনে শুধু সশ্রদ্ধ ভীতিই জাগায়। রচনার সাবলীলতার সঙ্গে তত্ত্ব-তথ্য উদ্‌ঘাটন যদি যথার্থভাবে না হয়, তাহলে সে রচনা ব্যর্থ-উদ্দেশ্য হবে। সর্বসাধারণের এই মনের খোরাক জোগানোর ব্যাপারে উপযুক্ত মূল বাংলা রচনা যদি যথেষ্ট পরিমাণে না মেলে, তাহলে অনুরূপ বিদেশী বই বাংলায় অনুবাদ করার বিশেষ সার্থকতা আছে; কারণ, সে সব ভাষায় এই জাতীয় বহু বই যথাযোগ্যতার

সঙ্গে লিখিত হয়েছে। জেমস্ জীন্‌স্-এর 'দি মিস্টিরিয়স্ ইউনিভর্স্' এবং ডাইসন কার্টার-এর 'রাশিয়াস সিক্রেট ওয়েপন' বই দুখানার এই বাংলা অনুবাদ দু-টি তাই এদিক থেকে অত্যন্ত উপযোগী হবে।

জটিল বিজ্ঞানকাণ্ড আর অঙ্কের প্রতীক চিহ্নের বাঁধন থেকে মুক্ত করে এনে বিশ্বরহস্যকে যাঁরা অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে জেম্‌স্ জীন্‌স্-এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীন্‌স্-এর নানা আবিষ্কার ও নতুন তত্ত্বের অবদান তাঁকে এ যুগের বিজ্ঞান-ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে; সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু জনসাধারণের মনেও জীন্‌স্ শ্রদ্ধার আসন অর্জন করেছিলেন—জনমানসের সঙ্গে বিজ্ঞানী মনের যোগাযোগ স্থাপন করার কাজে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অদ্বিতীয়। সাধারণ মানুষের সহজ বোধের উপযোগী করে অসাধারণ সাহিত্যরসের সঙ্গে বিজ্ঞানতথ্য পরিবেশন করে গেছেন; ভাষার সহজ মিষ্টতায়, ঘরোয়া উপমার প্রয়োগে, তথ্য ও যুক্তির যোগাযোগে বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে তুলতে পারতেন তিনি—অত্যন্ত গুরুতর আর জটিল বিষয়ও তাঁর রচনার গুণে গুরুভারমুক্ত হয়ে উঠেছে, অথচ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি।

'বিশ্বরহস্য' বইখানার মূল ইংরেজী 'দি মিস্টিরিয়স ইউনিভর্স্' সর্বজন-পরিচিত বই; ইংরেজী-জানা বাঙালী পাঠকদের মধ্যেও এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যিনি এই বইটি অন্তত 'পেলিক্যান সিরিজের' কল্যাণে না-পড়েছেন—যদিও প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর কাছে এ-বইয়ের আলোচ্য বিষয় খুব সহজবোধ্য নয়। তবু, জীনস্-এর দার্শনিক মতবাদ ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছাড়া, প্রাকৃত তথ্যের উপকরণে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ও বিশ্বলোকের বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবার ফলে জীবন সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশ, কাল, গ্রহ আর প্রাণের আবির্ভাবের সেই আদিম জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে, নির্বাণোন্মুখ সূর্য, আধুনিক পদার্থবিদ্যার নয়া-জগত, বস্তু ও বিকিরণ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও তেজস্ক্রিয়া, আপেক্ষিকতা ও ঈথর—ইত্যাদির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও রীতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির স্তরগুলি জীনস এই বইয়ে উন্মোচন করেছেন আশ্চর্য সাহিত্যিক নিপুণতার সঙ্গে। সেই সঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবনদর্শন গড়ে তোলার কাজে এই সব জ্ঞানের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও তিনি করেছেন, এবং শেষ অধ্যায়টিতে ('অতল বিশ্ব সমুদ্রে') বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বিচারের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব বিজ্ঞান-দর্শনটিকে ব্যক্ত করেছেন।

ধারণাতীত বিপুলায়তন এই বিশ্বে প্রাণের আবির্ভাব নিতান্তই আকস্মিক, বিরাট গ্রহলোকে মানুষের স্থান নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর, মুমূর্ষু সূর্যের তাপ-নির্ভর এই নগণ্য প্রাণ-লোকের পক্ষে সমস্ত বিশ্বব্যবস্থাটাই নিতান্ত পরিপন্থী এবং মানুষের শেষ পরিণাম অনিবার্য আর নিঃসঙ্গ এক সর্বব্যাপী মহানির্বাণে—এর থেকেই জীনসের দার্শনিক মতবাদের সূত্রপাত। কথাগুলো সবই ঠিক হতে পারে; কিন্তু মানুষের এই অন্তিম পরিণতি আর বিশ্বভূমিকায় প্রাণ-যাত্রার এই প্রতিকূল পরিবেশের উপলব্ধি থেকে একটা নিষ্ক্রিয়তা আর মায়াবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এখানে সদ্‌বৈজ্ঞানিকের কাছে আশা করব তিনি যেন পাঠকের বুদ্ধি-বিভ্রাট ঘটতে না দেন, তাঁর বিশ্লেষণটা যেন বস্তুমুখাপেক্ষী হয়। মনে রাখতে হবে, বইটার প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সালে—তখন পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের বেহিসাবী ধন-প্রাণক্ষয়ের বীভৎস

স্মৃতি এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট লোকের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ; যুদ্ধের সেই নিরর্থকতা আর মহাক্ষতিময় পরিণামের জন্যে উত্তর সামরিক নিরালম্ব সমাজমন প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানকেই দায়ী করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটা নিশ্চয়ই এই নব্যমায়াবাদের প্রভাবমুক্ত নয়। এই মতবাদের পরবর্তী অধ্যায়ে জীনস প্রাকৃতিক সংগঠনের মূল নিয়ামক হিসেবে 'মহান গণিতবেত্তা'র (Great Mathematician) পরিকল্পনা করেছেন : "খেয়াল ও প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত আমাদের আচরণ বা আমাদের পেশী ও সন্ধির আচরণ অনুযায়ী প্রকৃতি তার নিজের আচরণ পরিবর্তন করে না, তার আচরণ নির্ধারিত হয় আমাদের সক্রিয় মনের আচরণ দিয়ে। আমাদের মনের নিয়মাবলী প্রকৃতির ওপর আরোপিত হোক বা প্রকৃতি তার নিয়মাবলী আমাদের মনের ওপর আরোপ করুক, অবস্থার কোন ভেদ ঘটেনা ; বিশ্ব যে গাণিতিক ছাঁচে গড়া এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ এই যুক্তি থেকেই পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত নরত্ববোধের ভাষায় (anthropomorphic language) আবার বলতে পারি যে বিশ্বপরিকল্পনার মূলে কোন জীববিজ্ঞানী বা এঞ্জিনীয়ার থাকার সম্ভাবনা নেই। মহান বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টি এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাঁর আবির্ভাব এক শুদ্ধ গণিতবেত্তা রূপে" (পৃঃ ২২৫)। এই মতের পরিণতি বোধ হয় এই-যে, পরমাণুর রহস্যসন্ধানে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান নাকি আবিষ্কার করেছে, বস্তু জিনিষটা বাস্তবিক নয়, matter is not material—সুতরাং, নিয়মিক জড়জগত আজ আবার রূপান্তরিত হয়ে গেছে ব্যক্তি-মানসের প্রতিভাষিক জগতে ; ফলে, জীন্‌স্-এর প্রকৃতিদেবী কি নতুন করে ঈশ্বরকে স্থান ছেড়ে দিতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন না ? মনে হয় জীন্‌স্ এটাকে উপগম (assumption) হিসেবে না দেখে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের সিদ্ধান্ত (inference) হিসেবেই দেখেছিলেন। "বিরাট যন্ত্রের চেয়ে, এক বিরাট চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বের বেশী সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হয়।...এই মন আমাদের স্বতন্ত্র মন নয় ; এ হল এক 'সর্বগত মন', যেখানে আমাদের স্বতন্ত্র মনসৃষ্টিকারী পরমাণুর দল চিন্তারূপে বিরাজমান।... বিশ্বে ভর করে আছে একটা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি, যে-শক্তির সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র মনের খানিকটা মিল রয়েছে ; ভাবাবেগ, নীতি ও সৌন্দর্যবোধের স্থান সেখানে নেই, অন্তত আজও তার সন্ধান মেলেনি—কিন্তু রয়েছে এক চিন্তাধারার বেগ, যাকে বলতে হচ্ছে 'গাণিতিক', এর চেয়ে ভালো শব্দসম্পদ নেই বলে" (পৃঃ ২৪৮, ২৪৯)।—অর্থাৎ মন যে বস্তুর পূর্বতন এই 'মেণ্টালিজ্‌ম্' থেকেই জীন্‌স্-এর সেই পূর্বকথিত শত্রুভাবাপন্ন বিশ্বব্যবস্থা—"যে-বিশ্বব্যবস্থায় প্রাণের কোন স্থান নেই, যা প্রাণের পরিপন্থী বা সর্বতোভাবে তার প্রতি উদাসীন" (পৃঃ ৫২)—তার থেকে তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার সূত্রপাত। জীনস্-এর এই পলায়নের পেছনে প্রধানত যে মানসিক প্রবণতার ক্রিয়া দেখা যায়, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে—বিশ্বলোক যে সচেতন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে এই ধরণের একটা নরত্ব আরোপের (anthropomorphism) প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞানীর মানসদ্বন্দ্বের সমাধানে জীনস শেষ পর্যন্ত আত্মমুখীনতার ওপর নির্ভর করেছেন, বোধহয় সেই নব্যমায়াবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন কুণ্ঠা বোধ করেছিল বলেই। জীনস্-এর বেলায় এই আপাতবিরোধিতা নিশ্চয়ই সচেতন ভাবে ঘটেনি। তাই তিনি শেষ অধ্যায়ে আশার কথা শুনিয়েছেন বটে—"যদিও এই বিশ্বপ্রকৃতিতে অনেক কিছুই প্রাণের স্থূল আনুষঙ্গিকের পরিপন্থী বলে মনে হয়, অনেক কিছুই আবার প্রাণের মূল সক্রিয়তার অনুকূল বলে দেখি। আদি-পঙ্কে (primaeval slime) যে-সব জড়পরমাণু প্রথম

প্রাণের আবেগে এক অপরিস্ফুট স্পন্দন নিয়ে জেগে উঠেছিল, তারা এই আপাত পরিপন্থিতাকে জয় করে বহুগুণিত হয়েই চলেছে। বিশ্বের মূলশক্তির সহায়তা না পেলে তারা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রাণের ধারা আজও অব্যাহত রাখতে পারত না" (পৃঃ ২৪৯)—কিন্তু এই আশাবাদের পেছনে কালসাপেক্ষ বস্তুবাদী মনের বলিষ্ঠ নির্ভরতা না থাকায় জীনস বরাবর একটু দ্বিধাগ্রস্থ থেকেই গেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর বস্তুবাদী আশাবাদ, আর অতিপ্রাকৃত 'মূলশক্তি'তে বিশ্বাস থেকে উৎসারিত আশাবাদ নিশ্চয়ই এক জিনিষ নয়। যে বিজ্ঞানে সর্বপ্রাণীর জীবনধারা, সমাজসত্তা এবং প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্র পরস্পর-বিচ্ছিন্ন আর সম্পর্কহীন, সে বিজ্ঞান কি সজ্ঞানে বা অচেতনভাবে খানিকটা বৈজ্ঞানিকের শ্রেণীকামনা-দুষ্ট নয়?

ডাইসন কার্টার-এর 'সোভিয়েট বিজ্ঞান' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের রচনা। বিজ্ঞানকে সর্বজনীন সমাজকল্যাণে নিযুক্ত করার ফলে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশের নতুন সভ্যতা যে অপরাজেয় শক্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তারই আশ্চর্য কাহিনী বলেছেন এই কানাডীয় বৈজ্ঞানিক। সোভিয়েট দেশের বিজ্ঞান-কর্মীরা ধনতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীদের মত শোষিত শ্রেণীর অংশ নন। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান-আবিষ্ক্রিয়ার পেছনে বিজ্ঞানীর যে আজীবন সাধনা, ধনিক-নিয়ন্ত্রিত সমাজে তার ফলভোগী হয় কায়েমী মালিকানার দল। সোভিয়েট বিজ্ঞানীর পথে এসব বাধা নেই বলেই তাঁরা একদিকে যেমন সমাজধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজে নেমেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বরহস্য সন্ধানে কোন স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কিম্বা বৈজ্ঞানিক আত্মোপলব্ধির মধ্যে শ্রেণীসচেতন কোন ফাঁকি তাঁদের মনে ঢুকতে পারেনি।

কৃষিকার্য আর যন্ত্রশিল্প—রাষ্ট্রের এই দুই প্রধানতম সমবায়ে বিজ্ঞানকে সর্বাঙ্গীন কৃতিত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করার চেষ্টায় সোভিয়েটের সমস্ত জাতি মিলে মানসক্ষেত্রে, জীবনযাত্রায় আর কর্মশক্তিতে শত্রু-প্রতিরোধের দুর্বার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করেই চলেছে। এই সর্বজনীন সাধনযজ্ঞের হোতা হচ্ছেন বৈজ্ঞানিকরা—ভূবিজ্ঞানী ইয়েক্রমভ, যিনি অক্লান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে সূর্যকে মানুষের বশ মানিয়ে সাইবেরিয়ার মাটিতে সোনার ফসল ফলাচ্ছেন; জীববিজ্ঞানী লাইসেন্‌কো, যাঁর 'ইয়ারোভাইজেশন' প্রক্রিয়ায় একই জমিতে একশগুণ ফসল বেড়ে যায়; নয়া-টারবাইনের আবিষ্কারক ক্যাপিট্‌সা, যিনি যন্ত্রনির্মিত পণ্যের উৎপাদন-ক্ষিপ্রতায় অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছেন; চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ফিলাটভ্, যিনি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে চোখ তুলে নিয়ে চক্ষুহীন জীবন্ত লোকের দেহে বসিয়ে দিয়ে তাদের চক্ষুষ্মান করে তোলেন; আর, মজুরের ছেলে খনি-বিজ্ঞানী স্টাকানভের কথা তো আজ বিশ্বপরিচিত। ডাইসন কার্টার এই বইয়ে নতুন-বিজ্ঞানের সেই সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পরিচয় দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ গল্পের ভাষায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের অপরিহার্য ঐক্যের ওপরেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থিতি পায়—সুতরাং সেখানে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা প্ল্যানিংগুলোর নেতারাও প্রধানত বৈজ্ঞানিক। শিশুদের লালনপালনের জন্যে 'ক্রেশ্' থেকে আরম্ভ করে 'রাইফেল-সংঘের' বাৎসরিক ভোরোশিলভ্-পুরস্কার ঘোষণা পর্যন্ত সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত্। দেশ জোড়া এই শিক্ষার আয়োজনে বিজ্ঞানের ভূমিকা বহুব্যাপী। কৃষক-মজুর-বুদ্ধিজীবি অগণ্য জনসাধারণ পরস্পরের মনকে আর শক্তিকে সম্মিলিত করবার লক্ষ্যে প্রকৃতির রহস্যকে চিনে জেনে নিচ্ছে, শোধন করে নিচ্ছে,

নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। দেশের এই ঐশ্বর্যসৃষ্টির ব্যাপারে সর্বজনের চিত্ত সম্মিলিত হবার ফলে সোভিয়েট সমাজের শক্তি আজ রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বিভাগে অমিত তেজে উৎসারিত। এই গোপন শক্তির উৎস-সন্ধানে ডাইসন কার্টার-এর বইটি মূল্যবান গাইড্-বুক।

কানাডার 'লেবার প্রগ্রেসিভ পার্টি'র সম্পাদককে লেখা ডাইসন কার্টার-এ এক উল্লেখযোগ্য চিঠি এই বইয়ের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। সমাজ-জিজ্ঞাসার উত্তরে সদ্‌বিজ্ঞানীর আত্মোপলব্ধি আর সাম্যবাদী লক্ষ্যে তাঁর অবশ্যম্ভাবী মানসিক বিবর্তন এই চিঠিতে সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্র মজুমদার

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

মোপাসাঁ থেকে—শীতাংশু মৈত্র। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

সমারসেট্ মম্-এর গল্প—সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র। সিগ্‌নেট্ প্রেস : কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

সবার সেরা দেশে—অশোক গুহ। প্রগ্রেসিভ্ ফোরাম : কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা।

অমর কথাশিল্পী গী দ্য মোপাসাঁর সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় বাঙালী পাঠক-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই আছে। শুধু ফরাসী সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিশিষ্ট তাঁর স্থান—আধুনিক ছোট গল্পে নিজস্ব আঙ্গিক রূপ মোপাসাঁই দিয়ে গেছেন প্রথম নির্দিষ্ট করে। সামান্য দু-চারটি আঁচড়ে বর্ণাঢ্য পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানা সত্যিই তাঁর অপরিসীম।

মোপাসাঁর সার্থক রচনাকাল মাত্র দশ বৎসর। তার মধ্যেই তিনি লিখেছেন প্রচুর। তা থেকে মাত্র ন'টি গল্প চয়ন করে এখানে অনুবাদ করেছেন শ্রীযুত শীতাংশু মৈত্র। আলোচ্য গ্রন্থটির জন্য সাধারণ বাঙালী পাঠক মৈত্র মশায়কে ধন্যবাদ জানাবেন এজন্য যে, মোপাসাঁর চলনসই একটা সংকলন তিনি পেরেছেন তাঁদের পরিবেশন করতে। মোপাসাঁর যে গল্পটি রাতারাতি তাঁকে যশ ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছিল, বিখ্যাত সে গল্পটি (Boule de Suif) এর সঙ্গে সন্নিবেশিত হলে সংকলনটি প্রতিনিধিমূলক হত খানিকটা।

মোপাসাঁর রচনা ও বচন ভঙ্গীর স্বকীয় ধারার জের পরবর্তী যুগে যাঁরা টেনে চলেছিলেন সার্থকভাবে ইংরেজ লেখক সমারসেট মম্ তাঁদের অন্যতম। সত্যিই বুঝি তাঁর মধ্যে 'ইংরেজের শাঁসালো ভারের চেয়ে ফরাসীর উজ্জ্বল ধারই প্রকাশ পেয়েছে বেশি।' সাউথ সি আইল্যাণ্ডস্-এর অভিনব, বিচিত্র, রোমাঞ্চকর, সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকায় ঘুণ-ধরা বুর্জোয়া সমাজের সব রকমের ক্লেদাক্ত গ্লানি, মিথ্যা আর আত্মপ্রতারণার মুখোশ তিনি খসিয়ে দিয়েছেন নিপুণ ভাবে নিষ্ঠুর, নির্মম হস্তে। কখনও তিনি ক্ষমা করেননি মানুষের দুর্বল মুহূর্তকে। তাই কোথাও বা তিনি ফেটে পড়েছেন বিদ্রূপের বাঁকা হাসিতে ; কোথাও বা মুখর হয়ে উঠেছেন

তীব্র, তিক্ত শ্লেষে। কিন্তু মানুষের সব রকমের অপটুতা আর ভুল-ভ্রান্তির নেপথ্যেই রয়েছে তাঁর সংবেদনশীলতার ফল্গুধারা। মোপাসাঁর মতই প্রকাশভঙ্গী তাঁর সূক্ষ্ম, সরল, অনাড়ম্বর; কিন্তু পরিসমাপ্তির অপ্রত্যাশিত চমক হার মানিয়ে দেয় এমন কি ও-হেনরীকেও। এখানেই বৈশিষ্ট্য সমারসেট মম-এর।

সমারসেট মম-এর বাছাই-করা দশটি গল্পের স্বচ্ছন্দ ও সুখপাঠ্য অনুবাদ করেছেন শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীশ রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কল্প কর আর শীতাংশু মৈত্র। বাঙালী পাঠক-সাধারণের কাছে সমারসেট মম্-কে আরও একান্ত করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বলে এঁরা প্রত্যেকেই ধন্যবাদার্হ।

এ স্তবকের তৃতীয় বইখানা হোল ছোটদের একটি ভ্রমণ কাহিনী। পিটার আর জুডি ছোট দুটি ভাই-বোন। দেশ তাদের সুদূর আমেরিকায়। কিন্তু বাবা, মা দুজনেই থাকেন নয়া সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েটভূমিতে। নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মত সোভিয়েট দেশে পুনর্গঠনের যে কাজ শুরু হয়েছে, বাবা তাতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেন সেখানে। বাবা-মার চিঠি পেয়ে ওরা তাই ছুটিতে যাচ্ছিল সোভিয়েট দেশে। মস্কোর মেট্রোতে পৌঁছে ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল, ওরা তো অবাক বনে গেল। এ যে তাজ্জব ব্যাপার! কাণ্ড-কারখানাই সব এখানকার উল্টো। তারই বিচিত্র কাহিনী মার্জরি ফিসার কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর Palaces on Monday বইতে অভিনব এক ভঙ্গিতে। আর তাকে ঝর-ঝরে তক তকে মিষ্টি করে রূপায়িত করেছেন বাঙলায় শ্রীযুত অশোক গুহ।

তবে একটি কথা। 'অবলম্বন'-এর সোজা কাট-ছাট পথ অনুসরণ না করে মূল বই-এর বৈশিষ্ট্যটুকু যতদূর সম্ভব আরও বজায় রাখবার চেষ্টা করলে, আমার বিশ্বাস, এ শ্রেণীর বই-এর প্রতি সুবিচাব করা হয় আরও বেশি।

নিখিল সেন

পাঠকগোষ্ঠী

(১)

গত ষোলই আগস্ট কলকাতায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'জনিত প্রথম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরেই এরকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তথাকথিত জাতীয়তাবাদের আড়ালে অচিরেই সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পাবে। এসম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমি এক বিবৃতিও দিয়েছিলাম। সে আশংকা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার, ও পাকিস্তান দাবীর অনুরূপ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও আজ হিন্দুবঙ্গ গঠনের আন্দোলন শুরু করেছে এবং শুধু শুরু করাই নয়, রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস এতদিন অসাম্প্রদায়িকতার দাবী করত। সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পাবে—এই অজুহাত দেখিয়ে কংগ্রেস বাঙালী মুসলমানদের

এক বিরাট বিপুল অংশের পাকিস্তান দাবী—ন্যায় হোক, অন্যায় হোক,—সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখার উদ্যমও করেনি। নিজের কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে মুসলিম গণসংযোগের জন্য বা বাঙলার সেই বিরাট চাষীকুলের—যাদের অধিকাংশই মুসলমান—অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংগ্রামপন্থা পর্যন্ত উপস্থাপিত করেনি। আজ সেই কংগ্রেসকেও অকস্মাৎ হিন্দুবাঙালীর এক বিপুল অংশের এই বঙ্গবিভাগ দাবী সমর্থন করে মেতে উঠতে দেখা যাচ্ছে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ বাঙলাদেশে কংগ্রেসী রাজনীতির নিষ্ক্রিয়তা এবং হিন্দুমহাসভাভাবাপন্ন দলের প্রাধান্যদুষ্টতা অনিবার্যরূপে কংগ্রেসের মধ্যে এ পরিণতি এনে দিয়েছে। সে যা হোক, বঙ্গ বিভাগের এই আন্দোলন যদি কেবলমাত্র বর্তমান অসুস্থ রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তবে রাজ্য রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙাগড়ার বিপর্যয়ে শিল্পীর (Art-এর কারবারীর) দায়িত্ব স্বীকার করেও, তাদের তরফ থেকে এই আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার হয়তো অবকাশ ঘটতো না; কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনেও বহু সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবী এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন এবং শুধু সমর্থন করাতেই নয় সংস্কৃতিরক্ষার অজুহাতে এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আর বাস্তবিকপক্ষে বলতে কী, এবারকার সম্মেলন প্রকৃতপ্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও হিন্দুবঙ্গ সম্মেলনরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবিশ্যি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন নিয়ে যতোই হৈ চৈ হোক না কেন রায়বাহাদুর, রায়সাহেব এবং প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকগোষ্ঠীর প্রাধান্য-পরিপুষ্ট এই মজলিসের 'অভিভাষণ'গুলি কখনো অবহেলার কখনো বা 'পাঠ্য-সাহিত্যে'র দৃষ্টিতেই দেখেছি মাত্র; কিন্তু এবারকার সম্মেলনে বঙ্গ বিভাগ এবং শিল্পকে সম্প্রদায়াশ্রয়ী করার দাবী উঠেছে বলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে একে দেখা দরকার। বহু শিল্পী সাহিত্যিক এ সম্মেলনে অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে যে শিল্পী-ধর্মবিরোধী কাজ করেছেন, তার আলোচনার জন্যই এই পত্রের অবতারণা। অবশ্য যে 'সাহিত্যিক'দের অভিভাষণে উক্ত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন এবং মোটেই প্রগতিশীল নন ('প্রগতিশীল' কথাটা আমরা অন্তত এই অর্থেই ব্যবহার করি)। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে এক্ষেত্রে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। কিন্তু বাঙলাদেশের প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অভিভাষণে যে পরাজিত মনোভাব ফুটে উঠেছে, তা সকল সংস্কৃতি-প্রেমিককেই বিস্মিত ও ব্যথিত করেছে সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন: অনিবার্যভাবেই বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্র, বাঙালীর আবাসভূমি আজ খণ্ডিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ খণ্ডন মর্মান্তিক বেদনাদায়ক এবং আদর্শ-বিরোধী একথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু কার্য ও কারণে এ খণ্ডন অনিবার্য হয়ে উঠলে তাকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়? যদিই তাই হয় তাতেও হতাশ হবার কোনো কারণ আমি দেখি না। ইত্যাদি।

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী আজ দুটি অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বজনিত সংঘর্ষ সাধারণ জীবনকে সর্বপ্রকারে পর্যুদস্ত করে ফেলছে। আজকের শিল্পীরা যে তাকে যথেষ্ট সমাজবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেননি, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তারই প্রমাণ দিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে কি আরো প্রমাণিত হলো না যে, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো বহু বিরাট শিল্পীর ঐতিহ্যবহ বাঙলার প্রগতিশীল শিল্পী সম্প্রদায়ও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক সচেতন নন? *

বর্তমান শতাব্দীতে শিল্পের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হচ্ছে: বর্তমানের প্রগতিশীল শিল্পীরা বিশ্বাস করেন যে জীবনকে প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর সর্বরকম বিধিবন্ধন থেকে মুক্ত করে সার্থক ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করাই শিল্পের ধর্ম। এই ধর্মই কখনো

---

* বাংলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিষয়ে কোনো মতামত এখনো প্রকাশ করেন নি।—সম্পাদক।

মানবপ্রেম, কখনো অ-সুন্দরেব প্রতি ঘৃণার এবং সত্য ও সুন্দরকে কামনার আকারে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য মারফৎ প্রচারিত হয়েছে: রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়-গোর্কি প্রভৃতিরো তাই ধর্ম ছিল। রাজ্য রাষ্ট্র ভাঙাগড়াব বিপর্যয়ে যথার্থ শিল্পীর নিকট এ আদর্শ কোনদিন পরিত্যক্ত হয়নি বা তার হাতে কোন জন্মগত বা সম্প্রদায়গত রূপায়ণেও শিল্প শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে বলে জানিনে। যদি কখনও হয়েও থাকে আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী তাকে মহৎ শিল্প বলে কখনই স্বীকার করব না।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যও যখন তার এই মহান ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে নব নব সৃষ্টিতে সত্য ও সুন্দরের বন্দনাগানে জোয়ারের মতো কল্লোলিত হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই যাঁরা শিল্প ও সংস্কৃতিরক্ষার অজুহাতে তাকে সম্প্রদায়গত আবরণের নীচে টানতে প্রয়াস পাচ্ছেন, প্রগতিশীল শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের শিল্পীধর্মচ্যুত বলে অভিহিত করতে কোনো দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না।

অবশ্য তাঁদের কেউ কেউ এ বিপর্যয়ের পরিবেশে শিল্পীর গুরুদায়িত্বের কথা, তার দ্বারা মিলনের ক্ষেত্র রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের উপলব্ধি এবং অল্পবিস্তর সকলেরই শিল্প ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বেদনাবোধকে প্রশংসা না করে পারিনে। কিন্তু তবু সমস্ত সম্মেলনের মধ্যে যে-কথাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখা দিয়েছে তা পরাজিতের মনোবৃত্তি। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের পরিবেশে এই পরাজিত মনোভাব যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তখন বিশ্ব ও জীবনের বৈজ্ঞানিক-বোধ এবং সামাজিক চেতনার ভিত্তিতে যাঁদের শিল্পীমন প্রতিষ্ঠিত নয় তাঁরা যে বিচলিত বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। কিন্তু যাঁরা সে গোষ্ঠীভুক্ত নন, তাঁদের মধ্যে এর সংক্রমণ দেখে মনে হচ্ছে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে আজ আবার নতুন করে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথার অবতারণা করছি।

শিল্পের যে ধর্মের কথা উল্লেখ করেছি তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চেতনাবোধেব উপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ ও জীবনের যে রহস্য, লীলাবৈচিত্র্য, সুখদুঃখ, হাসিকান্না ও বেদনা-বাসনা শিল্পীর মনে রেখাপাত করে, emotion জাগ্রত করে, বৈজ্ঞানিক intellect-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সম্যক উপলব্ধি করে, সত্য ও সুন্দরের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা অথবা অন্যায়-অত্যাচারের বীভৎসতার প্রতি মনোভাব গড়ে তোলাই শিল্পীর উদ্দেশ্য, ধর্ম এবং দায়িত্ব। শিল্পের প্রয়োজন ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সমষ্টিগত ভাবে সমাজস্বার্থে। উনবিংশশতকে রাষ্ট্র ও সমাজগঠনে কার্ল মার্ক্‌সের যে চিন্তাধারা জীবনের সর্ববিধ রীতি ও ধারণায় বিপ্লব এনেছে, মানুষকে সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণদর্শনের পথ দেখিয়েছে তারি অনুসরণে আজ শিল্পের ধর্ম এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্র নতুন করে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। নতুন করে বলছি এই জন্য যে, উক্ত জীবনদর্শন প্রচারিত হবাব বহু আগে থেকেই শিল্পের ক্ষেত্রে এ আদর্শের উদ্ভব হয়েছে—প্রাচীন মহৎ সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রমাণের অভাব হবে না।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, প্রতিকুল পরিবেষ্টনীর সর্বপ্রকার শোষণবন্ধন থেকে ব্যক্তিজীবনের মুক্তি এবং প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা দান। এবং এ কেবল সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। ভারতবর্ষেও যখন ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র ও শ্রেণীবদ্ধ বা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কলহের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ে জীবনের পরিবেশ প্রতিকুল হয়ে উঠেছে, এসময় এ বিপর্যয়ের মধ্য থেকে ব্যক্তিজীবনকে মুক্তি দিতে হলে, জীবনকে সুন্দরতর করে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপনে যত্নবান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, একথা আজকের রাষ্ট্রশিল্পী তথা জীবনশিল্পীরা প্রচার করছেন।

প্রগতিশীল শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলনও আজ সে কথারই প্রতিধ্বনি। বস্তুত শিল্পী এই রাষ্ট্রের স্বপ্ন বহুকাল পূর্বেই দেখেছিলো এবং আজো নতুন করে দেখছে। সুতরাং শিল্পের ধর্মানুযায়ী বর্তমান রাষ্ট্রশিল্পী ও সাহিত্যশিল্পীদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এক এবং অভিন্ন। তাই শিল্প যে সংকীর্ণতামুক্ত পবিত্র মানুষ গড়ে তুলতে পারবে, তার

মধ্যে এতটুকু অবাস্তব স্বপ্ন নেই। বাস্তবিক বলতে কী, যে প্রেরণায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাতসংকুল এই দেশে জীবনের ভাঙনের বেদনায় রাষ্ট্রশিল্পী তার কর্মে উদ্বুদ্ধ, ব্যাপকভাবে সাহিত্য-শিল্পীও সেই বেদনা দ্বারাই তার সৃষ্টিতে নিয়োজিত।

দু'য়ের সেই মূল ঐক্যকে স্বীকার করে নিলে আজকের সৎ রাষ্ট্রশিল্পী যেমন পাকিস্তান বা বঙ্গভঙ্গ কোনটাকেই সমাধান বলে মেনে নিতে পারেন না, জীবনের সেই সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণাদর্শকে প্রতিষ্ঠাই একমাত্র করণীয় বলে মনে করেন, তেমনি সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও তাদের ধর্ম ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। বর্তমানের এই অর্থনৈতিক ও সামান্তযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির উন্মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে শিল্প ও সংস্কৃতি (যা জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো দরকারী) রক্ষাব জন্য শুধুমাত্র হিন্দুরাজ বা পাকিস্তানরাজের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, জীবনের সর্বক্ষেত্রকে গ্রাস করবার জন্য যে অ-সুন্দর মস্তক উত্তোলন করছে—মনুষ্যত্ব, মন, সভ্যতা, সংস্কৃতি যতোটুকু আমরা উত্তরাধিকারীর সূত্রে পেয়েছি, তাকে নিঃশেষে ছারখার করে দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে সামগ্রিকভাবে—তার রূপ উপলব্ধি করে সংগ্রাম ঘোষণাই এখন সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য। বাঙলাদেশের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই এ কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু যারা এখনো জীবনকে ব্যাপকতর দৃষ্টিতে দেখার অভাবে দেশেব এই বিপর্যয়সংকুল পরিবেশে শিল্পীর মহান ও গুরুদায়িত্বকে সঠিক উপলব্ধি করেননি, তাঁরা অবিলম্বে অবহিত হোন। তা না হলে যুগযুগ বহু মনীষা ও প্রেমে পুষ্ট শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তার লক্ষ্যে নিয়ে পৌছানো দূরের কথা, তাকে রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

(২)

অল্পদিন হইল অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু ও মুসলিম' ধারাবাহিক ভাবে 'পরিচয়ে' বাহির হইবার পর সম্প্রতি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্বেও 'পবিচয়ে'ই মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুত আবদুল মওদুদের প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের Studies in Indian Social Polity পুস্তকে বিশদভাবে বহু প্রমাণ সহ ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানিতে মুসলমান সমাজব্যবস্থার কোনই আলোচনা নাই, আছে মাত্র হিন্দু সমাজব্যবস্থার। তাহাও মুসলমান যুগে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে। উপরোক্ত লেখকগণেব প্রত্যেকেই ঘটনার পিছনে বাস্তব এবং ঐতিহাসিক কার্য-কারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী তাই ইঁহাদের লেখনী-প্রসূত ব্যাখ্যায় মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই সদুত্তর খুঁজিয়া পায়।

মুসলিম সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা কালে হিন্দুর জীবন এবং সংস্কৃতির সহিত মিল ও অমিল উভয়ই হীবেনবাবু কার্য-কারণ সহ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু একটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ইঁহাদের কেহই, এমন কি শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারও তাঁহার সংস্কৃতি-বিষয়ক কোন আলোচনায় স্থান দেন নাই।

হিন্দু জনতাকে সহজে উদ্বোধিত এবং উত্তেজিত করিতে হইলে, আমরা দেখিয়াছি হিন্দু বক্তাবা স্ত্রী জাতি বা মাতৃজাতির নামে আমাদের সুপ্ত চেতনাকে কষাঘাত করিয়া থাকেন। হিন্দু জনতার উপর এই অমোঘ অস্ত্রের যে কি বিপুল প্রভাব তাহা রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক উভয় শ্রেণীর agitatorদের নিকট ইহার সমান আদর হইতে বুঝিতে পারি। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতে হইলে সরাসরি কোরআন এবং ধর্মের অনুশাসনগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা উভয়েই এই অস্ত্র হামেশাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উভয় পন্থাই যে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত জনতার উপর বিদ্যুৎস্পর্শের ন্যায় কাজ করে এ সম্পর্কে আশা করি কাহারই দ্বিমত নাই! অপর দিকে, বাস্তবজীবনে নারীজাতির অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থের এই

আকর্ষণী এবং উদ্বোধনী শক্তি হিন্দুদের নিকট অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যদি বহুযুগ যাবৎ একত্র বসবাস, একই ভাষায় কথোপকথন, সাধারণ ভাবে একই ধারায় জীবনযাপন প্রণালী একই ধরণের মানসিক গঠনের পরিপোষক হয় তবে উভয়ের এই তীব্র বৈসাদৃশ্য কোন বিশেষ কারণের জন্য ?

'পরিচয়'-পাঠক হিসাবে আমি প্রশ্নটি ইহার লেখক ও সুধীসমাজে উপস্থিত করিলাম, আশা কবি হীরেনবাবু প্রমুখ যাঁহারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন তাঁহারা এই বিষয়ে আলোকপাত করিবেন।

বলাই বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

চৈত্র সংখ্যা (১৩৫৩) 'পরিচয়'-এ বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্-এর History of Western Philosophy গ্রন্থের সমালোচনায় কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে :—

৬৬৭ পৃষ্ঠায় Whitehead-এর উদ্ধৃতিতে 'inaguration' স্থলে 'imagination' হইবে।

৬৬৮ পৃষ্ঠায় ১১শ পংক্তিতে 'দর্শনের হাত' স্থলে 'দর্শনের জাত' হইবে।

৬৬৯ পৃষ্ঠায় ২১শ পংক্তিতে 'their notions of property lookingly' স্থলে '......look ugly' হইবে।

৬৭০ পৃষ্ঠায় Whitehead-এর উদ্ধৃতিতে 'substraction' স্থলে 'subtratum' হইবে।

৬৭১ পৃষ্ঠায় ১০ম পংক্তিতে 'ইন্দ্রিযোপাত' স্থলে 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত' হইবে।

সম্পাদক

হিরণকুমার সান্যাল

গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং
৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

লুই আরাগঁ

অল্প কয়েক বছর আগেও বিশেষ কয়েকটি সাহিত্যিক গোষ্ঠির বাইরে খুব কম জনেই লুই আরাগঁর নাম জানত। আজ তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত জীবিত কবিদের মধ্যে অন্যতম; তাঁর রচনাবলী পৃথিবীর সব দেশে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে তাঁর রচনা, পুস্তিকা আর প্রবন্ধ ইত্যাদি সোৎসাহ প্রশংসার সঙ্গে কিম্বা বিরুদ্ধ মন্তব্যের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আমি যে এই আলোচনায় যোগদান করছি, সে সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ এই-যে, এ পর্যন্ত কেউ আরাগঁ-প্রসঙ্গে মূল প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন বলে জানি না: তাঁর প্রথম জীবনের রচনা থেকে আরাগঁ কিভাবে ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছেন, এবং কেন তিনি কবি হিসেবে এতখানি বিশিষ্ট এবং অনন্যসাধারণ।

এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জগতকে দেখছেন এবং এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর আছে, যে তার ফলে আরাগঁ-র প্রত্যেকটি রচনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে;—এটাই আরাগঁ সম্বন্ধে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই ব্যাপারটাকে স্থিতিশীল একটা মনোভাব হিসেবে দেখলে চলবে না, তাঁর মানসিক বিবর্তন এবং ক্রমপরিণতির দিক থেকে এর বিশ্লেষণ করা চাই। আরাগঁ-কে বুঝতে গেলে আজকে তাঁকে যেমনটি দেখছি, শুধু সেইটুকু দেখাই যথেষ্ট নয়; কোথা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, এবং কোন লক্ষ্যে তিনি চলেছেন সেটাও জানা চাই, কোন পথ বেছে নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন সেটা উপলব্ধি করা দরকার। এর থেকেই কবি আর তাঁর সমাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা ওঠে, ধনতন্ত্রের অধীনে শিল্পীকে যে সব সমস্যা আর স্বতঃবিরোধিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় সে আলোচনাও এই প্রসঙ্গে এসে যায়।

আরাগঁর পরিণতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কাব্যের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই; কিন্তু এই বিষয়ে মার্ক্সবাদী সমালোচকদের কয়েকটি সিদ্ধান্ত এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় বলে মনে করি: "ধনতন্ত্রের কাছে সংস্কৃতির আর কোন উপযোগিতা নেই", বুর্জোয়া আদর্শ কায়েমী করা এবং চালু রাখার জন্যেই "শিল্পকে আজ পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয়েছে," শস্তা আর থেলো করে ফেলা হয়েছে,—এবং এযুগের কবিকে একটা নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছে: হয় ধনতন্ত্রের কাছে আজ তাঁকে আত্মবিক্রয় করতে হবে, আর না হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যা-কিছু সুখসুবিধা সবই তাঁকে বর্জন করতে হবে।

এই নির্বাচনের প্রশ্নটা ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল তাঁর "ইলিউশন অ্যাণ্ড্‌ রিয়ালিটি" নামক বইয়ে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তাঁর সেই বিশ্লেষণ এত বেশী প্রযোজ্য যে এখানে তাঁর রচনার দুটি অংশ একটু বিশদ ভাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আজকের সমাজে চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে কড্‌ওয়েল বলছেন,

> "সামাজিক চৈতন্য আজ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—দেহ-বিচ্ছিন্ন অস্থির মতই। সমসাময়িক চেতনায় যে বিশৃঙ্খলা আপাত-লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তার থেকেই বোঝা যায় যে এই অঙ্গহীনতার যন্ত্রণাটা মানুষের পক্ষে কতখানি দুঃসহনীয়।
>
> শাসক-শ্রেণীর স্বার্থের অনুবর্তী যে চেতনা, সে চেতনা তার জৈবিক সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে নিজেকে সঙ্কুচিত করে আনে, আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ সেটা একান্তভাবে টুলো-পণ্ডিতীয়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়াশীল আর ফ্যাশিস্ট্‌-পন্থী হয়ে ওঠে। এইভাবে জীবিত অবস্থাতেই তার মধ্যে মৃত্যুর পচনক্রিয়া ধরে। সচেতন শিল্পীদের অধিকাংশই এই ক্ষয়িষ্ণুতাকে কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। সেইজন্যে এঁদের কেউ কেউ তাঁদের সমস্ত অন্ধতা নিয়ে আর সংস্কারের প্রেরণায় বিপরীতমুখে শোষিত শ্রেণীর অভিমুখে আকৃষ্ট হচ্ছেন। ফলে শিল্প-চেতনার সমস্ত আধারটাই ভেঙে গিয়ে একাধিক ভগ্নাংশে পরিণত হয়।
>
> ক্ষয়িষ্ণু এবং বেদনা-বিমূঢ় দিশেহারা এই আধুনিক বুর্জোয়া শিল্পের প্রত্যেকটি 'আন্তরিক' সৃষ্টির মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার নেশায় আত্মহারা এক চিন্তাবিভ্রাট দেখা দিয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় শিল্পীর চেতনায় এই দ্বৈতাকর্ষণের চাপটা কতদূর অসহনীয়।..."
>
> (পৃঃ ৩১৭)।

১৯১৯-এর মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই চিন্তাবিভ্রাট যখন চরমে ওঠে, সেই সময়ে আরাগঁ লিখতে শুরু করেন। ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির দিন তখন থেকেই শেষ হয়ে আসছে, তার আত্ম-সন্তুষ্টি আর নির্দিষ্ট ধারণাগুলি আর টিকছে না; পুরাতন ব্যবস্থা তার সমস্ত লোভ, অন্যায় আর দুর্নীতি নিয়ে কুৎসিত রূপে আত্মপ্রকাশ করল, সৎ-শিল্পী আর তার মধ্যে গৌরব করে তুলে ধরবার কিছু পেলেন না। যুদ্ধে যারা লড়াই করে এসেছে, সেই তরুণরাই এই বীভৎসতা, অপচয় আর অভিজ্ঞতালব্ধ নির্মমতা সব চেয়ে তীব্র ভাবে অনুভব করল; মানুষ যদি সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে এরকম অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সে চেতনার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানই ভাল। [এই মনোভাবই 'অবচেতন-তন্ত্রের' (the cult of subconscious) অন্যতম কারণ।] এঁদের গোষ্ঠি থেকেই এলেন সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর নেতারা,—যাঁরা সব কিছুরই বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন; আরাগঁ ছিলেন এই নৈরাজ্যবাদী, ধ্বংসোন্মত্ত কালাপাহাড়দের অন্যতম।

এই নৈরাজ্যের পথ ছাড়া অন্য যে পথটা ছিল, সেটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নিজেকে সহযোগী করে তোলা, বাস্তব সম্বন্ধগুলি মেনে নিয়ে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা; কিন্তু খুব কম জনেই এরকম করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক ছিলেন। কড্‌ওয়েলের কথায় বলতে গেলে—এঁরা বিপ্লবের আশায় ছিলেন বটে, কিন্তু সেই নতুন বাস্তব জীবনের বিশিষ্ট রূপটি তাঁরা শিল্পীজনোচিত স্পষ্টতার সঙ্গে অনুভব করেন নি, কারণ তাঁরা

নিজেদের এমন একটা সংজ্ঞা ঠিক করে নিয়েছিলেন, যার ফলে যে সংগঠন সেই বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবে, সেই সংগঠন থেকেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন।

অন্যান্য সুররিয়ালিস্ট্‌দের সঙ্গে আরাগঁও মনের অবচেতন রাজ্যে অভিযান শুরু করলেন, স্বপ্নের জগত তৈরী করে নিয়ে চারপাশের ঘৃণিত এই বাস্তব সংসারকে অতিক্রম করে যেতে চাইলেন।

জনৈক অনুরাগী সমালোচক রেনে বের্‌তেলে সুররিয়ালিস্ট্‌ কবিতার প্রকৃতি "ক্ষণিকের প্রতিচ্ছায়া" বলে বর্ণনা করেছেন—

"এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, অন্য কিছু নয়।...কবিতার এক নতুন সংস্কার আবির্ভাব হল, পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসেবে এই কবিতা হয়ে উঠল প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী—বিদ্যুৎস্ফুরণের মত, চোখ ঝলসানো অগ্নিশিখার মত এই কবিতা একটা চিৎকার, একটা বিমুগ্ধ বিহ্বলতা হয়ে উঠল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশৃঙ্খলা থেকে ছিন্ন হয়ে এসে এ যেন উন্মত্ত দুঃসাহসিক এক অভিযানে বেরিয়েছে। অন্তর্লীন জীবনের সবচেয়ে অপরিচিত দুর্জ্ঞেয় গভীরতা থেকে উৎসারিত এর ধ্বনিব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য সমুদ্রতলের উদ্ভিদ আর প্রাণী জগতের মতই আশ্চর্য রহস্যময়। নতুন আর বিচিত্র একটা সৌন্দর্যও এতে ব্যক্ত হয়... যে সৌন্দর্যে মন অস্থির হয়ে ওঠে, বৈকল্যের সৃষ্টি হয়।"

এই ধরণের খানিকটা বর্ণবহুল ভাষায় সাধারণ ব্যাখ্যা দেবার পর বেরতেলে এই ভাবে এলুয়ার, আঁদ্রে ব্রেতঁ এবং আরাগঁর কবিতার বিবরণ দিয়েছেন—

"এই করুণ সাক্ষ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির যাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন সমস্ত কিছুর ঝুঁকি নেবেন, সবপথ যাচাই করবেন এবং সমস্ত শৃংখল ভাঙবেন আত্মজয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় আর মনের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে।......"

পরবর্তীকালের আরাগঁকে দেখে বোঝা যায়—এই ব্যাপারটা তাঁকে কি ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মনের গভীরে সেই রহস্য অনুসন্ধানের পেছনে একটা উদ্ধত নির্ভীকতার দাবী ছিল, আর ছিল প্রচলিত রীতিগুলোকে অগ্রাহ্য করার দিকে ঝোঁক যাতে তিনি তাঁর সহজাত কবিত্বশক্তি এবং ঐশ্বর্যময় কল্পনাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুররিয়া-লিজ্‌ম্‌-এর ভিত্তিহীনতা এবং শেষপর্যন্ত তার অন্তঃসারশূন্যতা আরাগঁর মত প্রত্যক্ষদর্শী লোকের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখতে পেলেন। সুররিয়ালিস্ট্‌দের জনৈক অনুরাগী জর্জ হুগ্নের ভাষায় এটা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"সাহিত্যের সীমানা থেকে—বলা যেতে পারে, কাগজের বুক থেকে—কবিতা এসে প্রবেশ করেছে জীবনের মর্মস্থলে। কবিতা এখন আর একটা মানসিক অবস্থা রইল না, সে নিজেই জীবন হয়ে উঠেছে, মন হয়ে উঠেছে।......শিল্পীর সচেতন মানসের অবদমনের ফলে কবিতাকে পরিচালিত করা হল আত্মঘোষণায়, এমন এক শাখার শেষ প্রান্তে তাকে নিয়ে যাওয়া হল যার তলায় তুমি বলবে কিছু নাই, আমরা বলছি সব আছে...... "

সুররিয়ালিজ্‌ম্‌ তার নিজের স্বীকৃতিতেই এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যেখান

থেকে তার আর অগ্রসর হবার উপায় ছিল না। "শাখার শেষ প্রান্তে এসে ফেলার" পর কি করবার থাকতে পারে? সুররিয়ালিস্টরা এক বিশ্রী সংকটের সম্মুখীন হলেন: এই কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলেন। রজার ভেইয়াঁ তাঁর 'দ্রোল্ দ্য জ্যু' নামক সুলিখিত উপন্যাসে এই ধরণের স্বপ্নচ্যুত বুদ্ধিজীবিদের বর্ণনা দিয়েছেন; এই উপন্যাসের ভাষাটা একটু স্থূল হলেও বর্ণনাটা উপভোগ্য—

> "মাদকদ্রব্য, ট্রট্স্কীবাদ, আত্মহত্যা, মদ, 'জাতি-বাদ'—এই সমস্তই আমার অধিকাংশ বন্ধুর মৃত্যু অথবা মুমূর্ষু অবস্থার জন্যে দায়ী। যাদের মন অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাক্লিষ্ট, তারা সিনেমার স্টুডিওতে কাজ করে।...অন্য একজন অরাজনৈতিক পত্রিকাগুলিতে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে।...কোন ব্যাপারে তার সহযোগিতা চাইলে সে উত্তর দেয়, 'আমি নৈরাজ্যবাদী। সব কিছুই আমার কাছে বিরক্তিকর, আমি নিজেই নিজের কাছে বিরক্তিকর।' আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল ছিল: বুর্জোয়া মূল্যবোধ আমরা কেউই নিষ্ঠার সঙ্গে নিতে পারিনি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার নিজের মধ্যেই যে বিরোধ সৃষ্টি করে, আমরা ছিলাম সেই বিরোধেরই একটা চরম উদাহরণ।... 'সৌন্দর্যদেবীকে এনে কোলে বসিয়েছি, আর তাকে বেইজ্জত করে ছেড়েছি'—এই অন্তিম অর্ঘ্য আমরা শিল্পের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলাম। উৎকট বিকৃত সব রসিকতা—সুররিয়ালিস্ট্ রসিকতা।..."

এমন কি সুররিয়ালিস্ট্দের মধ্যে যাঁরা অধিকতর নিষ্ঠাবান, তাঁরাও উপলব্ধি করলেন-যে যে জগতকে পরিবর্তিত করবার জন্যে তাঁরা এত অস্থির, সে জগতকে তাঁরা তাঁদের লেখার দ্বারা একটুও বদলে দিতে পারেন নি, পারাও সম্ভব নয়। বেরতেলে—যিনি নিজে একজন 'অরাজনৈতিক সাহিত্যিক'—তিনিও স্বীকার করেছেন: একমাত্র অন্য পথ হচ্ছে লেখার বদলে কর্মের দ্বারা এই কাব্যরিক্ত জগতকে ধ্বংস করে, বহুবাঞ্ছিত সেই কাব্যের জগত সৃষ্টি করা। বেরতেলে বলছেন, "এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাই-ই করতে গেলেন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে"; তিনি একথাও বলেছেন যে, সুররিয়ালিস্ট্ কবিদের মধ্যে অনেকেই 'অবচেতন তত্ত্বের' অনুশীলনের ফলে অধিকতর কাব্যসম্পদ অর্জন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

এঁদেরই অন্যতম হচ্ছেন আরাগঁ। তাঁর সুররিয়ালিস্ট-পর্বে তিনি অজস্র রচনা করেছেন, এবং মনের গভীরে ডুব দিয়ে দিয়ে তিনি প্রকাশ ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা, অভিনব কল্পনা আর মৌলিক চিত্রকল্প আহরণ করে এনেছেন। এই সব গুণ তাঁর অতি সাম্প্রতিক কাব্যেও প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলি আজ দুর্বোধ্য ঠেকে এবং এযুগের পক্ষে সেগুলো অদ্ভুত বেসুরো বলে মনে হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটা সজীবতা এবং গীতিকাব্যের মাধুর্য আছে। উদাহরণ হিসাবে এই কবিতাটা ধরা যেতে পারে (দুর্ভাগ্যবশত এর শব্দবিন্যাস অনুবাদে বজায় রাখা অসাধ্য)—

> Les fruits à la saveur de sable
> Les oiseaux qui n'ont pas de nom
> Les chevaux peints comme un pennon
> Et l'Amour nu mais incassable.

Soumis à l'unique canon
De cet esprit changeant qui sable
Aux quinquets d'un temps haissable
Le champagne clair du canon…]

* বালুকণার মত স্বাদু ফল
নামহীন সব পাখী
পতাকার মত রঙীন ঘোড়া
আর নগ্ন অবিনাশী প্রেম

পরিবর্তনশীল শক্তির
অদ্বিতীয় পরীক্ষায় সমর্পিত
যে শক্তি ঘৃণিত সময়ের বাতির আলোয়
কামানের সুরা পান করে…

কিম্বা 'লে শেভালিয়ে দ্য লুরাগাঁ' রচনাটি ধরা যেতে পারে ; এই কবিতায় যে ঝঙ্কার আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেটা প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটার মত পাঠককে অভিভূত করে। চিত্রের জগতে পিকাসোর মতই আরাগঁও এই যুগে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, কাব্যের রূপরীতির আঙ্গিকগত জটিলতা আয়ত্ত করেছেন এবং এমন একটি স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছেন, যা এখন অনেকের মনেই ঈর্ষা জাগায় ; আরাগঁ সম্বন্ধে সমালোচকরা যে যেরকম মনোভাব পোষণ করে সেই রকম মনোভাব অনুযায়ী কেউ বা তাঁকে অভিনন্দন জানায়, কেউ বা গালাগাল দেয়।

সুররিয়ালিজ্‌ম্‌ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসার পরে, আরাগঁ আগে যে জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সেই জগতকে বুঝবার জন্যে রাজনৈতিক ধারণাটা স্পষ্ট করে নেবার সময়ে, অল্প কিছুকাল তিনি এমন সব কবিতা লিখেছিলেন যাতে বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত বা বিশ্বাসের ছোঁয়াচ লাগেনি। সুররিয়ালিস্ট্‌ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলেই তাঁকে অন্য পথ খুঁজতে হয়েছিল। তাঁর অবস্থাটা হয়ে উঠল যে-কোন বুর্জোয়া শিল্পীর মত, যাকে—কড্‌ওয়েলের ভাষায়—"শ্রমিক-শ্রেণী সম্পর্কে এই তিনটি সম্ভবপর ভূমিকার মধ্যে যে-কোন একটিতে অবতীর্ণ হতেই হবে—বিরুদ্ধতা, সহযোগিতা কিম্বা সাঙ্গীকরণ।" আরাগঁর পক্ষে প্রথম ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল :

> "বিরুদ্ধতা করা মানেই পূর্ব-পরিত্যক্ত অবস্থায় ফিরে আসা। গত কাল যে-রীতি-ব্যবস্থা ত্যাগ করে আসা গেছে, আজ আবার তাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব ; এঁরা নিজেদেরকে অস্তিত্বহীন করে তুলেছেন…ইতিহাসকে পেছন দিক থেকে উল্টে নেবার এই চেষ্টা থেকেই স্পেংলারীয়, 'আর্য' অথবা ফ্যাশিস্ট-শিল্প জন্ম নেয়।" ('ইলিউশন অ্যাণ্ড্‌ রিয়ালিটি'। পৃঃ ৩১৮।)

* কবিতাটি আপাতদৃষ্টিতে এতই অবোধ্য এবং অর্থহীন, যে একে ভাষান্তরিত করা অসম্ভব বলে মনে হয়। এখানে মোটের ওপর একটা আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, পাঠকের কাছে এই আক্ষরিক অনুবাদ অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকবে। পরবর্তী কবিতাগুলির অনুবাদও নিতান্তই ভাবার্থবোধক ; মূলের কাব্যসৌন্দর্য এগুলিতে একটুও বজায় রাখা যায়নি।—অনুবাদক।

দ্বিতীয় পথটাও সন্তোষজনক নয় ; কডওয়েল লিখেছেন, সে সময়ে অধিকাংশ বুর্জোয়া শিল্পীই "সহযোগিতার পথ ধরে চলছিলেন—এবং বহু স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্ শিল্পীও একই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই সহযোগিতা উচ্ছৃঙ্খল-সহযোগিতা মাত্র ;" এই শিল্পীরা "সর্বহারা শ্রেণীর কোন সংগঠনের মধ্যে আসেন না, দলের বাইরে সহযাত্রী হিসাবে থাকেন। সুতরাং সমাজের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—তাঁদের মনোভাব হয়ে ওঠে অরাজক নাস্তি-বাদী 'স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্'-এর মনোভাব।" (ঐ, পৃঃ ৩১৯)

স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্ ছেড়ে আসার পর, ১৯৩০-এ আরাগঁ এই ধরণের সহযোগিতায় খুশি হতে পারেননি। তিনি একমাত্র অবশিষ্ট পথটাই বেছে নিলেন, 'সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠনে' যোগ দিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আত্মসমীকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

আরাগঁ তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী স্বভাব, নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর একান্ত বিশ্বাস, সততা এবং আপোষ-বিরোধী মন নিয়ে এবার চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করলেন ঃ স্যুর্‌রিয়ালিস্ট-দের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল নন, তাঁদের সংসর্গ ত্যাগ করলেন এবং ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলেন।

এই যুগের প্রথম কবিতাবলী 'অত্যাচারিত অত্যাচারী'তে (১৯৩১-৩২) তাঁর নবলব্ধ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নেই—এমন কি "কমিউনিস্টরা ঠিকই করেছে" শীর্ষক কবিতাতেও স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্-এর ছাপই থেকে গেছে। কিন্তু ১৯৩৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণের সময় আরাগঁর মন থেকে "অবচেতন তন্ত্রের" সূক্ষ্ম জটিল জাল নিঃশেষে উড়ে যায় রাশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের হাওয়ায়, শ্রমিক রাষ্ট্রের সজীব সংস্পর্শে এসে তাঁর স্যুর্‌রিয়ালিস্ট চেতনার শেষ চিহ্নও অবলুপ্ত হল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে 'উরালের জয়!' নামে যে কবিতা-পুস্তক তিনি লেখেন, তা তাঁর পূর্ব-লিখিত সমস্ত কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কবিতাগুলো সরল, প্রত্যক্ষ, এমন কি স্থূল—কিন্তু অত্যন্ত প্রাণবন্ত। ১৯২০ সালে তাঁর কোন লেখায় জীবনের প্রতি এই আবেগ ছিল না। মনে হল কবি তাঁর নিজস্ব আনন্দ ও উৎসাহে তাঁর নিজের তৈরী কাঠামোকেই ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। কবিতার নামের ভেতরেও এই অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য এই কবিতাগুলি তাঁর আগেকার লেখার মত অত চমৎকার নয়—এখানে শুধু কতগুলি প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি মায়াকোভ্‌স্কি-র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বোধহয় সোভিয়েট ইউনিয়নেই তিনি প্রথম মায়াকোভ্‌স্কিকে জেনেছেন (পরে মায়াকোভ্‌স্কির শ্যালিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়)। যে স্বপ্ন-প্রাসাদের আড়ালে এতদিন তিনি কাটিয়েছেন, সেই প্রাসাদ চূর্ণ হবার প্রথম লক্ষণ এই কবিতাগুলো।

তাঁর পূর্বতন লেখার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই লেখা, এবং আরাগঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করলে এই পরিবর্তনকে অবধারিত ও দ্বন্দ্বমূলক (dialectic) বলা অযৌক্তিক নয়।

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পর ছ বছর আরাগঁ কোন কবিতা প্রকাশ করেননি। নিজের অন্তর্নিহিত মূল্যজ্ঞানগুলিকে নির্মূল করছে যে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কবিতাকে যথেষ্ট কার্যকরী অস্ত্র বলে তাঁর মনে হয়নি! অব্যবহিত সংগ্রামের জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পথ—রাজনৈতিক কর্মনিষ্ঠা এবং সেই পথকে

গ্রহণ করে তিনি কিছুদিনের জন্তে কবিতা লেখা বন্ধ করলেন। পার্টির কাজ হিসেবে তিনি সাংবাদিকতা করেন কমিউনিস্ট সান্ধ্য সংবাদপত্র "সন্ধ্যা"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক); প্রগতিশীল মতকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত করেন—যার পরিণতি তাঁরই সম্পাদকীয় দায়ীত্বে 'সংস্কৃতি সংসদ' এর প্রতিষ্ঠায়; 'মানবিক অধিকার-লীগ-এর এবং পপুলার ফ্রন্টের অন্তান্য বামপন্থী দলের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানান।

কবিতা বন্ধ হবার পর উপন্তাস লেখাকে মনে হল আক্রমণের উপযুক্ত হাতিয়ার, ধনতন্ত্রবাদের অন্তঃসারশূন্ততা উদ্‌ঘাটিত করার সহজ উপায়। ১৯৩৪ সালে তিনি উপন্তাস লিখতে শুরু করেন। তাঁর উপন্তাস মোটামুটি বালজাকের বা জোলার অনুসরণে 'প্রবহমান উপন্তাস'—বর্তমান সমাজের অধঃপতন ও দুর্নীতির চিত্র। 'বাস্তব পৃথিবী'—এই নাম থেকেই উপন্তাসটির পরিধি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে 'অরেলিয়ঁ' নামে আর একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

আরাগঁর সাহিত্য-বিচারে এই সব উপন্তাসের মূল্য কতখানি, বা আরাগঁর ক্রমবিকাশে এদের স্থান কোথায়—সে বিচারের সময় এখনো আসেনি। একটা বড় ক্যানভাসের ওপর অনেক খুঁটিনাটি বিবরণসহ কতগুলো নির্খুত ও বিষণ্ণ চিত্র—এই হচ্ছে আরাগঁর উপন্তাস। গঠন পারিপাট্য সত্বেও স্থানে স্থানে অসমান ও দীর্ঘসূত্রী, বহু চমৎকার বর্ণনা ও নাটকীয় মুহূর্ত (যেমন, স্তাভয়ের ধর্মঘটের বর্ণনা ও একজন কমরেডের মৃত্যুর পর শ্রমিকদের মিছিল) সত্বেও মনে হয় ধনতান্ত্রিক সমাজের অভিজাত জীবনের গোলকধাঁধায় আরাগঁ পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কলমে শব্দের ফোয়ারা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কবির স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান পরিত্যাগ করায় তাঁর রচনা বিশৃঙ্খল জলপ্রপাতের মত হয়ে পড়েছে।

আরাগঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ফরাসীদের দাসত্ব ও মহত্ব' পড়লে গল্প লেখক হিসেবে তাঁর সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে। তাঁর উপন্তাসের যা কিছু সদ্‌গুণ গল্পগুলোতে আছে, কিন্তু দুর্বলতাগুলো প্রায় নেই বললেই চলে। এই রেখাচিত্রগুলোতে—রেখাচিত্র বলাই ঠিক, তার বেশী কিছু নয়—প্রতিরোধ-আন্দোলনের কয়েকটি ঘটনা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনাগুলি কখনো নাটকীয়, কখনো মর্মান্তিক, কখনো হাস্তকর। ঘটনাগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রত্যেকটি জমাট ও গতিশীল—তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও নিপুণ চরিত্র বিশ্লেষণের পরিচায়ক। একটি গল্পে জার্মানরা যখন গির্জায় অলিন্দ খানাতল্লাশী করছে তখন পাদ্রীর কাছে 'মাকিস' দলের নাস্তিকের আত্মস্বীকৃতি বা অন্ত আর একটি গল্পে হাসপাতাল থেকে বীরদের উদ্ধারকার্য—পড়লে মোপাসাঁর কথা মনে পড়ে। কিন্তু আরগঁর 'জার্মান-সহযোগী' গল্প পাঠকের মনকে যতটা নাড়া দেয়, মোপাসাঁর কোন গল্প তা পারে না। গল্পটির ঘটনাসংঘাতের পরিণতিতে শিশুহত্যা পর্যন্ত এসে আতঙ্কে ও তিক্ততায় পাঠকের দম বন্ধ হয়ে আসবে।

উপন্যাসের তুলনায় গল্পগুলো যে অনেক বেশী উৎরেছে তার কারণ হয়ত-এই-যে গল্পের বিষয়বস্তু আরাগঁর কাছে অত্যন্ত সত্য, প্রত্যক্ষ ও প্রিয়—উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মত অপ্রীতিকর নয়; কিংবা হয়ত এই কারণে-যে, এই ধরণের গল্প কাব্যধর্মী। এখানেও একটা কাঠামোকে আশ্রয় করে সংযত ও সোজাসুজি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে; কিংবা

এমনও হতে পারে যে এই দুই লেখার মাঝখানে যে সাতটি বছর পার হয়েছে সে সময়ে তিনি আরও পরিণত হয়েছেন। গল্পগুলো পাকা হাতের লেখা। ভবিষ্যতে যদি 'বাস্তব পৃথিবী'-র কথা পাঠকরা ভুলেও যায়, তখনো এই গল্পগুলো স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। উপন্যাসগুলোর ভবিষ্যৎ যাই হোক, এখনকার মত শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, সমসাময়িক ফরাসী শাসকশ্রেণীর স্বরূপ প্রকাশ করার কাজে উপন্যাসগুলো একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছে। আর একটা লাভ এই যে, আরাগঁর নিজের জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনার স্মৃতি বহিঃপ্রকাশের পথ পেল—যা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু একথা বলতেই হবে, আরাগঁর জীবনে কবিতা লেখার এই বিরতিটুকু কেটেছে উত্তর জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে। এই সময়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে পরিণত হয়েছেন, আসন্ন সংগ্রামের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের সাহচর্য, আত্মবিশ্বাসে অচঞ্চল সত্যিকার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর ভেতর এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যে তরুণ লেখক ১৯২০ সালে লিখেছিলেন 'আমি চাইনা মানুষের সঙ্গ'—এখন তিনি উপলব্ধি করেছেন যে 'মানুষ' বলতে 'জনগণ' বোঝায় না। 'এল্‌সার চোখদুটি' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সেই বিশ্বাসের বাণীই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—যে বিশ্বাসের জন্ম জনসাধারণের সঙ্গে পরিপূর্ণ যোগাযোগের ভেতর দিয়ে :

"আমি মানুষের গান গাই···আমার গানের মৃত্যু নেই...কারণ বেঁচে থাকার স্বপক্ষে সব চেয়ে বড় যুক্তি যে জীবন সে জীবন তো মানুষেরই।"

'স্বৈরাচারিতা' (১৯২৪) কবিতায় যে যৌনপ্রেমকে তিনি একমাত্র সত্য বলে দাবী করেছিলেন—"আমার কাছে এমন কোন কিছুই নাই যা কামনার বশীভূত নয়" সেই মনোভাবেরও রূপান্তর ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। সেই প্রেমে এসেছে ঔদার্য—'এলসার চোখদুটি' বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"একমাত্র তোমাকেই আমি প্রিয়জন হিসেবে স্বীকার কবি, তোমার চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখি আমি।"

যুদ্ধ, আক্রমণ, দেশ-অধিকার—এই সমস্ত কারণে ১৯৪০-৪৪ সালে যে তীব্র আবেগ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রকাশ করবার স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় উপায় হচ্ছে কবিতা। ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্রান্সের পরাজয়, মর্মান্তিক পত্নীবিচ্ছেদ, সংঘর্ষ-পলায়ন-বিশৃঙ্খলার হৃদয়বিদারক দৃশ্য, একে প্রকাশ করবার একমাত্র ভাষা কবিতা—কেন্দ্রীভূত, আবেগ-সঞ্চারী, আত্মসচেতন কবিতা। ফল হল "দীর্ণ হৃদয়"। এই কাব্যগ্রন্থে আরাগঁ ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ফ্রান্সবাসীর অনুভূতিকেই ভাষা দিয়েছেন। কবি ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, এবার তা ভেঙে গেল। কবির সুর প্রতিধ্বনিত হল জনসাধারণের মধ্যে। নাৎসী অধিকারের সময় সমগ্র ফ্রান্সের স্ত্রী-পুরুষ আরাগঁর কবিতা বারবার আবৃত্তি করেছে—তাদের যদি কবিতা লিখবার ক্ষমতা থাকত তো এই ভাষাতেই চিৎকার করে উঠত তারা।

ছ-বছর বিরতির পর লেখা এই কবিতাগুলোতে একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে—তা হচ্ছে আরাগঁর পরিবর্তন। পূর্বযুগের কবিতার সুরমাধুর্য ও শিল্প-দক্ষতার সঙ্গে মিশেছে উত্তর-সুররিয়ালিস্ট কবিতার প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্যমুখীনতা। প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য যদি

কমিটিতে একত্র করতে পেরেছিলেন। তিন বছর তাঁকে গুপ্ত জীবন কাটাতে হয়েছিল এবং এই তিন বছর তিনি অক্লান্তভাবে নাৎসী বিরোধী কাজ করেছেন। ন্যান্‌সী কুনার্ড্ তাঁর সম্পর্কে বলেন :

"বিপদে ও ক্লান্তিতে অপরাজেয়, বিপরীতধর্মী মানুষকে সক্রিয় ও সোৎসাহ সহযোগিতায় একত্রীকরণে পারদর্শী,...স্বাধীনতাযুদ্ধের নানাপর্যায়ে বারবার ফ্রান্স যে ইতিহাস রচনা করেছে, তারই মূর্ত প্রতীক..." ('আওয়ার টাইম' নভেম্বর, ১৯৪৪)

ফ্যাশিস্টবিরোধী গুপ্ত সাহিত্য প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তিনি। কাজটা কত দুঃসাধ্য এবং এই কাজে কত বিপদের সম্ভাবনা সেটা বোঝা যাবে একজন 'মাকিস' লেখকের এই লাইনগুলো পড়লে এবং এও বোঝা যাবে যে প্রতিরোধ আন্দোলনের কবিরা জনসাধারণের কত প্রিয় ছিলেন :

"মাকিস দলে এইভাবে বই ছাপা হত : মুদ্রণযন্ত্রের পাশেই থাকত টোটাভর্তি মেশিনগান, 'ফ্রঁ তিরোর এ পার্তিসাঁ ফ্রাঁসে' পত্রিকার সংস্করণগুলো 'ফিল্ড্ প্রেসে' ছেপে বার করতে হত আমাদের। এইভাবে আমরা আরাগঁ, এলুয়ার, কামু ও ও ভেরকর্‌-এর কিছু কিছু লেখা প্রকাশ করেছিলাম। এই ছোট ছোট বইগুলো খুব শস্তায় বিক্রি করা হত এবং এই কাজ অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রত্যেকটি লোকের আরাগঁর 'লে ম্যুসে গ্রেভ্যাঁ' এবং এলুয়ারের 'লিবের্তে' কণ্ঠস্থ ছিল।"

অবিশ্রান্ত গুপ্ত কাজকর্ম সত্ত্বেও আরাগঁ লেখা বন্ধ করেননি। তাঁর কবিতা ক্রমশ অধিকতর সংগ্রামশীল হয়ে উঠেছে, ফরাসী জনসাধারণকে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। "দীর্ণ হৃদয়"-এর পর "এলসার চোখ দু'টি" প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত বইটির প্রথমাংশে পূর্বেকার সেই বিষণ্ণ গীতিকাব্যধর্মী কতকগুলি কবিতা আছে ; কতকগুলো কবিতা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তার আঙ্গিকের খুঁটিনাটি মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্য থেকে ধার করা। (প্রসঙ্গত আরাগঁ সগর্বে ঘোষণা করেন যে, তিনি "অনুকরণ" করতে ভীত নন—ফরাসী কবিতার ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে তিনি কুণ্ঠিত নন।) প্রথম দিককার এই কবিতাগুলির পরেই অবশ্য তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের জয়গানে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

যেমন, "সিংহ-হৃদয় রিশার" (Richard Coeur de Lion) কবিতাটিতে—

"যে নামেই ডাকিনা কেন,
ফরাসীরা সকলেই ব্লঁদেল-এর মত ;
মুক্তির পক্ষ-বিধূননে
সিংহ-হৃদয় রিশার্-এর সঙ্গীত অনুরণিত হয়।" *

এখানেও তিনি কাব্যকে গজদন্ত মিনারে কোনঠাসা করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যে সব সমালোচকরা তাঁকে সত্য ঘোষণায় বাধা দিয়েছে তাদের তিনি "অশ্রুর চেয়ে সুন্দর" নামক কবিতায় আক্রমণ করেছেন :

---

* ব্লঁদেল—দ্বাদশ শতকে ফ্রান্সের একজন জনপ্রিয় লোককবি (troubadour) এবং প্রথম ধর্মযুদ্ধ বা 'ক্রুসেড'-এর নেতা রিচার্ড-এর যুদ্ধসঙ্গী।—অনুবাদক।

"আমার নিঃশ্বাস বুঝি তাহাদের কাছে
জীবন-বিরোধী যেন বিষবাষ্প সম,
ভেঙে দিই নিদ্রার আরাম, ভরে তুলি
কি জানি কি গ্লানিভরা অনুশোচনায় ;
আমার ছন্দে যে বাজে যুদ্ধের ঝঞ্ঝনা
মৃত্যুলোক জেগে ওঠে অট্টরবে তার।"

"এল্‌সার উদ্দেশে গান"-এ (Cantique a Elsa) তিনি স্বীকার করেছেন—তাঁর কবিতাকে আরও সার্বজনীন করে তুলবার উদ্দেশ্যে তিনি দুর্বোধ্যতা এবং আঙ্গিকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জটিলতা কাটিয়ে উঠতে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন ;—এলসার প্রেরণাতেই তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন :

"তুমি বলেছিলে আমায়: 'কথার ঝঙ্কার-ঝঞ্ঝা বন্ধ রাখো একটুখানি
আপাতত বহুলোক
অভিধান ঘাঁটতে অপারগ, তাই
ওরা চায় এখন
শাদা কথার গুঞ্জন, মনে মনে গুনগুন গাইতে।'

তুমি বলেছিলে, 'যদি ভালবাসা চাও
(আর আমি তো ভালবাসিই তোমায়)
তবে তোমার তুলিতে আঁকা আমার ছবিতে যেন থাকে
চন্দ্রমল্লিকার বুকে প্রজাপতি কীট যেমন গোপন, তেমনি
ভাবের গভীরে ভাব, যেন সে পারে
আগামী সূর্যকে বাঁধতে মুগ্ধ প্রেমে, প্রেমের গাঁটছড়ায়।"

এখন থেকে এমন এক ভাষার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করলেন জনসাধারণের কাছে যার আবেদন ব্যাপকতম, ফ্রান্সের প্রতিটি কোণে স্বভাবত কবিতা-নিরাসক্ত জনসাধারণের কাছে গিয়ে যা পৌঁছবে : ভাষা হবে শত্রুর বিরুদ্ধে শাণিত হাতিয়ার, বীরদের কীর্তিগাথা গাইবার সুরযন্ত্র আর শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলবার যন্ত্রপাতি—

"ভাষা খুঁজি বাতাসের স্তরে স্তরে
যে ভাষা ঘুমের ব্যূহ ভেদ করে সূর্যরশ্মির মত
যে ভাষা স্বচ্ছ জলে তৃষ্ণা মেটায়।"

কবিতাকে এই ভাবে ব্যবহার করার সপক্ষে আরাগঁ ভাল ঐতিহাসিক নজীর পেলেন : ভিক্টর হুগো, হুইটম্যান, মায়াকভ্‌স্‌কি, এঁরা নিজেদের কবি-প্রতিভা বৈপ্লবিক আদর্শে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের সমস্ত কবি এই এক পথই গ্রহণ করেছিলেন। ফ্যাসী-বিরোধী সংগঠনের গোপন সংবাদপত্রে কবিতার একটা বিশেষ সম্মান ছিল, সাধারণ লোকের হাজার হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত এই কবিতা—এরকম ঘটনা ধনতান্ত্রিক সমাজে নিশ্চয়ই অভাবিত। ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে, প্রতিরোধ-আন্দোলনের কবিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আরাগঁ বলেন : "প্রত্যেকে তাঁরা লিখেছেন, এবং প্রত্যেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন; তাঁদের অনেকের মধ্যে আমি মাত্র একজন।"

তবুও সকলের চাইতে অসাধারণ, সকলের চেয়ে বেশী সৃষ্টিশীল ও প্রধানতম ছিলেন তিনি; বিশিষ্ট লেখক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক স্বীকার করেছেন এ কথা; তিনি ক্যাথলিক এবং আগে কমিউনিস্টদের সঙ্গে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য মরিয়াক্-এর ছিল না; ১৯৪৫ সালে পারীর 'মুক্তি-উৎসবে' তিনি বলেন :

"কপট-নিদ্রাশ্রয়ীদের উপেক্ষা করে হঠাৎ এক কবির আবির্ভাব হল; "দিয়ানে ফ্রাঁসেজ্"-এর 'আগমনী' গাইলেন তিনি। তাঁর দেশপ্রেম...একটা আকস্মিক উচ্ছ্বসিত আবেগে ফেটে পড়ে কবিতায় পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ল—সত্যিকার আর সবচেয়ে মহৎ অর্থেই এ কবিতা জনপ্রিয়, দেশের মাটির সঙ্গে এ কবিতার সংযোগ, ভিক্টর হুগোর পর থেকেই. এই কবিত্ব-শক্তির রহস্য আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফরাসী বিপ্লব ও অন্যান্য গাথার ভেতর দিয়ে আমাদের অতি প্রাচীন কবিদের ছন্দস্পন্দ আবার যেন তিনি ফিরিয়ে আনলেন। প্রেমের কবিতা, কিন্তু আবেগ-উন্মত্ত সেই প্রেম; আরাগঁর কবিতায় আগাগোড়া র‍্যাঁব-র ভাবাবেগের প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায়। এই ব্যাকুল রুদ্ধশ্বাস ছন্দ বিজিতদের বাধ্য করে অপহৃত মাথা তুলে দাঁড়াতে, প্রায় জোর করেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক এক সুপ্ত বীরকে উদ্বোধিত করে।"

'লা ম্যুসে গ্রেভঁ্যা,' ও 'ব্রোসেলিয়ঁদ'-র মতই "ল্য দিয়ানে ফ্রাসেজ্"-এর কবিতাবলীও অধিকাংশই ফ্রাঁসোয়া লাকোলেয়ার ("ক্রুদ্ধ ফরাসী") এই ছদ্মনামে গুপ্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই উপযুক্ত ছদ্মনাম আরাগঁকে পুরোপুরি গোপন রাখতে পারেনি। "দিয়ানে" (যার অর্থ "অস্ত্রধারণের আহ্বান") নামেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কবিতা-সংকলনের বক্তব্য : সংগ্রামের আহ্বান, মুক্ত ও প্রতিধ্বনিত সে আহ্বানে "ভাবের আড়ালে ভাব" গোপন রাখার কোন চেষ্টা নেই; অতি সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবগুলো কবিতাই অত্যন্ত সরল ও দ্বিধাহীন। কতগুলো কবিতা ইতিহাসকে আশ্রয় করে জনপ্রিয় গাথার ভঙ্গীতে লেখা; গাব্রিয়েল পেরীকে গুলী করে মারার বর্ণনা—"নির্যাতনের মধ্যেও যে গান গায়, তারই গাথা" এই রকমই এক মর্মস্পর্শী রচনা; "লা রোজ এ ল্য রেসেদা" নামে আর একটি কবিতা পেরী এবং দ্'ইস্তিএনদর্ভ-কে উৎসর্গ করা হয়; কবিতাটির বিষয়বস্তু এক নিরীশ্বরবাদী ও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসীর মিলন, তারা দুজনেই ফ্রান্সের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে। (কবিতায় আরাগঁর রাজনৈতিক চেতনা প্রয়োগের একটি নিদর্শন; এই কবিতায় ক্যাথলিক ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মিলনের সেতু রচনার যে পার্টিগত দায়িত্ব আছে, তা তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রতিপালন করেন; অন্যান্য যেসব কবিতায় তিনি নিউ টেস্টামেন্ট থেকে উপমা ব্যবহার করেছেন, সেখানে তিনি যীশুখৃষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ ফ্রান্সের তুলনা করেছেন, মানব-পুত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন সমস্ত মানবজাতির।)

তাঁর কবিতার মধ্যে কতকগুলি নিছক যুদ্ধের গান; ফিলিপ টয়েনবী সোজাসুজি এগুলো বরবাদ করে দিয়েছেন :

"...সাহিত্যিক বিচারে এ কবিতাগুলির মূল্য আমি কম বলেই মনে করি, কারণ মূলত এদের উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক।" ('হোরাইজন'—নভেম্বর, ১৯৪৪)

টয়েনবী-কথিত এই ভয়ানক দুর্বলতা সত্ত্বেও যে সমস্ত পাঠক অপেক্ষাকৃত

তাঁদের কাছে একটি রাজনৈতিক পার্টি এমন কিছু নয় যাকে মহান বলা যেতে পারে। তত্ত্বের ভিত্তিতে এইসব সমালোচকদের যুক্তিতে জোর আছে, কারণ, কাব্যের মত উচ্চাঙ্গের শিল্পে দলীয় রাজনীতি আনা সনাতনপন্থা-বিরোধী ও অ-চল। আসল কথা, এই সব বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মধ্যেই সৎসাহসের একান্ত অভাব। প্রগতিশীল আন্দোলনে প্রচুর সহানুভূতি দেখান তাঁরা, কিন্তু যখনই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে, যখন জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য বুর্জোয়া স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে সামান্যতম আত্মস্বাতন্ত্র্য ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে, তখন তাঁরা দূরে সরে যান, আর যে সমস্ত কবিরা তাঁদের মতে সায় না দেন তাঁদের নিন্দা করেন।

আজ যাঁরা আরাগঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম এবং মতবাদের ঘোষণাকে আক্রমণ বা নিন্দা করেন, তারাই ১৯৩৭-এ সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে কড্‌ওয়েল-কথিত সেই উচ্ছৃঙ্খল সহযোগিতায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কড্‌ওয়েল এঁদের "এই রূপান্তরের মধ্যে ট্রট্স্কি-সুলভ মনোভাব"এর কথা উল্লেখ করে বলছেন "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে এঁরা একটু বেশী মাথা ঘামান এবং পাছে ক্ষুদে-বুর্জোয়া ধ্যানধারণা এবং নির্দিষ্ট সীমার বাইরে সর্বহারা বিপ্লবের থিয়োরী লক্ষ্যচ্যুত হয় সেই আশঙ্কায় এঁরা সেই থিয়োরীর ভ্রম সংশোধনের জন্যে কিম্বা সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পাবার জন্যে ইতস্তত ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়ান।"

এ দেশের এবং ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর লেখকরা, অন্ততপক্ষে স্পেন সম্বন্ধে লিখতে গিয়েও এক সময়ে ফ্যাসীবিরোধী পথ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তাঁরা "ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি"-তে উল্লিখিত সেই 'অনিশ্চিত মিতালী' থেকেও পিছিয়ে গেলেন। অডেনের মত কেউ কেউ রাজনৈতিক লেখা একেবারেই ছেড়ে দিলেন; আর্থার কোয়েস্‌লারের মত অন্যান্যরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবী করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং উগ্র রকমের সোভিয়েট-বিরোধী হয়ে পড়েন। (প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে, প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার সাহিত্য-সমালোচকদের কাছ থেকে কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁরা ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন।) প্রগতি এবং উন্নতির ধ্বজাবাহক হিসেবে তাঁদের বিচারে তাঁদেরই মূল্য স্বীকৃত হবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা রয়ে গেছে। যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনই প্রগতির আসল কেন্দ্র তা থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে তাঁরা কাজ করছেন। এই সব শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এ দেশে যাঁরা সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের দাবী করেন এবং ফ্রান্সে তাঁদেরই সমগোত্রীয় যাঁরা আঁরি মিশো ও বিকৃত যৌন-উপন্যাসের লেখক জঁ। পল্ সার্ত্র্‌কে দলে ভেড়াবার চেষ্টায় আছেন, তাঁরাই নতুন এক দার্শনিক মতের দিকে আজ ঝুঁকবার চেষ্টা করছেন (যেমন 'অস্তিত্ববাদ' বা Existentialism)। এই হল তাদের বাস্তব থেকে পলায়নের পথ, প্রত্যেক শিল্পীকে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হতেই হবে সেই মীমাংসায় এই হল তাদের মত। সুররিয়ালিজমের মত একেবারে শেষপ্রান্তে চলেছেন তারা, কিন্তু আরাগঁর পথ কোন দিকে প্রসারিত আমরা তা দেখেছি: যে রাজ্যে শিল্পী বাস্তবের সঙ্গে জীবনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজের পরিপূর্ণ সংযোগ আবিষ্কার করেন, যে রাজ্যে আবশ্যিকতাকে স্বীকার করে নেবার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, সেই রাজ্যে আরাগঁর পথ প্রসারিত। প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমীকরণের পথ বেছে নিতে গিয়ে পিকাসো এটা উপলব্ধি করেছিলেন, "এই পার্টির

মধ্যেই আমি আমার স্বদেশকে খুঁজে পেয়েছি" এই কথা উচ্চারণ করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

প্রতিক্রিয়ার পথকে বেছে নেন যে শিল্পী, ক্রমশই জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন তিনি; কারণ সর্বহারার সংগ্রামের ভেতর দিয়েই সমাজতন্ত্র অনিবার্যভাবে পথ করে নেয়। প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে একই তালে এগিয়ে চলে যে, সে কখনও বাস্তবের সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না, ক্রমশই তার লেখায় লক্ষ্য ও বলিষ্ঠ বিষয়বস্তু সঞ্চারিত হয়। আরাগঁ যদি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকেন (আমাদের আশা এবং বিশ্বাস তিনি থাকবেন) "মানবতার জয়গান" তিনি গেয়ে যাবেন—পারী কবিতা প্রকাশের সময় 'লুমানিতে' ("মানবতা") পত্রিকায় এই সত্যই বিবৃত হয়। মার্ক্‌সিজম্ অ্যাণ্ড পোয়েট্রি"র লেখক জর্জ টমসনের ভাষায়—"কবি ও জনতার মাঝখানের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে, কবিতা ও জীবনের যে অবিচ্ছিন্নতা একদিন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করে" তাঁর আদর্শের পূর্ণতার পথেই তিনি চলতে থাকবেন।

ফ্রিডা স্টিউয়ার্ট

কিশোর বহ্নি-তনু নিরাকার
ছড়াবে অযুত স্ফুলিঙ্গ তার
জাগাবেই নব-জীবন চেতনা
কবিতা অপ্রমত্ত
এও সত্য ! চির সত্য !
আহা নবযুগে নওল কিশোর !
কেঁদে ফিরে গেল সারা নিশিভোর
মুছে গেল কাল-বৈশাখী মেঘে
শিশু-সূর্যের রক্ত ;
এ যে নিদারুণ সত্য !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কবির মৃত্যু

যাই।
সূর্যঝরা আকাশ যদি, চোখে অগাধ অন্ধকার
যাই।
আলোয় আলো দিন পিছনে, গান রইলো, গান।

সেই যে গান রইলো গান রইলো, গান
মাটির শুনে শুনেই কান মজেছে গান গেয়েছি, গান
মাটিরই, সেই ব্যাকুল এলোমেলো শিকড়ে অন্ধকার
কঠিন টান
গুঁড়িতে উঁকিঝুঁকি লতায় পাতায় পাতাবাহারে ঘোর
সবুজ টান
টান গোলাপে লাল রজনীগন্ধা টানে শাদায় শুধু
সবুজ সুর শিরায়, সুর
শিখায়, সুর ঝিরঝিরিয়ে বন্যা রস বন্ধহীন
টান মাটির টান : সেই তো গান
আমার গান।

জন্মে ছিলো ঝড়, ঝড়ের
ঝন্‌ঝন্‌ এই গান গভীর
বাজ বাজলো মাদল ঢেউ রুদ্র ঢেউ দুললো বুক
টললো যুগ অহল্যার ঘুম টললো
ভাঙলো বাঁধ
ভাসলো দিকচিহ্নহীন জলে জীর্ণ সময়, বাসি
সময় শেষ
পচা পাতায়,
পায়ের নিচে তবু মাটির চাপ দু'পায়ে মাটিকে ধরা
মাটিতে ধরা
পায়ের নিচে তবু ঘাসের শিষ কি শিখা,
শিরশিরিয়ে
শরীরে সেই আগুন—সুর
ঘনায় গান ঘনায়
গান মাটির গান মাটিরই মাজা
উঠোনে বাঁধা বেড়ায় ঘেরা
দাওয়ায় তকতকে নিকোনো
মাটির গান মনের গান মনের ঘর বাঁধার।

যাই।
যদিও ঘর গড়ার কাজে হাত লাগানো
বাঁধ বাঁধানো
বুকে, বুকের ভিত গাঁথার গান
ধরেছি সবে সবেই, কথাগাঁথা হৃদয়ে টান
ধরেছে সবে মাটির, মাঠমাতানো এই ধান
সবে সবুজ-হলুদ, হায় সবে শুনেছি গান
মাটির—ধরা মাটিতে তবু যেতেই হ'লো
যাই।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সুকান্ত স্মরণে

সম্ভাবনার অযুত শপথে ভরা
তোমার তরুণ বাঙ্‌ময়তার অরুণিম উৎসবে
হঠাৎ নেমেছে সূর্যাস্তের বিষন্ন ছায়া খানি :
নির্মম,—তবু এ সংবাদের সুগভীর বেদনায়
তোমার বিদেহ-সম্মান পাশে
গৌরবে নত আমারে যে দেখিলাম—
তোমার চলার অনেক যা ছিল বাকি
সবুজ তোমার প্রেরণার স্বাক্ষরে
সে চলার পথে অধিকার লভিলাম।

দৈবিক-ক্ষয়ে জীর্ণ তোমার হৃদয়-শঙ্খ হ'তে
বাণীময়তার ফুৎকার কাড়ি নিয়া
মৃত্যু ভেবেছে রুধিবে তোমার কিশোর-কণ্ঠে জীবনের জয়গান!
কিন্তু বন্ধু! মৃত্যুর ঐ কালো-মোহ-ঘেরা মূঢ়তার অবকাশে,
তোমার প্রাণের সাগর-শঙ্খ
বহু শুক্তির তন্দ্রালু চোখ হ'তে
কেড়ে নিয়ে গেছে জীর্ণ-যুগের ঘুম।
ক্ষুব্ধ সাগর-তলদেশে আজ প্রবাল-শিবিরে বিদ্রোহী-সমাবেশে
চোখে চোখে দেখি শুক্তির বুকচেরা
নবজীবনের মুক্তার আলো নাচে।

বহু গ্রামান্তে বেণুকুঞ্জের শীর্ষ ছাপিয়ে ঘনকালো মেঘ আনে
সূর্য-হারান-দিনের আঁধার ব্যথা,
সে ব্যথার রঙে কালো হয়ে-ওঠা ঈশান কোণের পুঞ্জিত মহারোষে
ক্ষুব্ধ সাগর কেঁপে ওঠে থরো থরো।
আজ দুর্বার আসন্ন ঝঞ্ঝায়,
মৃত্যু-আঁধারে, বাণীবিদ্যুতে তোমাতে আমাতে দেখা।
হে সহযাত্রী! অভিযাত্রার প্রস্তুতি হল সারা,—
তোমার নবীন আশ্বাসে ভরা হাতে হাত রেখে এবার চলিতে হবে।
মহাসূর্যের বোধনমন্ত্রে উদিত আলোর দুয়ার খুলিবে কবে!
বন্ধু! এখনো অনেক কাজ যে বাকি,
—রাস্তার ধারে উলংগ ছেলেটাকে,
উষ্ণ-আলোর আশ্বাস আর গরম কাপড় দিয়ে দিতে হবে ঢাকি।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য

স্থির-বিদ্যুৎ-দীপ্ত লেখনী তব
লিখে রেখে গেছে নবজীবনের গান ;
কাব্যজগতে যদিও তা অভিনব,
তার চেয়ে বড়—জাগায়ে তুলেছে প্রাণ।

সূর্য-সারথি, আজি কি তোমার রথ
অকালমৃত্যু গ্রাসিবে মাটির নীচে?
দিগন্ত থেকে হাতছানি দেয় পথ—
সে পথ-যাত্রা হবে কি সকলি মিছে ?

বাংলা দেশের হে তরুণতম কবি !
রেখে গেলে পিছে জ্বলন্ত স্বাক্ষর ;
জাগিবে এ দেশ আগুনের ছোঁয়া লভি
তোমার কাব্য আনিবে যুগান্তর।

প্রভাত বসু

সুকান্ত স্মরণে

এ জীবনে দেখিলাম ভগ্নডানা কতো ভ্রষ্টনীড়
পালক-কোমল বুক বিঁধে গেলো কতো বিষতীর,
মৃত্যুকীট কেটে খেলো তপ্ততাজা কতো ফুস্‌ফুস্‌
সহে গেছি ক্ষয়ক্ষতি করিনিতো ব্যর্থ আপশোষ।
তবু যদি দুর্বিসহ দুঃখভারে নুয়ে গেছে মাথা
ন্যুব্জ-দেহ ঋজু করে দিয়ে গেছে তোমার কবিতা।
কিন্তু কবি তুমি নেই মানবতার এ দুর্বিপাক
আজ তা কেমনে সই পাঞ্চজন্য নিজে স্তব্ধবাক।
অগ্নিঝড়ে দগ্ধপ্রাণ-বিহঙ্গম কিশোর শহীদ
আজিকার সৃষ্টিযজ্ঞে করে গেলে নিজেরে সমিধ।
নতুনের নচিকেতা মৃত্যুলোকে জীবন সাধনা
শীতের সুমেরু দেশে করে গেছ সূর্যের বন্দনা;

গোষ্পদের মীনে তুমি শুনায়েছ সাগর-কল্লোল
অঙ্কুরিত বীজে জাগায়েছ বনস্পতির হিল্লোল।
স্মৃতিস্তম্ভ গড়িব না, প্রহসন 'স্মৃতির ভাণ্ডার'
অর্থগৃধ্নু সমাজের তুমি নও কবি গীতিকার,
তুমি বেঁচে রবে নিত্য মাঠে মাঠে সোনালি ফসলে
তোমার স্মৃতির হাওয়া দিবে দোলা জীবনের পালে ;
বেঁচে রবে চিরদিন জনতার জয়-কলরবে
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের রৌদ্রজ্জ্বল নবান্ন উৎসবে,
আগন্তুক কিশোরের স্বপ্নচোখে আঁকা তব ছবি
বুকে বেঁধে নিবে সূর্য-স্বয়ম্বরা আগামী পৃথিবী।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত কবিতা

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পথের বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানেনা কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টীমারের মত চলে,
প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকেনা শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরো থরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায়না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী

কত যুগ, কত বর্ষান্তের শেষে
জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী
আকাশে মেঘের তাড়াহুড়ো দিকে দিকে
বজ্রের কাণাকানি।
সহসা ঘুমের তল্লাট ছেড়ে
শান্তি পালাল আজ
দিন ও রাত্রি হ'ল অস্থির
কাজ আর শুধু কাজ!
জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!

হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড়, স্মরণে গভীর
ভুলিনি তাদের আত্মবিসর্জন।
ঠোঁটে ঠোঁটে কাঁপে প্রতিজ্ঞা দুর্বোধ :
কানে বাজে শুধু শিকলের ঝনঝন ;
প্রশ্ন নয়ক পারা না পারার
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বারভাঙা আজ পণ ;
এতদিন ধরে শুনেছি কেবল শিকলের ঝনঝন !
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর ;
ওদের স্মৃতিরা শিরায় শিরায়
কে আছে আজকে ওদের ফিরায়
কে ভাবে ওদের পর ?
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড় !
নিদ্রায়, কাজকর্মের ফাঁকে
ওরা দিনরাত আমাদের ডাকে
ওদের ফিরাব কবে ?
কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
কোটি মানুষের দুর্বার চাপে
শৃঙ্খল গত হ'বে ?
কবে আমাদের প্রাণ-কোলাহলে
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেসে যাবে কারাগার ?
কবে হ'বে ওরা দুঃখ সাগর পার ?
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি ;
ওরা আমাদের রক্ত দিয়েছে
বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে
গোপনে করেছে ঋণী ;
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি !
হে খাতক নির্বোধ
রক্ত দিয়েই সব ঋণ কর শোধ !
শোন পৃথিবীর মানুষেরা শোন
শোন স্বদেশের ভাই
রক্তের বিনিময় হয় হো'ক
আমরা ওদের চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাড়ির কাছের জমি

তাগড়া যোয়ান ষণ্ডা লোকটা একদিন মারা গেলো। সেদিন সকালে উঠে সবাই শুনলো জুড়ন রাত্রেই মারা গেছে। নন্দর বাপ জুড়ন—বয়স বেশি হয়নি। পঁয়তিরিশের বেশি কখনই না—এমন স্বাস্থ্য, এমন যোয়ান লোকটা কয়েকদিনের জ্বরেই শেষ হবে গেলো।

জুড়নের বৌ, আর এক মাত্র ছেলে নন্দ। বৌটারও যেন রূপ ফেটে পড়ছে—বয়েস আর কতো হবে! পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। আর নন্দ,—যেমনি বাপ তার তেমনি ছেলে। দশ বছর বয়েস ছেলেটার।

বৌটা কাঁদলো খুব। কোথায় দাঁড়াবে এখন,—ভাত জুটাবে কে!

গায়ের শক্তিশালী জোতদার ক্ষেত্রনাথবাবু। সংবাদ শুনে পেয়াদাকে পাঠিয়ে দিলেন বৌটাকে ডেকে নিয়ে আসতে। জুড়নের বৌ এলো। এখানকার আশপাশের চাষীরা সব ক্ষেত্রনাথবাবুর পত্তনি প্রজা—কেবল জুড়ন বাদে। জুড়নের বাড়িটা তার নিজস্ব এবং দু'চার বিঘা আবাদী জমিও আছে। শুধু চাষ-বাসই সে করতো না—সুতো নিয়ে এসে তাঁতে কাপড় বুনতো। মোটের পর লোকটা খাটতো খুব।

ক্ষেত্রনাথবাবুর বাড়িটাই গ্রামের ভিতর একমাত্র সুউচ্চ কোঠা বাড়ি। পশ্চিমে দিঘড়ের বিল—সেখানকার অগাধ জমির মালিক হচ্চেন তিনি। পূবে পুকুর ও বাগ-বাগিচা। আশপাশে পত্তনি প্রজারা সব। হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজাই তাঁর আছে। জুড়নের বাড়িটা তাঁর বাড়ির একেবারে কাছেই—মাঝে কেবল একটা বাগান ও তিন বিঘার নীচু পাটের জমি পড়ে।

জুড়নের জমিটা যে তাঁর নয় সে জন্যে ক্ষেত্রনাথবাবুকে দায়ী করা যায় না। জুড়নের ভিটে ও জমিটা তাঁর একেবারে বাড়ির কাছে বলে অনেকবারই তিনি ছলে বলে চেষ্টা করেছেন জমিটা আত্মসাৎ করবার, কিন্তু চেষ্টা করেও এই কয়েক বিঘা জমি দখল করতে পারেন নি। কারণ, জুড়নের বাপও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিটা রক্ষা করে গেছে—তারপর জুড়ন।

বৌটির বাড়ন্ত গড়ন—সুডৌল গলার ভাঁজপড়া মাংস, একরাশ কালো চুল আর বিশেষ করে চোখ দুটি,—ক্ষেত্রনাথবাবুকে মুগ্ধ করে। তিনি চেয়ে দেখেন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এই তরুণী বৌটির শোক-সন্তপ্ত গাল দু'টি আরো কতো রাঙা দেখাচ্ছে—চুলগুলি অগোছাল থাকাতে তার গাঢ়তা আরো কতো বেশি হয়েছে—কতো সুন্দর সে! তিনি বললেন—'বুলি, আমার এখেনে আসপি তো! আমিতো আছি এখেনে। স্বামী মরে গেছে তো কি হইছে,—মানুষ মাত্রেই মরে। তুইও একদিন মরবি রে বেটি!'

বৌটি শুধু দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে কেঁদেই যাচ্ছিলো।

—'তোর ভাবনার কি আছে—আমি তো আছি। তোর ভালোমন্দো দেখার আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তুই আমার প্রজা না হতি পারিস কিন্তু প্রজার মতোই।'

আরো কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলো। তারাও মোসাহেবীর ভঙ্গিতে সমর্থন করলো কথাটা।

—'ছেলেডারে নিয়ে চলে আয় এথেনে। কাজকাম করবি—আমার বাড়িতিই থাকপি। আর কুথায়ও যাত্তি হবে না তোর।

জুড়নের বৌ কিন্তু এলো না।

ভিটের পরে এই শূন্য বাড়িটাতেই পড়ে থাকবে সে।

সবাই আহা আহা করলো। এমন যোয়ান লোকটা যে এমন হঠাৎ মারা যাবে, কে জানতে পেরেছিলো তা। তবে ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে। ও নিশ্চয় কালে কালে এমনি একটা মানুষ হয়ে উঠবে। এবং তখনই কেবল বৌটির দুঃখ ঘুচবে, তার আগে না। আবার যেদিন ও বাপের মতো লাঙল ধরবে সেদিন।

নন্দর দিকে চেয়েই আবার আশায় বুক বাঁধে বৌটি। এমনি ছেলের মা সে! এই ছেলের জন্যেই সবাই তার ভাগ্যকে হিংসে ক'রতো। কপালই যদি না ভাঙতো তবে এমনি ছেলে আবো হোত। তার স্বামীর হাতের শক্ত কাঠের লাঙল হয়তো যোয়ান ছেলেরা আরো শক্ত করে তুলে নিতো। কেবল তার জীবনটি আরম্ভ হয়েছিলো, এমনি সময় ভেঙে গেলো। অবশ্য এ ব্যাপার নতুন না। ভালো যোয়ান খাটিয়ে লোক যারা, এমনি পট্‌পট্‌ করে তারা মরে যায়—আগে থেকে একটুও বোঝা যায় না। এখন অনেক দৃষ্টান্ত সে নিজেই দিতে পারে।

জুড়নের বৌ এলো না বটে, কিন্তু এক মাস না যেতেই ছেলেটার হাত ধরে ভিটে ছাড়তে হ'ল বৌটাকে, আর নন্দকে নিয়ে সে ক্ষেত্রনাথবাবুর ওখানেই এসে উঠলো। ক্ষেত্রনাথবাবু বললেন, এটা তাঁকে ধর্মের দিক চেয়েই ক'রতে হ'ল, কারণ জুড়ন কিছু দেনা করে গিয়েছিলো তাঁর কাছে—সেটা অপরিশোধ থাকলে জুড়নেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না। জুড়নের মৃত আত্মা যাতে শান্তিলাভ করে সেজন্যেই তাঁকে বাধ্য হয়ে এ কাজটা ক'রতে হল। তবে ওরা দু'জনে যদি এখানেই থাকে আর একটু আধটু কাজ-কাম করে, তবেই তিনি কথা দিতে পারেন যে, ভবিষ্যতে নন্দ বড়ো হয়ে চাষ-বাস করতে চাইলে তাকে তিনি তখন আনন্দের সঙ্গে জমি ফিরিয়ে দেবেন।

জুড়নের বৌ এ তত্ত্বকথা বুঝলো কিনা বলা যায় না। আর বুঝলেও যে সে স্বামীর স্বর্গ কামনায় ভিটে থেকে ছেলেটার হাত ধরে এসে ক্ষেত্রনাথবাবুর ওখানে স্ব-ইচ্ছায় ধন্না দিতো—তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু না বুঝলেও তার করবার কিছুই ছিলো না। ভিটে তাকে ছাড়তে হোল।

এইখান থেকেই নন্দর জীবনটা একটা নতুন দিকে পা বাড়ালো। তারা যে এখন পরের বাড়িতে খেটে খাচ্ছে সেটা বুঝবার মতো বয়েস তার হয়েছে। তার মা সারাদিন খাটে—বাড়িটির যাবতীয় কাজ একে একে তার ওপর এসে পড়ে। সংসারের কাজ ছাড়াও সে আস্তে আস্তে ধান ঝাড়াই—ফসলপাতির তদারক করা—গোরুর তদারক—সবই করতে আরম্ভ করে। বাড়িতে আর একটি হিন্দুস্থানী কার্যকারক আছে যার নাম হচ্ছে দুখী। নন্দও খাটে। সে ছোট হলেও প্রচুর খাটতে পারে। বাড়ির ছোটো বড়ো হুকুম তামিল করা ছাড়া দুখীর খৈনীর তামাক যোগাড় করে দেওয়া—লাঠিখানায় তেল মাখিয়ে দেওয়া আছে। তারপর সে ফুরসৎ পেলেই মায়ের কাজে সাহায্য করে।

গোয়ালে দুধ দোহাতে যেয়ে এক প্রচণ্ড লাথি খেয়ে তার মা পড়ে গেলো একদিন। নন্দ কাছেই ছিলো। ছুটে এসে এক গাছা দড়ি দিয়ে পেছনের পা দু'টি জড়িয়ে বেঁধে দিলো গোরুটির। মাকে উঠতে সাহায্য করলো—বাঁ হাতখানিতে বড়ো বেশি লেগেছিলো। ভালো করে হাতটা টেনে দিলো।

তার মা সামলে উঠে তাকে নিরস্ত করে—না, এমন কিছু হয়নি। কেমন চোখে যেন চায় নন্দর দিকে। এই হৃষ্টপুষ্ট চাষার ছেলেটি কবে বড়ো হবে—একটা চাষা হয়ে উঠবে কবে! তার বাবার মতো খুব খাটিয়ে লোক হবে কি,—না আয়াসে হবে।

একদিন দুখী নন্দকে বললো—'তুই গাছে চড়তে পারিস ?

নন্দ বললো—'পারি, কোন গাছে ?'

—'ঐ সুপারির গাছে উঠে থোড়া সুপারি পেড়ে লিয়ে আয় তো।'

নন্দ লাফাতে লাফাতে চলে গেলো। গাছে উঠতে পারে কিনা এই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে যেন। হন্ হন্ করে সুপারি গাছটায় উঠে গেলো। কয়েকটা সুপারি পেড়ে নিয়ে নেবে এলো।

দুখী সুপারি ক'টা নিয়ে একটাতে তখন তখনই কামড় বসায়। আদর করে পিঠ চাপড়ে দেয়—'তুই তো বড়ি বড়নেয়ালা রে।'

নন্দর গর্ব হয়।

ক্ষেত্রনাথবাবু কোথা থেকে দেখলেন ব্যাপারটা। নন্দ যে এমন সুন্দর গাছে চড়তে জানে তা তিনি নিজেও জানতেন না। তিনিও প্রশংসা করলেন খুব। তারপর দুখীকে বললেন—'ওরে নিয়ে একবার পশ্চিমির বাগানে যাও। সেখেনে প্রচুর সুপোরি পাকে আছে, কিছু সুপারি পাড়ায়ে নিয়ে আসো যায়ে।'

নন্দ থ মেরে গেলো। আসলে গাছে চড়া সে কেবল শিখেছে—এখনো ভালো ক'রে আয়ত্ত করতে পারেনি।

দুখী উঠে একটা ঝুড়ি নিলো আর তার লাঠিখানা।

নন্দ গাছে উঠে সুপারি পাড়লো। একটির পর একটি গাছে অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগলো। অবশেষে এক সময় তার দ্বিতীয় আর একটি গাছে ওঠবার মতোও শক্তি অবশিষ্ট থাকলো না। সে বললো—'আর পারবো না।'

দুখী হেসে প্রতিবাদ ক'রলো—'ওতো হোবে না, আউর উঠতে হোবে।'

দুখী শেষকালে প্রস্তাব ক'রলো যদি এক ঝুড়ি সুপারি নন্দ গোপনে একখানে দিয়ে আসতে পারে, আর সে যে দামটা দেবে সেটা এনে দুখীকে দেয় তবেই কেবল এখনকার মত সে রেহাই পেতে পারে।

নন্দ রাজি হল।

এর পর থেকে কিন্তু প্রত্যেক্‌দিনই তাকে গাছে উঠতে হত।

রক্ষিতের ছোট মেয়েটা তার সাথে ঘোরে। রক্ষিতের তাতে কোনই আপত্তি নেই। বরং সে চায় আরো যত বেশি করে ঘোরে। এই গাঁয়ের মধ্যে ওমনি ছেলে আর নেই। একদিন যখন ও লাঙল ধরবে তখন ওকে আর পায় কে। নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে দুখীর কাছ থেকে একটা ডাব চেয়ে মেয়েটাকে দেয় নন্দ। মেয়েটা লাফাতে লাফাতে

ডাবটা নিয়ে বাড়ী গিয়ে বাবাকে দেখায়। তার বাবা ডাবটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটার গুণের প্রশংসা ক'রতে ক'রতে কেটে ফেলে। মেয়েটাকে অল্প একটু দিয়ে নিজে বেশিটা খেয়ে ফেলে।

মেয়েটার সাথে যে নন্দর বিয়ে হবে এমনি একটা কথা অবশ্য অনেকদিন থেকে সবাই জানে। কেমন করে যে জানে বলা কঠিন। কোনদিন যে এমন কথা উঠেছে, তাও নয়। তবু লোকে এই রকম জানে। খুব সম্ভব মেয়েটার বাবাই এ রকম কোন মত প্রকাশ করে থাকবে। নন্দর কাছেও যেন এ ভাবটা কেমন করে যেন সত্যি হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাতে নন্দর মা নন্দকে কোলের পরে শুইয়ে মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিলো—'তুই বড়ো হবি—আবার নিজিগের ভিটেই ফিরে যাবো আমরা। তোর বাবার মতো তোরও এক জুড়া গরু ও এট্টা লাঙল হবি। তোরে বিয়ে দিয়ে এট্টা সুন্দর বৌ নিয়ে আসপো—তারপর......

মার কথা যে আটকে গেছে তা বুঝতে পারে নন্দ। নন্দর মুখে একটা চুমু খায় মা।

সেই থেকে নন্দর মনে একটা নতুন অনুভূতি এসেছে। সে বেশ একটা মানসিক পরিবর্তন নিজের মধ্যে অনুভব করছে। এতোদিন এ সম্বন্ধে সে কিছুই ভাবতো না। তারা যে এখনো পরের বাড়ি খেটে খাচ্ছে এইটাই জানতো—তাদের যে আবার একদিন নিজেদের বাড়ি হবে এবং সেই হবে সে বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা, এটা তার খেয়াল ছিলো না বা সে জানতো না। তাই এখন সে নিজেকে সেইভাবেই দেখতে লাগলো।

ভবিষ্যতে তাহলে তাকে একজন চাষী হতে হবে এবং ঐ হিন্দুস্থানীটার বেয়াদপি সে আর সহ্য করবে না। তাকে অযথা খাটিয়ে মারে সে—আর যখন তখন, যা তা হুকুম করে। মাও বলছিলো—লোকটা ভালো না—তাকেও জ্বালাতন করছে সে!

নন্দর মনকে মুহূর্তের জন্যে একটা বলিষ্ঠ বিদ্রোহী ভাব অধিকার করে বসে। সে যেন আর বাবুদের অধীনে চাকর নয়—একজন সোমত্ত চাষী। তার মা? না তার মাও আর কারো অধীনের দাসী নয়।

সন্ধ্যের সময় দাঁড়িয়ে ছিলো বাইরের উঠানে। নিজের অজান্তেই ডেকে বসে—'মা'। মাকে যে কি বলবে—কি জন্যে ডাকছে তাকে সে সম্বন্ধে নিজেই কিছু জানে না।

কেবল অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা তীক্ষ্ণ গোঙানি সে শুনতে পায়! তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সেদিকে। তার মা পড়ে গিয়েছিলো—ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়ায়। নন্দ ধরে ফেলে—এ আর কেউ নয় দুখী। দুখী তার মার গায় হাত তুলবে! সে রেগে যায়—চেঁচাতে যায়। তার মা মুখ চেপে ধরে। নন্দর আরো রাগ হয়ে যায়—কেন, একজন মেরে যাবে ওমনি ওমনি তার মাকে, আর সে সহ্য ক'রবে? কিন্তু তার মা তাকে চেঁচাতে দেয় না। নন্দ বুঝতে পারে না মায়ের হাবভাব।

আর একদিন তার মা তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে—চুপি চুপি, যেন কি গোপন কথা বলছে, এমনিভাবে বলে—'এখন পরের বাড়ি চাকরি করতিছি সিডা মনে রাখবি। তুই যতো দিন না বড়ো হচ্ছিস ততোদিন সয়ে সয়ে থাকতি হবি। এখন বাবুরি চটায়ে দিলি, আমাগেরই ক্ষতি। জানিস তো আমাগের বাড়ি তিনি সব কিনে নেছেন। তুই বড়ো হলি

তিনি আবার সব ফিরায়ে দেবেন বলেছেন। এখন চটায়ে দিলি তিনি যদি আর ফিরোয়ে না দেন? তাহলি আবার আমাগের বাড়ি যাওয়া হবি কি করে?'

নন্দ এ সমস্যাটার কথা আগে জানতো না। মায়ের সেদিনের কথার পর থেকে সে যে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলো সে স্বপ্নের পথে এই নতুন বাধাটি তাকে একটু ভাবিয়ে তুললো। যাই হোক সে এই নতুন বাধার জন্যে তার স্বপ্নটাকে মাটি হতে দিতে পারে না। মায়ের কথায় সে সম্মতি জানায়।

রক্ষিতের মেয়েটার সাথে সে এর পর থেকে আরো ভালো ব্যবহার করতে লাগলো। তাহলে এই তার সেদিনকার বৌ হবে—সে মনে মনে ঠিক করে ফেললো।

এখন থেকে যেন তার গাছে ওঠাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষেত্রনাথ বাবু সকাল হলেই দুখীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন সুপারি আর নারিকেল পাড়বার জন্যে। বহু বাগ-বাগিচা আছে এবং অনেকগুলিই বেশ দূরে দূরে। মোল্লাপাড়ায় একটা বাগান আছে। গ্রামের খাল পেরিয়ে সোজা একটা মেঠো রাস্তা যেখানে পোস্ট-অফিসের দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ইছাক মোল্লার বাড়ির সীমানার পর থেকে বাগানের সীমানা আরম্ভ। সুপারি নারকেলের প্রচুর গাছ আছে সেখানে। আর একটা বাগান আছে পশ্চিমে – ঘোষ পাড়ার মাঝ দিয়ে যেতে হয়। প্রায় দেড় মাইল ঘুরে নদীর ধারেই সেটা। কাছের বাগানটা হচ্ছে পালেদের পোড়ো ভিটের কাছে। এইগুলিই হচ্ছে বড়ো বড়ো বাগান। আরো অনেক ছোট ছোট বাগান আছে। সকালে উঠেই চাট্টি পান্তাভাত খেয়ে নেয় নন্দ—তারপর দুখীর সাথে ওকে পাঠিয়ে দেন ক্ষেত্রনাথ বাবু। একটির পর একটি গাছে ক্রমান্বয়ে উঠতে হয় নন্দকে। দুখী কখনো গাছতলায় বসে ঝিমায়। কিছুটা সুপারি নারকেল পাড়া হয়ে গেলে নন্দর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে দিয়ে বলে—'নিয়ে যা এগুলি বাড়ি।' একে গাছে গাছে বেড়িয়ে ক্লান্ত, তারপর ঐ ঝুড়ির ভারে সে একেবারে নুইয়ে পড়ে যেন। কিন্তু তবু হাল ছেড়ে দেয় না। একেবারে যখন মেজাজ বিগড়ে যেতে বসে তখনই তার মায়ের কথা কটি মনে পড়ে—সে অমনি নিজেকে সমঝে নেয়। ওর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্যে ও সব কষ্টকেই প্রায় তরিয়ে যায়।

যারাই তাকে গাছে চড়বার সময় দেখে তারাই শতমুখে প্রশংসা করে যায়। এতো-টুকু ছেলে এমন হন্ হন্ করে উঠে যায় এবং উঠবার সময় সত্যিই তাকে সুন্দর দেখায়। গাছ আঁকড়ে ধরা তার শক্ত পা দুটি, আর পেশীবহুল হাত দু'খানা, আর বড়ো বড়ো চোখ —'ও যেন যে কোন কাজ করতে সক্ষম,—ছোটো ছেলে হলে কি হয়। ওর দৌলতে দুই একজনে এক আধটা নারকেল চেয়ে নিয়ে যায়—দুখী আর বিশেষ আপত্তি করে না।

সকাল বেলা এসে মোল্লাপাড়ার নারকেল গাছে উঠেছিলো। কেমন ক্লান্তি বোধ করে। ক'দিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বেটা হিন্দুস্থানীটা তো এসেই একটা কেটে ফেলা গাছের গুড়ি আশ্রয় করে লাঠি গেঁড়ে গাঁজার ভাঁজ পোরবার যোগাড় করছে। আর কিছুক্ষণ পরেই নেশায় ঝিমুবে পড়ে পড়ে। নারকেল পাড়ে প্রতিটি গাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নন্দ। এক সময় নেশার আমেজ ভেঙে ভিরিক্কি চালে উঠে পড়ে হিন্দুস্থানীটা। প্রচুর পাড়া হয়ে গেছে দেখে, নন্দকে কিছু নারকেল রেখে দিয়ে আসতে বলে। ঝুড়িতে করে নারকেল নিয়ে বাড়ি মুখো যায় নন্দ। কয়েকবার টেনে, এক সময় মাকে বলে—আর

পারছে না সে, বাবুকে বলে আজকের মতো তাকে রেহাই দিক। তার মা তার ক্লান্তিটা যেন হাতে স্পর্শ করতে পারে। ক্ষেত্রনাথ বাবুর কাছে বলে কথাটা। ক্ষেত্রনাথ বাবু বললেন —'নারকেল আর তোরে টানতে হবে না। শুধু আর দুইচারডে যা গাছ বাকি আছে সেই কয়ডা সারে আয়—তাহলিই তোর ছুটি। কারণ আজই আমার এক খদ্দেরকে দুই হাজার নারকেল দিতে হবে।' নন্দকে আবার যেতে হয় মোল্লাপাড়ার বাগানে। সে চলে যায় খুবই ক্লান্ত এবং অবসন্ন ভাবে। অতটুকু প্রাণেও একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আঁচ লেগে থাকে—কিছুতেই সে ভেঙে পড়বে না, এবং এরই পরে নির্ভর করছে তার ভবিষ্যতের ঘরবাঁধা। যে ভিটেটা এখন পোড়ো হয়ে গেছে, আর যেটা এখন একেবারেই মানুষের দর্শন পায় না, সেটায় আবার ঘর দুয়ার ওঠা নির্ভর করছে তার ওপর—একেবারে সম্পূর্ণ তার ওপর—তার শক্তির ওপর।

মায়ের মনে খোঁচা লাগে। সখ করে গাছে ওঠা শিখেছিলো—সে বেশি দিনের কথা না। তার বাপ তখন বেঁচে। একেবারেই কাঁচা যে—তাই ভয় করে। এভাবে গাছে গাছে বেড়াবার পক্ষে একেবারেই বাচ্চা সে। তবে—। কিন্তু ওর শরীরটাও যে ভালো ও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—সেটাও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এখন। এতো খাটুনি পেরে ওঠে না—সত্যি কি করে পারবে! ও বড়ো মুখটা ভার করে চলে গেলো।

সেদিন ছিলো রবিবারের দুপুর বেলা। আকাশে একেবারে মেঘ নেই—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। জ্যৈষ্ঠের দুপুর। বেশিক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হয় না—ওকে নিয়ে এসে হাজির করে দুখী আর একজন মুসলমান চাষী, রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। মা কেঁদে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে ছেলেটির ওপর। ডান পায়ে হাড় দু'জায়গায় ভেঙে গিয়েছে—মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে—উঃ, কি বীভৎস। জ্ঞান হারা হবার উপক্রম হয়।

তখনকার মতো গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারকে ডেকে হাড়টা কোন রকমে মাংসের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বেঁধে দেয় ওরা। ছোট্ট খড়ের চালা ঘরখানির নীচে শুইয়ে রাখে তাকে।

—পা সেরে যাবে তো ওর? তার এই একই প্রশ্ন। কাজে সে কোন রকম ঢিল দেয় না। ক্ষেত্রনাথ বাবু সান্ত্বনা দেন,—সেরে যাবে নিশ্চয়। ঐ হাড় তখন তখন ঠেলে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এবার আর ভয়ের কোন কারণ নেই। কেবল জলপটি দিয়ে যাবে—আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। তবে সময় লাগতে পারে কিছু। তবু প্রশ্ন যায় না। ওষুধ-পত্র লাগবে না?—'না ওষুধ-পত্তর ওতে লাগে না কিছু। এক যখন একেবারে সারে আইছে বুঝা যাবে তখোন এক আধডে মলোম লাগানো যাতি পারে যাতে শিরাগুলো স্বাভাবিক হয়ে আসে—অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করতি না হয়। এবং সে সব বিষয়ি কি করতি হবে না হবে সেদিকি আমার খেয়াল আছে। কিছুরই ত্রুটি রাখবো নানে আমি।'

চীৎ হয়ে শুয়ে থাকে নন্দ। এখোন আর রোজ সকালে উঠে পান্তা খেয়েই গাছে উঠবার জন্যে ছুটতে হয় না। কিন্তু পা কি তার আবার ভাল হবে? কখনো ভাবতে চেষ্টা করে,—দোষ কার? সে নিজে একটু অসাবধান হয়েছিল সত্যি—অভিমানি হয়েছিল, দুঃখে তার কান্না পাচ্ছিল। নিজের যেন একটু আত্মঘাতী মনোভাব হয়ে পড়েছিলো। গাছে উঠছিল অত্যন্ত দ্রুতবেগে—তার শক্তির সবটুকু সে প্রয়োগ করবে

এমনি একটা জিদ এসে গিয়েছিল। কিন্তু কাজ যখন সে প্রায় সমাধা করে এনেছে তখনই গাঁজার নেশার ঝিমুনি ভেঙে উঠে এলো দুখী আর গাছ থেকে ঝোলানো দড়িতে তার অজ্ঞাতে দিলে টান। পায়ের নীচ থেকে সর সর করে দড়িটা সরে যেতে আর সে সামলাতে পারল না। এমনভাবে ডাল ছেড়ে দিয়ে বসে সে কোনদিন থাকেনি। ডাল ধরা থাকলে সে পড়ত না—কিন্তু একটা অসম সাহসিকতা—একটা নেশার ঝোঁক এসেছিলো যেন তার মধ্যে।

দিনের পর দিন তার পায়ের ব্যথা প্রচণ্ডতর হতে থাকে। সে বুঝতে পারে না ঐ বাঁধার মধ্যে কেন এতো যন্ত্রণা হচ্ছে। কে যেন তার পা'খানি রাতদিন কুরে কুরে খাচ্ছে। আস্তে আস্তে খেতে খেতে একদিন যদি তার সমস্ত দেহটাকে খেয়ে ফেলে শিউরে উঠে নন্দ। মাকে বেশিক্ষণের জন্যে পায় না কাছে—কিন্তু কাছে পেলেও মায়ের কাছে সে যন্ত্রণা গোপন করে।

দিন পনেরো পর তার পায়ে এই কুরে কুরে খাবার কারণটা হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ে। পায়ের যে দুই যায়গায় মাংস ফেটে হাড় বেরিয়ে পড়েছিলো সেখান দিয়ে স্রোতের বেগে পুঁজ গলে পড়তে থাকে। যেটুকু আশাও ছিলো, সে আশাটুকুও এবার মরে যায়। ঐ ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে সে শেষ দিনের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

মাসের পর মাস সে ভুগতে লাগলো পড়ে—মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

দীর্ঘ দুটি বছর সে ভুগলো এবং যখন বেরিয়ে এলো তখন সে একটি শীর্ণ পাংশুটে খোঁড়া ছেলে। ডান পাটা টেনে নিয়ে চলে—গ্রন্থি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অকেজো।

একটা ক্লিষ্ট ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে দেখে তার পাখানাকে—সে পঙ্গু—অকেজো।

জগতটাও তার কাছে আর পুরানো ধাঁচে থাকে না। সে তো আর এখন বলিষ্ঠ, কর্মঠ ছেলে নয়!

একটা অকর্মণ্য জীবনের সব চেয়ে নগ্ন বিদ্রূপ এবার থেকে আরম্ভ হয় তার জীবনে।

সকালে উঠে গোরুটা নিয়ে যায় খোঁড়া পায়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। মাঠের হালটের পরে বেনা-ঝোপ আর কাঁচা লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে সূচালো খুঁটোটা গেঁড়ে দিয়ে লম্বা হয়ে বসে। বেশিক্ষণের জন্যে না—এখনই যেয়ে পান্তা খেয়ে বাঁশ ছালতে বসবে,—লম্বা বেড় ঘেরবার বাঁশ। তবু ঐ পাকা বাড়ির আবহাওয়া থেকে যেন একটা পালানো ছুটি। কালো হালের বলদটা এসে 'ঢু' দিয়ে ফেলে কাঁচা বাছুরটাকে। হাতের লাঠিটা নিয়ে আবার ওঠে—'শালার গোরু মরতি যাগা পালি নে!'

আমের ধামা কাঁখে শানবাঁধানো মেঠো পতিত পুকুরটার ঝাড়ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রক্ষিতের মেয়েটা। বাপ্ চৌধুরীদের গাছে আম পাড়ছে,—তারই পাড়ানি ভাগ মেয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ি।

—'তোর বাপ কনে রে?'

—'বাবা হনেই আছে—মিঠে কালো-জাম গাছটায় উঠিছে।'

—'কোন গাছের আম নিয়ে আলি দেখি?'

—'ভাদুরে আর বাউই-ঝাড়ার আম। খাবা নাকি দুডো......পাক বেশি নেই।

বাবুরো সব পাকাগুলো নিয়ে কাঁচাগুলো আমাগেরে ভাগে ঠেলে দেয়। আমাগের চাড্ডে খানিকির মধ্যিবতেও ফাঁকি দেবে। কলি কয়, কতো পাড়ানদার আছে—তুমি না পাড়তি চাও, ক্ষেত্তর মাঝিরি ডাকপো—নয় ঝড়ু—নয় কালা ধুপি আছে।'

নন্দর মনে পড়ে 'পাড়ানদার' সেও একদিন ছিলো। দু'বছর আগে আমগাছে তো সে হেসে খেলে উঠতো।

মেয়েটার ধামা থেকে দু'টি পাকা দেখে তুলে নিয়ে একটার পেছনদিকে দাঁতে পিষে ধরে। গোটা দুই তিন আম সে খেয়ে ফেলে।

রক্ষিত আসে ধামা মাথায় করে অবশিষ্ট আম কটি নিয়ে। মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে গোটাকতো কিল-চাপড় দিয়ে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দেয়—'মাগী—খুঁড়ার সাথে পিরীত কিসির?' খেবে ফেলা ছোবড়াগুলির দিকে চোখ পড়তেই ক্ষেপে যায়—'পাকা পাকা আমগুলো! গাছে গাছে টো টো করে বেড়ায়ে চাড্ডে আম জুগাড় করিছি, আর তুই পিণ্ডি দিতি আইছিস এখেনে—বুড়োঘাগী!'

মেয়েটার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে যায়। নন্দ চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—চুপ হয়ে যায় একেবারে।

পান্তা খেতে বসে, কলার পাতা ধুয়ে নিয়ে রকের এক কোনে—এক ঠ্যাং লম্বা করে দেয়।—'ত্যাও পিণ্ডি গেলো—কেবল রাতদিন খুঁটোর মতো গাঁড়ে বসে থাকপা আর ভাত গিলবা।'—'সারাডা জীবন তো জ্বালাবা—আর কোন চুলোর তো জাগা হবিনে। দু'দিনির জন্যি এখেনে উদ্ধার করতি আসে দিনায় জড়ায়ে ফেলিছো।'

নন্দ কাঁচা বড়ো লঙ্কাটা দিয়ে জলে ভেজানো ভাত ক'টি খুঁটতে খুঁটতে গিলে যায় কথাগুলো। বাসি পোড়ানো ডাল দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে গ্রাস গ্রাস ভাত মুখে পোরে। বলাই মাঝির বৌটা সামনের পথ দিয়ে হেঁটে যায়—কথাটাও কয় না। মাসি বলে, কতো আদর খেয়েছে ওর কাছে। ঝাঁটা হাতে তার মা তখন উঠানটার একপাশ ঝাঁট দিয়ে এক জায়গায় জঞ্জাল জড়ো করছিল।

ক্ষেত্রনাথ বাবুর চাহনিটা বড়ো দুর্বিসহ। আধকানা চোখের মতো এমনি বাঁকা চাহনি যেন শরীরের ভেতর গিয়ে পৌছায়।

তামাক আনতে দেরী হোল সেদিন। পায়ের চটী জুতো দিয়ে মেরে পাট্ ক'রে ফেলে দিলেন—'সারাডা জীবন এইভাবে জ্বালিয়ে খাবে—দূর হয়ে যা আমার সামনের থে।' চীৎ হয়ে পড়ে যায় নন্দ এবং শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে আবার পাখানা টেনে টেনে সেখান থেকে চলে যায়। মাও দূবে দাঁড়িয়ে দেখে চেয়ে চেয়ে—প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

নন্দ কেঁদে ফেলে সময় সময়। ভাগ্যটা কেমন একটা সামান্য ঘটনায় ওলটপালট হয়ে যেতে পারে কল্পনা করে উঠতে পারে না।

মা বলছিলো—'ভাগ্যির লিখা কিডা খণ্ডাবে। না হলি তুই গাছেরতেই বা পড়বি ক্যান আর পড়বি তো শেষ পর্যন্ত পাডাই বা খোঁড়া হয়ে থাকলো ক্যান। আরো কতো লোকরি তো গাছেরতে পড়তি দেখিছি কিন্তু তারা তো ভাল হয়ে উঠিছে। জগার বাপ তো তালগাছেরতে পড়িছিলো—লোকে তো বলিছিলো বাঁচপেই না, কিন্তু শেষকালে তো একেবারে সম্পূর্ণ ভালো মানুষডা হয়েই সারে উঠলো। চাষ-বাসও করে গেলো জীবন ভোব।'

'ভাগ্যির লিখা কিডা খণ্ডাবে।'

নন্দও যেন বুঝতে পারে তার ভাগ্যির নির্দেশ। একদিন সন্ধ্যার সময় সে কেবল গরুটাকে বেঁধে দিয়ে পা'খানা টেনে টেনে দেয়াল-ঘেঁসা পথটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর থেকে একটা কথা কানে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্ষেত্রনাথ বাবু আর তাঁর আদায়কারক সরকারবাবু কথা বলছিলেন। তার সম্বন্ধেই কথাটা হচ্ছে শুনতে পেয়েই নন্দ দাঁড়াল।

ক্ষেত্রনাথ বাবু বলছিলেন—'তাই করি,—গাছুরি দিয়ে চতেলী বুনায়ে দিই। এখোন তো আর ভাবনার কিছু থাকলো না। ওর আর এখোন সারাডা জীবন এখেনে বেগার খাটে খাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই—এক যদি দেশ ছাড়া হয়। কিন্তু দেশ ছাড়া হয়ে যাবি কনে,—রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ছাড়া তো অন্য পথ নেই।'

নন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো অনেক কিছু শুনল। সে যা শুনল তার সারমর্ম হচ্ছে এই,—

জুড়ন মরে যাওয়ার পর ক্ষেত্রনাথ বাবু মিথ্যা দেনার দায়ে ভিটে-মাটি কিনে নিয়েছিলেন এবং ব্যাপারটা এতোই মিথ্যা এবং জাল যে ভবিষ্যতে এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হলে জমি তিনি রাখতে পারতেন না। তাই নন্দ বড়ো হয়ে চাষ-বাসে লাগলে, জমি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয় ছিল। এখন সে আশঙ্কা আর নেই এবং তিনি ভিটেটায় এবার নির্বিঘ্নে লাঙল দেবেন।

নন্দ আরো শুনলো,—

ডাক্তার তাকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল ক'রবার জন্যে ক্ষেত্রনাথ বাবু ডাক্তারকে প্রচুর পুরস্কৃত করেছেন। পরিবর্তে ডাক্তার হাসপাতালের প্রসঙ্গ একদম চাপা দিয়ে রেখে মাঝে মাঝে এসে তাকে ও তার মাকে অভয়বাণী শুনিয়ে গেছে—এইতেই সেরে যাবে আর ভয়ের কোন কারণ নেই। অবশ্য এ সব, সমস্ত কিছুরই মধ্যস্থতা করেছেন সরকার বাবু।

নন্দ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। এর পরের কথাবার্তা আর একটাও তার কানে পৌছায় না। চোখের সামনের সমস্ত জিনিসগুলি মিলিয়ে যায়—সামনের পাঁচিলের বড় গেটটা সে আর দেখতে পায় না—বড়ো জামগাছটা যেন ভুতুড়ে গাছের মত হাওয়ায় মিশে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

খানিক পরে পেছন থেকে দুখী এসে ধাক্কা মেরে বলে—'হেঁই,—বাবু বুলছে—পুকুরপাড়ে হোথায় যাও,—কপির চারা সব গেঁড়ে ফেলো। সাঁঝের আগে সব সেরে ফেলতে হোবে।'

নন্দ কোনই কথা বলে না। গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া লাঠিটা হাতেই ছিল, তাতেই ভর দিয়ে খোঁড়া পাখানা হেঁচড়ে টেনে নিয়ে সে কপির ক্ষেতের দিকে চলে যায়। যেদিন থেকে সে এই বাড়িতে এসেছে তারপর প্রতিটি দিনের ঘটনা একে একে যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার মধ্যে সে দেখতে পায় পশুর মত খাটিয়ে তার জীবনটাকে বিকল করে দেবার ষড়যন্ত্র। গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার মধ্যেও যেন কার একটা গোপন ইঙ্গিত কাজ করে যাচ্ছে। তার পাটাও যেন জগার বাপের মতই সেরে উঠতো, কিন্তু—

একটা ভীতিসঙ্কুল অবাক বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে যায়।

তাহলে তাকে এরা শেষ পর্যন্ত খোঁড়া করে দিল—এবং সে আর কোনদিনই লাঙল ধরতে পারবে না। রাগে, ভয়ে ও দুঃখে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

পরদিন সকালে গাছুকে ডেকে ক্ষেত্রনাথ বাবু ভিটেটা চাষ ক'রে রাই-সরিষা বুনতে বলে দিলেন। বললেন—'সামনের পরে জমিডা পতিত পড়ে রইছে। তবু যাই হোক দুইচার পয়সা ঘরে আসবে।'

কিন্তু নন্দকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।

সমস্ত গ্রামটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না তখন তার মার আর কোন সন্দেহ থাকে না যে নন্দ পালিয়েছে।

পাগলের মতো ভিটেটার পরে এসে দাঁড়ায়। এখনো দাওয়ায় কয়েকটা খুঁটি খাড়া হয়ে রয়েছে—চাল নেই। কাঁদে—কিন্তু জোরে না। কাপড়ে চোখ মোছে।—কিন্তু কাঁদছে কেন সে?

তার ছেলে কি মারা গেছে? অমঙ্গল সে নিজে ডেকে আনছে! এবার আত্মসংবরণ করে নিয়ে ভাবে—তার ছেলে গেছে শহরে। সেখানে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করলে পা ভাল হয়ে যাবে। একেবারে ভাল ছেলেটি বাড়ি ফিরে আসবে।

সে তো ফিরে আসবে একদিন—ফিরে না এসে পারে কখনো!

রাত্রে ঘুম ভেঙে বিছানার পরে উঠে বসে—নন্দ এসে চুপ করে শুয়ে আছে তার পাশে। বাঁ হাত দিয়ে হাতড়ে দেখে বিছানা—কিন্তু কই আসেনি তো!—আঃ, লজ্জায় মুখখানা চুপসে এতটুকু হয়ে যায়। সে যে স্বপ্ন দেখছিল—নন্দ তো আর সত্যিই এসে তার বিছানায় শোয়নি।

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

কৃষক আন্দোলনের মূল সমস্যা

কৃষক আন্দোলনের মূল সমস্যা জমির সমস্যা। জমিকে অবলম্বন করেই গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বাংলা দেশের শতকরা ৭৪ জন কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে। ১৯৩১ সালের সেন্‌সাসে দেখা গিয়েছিল যে প্রতি হাজার জন চাষীর মধ্যে ২৯২ জন ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুর। কলিকাতার Statistical Laboratory-র অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হাজারে ৪০৭ জন হয়। সরকারী দপ্তর থেকে জানা যায় যে ১৯৪৩ সালের পূর্বে এক বৎসরে গড়ে যত জমির বিক্রয়-কোবালা রেজেষ্ট্রী হ'তো তার তিনগুণ হয়েছে ১৯৪৩ সালে। এই সব জমি গরীব চাষীরাই বিক্রী করেছিল। চাষী সম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) সেই সমস্ত কৃষক যাদের নিজেদের জমি থেকেই পরিবারের ভরণ-পোষণ হয়। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ ও ফ্লাউড কমিশনের মতে একটি মাঝারি কৃষক পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ১৫ বিঘা জমির প্রয়োজন। এরকম পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। (২) ভাগচাষী—যাদের নিজের কিছু জমি নেই অথবা সামান্য জমি আছে, কিন্তু তাতে কুলায় না। পরের জমি ভাগে চাষ করতে হয়। (৩) সম্পূর্ণ নিঃস্ব বা ভূমিহীন কৃষক। ক্রমশই দেখা যাচ্ছে সকল কৃষক জমি হারিয়ে ভাগচাষীতে পরিণত হচ্ছে, ভাগচাষীরাও প্রায় ক্ষেতমজুরের পর্যায়েই এসে পড়ছে। কৃষকদের গড়পড়তায় পরিবার পিছু মাত্র চার বিঘার কিছু বেশী জমি আছে। এই জেলাতেই ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হবে শতকরা অন্তত ৬১ জন। অন্যদিকে জোতদারশ্রেণীর কারুর কারুর দশ হাজার বিঘা জমিও আছে। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁর "রায়তের কথা"য় লিখেছিলেন, 'জোতদার তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-টপকা ফল ভোগ করেন।' জোতদারী সৃষ্টির পিছনের যে ইতিহাস তা অনেকেরই জানা আছে। খুব কম ক্ষেত্রেই সাধু উপায়ে তার সৃষ্টি হয়েছে। 'রায়তের কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার মহাজনের দ্বন্দ্ব সমাসে তা আর টেকে না।" পরের পাতায় বড় বড় জোত কেমন করে গড়ে উঠলো সে সম্বন্ধে যে সমস্ত কঠিন মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলো উদ্ধৃত না করাই ভাল। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আধিয়ারকে চাষের খরচ বহন করতে হয়। সেই খরচ বহন করে পরিশ্রম করে যে ফসল উৎপন্ন হয় তার অর্ধেক তার প্রাপ্য। জোতদার শুধু জমিদারকে বিঘা প্রতি সাধারণত এক টাকা থেকে দেড় টাকা —কোথাও দুটাকা—খাজনা দেন। বহু ক্ষেত্রে অর্ধেক ফসল থেকেও আধিয়াররা বঞ্চিত হয়। মহলদারী, বরকন্দাজী, খোলান-ঝাড়া, ছেলে-পড়ানি ইত্যাদি নানা বে-আইনী আদায় গ্রামের

জোতদাররা করে থাকেন। সম্প্রতি একশত বিঘা বা তার বেশী যাঁদের জমি আছে তাঁদের উপর যে কৃষি-আয়কর বসেছে, সেটা অনেক ক্ষেত্রে জোতদাররা আধিয়ারদের উপর চাপিয়ে থাকেন। এ সবের উপর আছে—অভাবের সময় ধান ধার করলে অবিশ্বাস্য হারে সুদ। জোতদারের নিজের খামারে ধান উঠলে কৃষককে অনেকসময় অর্ধেক কেন তার অনেক কমে সন্তুষ্ট হয়েই ঘরে ফিরতে হয়। বহুকাল ধরে এই অত্যাচার চলে আসছে। দেশের নেতাদের এদিকে দৃষ্টি পড়েনি। ঠাকুরগাঁ মহকুমার মধ্যে আটোয়ারী-বালিয়াডাঙ্গি এলাকায় যেখানে আন্দোলনের শক্তি সবচেয়ে বেশী—কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষেরই সামিল তীব্র খাদ্যাভাব কৃষকদের নিত্যসঙ্গী হয়ে গেছে। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কমিটি এই এলাকায় খাদ্যাভাব তদন্ত করবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ১৯৩৯-৪০ সালে এখানে কৃষক আন্দোলন হয়। ১৯৪৩-এ এখানেও দুর্ভিক্ষ হয়—গভর্নমেণ্ট থেকে কয়েকটা লঙ্গরখানা খোলা হয়। গত শ্রাবণে ও তার পর এই এলাকায় ত্রিশ টাকা এমন কি পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরেও চাল বিক্রী হয়েছে। যে ধান আধিয়াররা উৎপন্ন করে সেই ধান্যই মজুতদার মুনাফালোভী জোতদার তাদের অভাবের সময় অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রী করে। ১৯৪৬ সালে বাংলা গভর্নমেণ্টের খাদ্যসংগ্রাহক বিভাগ (Procurement Department) ধান সংগ্রহ করবার যে চেষ্টা করে তার ফলে এই জেলার ১০৫ জন জোতদারের ৫ লক্ষ মন ধান আটক হয়। যাদের উন্নতিতে বাংলার উন্নতি—সেই কৃষকদের দারিদ্র্য কত তীব্র, আশা করি অনুমান করা যাবে। মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের আজ একান্ত অভাব; বহু কিছুই চোরা-বাজারে গিয়ে ঢুকছে। তার কি প্রতিকার? ধান উঠতে না উঠতেই শোনা যাচ্ছে যে কয়েকটা জেলায় চালের দর মণ প্রতি সাতাশ টাকা হয়ে গেছে। এবারও যে গরীব আধিয়ার না খেতে পেয়ে মরবে না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে? আমরা কি চাই যে ১৯৪৩-এর মত এবারও তারা নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে মরুক?

এবার আধিয়ারদের দাবী ছিল, হয় চাষের খরচের অর্ধেক চাই আর না'হলে ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ চাই। সাত বছর আগে ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করেছিলেন: '১৯২৮ আইনে বর্গাদার সম্পর্কে ঐরূপ বিধান করা ভুল হইয়াছে। বর্গাদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; অর্ধেক ভাগের বদলে মালিক তিন ভাগের এক ভাগের বেশী আইনত বর্গাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না।' এত বছরেও বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদ এই সামান্য ন্যায্য দাবীটুকু স্বীকার করে কোন আইন করেনি। এবার আন্দোলন সুরু হবার পর মন্ত্রীমণ্ডলী এই রকম আইনের প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা কবে কার্যকরী হবে বলা শক্ত।

বাংলা দেশের ওটি বারো জেলা জুড়ে গত পৌষ থেকে এবার 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু হয়। কম বেশী সব জেলাতেই আন্দোলন একই রূপ লাভ করে। তবে দিনাজপুরে তা সব থেকে প্রবল হয়। আন্দোলন শুরু হবার আগে আপোষের কোন চেষ্টা হয়নি, এ অভিযোগ ভুল। ১২ই ডিসেম্বর দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আহ্বানে ঠাকুরগাঁ শহরে সরকারী কর্মচারী, কৃষক সমিতি ও জোতদারদের প্রতিনিধিদের এক মিলিত বৈঠক হয়। তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপোষের নিম্নোক্ত সর্তগুলি উত্থাপন করেন: (১) আধিভাগ বজায় থাকবে, (২) মাঠে ধান ভাগ হবে, এবং (৩) ধান ভাগের সময় জোতদাররা কর্জা ও

তার সুদ কেটে নিতে পারবে না। সে আদায় তারা অন্যভাবে করবে। কথা ছিল এক সপ্তাহ পরে কৃষক সমিতি এই প্রস্তাবে তাদের মতামত জানাবে। ১৮ই ডিসেম্বর কৃষক-সমিতি আপোষের জন্য ঐ সর্তগুলি ছাড়া আর দুটি সর্ত দেয়ঃ (১) ধান কাটা ও মাড়াই খরচের অর্ধেক জোতদারকে দিতে হবে ও (২) বীজধান জোতদারকে দিতে হবে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে কৃষক সমিতি তে-ভাগা ও আধিয়ারের নিজের খামারে ধান তোলা—তাদের এ দুটো প্রধান দাবী ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু জোতদাররা তাতে রাজী হয় নি। আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আর একবার আপোষের চেষ্টা দিনাজপুরে হয়। নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভা আহ্বান করেন। তখন কৃষক সমিতির প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট। একটা কথা শোনা যায় যে ফসলের দশ আনা আধিয়ারের ও ছ' আনা জোতদারের এই রকম ভাগের একট প্রস্তাব সে-সভাতে উঠেছিল। আমরা যতদূর জানি এরকম কোন প্রস্তাব সে-সভায় ওঠেনি। সেদিন কৃষক সমিতি ঠাকুরগাঁ সহরে এক বিরাট মিছিল ও সভা করে। তে-ভাগা স্বীকার করে নেওয়া হোক—সেখানে সম্মিলিত কণ্ঠে এই দাবী ওঠে।

এই প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগেকার একটা ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৩৯-৪০ সালে ঠাকুরগাঁ মহকুমার আটোয়ারী-বালিয়াডাঙ্গি এলাকায় কৃষক আন্দোলন হয়। তার ফলে শেষে একটা আপোষ হয়। তার সর্ত ছিলঃ (১) আবওয়াব আদায় করা চলবে না, (২) মণে দশ সের সুদের হার—তার বেশী আদায় করা চলবে না, (৩) ধান ভাগের সময় কর্জা কেটে নেওয়া চলবে না, (৪) আধিয়ার বা জোতদারের খামারে ধান উঠবে না,—মাঝামাঝি জায়গায় ভাগ হবে; ও (৫) জোতদাররা এই আন্দোলনের জন্য আধিয়ারদের জমি ছাড়িয়ে বা অন্য কোন উপায়ে শাস্তি দিতে পারবে না। ঠাকুরগাঁর এস-ডি-ও, জোতদার প্রতিনিধিরা ও কৃষক সমিতির প্রতিনিধিরা এই আপোষে সই করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে জোতদাররা এই আপোষের সমস্ত সর্তগুলি ভঙ্গ করেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

এভাবেই প্রত্যেক জেলায় আপোষের চেষ্টা সকল রকমেই ব্যর্থ হয়। এখানে সে-সব প্রত্যেকটি প্রয়াসের উল্লেখ করা সম্ভব নয়, দিনাজপুরের কথাই বলা হল। দিনাজপুরেই সরকারী দমননীতি সব থেকে কুৎসিৎ ও অমানুষিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এখানকার বড় জোতদাররা অনেকেই মুসলমান। লীগের উপর তাদের প্রভাবও প্রবল। তারাই লীগ মন্ত্রীসভাকে এভাবে সাধারণ মুসলমান হিন্দু সাঁওতালের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে।

এ বছর তে-ভাগা দাবী করার জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের একটা অভিযোগও শোনা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন এই রকম অভিযোগ নিয়ে এসেছিল, তখন দেশের জনসাধারণ উত্তর দিয়েছিল যে চুক্তির চেয়ে ন্যায়ের মাপকাঠিই বড়ো। আমরা জানি কেমন করে কৃষকদের জমি তাদের হাত থেকে চলে গেছে। ইংরেজের চাপানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্রজা তার জমির উপর চিরকালের অধিকার হারালো। সেই বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তার ফলে বাংলার কৃষক সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যেতে বসেছে। এর উপর চুক্তির সম্মান কি এক পক্ষই

উপবাস করে মরতে মরতে করবে? অপর পক্ষের কোনই দায়িত্ব নেই? কোন চুক্তির জোরে জোতদাররা এতকাল বিভিন্ন আবওয়াব নিয়ে আসছেন, কোন চুক্তির জোরে 'দেড়িয়া' বা 'দুনা' সুদ তাঁরা আদায় করে থাকেন? এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ৪ মণ ধান ধার করলে আধিয়ারকে অগ্রহায়ণে দিতে হয় ১০ মণ। আষাঢ়-শ্রাবণে ধানের দাম ধরা হয় মণ প্রতি ১০৲ টাকা, অগ্রহায়ণে ৪৲ টাকা। এই প্রসঙ্গে স্টেটস্‌ম্যানের এক সাহেব বিশেষ-সংবাদদাতা দিনাজপুরে সরজমিনে তদন্ত করে ঐ পত্রিকার ২০শে মার্চের সংখ্যায় 'উত্তর বঙ্গে কৃষক-অসন্তোষ' ('Peasant Unrest in North Bengal') শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন: 'আধিয়ার (যার নিজের জমিজমা প্রায়ই আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয়) চাষের সমস্ত খরচ সাধারণত বহন করে এবং ফসলের আধা-আধি ভাগ হয়; কিন্তু আবওয়াবগুলোর হিসাব নিলে জোতদারদের পক্ষেই পাল্লা বেশী ঝোঁকে।...বছরের অভাবের সময় আধিয়াররা যে ধান ধার করে, সেই ধান বর্তমানে জোতদারদের আবওয়াবের প্রধান অবলম্বন। শতকরা ৯০০ হারে সুদ নেওয়ার দৃষ্টান্তও লিপিবদ্ধ হয়েছে।"

এই জেলায় বর্তমান আন্দোলনের দুটো পর্যায় ছিল। প্রথম দিকে আধিয়াররা ধান কেটে নিজের খামারে তুলেছে, জোতদারদের জানিয়ে দিয়েছে রসিদ দিয়ে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে আসার জন্য। হিংসা-অহিংসার কোন প্রশ্নই তখন ওঠে না। জোতদাররা ধানের প্রাপ্য অংশ যদি না পেতেন, তা'হলে দেওয়ানী আদালতের শরণ নিতে পারতেন। কিন্তু জোতদারদের আবেদনে পুলিশ বহু ওয়ারেণ্ট বের করেছে, ওয়ারেণ্ট না নিয়েও কয়েক জায়গায় কৃষকদের ধরতে গেছে। সাধারণত ধরা না দেবার জন্য কৃষকরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। কোন কোন জায়গায় পুলিশ ধরতে গেলে কৃষকরা ঘিরে মুক্তি দাবী করেছে। পুলিস যে ব্যাপকভাবে কৃষকদের বন্দী করার চেষ্টা করছিল, তা যদি সফল হতো তা'হলে বহু জায়গায় মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হতো। প্রথম থেকেই কয়েক জায়গায়, যেমন আটোয়ারী-বালিয়াডাঙ্গিতে জোতদাররা পূর্ণিয়া থেকে লাঠিয়াল ডেকে এনেছে, কৃষকদের ওপর মারধোর করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেবার চেষ্টারও কসুর হয়নি। এই প্রসঙ্গে স্টেটস্‌ম্যানের সেই ইংরেজ সংবাদদাতা লিখেছিলেন: 'যে দেশে লাঠিয়াল ভাড়া করা প্রচলিত রীতি, সেখানে সে (অর্থাৎ জোতদার) নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ তো নয়ই, এমন কি নিজেই প্রথমে এগিয়ে আসতে পারে এবং জমি নিয়ে লড়াইয়ে লোক খুন করতে তাদের লাঠিয়ালদের জানা গেছে। আজ তার ভবিষ্যৎ আর জীবিকা বিপন্ন দেখে আশা করা যায় না যে সে তার উপায় সম্বন্ধে খুব বেশী কুণ্ঠা বোধ করবে।'

একটা কথা শোনা যায় যে পুলিশ প্রথম দিকে হস্তক্ষেপ করেনি। একথা ভুল। ১২ই ডিসেম্বর আটোয়ারী থানায় ১৪৪ ধারা জারী হয়। ক্রমশ কাহারোল, খানসামা ও হরিপুর বাদে সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমায় এবং সদর ও বালুরঘাট মহকুমার যে যে থানায় আন্দোলন চলছিল, সেখানে ১৪৪ ধারা বা বেঙ্গল স্পেশ্যাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স জারী হয়। তাছাড়া প্রথম দিকেই কিছু ১০৭ ধারা ও অধিকাংশই ৩৭৯, ১৪৭ ও ১৪৪ ধারা অনুযায়ী প্রায় সমস্ত কৃষক সমিতির নেতা ও সাধারণ কৃষকদের বিরুদ্ধে বহু গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট জারি করা হয়েছে। সেই সমস্ত ওয়ারেণ্টের সংখ্যা সহস্রাধিক হতে পারে। জোতদাররা যে যে আধিয়ারের নাম দিচ্ছিল তাদেরই বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ওয়ারেণ্ট জারি করছিলেন। তা'ছাড়া

পুলিস ডিসেম্বরের শেষে ও জানুয়ারীর প্রথমে দু'জায়গায় গুলি ছুঁড়েছে। তার ফলে দুইজন কৃষক নিহত ও বহু আহত হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারী করার ও কৃষকদের গ্রেপ্তার করার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে—আধিয়ারদের ধানকাটা বন্ধ করা। যদিও ধান কেটে নিজের খামারে তোলা ফৌজদারী অপরাধ নয়, তবুও পুলিস জোতদারদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য প্রথম থেকেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল যে বহু নতুন জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। তখন ধানকাটা প্রায় হয়ে গেছে। লাঠি, জেল, গুলি কিছুই আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। তখন যে সমস্ত আধিয়ার কৃষক-সমিতির এলাকার বাইরে ছিল এবং লক্ষ্য করছিল যে কোন পক্ষ জয়লাভ করে, তারা আন্দোলনে যোগদান করলো। সমিতির প্রায় সমস্ত কর্মীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট, তাঁরা তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগসূত্র অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তখন রোজ নতুন নতুন এলাকায় কৃষক-আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করলো। সেই পর্যায়ে কয়েক জায়গায় জোতদারদের খামার ভেঙে কৃষকরা নিজেদের খামারে ধান নিয়ে গেছে এবং জোতদারদের প্রাপ্য অংশ নিয়ে আসবার জন্য জানিবে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জোতদারের খামার থেকে ধান নিয়ে আসবার সময় মোট ধানের পরিমাণ উল্লেখ করে রসিদ নিয়ে এসেছে। আবার অনেক জায়গায় যেখানে আধিয়াররা প্রথম দিকে ধান কাটেনি এবং অপেক্ষা করছিল, জোতদাররা সমস্ত ধান কেটে নিয়েছে। এমন ঘটনাও আছে যেখানে আধিয়াররা জোতদারের খামারে ধান তুলে নিয়ে এসেছে কিন্তু জোতদার সমস্ত ধান নিজের গোলায় নিয়ে গেছে। ফুলবাড়ী থানার আহ্লাদপুর ইউনিয়নে জোতদারের তে-ভাগা করার দৃষ্টান্তও আছে। জোতদার তে-ভাগার দাবী স্বীকার করতে আধিয়ার জোতদারের খামারে ধান তুলে দিয়েছে। তিনভাগ করে দুভাগ নিয়ে ও আধিয়ারকে এক ভাগ দিয়ে জোতদার বলেছে : 'তে-ভাগা হ'লো।' আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সাফল্য ও জোতদারদের এই সমস্ত অত্যাচার জোতদারদের খামার ভেঙে আধিয়ারদের নিজেদের খামারে ধান নিয়ে যাবার উৎসাহ জুগিয়েছিল। খামার ভাঙার প্রসঙ্গে সেই ইংরেজ সংবাদদাতা লিখেছিলেন : 'জোর করে প্রথার পরিবর্তন করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এটা আইনভঙ্গ কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গ্রামের রীতিনীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বলেন যে একে "লুঠ" বলে বর্ণনা করা অতিরঞ্জন।' আরো বলেছেন, 'যাঁদের মতে আস্থা স্থাপন করা যায় এবং যাঁরা নিরপেক্ষ, তাঁরা ধান জোর করে দখলের সংবাদের পর জোতদারদের পক্ষে পুলিসের হস্তক্ষেপ আইনসঙ্গত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে এ অপরাধ দেওয়ানী এবং কোর্টে তার বিচার হ'তে পারে। এটা ফৌজদারী অপরাধ নয় যে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।' তিনি আরও মন্তব্য করেছেন : 'গুলি ছোঁড়ার আগে পুলিস যা করেছে—তা' তদন্তের বিষয় হওয়া উচিত।' শেষোক্ত এই দুটি মন্তব্যই আইনজ্ঞদের পত্রিকা Calcutta Weekly Notes—২৪শে মার্চের সংখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন এবং সম্পূর্ণ সমর্থন করে লিখেছেন : "Mr. Suhrawardy can not be permitted merely to defend his police force ; when peasants die, men as well as women, braving police bullets, the matter concerns all who care for the province and its harassed

people." অর্থাৎ, 'সুরাবর্দি সাহেব তাঁর পুলিসবাহিনীকে শুধু সমর্থন করবেন তা হ'তে দেওয়া যায় না ; সাহসের সঙ্গে পুলিসের গুলির সম্মুখীন হ'য়ে যখন কৃষক পুরুষ ও নারী প্রাণ দেয়, তখন এই প্রদেশ ও তার নিপীড়িত অধিবাসীদের কথা যারা ভাবে তারা সকলেই এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।'

কয়েক মাস ধরে আন্দোলন চলেছে সুবিস্তৃত এলাকায়। অভিযোগ শোনা যায় কৃষকরা খুনজখম লুঠতরাজ ইত্যাদি করেছে। আমরা এই রকম ঘটনা জানবার চেষ্টা করেছি। ধান (যাতে কৃষকদের অন্তত অর্ধেক অধিকার আছে) "লুঠ" করা ছাড়া জোতদারদের অন্য কোন জিনিষ অধিয়াররা স্পর্শ করেছে বলে কেউ অভিযোগ করেন না। আর জখম, দৈহিক অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা তিনটি অভিযোগ পেয়েছি। বীরগঞ্জে এক বড় জোতদারের বাড়ী বহু আধিয়ার একদিন ঘিরেছিল কিন্তু কোন রকম দৈহিক অত্যাচার করেনি। দ্বিতীয়, বীরগঞ্জ থানার ৭নং ইউনিয়নে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা কতদুর সত্য বলা শক্ত। তৃতীয়, ঠুমনিয়ার উত্তরে ভোলা শেঠ নামে এক জোতদারকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় ও তার বোনকে মারধোর করা হয়। বোনকে মারধোরের খবরটা হয়তো সত্য নয়। জোতদারকে বেঁধে বা ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে হয়তো জানা যাবে যে আগের দিন সেই জোতদার বন্দুক ব্যবহার করেছিল। অভিযোগগুলোকে আমরা সত্য বলেই ধরে নিচ্ছি। আর আন্দোলন যখন চলছিল তখন জোতদারদের সামাজিক বর্জনের চেষ্টা হয়েছিল। কৃষকদের দ্বারা আর কোন দৈহিক অত্যাচারের ঘটনার কথা কেউ উল্লেখ করেন না। জোতদাররা লাঠিয়াল এনেছে, পুলিস ডেকে এনেছে, গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র পুলিসের ঘাঁটি বসিয়েছে, শত শত লোককে ধরিয়ে দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে, বহু পরিবার ধ্বংস হয়েছে, বহুগ্রাম প্রায় জনশূন্য, অন্তত ৩২জন গুলিতে নিহত ও শতাধিক আহত, তার ওপর নানাবিধ দৈহিক অত্যাচার করেছে, কয়েকজন কৃষকের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে—এত ব্যাপক আন্দোলন—কিন্তু কৃষকদের কৃত দৈহিক অত্যাচারের ঐ কটি ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনার কেউ উল্লেখ করেন না। তবুও কি আমরা বিশ্বাস করবো—এই বিরাট আন্দোলন হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিল ?

সশস্ত্র পুলিস গ্রামের মধ্যে ঘাঁটি করে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ওপর অভিযান চালাচ্ছে। বহু আধিয়ার ঘর ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে জোতদার ও তাদের লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামাঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। ইংরেজ 'সংবাদদাতা'র কথাই উদ্ধৃত করে দিই : 'বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার যে সমস্ত এলাকায় পুলিস ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে সেখানেই ত্রাস ও হতবুদ্ধির রাজত্ব।' তিনি আরও লিখেছেন : 'উত্তরবঙ্গের গ্রাম পরিভ্রমণ করা একজন আগন্তুকের পক্ষে অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। নির্বাক, সরল, আদিম অধিবাসীদের দলে দলে দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে, ট্রেনে গরু ছাগলের পালের মত ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কি তাদের ভাগ্য, তারা অনুমানও করতে পারে না—এ সমস্ত দেখতে অস্বস্তি লাগে।' যথেচ্ছ মারধোর, কৃষকদের কাছ থেকে নানা প্রতিষ্ঠানের নাম করে টাকা আদায়, তার ঘর লুঠ করা ও পোড়ানো, এমন কি মেয়েদের উপর অত্যাচারের অভিযোগও আমরা রোজ শুনতে পাচ্ছি। আইন ও শৃঙ্খলার নামে চরম বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের রাজত্ব এই জেলায়।

এই যখন গ্রামের অবস্থা তখন কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা বা অর্ডিন্যান্স চাপিয়ে আমাদের সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণ করে নিয়েছে। চীনে প্রেরিত কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সদস্য ডক্টর বি, কে, বসুকে খানপুরে আহতদের সেবাকাজের জন্য ঢুকতে দেওয়া হ'লো না। 'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা রমেন বন্দোপাধ্যায়, ফটোগ্রাফার আনন্দ পাল ও নিখিল ভারত কৃষক সমিতির সম্পাদক আবদুল্লা রসুলকে খানপুরে গুলিচালনার পর প্রবেশ করতে দেওয়া হব নি। আন্তর্জাতিক যুব-প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে ৯ই মার্চ ঠাকুরগাঁ শহরে সভা করবার প্রথমে অনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতির জন্যে যে আবেদন করা হয় তাতে লেখা ছিল যে কৃষকরা দলে দলে গ্রাম থেকে আসবে। অনুমতি দিয়ে পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দিনাজপুর সহরে ১৬ই মার্চ পুলিশের দমননীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সভা ডাকা হয় তা ঘণ্টা কয়েক আগে অর্ডিন্যান্স জারি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলিকাতা থেকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হ'তে কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন গ্রামের খবর নেবার জন্য। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কলিকাতার Women's College এর অধ্যাপিকা। তাঁদের এক দল তিনজন ছাত্রের সঙ্গে চিরিরবন্দরে গিয়েছিলেন। ছাত্র তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় ও মহিলাগণকে পুলিসের সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বার ঘণ্টার মধ্যে দিনাজপুর জেলা ত্যাগ করবার আদেশ দেওয়া হয়। আর কয়েকজন মহিলা খানপুরের অবস্থা দেখতে যান। ওয়ারেণ্ট না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বালুরঘাট হাজতে রাখা হয়। পরে ঠাকুরগাঁ শহরে গেলে তাঁদের উপব বার ঘণ্টার মধ্যে জেলা ত্যাগ করার আদেশ জারি করা হয়। একদিকে গ্রামে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলেছে, অন্যদিকে বাইরের জগতের কাছে তা গোপন রাখবার জন্যে কর্তৃপক্ষ সমস্ত মৌলিক অধিকার পদদলিত করেছে। সেই ইংরেজ সংবাদদাতা মন্তব্য করেছিলেন 'অনেকে যেমন বিশ্বাস করেন যে কমিউনিস্ট ও যারা উস্কানি দিচ্ছে তাদের জেলে পুরলেই উত্তর বাংলার কৃষক অসন্তোষ দূর হবে, তা হবে না; তার জন্য প্রয়োজন রাজধানীতে আইন তৈরী করা।' তিনি আরও বলেছিলেন: 'সাম্প্রতিক অসন্তোষ সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের যে ব্যবস্থা, তার দ্বারা মূল কারণ দূর করার কোন চেষ্টাই হয়নি।' ন্যায্য দাবী স্বীকার করে আইন করার পরিবর্তে চললো ভয়াবহ দমন-নীতি, সাধারণ কৃষকের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুললো। এ সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা উইক্‌লি নোটস্' ৩রা মাচের সংখ্যায় বলেছেন: 'অ্যাসেম্ব্লি গৃহে সুরাবর্দি সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গণআন্দোলন দমন করবার জন্য অর্ডিন্যান্সগুলিকে প্রয়োগ করা হবে না, সে আশ্বাস নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে এবং ওয়ারেণ্ট-বিনা গ্রেপ্তার করা, বহিষ্কার করে দেওয়া, নির্বিচারে ও শয়তানি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা এবং জনসাধারণের অসন্তোষ মৃদু উপায়ে দূর করার আরও সব ঘটনা ঘটেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই সমস্ত সংবাদ একেবারে প্রকাশ না হতে দেওয়ার দরুণ এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ যথেষ্ট জোরেব সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে না। দিনাজপুরের কর্মরত কৃষকদের এমন কি তাদের নারীদেরও কেন নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হবে? আমরা বিশ্বাস করি না যে এই সমস্ত গরীব লোকেরা খুনে কমিউনিস্ট ছিল যারা কেবলমাত্র মজা দেখবার জন্য নিছক অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এবং 'মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে' পুলিশ থানা আক্রমণ করতে পণ করেছিল।' ঐ সংখ্যাতেই ঐ পত্রিকা আরও লিখেছেন..."হাসান সহীদ—

সুরাবর্দি সাহেব যে মন্ত্রীমণ্ডলীর নেতা যে মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে ক্ষমতা এখন ততটা নেই যতটা পুলিস্ ও আই-সি-এস্ চক্রান্তের হাতে—যাদের কাছে মনে হয় মন্ত্রীমণ্ডলী অন্ততঃ প্রদেশের প্রদেশের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সমস্ত ক্ষমতাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ছেড়ে দিয়েছেন।" তাই তাঁরা শুধু রাজনীতিবিদদের কাছে নয়, আইনজীবীদের কাজেও প্রস্তাব করেছেন ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা-সমিতি গঠন করে তুলবার।

তে-ভাগা আন্দোলনের কি কোন সার্থকতা নেই? আমরা দেখেছি এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতাকে এই জেলায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। চারিদিকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, তখন দিনাজপুর জেলার অধিবাসীরা সাম্প্রদায়িক চিন্তা দূরে পরিহার করেছিল। অবশ্য স্বার্থান্বেষীরা আন্দোলন ভাঙবার জন্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টাই করেছিল কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারের কাজে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়, আজ এই জেলায় আমরা লক্ষ্য করলাম অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ। যে বীরত্বের সঙ্গে নিরস্ত্র কৃষকেরা সশস্ত্র পুলিশ ও জোতদারদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে, তার তুলনা বিরল। কৃষক-মেয়েরা পর্যন্ত পুলিশের বন্দুকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেছে: "শুধু তো গুলি করবে, করো গুলি।" আজ বর্বর পশুশক্তির কাছে তারা যদি পরাজয়ই মানে, সে পরাজয় সাময়িকই হবে।

এ জেলায় কৃষকদের সমর্থনে মধ্যবিত্ত তেমন করে এগিয়ে এলো না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ছিল এতকাল পুরোভাগে। সাম্রাজ্যবাদের জুলুম ও অপপ্রচার সে ভালভাবেই জানে। তবু এ আন্দোলনকে সে মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারলো না। কারুর কারুর আশঙ্কা যে যাদের অল্প জমি আছে ও অন্য কোন সম্বল নেই, তাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে অল্প যাদের জমি আছে এবং আধিতে অন্য কৃষককে চাষ করতে দেয়, তারা প্রায়ই আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিজেদের তে-ভাগা কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, সেই কমিটি অবস্থাবিশেষে আপোষ করেছে। ক্ষেত-মজুরেরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। শুধু প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে বড় বড় জোতদারেরা। বর্তমান দাবী যে ন্যায্য সে কথা বলা বাহুল্য। অতি ক্ষুদ্র এ দাবী। কংগ্রেস জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ কামনা করে এবং স্বীকার করে যে চাষীই জমির মালিক হওয়া উচিত। মোসলেম লীগও জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধে। আমাদের দেশের ওপর ইংরেজের জোর করে চাপানো গোড়া থেকেই পঙ্গু যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে ভেঙ্গে ফেলবার দাবী মধ্যবিত্ত বার বার জানিয়েছে। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে জনগণের উন্নত জীবনের আশা স্বপ্নমাত্র। তবু, এই সামান্য দাবীর ভিত্তিতে কৃষকরা যখন সংগঠিত হয়েছে, অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তখন মধ্যবিত্ত তাদের অভিনন্দন করতে, সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, "আন্দোলনের দাবী ন্যায্য হলেও আন্দোলনের এটা উপযুক্ত সময় কিনা। দেশের নেতারা যখন ইংরেজের সঙ্গে আপোষে স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছেন এবং দেশবাসীকে বলেছেন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখতে তখন এরকম আন্দোলন সুরু করা উচিত কিনা।" এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। সাম্প্রতিক ইতিহাস একটু আলোচনা করা যাক। আমরা দেখেছি যে ১৯৪৫এর নভেম্বর থেকে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয়েছে। ছাত্র, শ্রমিক, সৈন্য, পুলিশ, কেরাণী এমনকি নৌসেনাদের মধ্যেও বিপুল আলোড়ন এসেছে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্য জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের পথে এগিয়ে এসেছে। এমন সময়ে এলেন ক্যাবিনেট মিশন। বহু আলোচনার পর তাঁদের 'পরিকল্পনা দিলেন। মধ্যকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। শুরু হলো কলকাতার নির্মম হত্যাকাণ্ড। তার ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা গেল বোম্বাইতে ঢাকাতে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায়। তারপর নোয়াখালি ও বিহার। দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারী বেরুলো এটলীর ঘোষণা। পাঞ্জাব নরকে পরিণত হ'লো। তারপর সেই সর্বনাশা দাঙ্গা চললো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কলিকাতায়, বোম্বাইতে, কানপুরে, রাঁচীতে। এখনও তার শেষ নেই। কূটনৈতিক চাল দিয়ে ইংরেজ এখন রঙ্গমঞ্চে অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে। আর হিন্দু মনে করছে মুসলমান তার প্রধান শত্রু, মুসলমান মনে করছে হিন্দু। মুসলমান ভাবছে হিন্দুকে আমি যত ধ্বংস করতে পারবো, ততই আমার পাকিস্তান কায়েম হবে। হিন্দু মনে করছে মুসলমানকে ধ্বংস করেই অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা, নেহাৎ পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করতে পারবো। দাঙ্গার পর দাঙ্গা, আবার দাঙ্গা। এর শেষ কোথায়? ১০ কোটি মুসলমানকে দমন করা বা ৩০ কোটি হিন্দুকে খর্ব করা—কোনটাই বাস্তব দিক থেকে দেখতে গেলে সম্ভব নয়। এর একমাত্র পরিণতি—সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। অথচ ইংরেজের সৈন্য, ইংরেজের ব্যবসা—সবই সংরক্ষিত রইলো। আজ যেন ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষ আমরা আর তেমন করে অনুভব করি না। প্রায় দুশো বছর ইংরেজ আমাদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে, জাতির স্বাভাবিক বিকাশ বলপূর্বক রুদ্ধ করে দিয়ে সবদিক থেকে দেশকে পঙ্গু করে রেখেছে, সে সব কথা এবং জালিয়ানওয়ালা বাগ ও ঐরকম সব ঘটনার স্মৃতি যেন গত এক বছরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় ইংরেজ বলেছে :

"কিন্তু যদি দেখা যায় যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে (১৯৪৮এর জুন) পূর্ণ প্রতিনিধি মূলক পরিষদের দ্বারা গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি, তা'হলে সম্রাটের গভর্নমেণ্টকে বিবেচনা করতে হবে কাকে ব্রিটিশভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে—সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারতের জন্য কোনরকম কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে, না, কয়েক এলাকায় বর্তমান প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলোকে অথবা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও ভারতীয় জনগণের সবচেয়ে কল্যাণকর যে ভাবে মনে হবে সেই ভাবে।"

তার অর্থ কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ যদি না মিলতে পারে তা'হলে ইংরেজ ভারতবর্ষের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবে, ইচ্ছামত ভারতকে অখণ্ড বা বহু টুকরোয় ভাগ করতে পারবে। ইংরেজ দেশীয় রাজ্যদের আশ্বাস দিয়ে বলেছে "সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নয় যে সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্রিটিশ ভারতের কোন গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে যায়।" আমরা শুনছি যে দেশীয় রাজ্য পৃথকভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে। ভারতবর্ষের মোট জন সংখ্যার এক চতুর্থাংশ এই সব দেশীয় রাজ্যে। ভারতের চারিদিকে এই সব দেশীয় রাজ্য ছড়ানো—বিশেষ করে উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত ও পূবে উড়িষ্যা পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যের মালা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে চলে গেছে। তা'ছাড়া ভারতবর্ষের একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর পূবেও দেশীয় রাজ্য রয়েছে। এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যে এখনও

মধ্যযুগের অবসান হয়নি। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আওতায় এদের স্পর্ধাও এত বেশী যে গত বছর কংগ্রেসের সভাপতি জহরলাল নেহরুকে পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল, এখনও নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতিকে বন্দী করে রেখেছে। এরা যে ইংরেজের সম্পূর্ণ তাঁবেদার থেকে নিজ নিজ এলাকায় জনগণের দাবী দমন করে রাখবে সেই সূচনাই দেখা যাচ্ছে। নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের গত বার্ষিক অধিবেশনে আমরা জহরলাল নেহরুর কাছ থেকে শুনলাম "বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষের যতটা সম্ভব স্বাধীন করা—অর্ধেক বা তিন-চতুর্থাংশ—তারপর বাকী অংশের স্বাধীনতার প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা হবে। ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সক্রিয় ও উল্লসিত করে তুলেছে। ১৬ই মের পরিকল্পিত রাষ্ট্র গঠন পরিষদকে অগ্রাহ্য করে আমাদের আত্মঘাতী লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের জনগণের ভাগ্য নিয়ে ইংরেজ যা খুশি তাই করতে পারবে। তার সামরিক ঘাঁটি ও কায়েমী স্বার্থ সবই বজায় রাখবার চক্রান্ত করছে যাতে তার বানিজ্যিক শোষণ অব্যাহত থাকে ও দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবান্বিত করতে পারে। আমাদের প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধ, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও কায়েমী স্বার্থ দেশের বিপ্লবী শক্তিকে দুর্বল ও ইংরেজকে শক্তিমান করে তুলবে না? খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ইংরেজের প্রভাবান্বিত দুর্বল কতকগুলি ভারতীয় গভর্ণমেন্টের শাসন—এই স্বাধীনতার স্বপ্নই কি আমরা এতদিন দেখেছি? এরই জন্যে এত আত্মদান, এত সংগ্রাম?

ভারতবর্ষের বাইরেও ইংলণ্ড ও আমেরিকা সুকৌশলে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। জার্মানীর এক অংশে, গ্রীসে, তুর্কীতে, চীনে, জাপানে পৃথিবীর বিরাট অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ভারতবর্ষকে নিজেদের কবলে এনে সোভিয়েট রাশিয়াকে চারিদিকে থেকে ঘিরে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র আঁটছে।

আজ ঘরে-বাইরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে কুটিল চক্রান্ত, তাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। উপায় সম্বন্ধেই আমাদের ভাল করে বিবেচনা করতে হবে, নিজেদের বুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রদায়িক আওয়াজ হিন্দু-মুসলমানকে পৃথক করে দিচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক সম-স্বার্থবোধ তাদের আবার মিলন করে দিচ্ছে। গত বছর অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত কলিকাতায় দাঙ্গা চলেছিল কিন্তু লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সেই কলিকাতায় আবার ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে একজোটে ধর্মঘটে নেমেছে, অর্থনৈতিক সংগ্রামে হাতে হাত মিলিয়েছে। ভুলে গেছে তারা দু'মাস আগেকার অতি-তিক্ত অভিজ্ঞতা। নোয়াখালি ও বিহারের জের না মিটতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান কৃষক মিলিত অভিযান শুরু করেছে তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্যে। এই আন্দোলনই আবার হিন্দু-মুসলমান জোতদারদের এক জোট করে দিয়েছিল। প্রায়ই দেখা যায় শাসক ও শোষকেরা সত্যিকার যে সমস্যা—ভাত, কাপড়, শিক্ষা ও স্বাস্থের সমস্যা—এড়াবার জন্যে মিথ্যা সমস্যা যথা লীগ পরিকল্পিত পাকিস্থান ও হিন্দু পরিকল্পিত বঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভাগ জনগনের সামনে ধরেন। জনগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন ও নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী-অঞ্চলের সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষকে ইংরেজের কবলমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র করে গড়ে তোলার চেষ্টা

করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। সে ভারতবর্ষে প্রতিটি সম্প্রদায় তার স্বকীয় বৈশিষ্ট বজায় রাখতে পারবে, প্রতিটি ব্যক্তি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আত্ম-শক্তি বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা দেখছি মিথ্যা সমস্তার সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলমানের আত্মঘাতী লড়াই চলছে। দাঙ্গা করে যদি নিজেদের শক্তি খর্ব করা হয় আর কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন যা হিন্দু-মুসলমানকে প্রকৃতই পরস্পরের কাছে টেনে আনছে—তাকে যদি বে-আইনী ঘোষণা করে অথবা গুলি চালিয়ে দমিয়ে দেওয়া হয়, তা'হলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া আর কোন সম্ভাবনা নেই। যে ইংরেজ মিশর থেকে এখনও সৈন্স সরায়নি, সৈন্স সরাবার দাবী শুনলে মিশরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সৈন্য সরিয়ে নেয়, যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সারা পৃথিবীতে ষড়যন্ত্র আঁটছে, সেই ইংরেজ ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীকে মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সম্পূর্ণ মুক্তি দান করে চলে যাবে!

বিভেদ নয়, ঐক্যই হচ্ছে স্বাধীনতার পথ, সমৃদ্ধির পথ, সংস্কৃতির পথ। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে অনেকেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তোলা সম্বন্ধে হতাশ হন। কিন্তু সত্যিই গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে, ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মধ্যে এই ঐক্য গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত কেরাণী ও শিক্ষকেরাও হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ভুলে একজোটে অর্থনৈতিক সংগ্রামে নামছেন। অভাবের তাড়না সাম্প্রদায়িকতাবোধ দূর করে দিচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন বাস্তব সত্য করে তুলছে। দেশের শতকরা ৯৫ জনই তো অভাবের তাড়নায় জর্জরিত। মিলনের সেই ভিত্তিকেই দৃঢ় প্রশস্ত করে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক আওয়াজকে ডুবিয়ে দিতে হবে অর্থনৈতিক সংগ্রামের আওয়াজ তুলে। কৃষক, মজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র ও যুবক—এই ত্রিশক্তির মিলন হলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন, সুখী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব। আজ মধ্যবিত্তের সামনেও নিদারুণ সমস্তা। লাখ লাখ যুবক বেকার সমস্তার সম্মুখীন হচ্ছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাহুগ্রস্ত ভারতবর্ষে সে সমস্তার কখনো সমাধান হবে না, মধ্যবিত্ত জীবনের বর্তমান হতাশা ও আনন্দহীনতা একটুও কমবে না। আজ কৃষক শ্রমিক কেরাণী ও শিক্ষকদের আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। সে সূত্র—অর্থনৈতিক সংকট। এ সমস্ত আন্দোলন একই শত্রুর বিরুদ্ধে, মূল লক্ষ্যও এক। শত্রু—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর; লক্ষ্য—এমন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা যে ব্যবস্থায় বিদেশী ও দেশী মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণকে শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত আন্দোলনের বিস্তৃতি ও সাফল্যের উপর নির্ভর করছে ভারতের ভাগ্য। একে ভাঙবার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার অস্ত্র হানছে—দাঙ্গা। আর সঙ্গে সঙ্গে তার আমলাতন্ত্র কঠোর দমননীতি চালিয়ে সমস্ত গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, নানা অর্ডিন্যান্স জারি করে মানুষের গণতান্ত্রিক সমস্ত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আমলারা আজ যে কোন ব্যক্তিকে কৈফিয়ৎ না দিয়েই জেলে পুরে রাখতে পারে। নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী পুলিস, আই, সি, এস্, ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পন করছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে, জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে সংগঠিত করে, দাঙ্গা ও দমননীতির প্রতিরোধ করে আমরা প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে পারি।

অন্য কোন পথ নেই। কৃষক ও মজুর—দেশের সবচেয়ে বড় দুটো শক্তির সাথে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার চেষ্টায় যোগ দিতে পাবলে সামনে আছে মহাসম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। প্রদেশে প্রদেশে ও কাশ্মীর থেকে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে এক বিরাট অভিযান চলেছে, মুক্তিকামী অগণিত নরনারীর মিছিল! বহু বাধা বহু ত্যাগ স্বীকার করে এরা এগিয়ে চলেছে। এদের উপর লাঠি ও গুলি চালনা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত কি আজ ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারবে না? বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে শোষণমুক্ত স্বাধীন শক্তিশালী দেশসৃষ্টির চেষ্টায় কি সহযোগিতা করবে না? কৃষক ও মজুরেরা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভুলে সব কিছু এমন কি জীবন পর্যন্ত দিয়ে ঐক্য গড়ে তুলছে—যে ঐক্যেব পথে আছে স্বাধীনতা শক্তি, সমৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত কোন্ পথ বেছে নেবে?

সুনীতি কুমার ঘোষ

মুদ্রা-রাক্ষস

চৈত্র সংখ্যার পরিচয়ে পুস্তকপরিচয় উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন:

> "প্রকাশকরা মনে রাখবেন বাঙালী পাঠক প্রায় নিম্নমধ্যবিত্তের লোক, বড় দুরবস্থা আমাদের। বাঙলা বইয়ের বহুল প্রচার চাই বলেই, চাই সস্তায় বই।"

এই প্রসঙ্গটিকেই এই সংখ্যায় আমরা আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

সস্তায় বই যে কেবল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যেই চাই তা নয়, তার চেয়েও 'নিম্ন' শ্রেণীর জন্যেও চাই! নূতন শাসনতন্ত্রেব রূপ শেষ পর্যন্ত যাই হোক, বাংলা বিভক্ত হোক কি যুক্ত থাকুক, স্বতন্ত্র হোক কি অখণ্ড ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকুক, হিন্দুরাজত্ব হোক কি মুসলমান-রাজত্ব হোক, জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। এই নূতন-শিক্ষিতদের জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তির সহজ উপায় যদি আমরা করে দিতে না পারি তবে এই শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা অনেকখানিই অর্থহীন ও নিষ্ফল হতে বাধ্য। এই নবশিক্ষিতশ্রেণীর আয়ের উপযোগী মূল্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রচারব্যবস্থা যদি দেশে না হয় তবে তাদের শিক্ষা আবার অশিক্ষায় পরিণত হতে ক'দিন লাগবে?

বই কিনবার ও পড়বার ইচ্ছা যে ক্রমশই বাড়তে থাকবে, গত কয়েক বৎসরেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যুদ্ধকালে ব্যবসা করে যাঁরা ধনী হয়েছেন তাঁদের যে-কোনো উপায়ে নিজেদের সংস্কৃতিমান্ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টার ফলেই যে বইয়ের এই চাহিদাবৃদ্ধি হয়েছে তা নয়; অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রচনাবলীর রেক্সিনমোড়া সেট বসবার ঘরে রাখা ফ্যাসান হলেও, সর্বসাধারণের মনে পড়বার জানবার যে ঔৎসুক্য গত কয়েক বৎসরে আশ্চর্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে, আসলে এ তারই ফল। বিনা দ্বিধায়

যাঁরা টাকা খরচ করতে পারেন গত কয়েক বৎসরে তাঁরাই যে কেবল বই কিনেছেন তা নয়, অন্যদিকে খরচ যাঁদের খুব সন্তর্পণে বাঁচিয়ে করতে হয়, গত কয়েক বৎসরে অধিকাংশ বই হয়ত দেখা যাবে তাঁরাই কিনেছেন। তাই, কাগজের যখন কোনো অভাব ছিল না, দাম শস্তা ছিল, তখন যত বই বেরিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বই বেরিয়েছে পেপার-কণ্ট্রোলের গত কয়েক বৎসরে, নূতন নূতন প্রকাশন ভবন দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে।

কিন্তু বই শস্তা হয়নি। ভবিষ্যতে শস্তা হবার পথও রুদ্ধ হতে চলেছে। কি ভাবে, পরবর্তী নিবন্ধে তার আলোচনা করব।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রসঙ্গে এ-কথাও বলেছেন :

"বাঙালী পাঠকের নিকট এসব গ্রন্থের দাম কি বেশি ঠেকছে? তাঁরাই এরূপ [বিলাতী] বইর দাম ৬ শিলিং ছেড়ে ১০॥ শিলিং দেখলেও মনে করেন তা ন্যায্য।"

এর মধ্যে অনেকখানি আলোচনা অনুক্ত রয়ে গিয়েছে।

বিলাতে কোন নূতন বই যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রথম তার দাম লাইব্রেরী ও অধিক আয়ের লোকের কিনবার মত উচ্চ মূল্যেই প্রকাশিত হয় বটে। কিন্তু যে-বই দশজনের পড়বার উপযোগী, দশজনের পড়া দরকার, সর্বসাধারণের ক্রয়সাধ্য মূল্যে তার সস্তা সংস্করণ বেরতেও খুব বেশি বিলম্ব হয় না। অনেক দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই, একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই অনেকের সেটি মনে পড়বে। বার্নার্ড শ'র The Intelligent Woman's Guide যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার দাম, যতদূর মনে পড়ে, ছিল ২১ শিলিং (কিছু ইতরবিশেষ হলেও বক্তব্যের ক্ষতি হবে না; এমন কি এই বিশেষ দৃষ্টান্তটিতে অন্য কিছু ভুল থাকলেও না, কারণ এরকম দৃষ্টান্ত বহু মিলবে); পরে ৫ শিলিং-এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; আরো পরে পেলিকান সিরিজে দুই খণ্ডে বইটি মুদ্রিত হয়, দুখণ্ডের মোট দাম হয় এক শিলিং বা এগারো আনা।—এ রকম আরো অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে, বস্তুত এটি বিলাতী প্রকাশকদের একটি সুপরিচিত রীতি—লেখক ও প্রকাশক প্রথমে অধিক আয়ের লোকের কাছে অধিক লাভ সংগ্রহ ক'রে, পরে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন; তাতে প্রতি কাজেতে সামান্য লাভ করেও, একদিকে তাঁদেরও যথেষ্ট লাভ থাকে অন্যদিকে সর্বজনের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্তির পথে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের পথেও কোনো বাধা হয় না! সুলভ সংস্করণ প্রকাশে Penguin Books এর সার্থকতার কথা এখন সর্বজনবিদিত—তার পূর্বেও Everyman Series, Benn Series প্রভৃতির কথাও সকলে জানেন—এ তো গেল এক একটি স্বতন্ত্র প্রকাশক-কোম্পানির চেষ্টার কথা; অনেক প্রকাশকের একত্র চেষ্টায় সুলভে বই প্রকাশের কথা এখন উল্লেখ করছি বাঙালী প্রকাশকদের জন্য—তাঁদের মধ্যে এ-রকম সহযোগিতার কথা বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল বুক্ লীগের মুখপত্র ব্রিটিশ বুক্ নিউজের আধুনিকতম সংখ্যায় "The British Publishers' Guild" নামে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছে তা থেকে এর পরিচয় কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ১৯০০ সালে এই Guild প্রতিষ্ঠিত হয়; Jonathan Cape, Casell, Chatto & Windus, Dent, Fater & Fater, Harrap,

Heinemann, Murray এই কয়টি সুবিখ্যাত প্রকাশক কোম্পানি এর সূচনা করেন, পরে Allen & Unwin, Constable, Methuen, Edward Arnold, Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman Green প্রভৃতি আরো আঠারোটি বিখ্যাত প্রকাশক কোম্পানি এতে যোগ দিয়েছেন। বিবরণে লিখিত হয়েছে :

> ..."Those who conceived the idea of a Publishers' Guild were well informed of the economic condition of Britain; they must also have been aware of the desire of an ever increasing number of people to read good books......It was known by the leading publishers that there were relatively few people who could afford 6s, 7s. 6d or 10s. 6d. which is the average cost of a book on its first appearance in the bookshops. What could be done to provide for the large public who wanted to read and possess good books but who could not do so? It was decided, after the ordinary cloth-bound edition had been offered to the libraries and 'higher income group', to re-issue selected titles in simple format with paper covers at an average price of one shilling...The emphasis is on contemporary or, at least, fairly recent literature. So far 840 titles have appearad under the Guild imprint. Fiction, biography, travel and religion are all catered for.

যুদ্ধের সময় এই Guild সর্বসাধারণের জন্য পুস্তক প্রকাশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধরতদের জন্য Service Edition প্রকাশ করতে থাকেন; এখন আবার পূর্ণোদ্যমে তাঁদের কাজ শুরু হয়েছে—Somerset Maugham, G. K. Chesterton, J. B. Priestley, D. H. Lawrence প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা লেখকের বই এই Guild এক শিলিং দামে প্রকাশ করেছেন।

আমাদের দেশে হিতবাদী বসুমতী প্রভৃতি এক সময়ে সুলভ সাহিত্য প্রচার করে দরিদ্র পাঠকের প্রভূত উপকার করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এক সময়ে বারো টাকায় পাওয়া যেত—কালীপ্রসন্ন সিংহের বিরাটাকার পাঁচখণ্ডের মহাভারত (১০″×৭½″ আকারের প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা) ষোল টাকায় অল্প কিছুদিন আগেও পাওয়া গিয়েছে।—বর্তমানে আমাদের দেশে এমন কোন কোন প্রকাশক কোম্পানীর উদ্ভব হয়েছে লাভই যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, নিজেদের অন্ন সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিক্ষা-বিস্তার, নানা বিষয়ে আধুনিক চিন্তার প্রসারের কল্পনায়ও যাঁরা অনুপ্রাণিত। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের আনুকূল্য লাভ করে গত তিন বৎসর যাবৎ যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশ করেছেন তার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন বৎসরে ছাপার দাম ও অন্যান্য খরচ অনেক বেড়ে গেলেও, তাঁরা এই গ্রন্থমালায় পৃষ্ঠাসংখ্যা কমাননি, দামও বাড়াননি। অন্যান্য অনেক বইয়ের দাম অল্পবিস্তর বাড়াতে হলেও,

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দামও (প্রতি খণ্ড, সচিত্র, রয়াল সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা—সাধারণ ডবল ক্রাউন আকারে ছাপা হলে যা প্রায় হাজার বারো শ পৃষ্ঠা দাঁড়াত) বিশ্বভারতী ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় সামান্যই বাড়িয়েছেন—সাড়ে চার টাকা থেকে ক্রমশ বর্ধিত হযে এখন দাঁড়িয়েছে ছ টাকা।

পূর্বে যে বসুমতী হিতবাদী প্রভৃতির কথা বলেছি, প্রেসমালিক-সমিতির নববিধানে সেই সব সুলভ সংস্করণ একান্তই আমাদের অনেক অতীত সুখের কাহিনীর অন্ততমরূপে পরিণত হতে চলেছে। চাহিদা যদি অনেক গুণ বেড়েও যায় তাহলেও এই সুলভ সংস্করণ আর প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।—যে সময়ে পড়বার জানবার বই কিনবার ইচ্ছা দেশে প্রবল হতে চলেছে ঠিক সেই সময়েই এই অবস্থা। কি হবে শিক্ষাবিস্তারের নানা পরিকল্পনা রচনা ক'রে, কোটি কোটি টাকা শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়ের দাবি করে, যদি দেশ থেকে বই উঠে যায় ?

"সংস্কৃতির সংকট"

এই অবস্থাকে যুগান্তর-সম্পাদক "সংস্কৃতির সংকট" বলে অভিহিত করেছেন এবং স্টেটসম্যান পত্রে এরই নাম দেওয়া হয়েছে "War on culture"। নানা দিকে পুস্তক-প্রকাশের ব্যয়বাহুল্যের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ; চরম দুর্দশার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পূরণ করে দিয়েছেন কলিকাতার প্রেস-মালিক-সমিতি, এক প্রস্তাবে ছাপার দাম দুরারোহ উচ্চশিখরে তুলে দিয়েছেন, বজ্রমুষ্টির এক আঘাতে লেখক প্রকাশক পাঠক সকলকে এক সঙ্গে ধরাশায়ী করেছেন।

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় যুগান্তরে (২৫ ফাল্গুন ১৩৫৩) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু "বাংলা ছাপা ও বাংলা সাহিত্য" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে

> "কলকাতার প্রেস-সত্ত্বাধিকারী সংঘ তাঁদের ১১ জানুয়ারির সভায় যে প্রতিজ্ঞাবলী গ্রহণ করেছেন তাকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মনে হয় যেন বাংলা সাহিত্যকে ধ্বংস করাই তাঁদের লক্ষ্য",

এবং তাঁদের নবনির্ধারিত মুদ্রণমূল্য * যে কতদূর অযৌক্তিক, বিশেষত অধিকাংশ ক্ষেত্রে

---

* প্রেস-মালিক-সমিতির মুদ্রিত মূল্যতালিকা থেকে নূতন হারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথম হাজার, প্রতি ফর্মা। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী পাইকা অক্ষর "Straight Forward" ৫২৲ "Complicated" অর্থাৎ অন্তরকম হরফ বা ব্লক থাকলে ৬০৲, গণিতের বই হলে ৭৪৲ ; ঐ স্মলপাইকা অক্ষরে যথাক্রমে ৬০৲, ৬৮৲ ও ৮০৲ ৮৮৲ , ডবলক্রাউন আটপেজী পাইকা ৫৬৲ ও ৬৪৲ স্মলপাইকা ৬৪৲ ও ৭২৲ ; ডবলডিমাই ষোলপেজী পাইকা ৬০৲ ও ৬৭৲, স্মলপাইকা ৬৭৲ ও ৭৫৲।

এই সুলভ দরে তাঁরা অনুগ্রহ করে ছেপে দেবেন ছাপা কপি থাকলেই ; হাতে লেখা কপি হলে শতকরা আরো দশটাকা ট্যাক্স দিতে হবে।—কালো কালি ছাড়া অন্ত কালিতে ছাপলে অবশ্য এ-দর আর চলবে না, এবং লেখককে যদি প্রুফে লেখার কোন পরিবর্তনাদি করতে হয় তো প্রতি লাইনে তাঁকে দু আনা জরিমানা দিতে হবে। প্রেস থেকে যদি একটি প্রুফ দয়া করে দেখে দেওয়া হয় (নাও দেওয়া হতে পারে, দিলেও আশ্বস্ত হবার কারণ নেই, প্রেসের প্রুফরিডারদের যোগ্যতা সাধারণত অধিক নয়) তাহলে আর দুটি মাত্র প্রকাশক বা লেখকের দেখবার অধিকার থাকবে—অবশ্য ভুল সংশোধন করে দিলেও যে-ক্ষেত্রে প্রেসের লোক ভুল ঠিকমত সংশোধন করেন না, সে ক্ষেত্রেও ঐ দুটি প্রুফেই কাজ চালাতে হবে কিনা,

বাংলা ছাপাখানার সর্বতোমুখী অপটুতার কথা বিবেচনা করলে (এই অপটুতার বিষয় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন), তা প্রমাণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এই দাম দিয়ে বই ছাপালে তার দাম যেরূপ বাড়াতে হবে তাতে বই বিক্রি করার সম্ভাবনা নেই; যাঁর বই হয়ত বর্তমানে খুব বেশি দামেও বিক্রি হতে পারে সেই রবীন্দ্রনাথের পুস্তকপ্রকাশ-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগান্তরে (২৩ মার্চ ১৯৪৭) জানিয়েছেন:

"[বইয়ের দাম] আর বাড়াইলে তাহা সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাবহির্ভূত হইবে। এইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যদি এইরূপ বর্ধিত দর দিতে হয় তবে আমরা বরং রবীন্দ্রনাথের বই ছাপানোও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিব কিন্তু কোনোক্রমেই এরূপ দরে বই ছাপাইব না। রবীন্দ্রনাথের বই হয়ত অধিকমূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ক্রয় সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হউক এরূপ কোন ব্যবস্থায় আমরা যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি না।"

যুগান্তর-সম্পাদক এ সম্বন্ধে "সংস্কৃতির সংকট" প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করে বলেছেন,

"বাংলাদেশে অনেক কিছু না থাকার মধ্যেই ছিল একটা জিনিস—এদেশে একটা প্রাণবান ক্রমবর্ধনশীল সাহিত্য ছিল—নিত্য-নূতন গল্প, উপন্যাস ও কবিতাগ্রন্থ বাহির হইত—মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক রকমারি পত্রিকা বাহির হইত; সবই যে খুব ভালো বা উচ্চাঙ্গের জিনিষ হইত তা নয়, কিন্তু তাহাতে সমগ্রভাবে বাঙালীর মন ও মননশীলতা যে একটা সজীব অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে তাহা বোঝা যাইত।... যে হারে আজ ছাপার দাম বাড়িয়াছে তাহা দিয়া বই ছাপাইয়া এবং বিজ্ঞাপন দিয়া বই ছাপাইতে হইলে বইয়ের দাম সম্ভাব্য হারের চতুর্গুণ না করিলে উপায় নাই—আর তাহা করিলে ক্রেতা আজিকার বাজারে বই কিনিতে পারেন না...তাহাতে

এবং প্রেসের দোষে ভুল-ছাপা বা কুমুদ্রিত ফর্মাই প্রকাশককে নিতে বাধ্য করা হবে কিনা, এবিষয়ে ছাপাখানা-মালিক-সমিতি নীরব।

১৯৩৯ সালের দর সম্বন্ধে ভালো প্রেসেই সন্ধান নিয়ে জেনেছি—এই প্রেসে একটি সুবিখ্যাত রচনাবলীর অধিকাংশ খণ্ড ছাপা হয়েছে—ডবলক্রাউন প্রথম হাজার প্রতি ফর্মা পাইকা স্মলপাইকা ১০৲ ১২৲; ডিমাই ৮৲ ১০৲; ডবলডিমাই ১৬৲ ২০৲; রয়াল সাইজের পূর্বোক্ত রচনাবলীর ছাপার দর তখন ছিল প্রতি ফর্মা ৮৲।

পূর্বনিবন্ধে বলেছি, "চাহিদা যদি অনেকগুণ বেড়েও যায় তাহলেও সুলভ সংস্করণ আর প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।" সুলভ সংস্করণ প্রকাশের অন্যতম প্রধান উপায়, অধিকসংখ্যায় বই ছাপানো; কাগজ ও দপ্তরী খরচ বেশি সংখ্যায় বই ছাপালে অনুপাতে কমে না, কিন্তু ছাপাখরচ কমে; তারই গড়পড়তায় বইয়ের দাম কম রাখা সম্ভব হয়। আগে বাংলা ছাপাখানায় দ্বিতীয় থেকে প্রতি ফর্মা প্রতি হাজার দাম দিতে হত ২৲ ৩৲ করে এখন সমিতি দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন—পরবর্তী ১০০০, তিন হাজার পর্যন্ত এই অনুপাতেই চলবে, কমবে না—ডিমাই ১০৲, রয়্যাল ১১৲, ডবলক্রাউন ১২৲, ডবলডিমাই ১৫৲। (লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই দর ১৯৩৯ সালের প্রথম হাজারের দরের সমান বা কিঞ্চিন্ন্যূন)। কাজেই অনিশ্চিত বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে যে কেউ বেশি সংখ্যায় বই ছাপাতে প্রস্তুত হবেন সে পথও বন্ধ হল।

একদিকে যেমন বইয়ের ব্যবসা মারা যাইবার মত হইয়াছে তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবার মত হইয়াছে।...

আসলে এই যে বই ছাপার হার বৃদ্ধি, ইহা ন্যায়সংগতও নয় স্বাভাবিকও নয়। ছাপাখানাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক আয় ও ব্যয়ের অনুপাত করিয়া দেখিলে এ কথা কি বলা যায় যে, তাঁহারা নিছক ব্যয়বৃদ্ধির খাতিরেই ছাপার মূল্যহার এতটা বাড়াইয়া দিয়াছেন ?...এই বৃদ্ধির পশ্চাতে যে মোটা মুনাফা কামাইবার মনোভাব নিহিত আছে, ইহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।..."

ছাপাখানা-মালিক-সমিতি এ যাবৎ এ সকল আলোচনার কোনোই উত্তর দেননি (আসলে নিরুত্তর থেকে সমিতির সম্পাদক অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে 'যুগান্তরে' যে দুটি চিঠি লিখেছেন (৩০ বৈশাখ ও ১১ জ্যৈষ্ঠ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (২ জ্যৈষ্ঠ) ও 'মুদ্রারাক্ষস' (৪ জ্যৈষ্ঠ), এবং শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (২১ জ্যৈষ্ঠ) তার সমুচিত উত্তর দিয়েছেন ; কেবল স্টেটসম্যান পত্রে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু যে চিঠি লেখেন (৩০ এপ্রিল) তার একটি উত্তর স্টেটসম্যানে (১৩ মে) ছাপাখানামালিক-সমিতির সম্পাদক দিয়েছেন। অন্য উত্তরের অভাবে, এই চিঠিতে তিনি যা বলেছেন তা অবলম্বন করেই দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

১। তিনি বলেন যে, নূতন মেসিনের দাম পাঁচ হাজার থেকে ৩১,০০০৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে ইত্যাদি। (অর্থাৎ মেসিনের দাম বৃদ্ধিই ছাপার দর বৃদ্ধির কারণ।)

তাঁর সমিতিভুক্ত কটি ছাপাখানা নূতন মেসিন এই ক'বছরে কিনেছেন তা আমরা জানতে পারি কি ? তার সংখ্যা, সমিতির সদস্য সংখ্যা অনুপাতে খুবই নগণ্য বলে আমরা অবস্থাবিচারে অনুমান করি; সেই কটি প্রেসের হয়ত দর বাড়াবার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু অন্য সদস্যগণের, প্রাগৈতিহাসিক মেসিন নিয়ে এখনো যাঁরা কাজ চালাচ্ছেন, দর হঠাৎ বেড়ে যায় কেন ?

২। ছাপাখানামালিক-সমিতির সম্পাদক আরও বলেন যে, কর্মীদের বেতন ছাড়াও বর্ধিতমূল্য ভাতা, বোনাস প্রভৃতি দিতে হয়, বেতন ইত্যাদি হিসাবে মোট চারগুণ থেকে ছ'গুণ খরচ বেড়ে গিয়েছে। অতএব ইত্যাদি।

প্রেসকর্মীদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন কিছুকাল ধরেই চলে আসছে। ১৯৪৬ আগস্ট মাসে প্রেস-কর্মীগণ বেতনবৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করবেন কথা ছিল—এই প্রসঙ্গে লেবর-কমিশনার বিভিন্ন স্তরের প্রেস-কর্মীদের বেতন প্রভৃতির একটি হার নির্দিষ্ট করে সব প্রেসকে সেটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, যাতে ধর্মঘটের কথা আর না ওঠে। লেবার-কমিশনার নির্দিষ্ট এই হার ১৯৩৯ সালের বেতন-হারের চার থেকে ছ'গুণ তা আমরা বলতে পারব না; তবে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যায়—

(ক) ছাপার দাম প্রসঙ্গে ছাপাখানামালিক-সমিতির সম্পাদক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত পূর্বোক্ত পত্রে বলেছেন—

"...Some authors and publishers feel inconvenienced. That is not because the rates are high, but because they have been accustomed to smooth sailing."

একথা তো ছাপাখানা-মালিকদের বেলায়ও বেশ খাটে, "authors and publishers"-এর বদলে "printers" এবং "high"এর বদলে 'low' বসিয়ে দিলে ; এতদিন তাঁরা প্রেস-কর্মীদের মধ্যে অভাবজনিত "Unhealthy rate-cutting"এর ফলে, তাঁদের যতটা কম বেতন দিয়ে পারেন তাই দিচ্ছিলেন, এখন বেশি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। লেবর-কমিশনারের নির্দিষ্ট বেতন-তালিকা নীচে দেওয়া গেল—

১। কম্পোজিটর—৩৫—৫।২—৬০ (Efficiency Bar)—১০।২—১০০ (E. B.)—১০।২—১২০

২। ডিস্ট্রীবিউটর—৩২—৪।২—৬০

৩। মেশিনম্যান—৩৫—৫।২—৬০ (E. B.)—৭॥০।২—৭৫ (E. B.)—৮০—১০।২—১০০

৪। ইঙ্কম্যান—২৫—৪।২—৪৫ (E. B)—৪৫—৫।২—৬৫

৫। মনোটাইপ কাস্টার—৩৫—৪।২—৫৫ (E. B.)—৫৫—৫।২—৭৫

৬ ও ৭। মনো ও লাইনো-টাইপ অপারেটর—৯০—১০।২—২০০

৮। লাডলো অপারেটার—৫০—৬।২—৮০ (E. B.)—১০।২—১৩০

৯। বাইণ্ডার—২৫—৪।২—৪৫ (E. B.)—৫।২—৬৫ (E. B.)—১২॥০।২—৯০

১০। ইম্পজিটর—৩০—৪।২—৫৪ (E. B.)—৫৪—৪।২—৬৬

বর্ধিত মূল্য ভাতা—যাঁদের ৩৫৲ বা তার কম বেতন তাঁদের মাসিক ২০৲; তদূর্ধ বেতনের লোকদের মাসিক ২২৲, বা বেতনের শতকরা ১৭॥০ ভাগ, যেটাতে বেশি দাঁড়ায়। এ ছাড়া প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের প্রস্তাব হয়েছে, টাকায় এক আনা কর্মীরা দেবেন, এক আনা দেবেন মালিক।

এই যদি চার গুণ বা ছ'গুণ বৃদ্ধির নিদর্শন হয় তবে প্রেস-মালিকরা এর আগে কি হারে বেতন দিচ্ছিলেন? তাতে কি কর্মীরা একবেলাও ভালো করে খেতে পেতেন? যদি বলি এতকাল প্রেস-মালিকরা "smooth sailing" করে অনেক লাভ করেছেন এখন একটু কম লাভে সন্তুষ্ট হোন, তাহলে কি অন্যায় কথা হয়? ধর্মঘটের ভয়ে ন্যায্য ন্যূনতম বেতন দেবার জন্য যে খরচ বেড়েছে, নিজেদের লাভ ষোলো আনা বজায় রেখে (এমন কি, আরো বাড়িয়ে?) সে বর্ধিত খরচটা অমনি সর্বসাধারণের উপরে, দরিদ্র পুস্তকক্রেতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা কেন? (একথাও বলব না যে, প্রকাশকেরা সকলেই সদাত্মা, কিন্তু একথা সত্য যে, ইচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক, তাঁরা বই-প্রতি কম লাভেই সন্তুষ্ট আছেন; তাঁদের যতটা খরচ বেড়েছে তার অনুপাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের দাম তাঁরা ইচ্ছা থাকলেও বাড়াতে পারেন নি, বা ইচ্ছা করেই বাড়ান নি)।

(খ) প্রেস-মালিক-সমিতির সকল সদস্যই কি লেবর-কমিশনারের নির্দিষ্ট হারে কর্মীদের মাইনে দিচ্ছেন? তবে কদিন আগে কাগজে এ খবর বেরিয়েছে কেন—

"প্রেস-কর্মচারী ইউনিয়নের মারফত কলিকাতার ১৭২টি ছাপাখানা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখ হইতে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়।...কলিকাতার হাঙ্গামার দরুণ এই ধর্মঘট স্থগিত ছিল, এবং ধর্মঘটের নোটিশ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। **লেবার কমিশনার প্রেস-মালিকদের গ্রহণযোগ্য একটি [বেতন] তালিকা প্রণয়ন**

করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

—দৈনিক কৃষক, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

এই তো চার গুণ থেকে ছ'গুণ বৃদ্ধির নমুনা। হতে পারে কোনো-কোনো প্রেস এই বেতন-তালিকা গ্রহণ করেছেন, এমন কি তার চেয়েও বেশি দিচ্ছেন (কোনো কোনো প্রেস আগে থেকেই, ছাপার দর কম থাকা কালেই, এ-রকম বেতন দিচ্ছিলেন—তাঁরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দিচ্ছিলেন, না, ভদ্র রকম একটা লাভ রেখে, অধিক লুব্ধ না হয়ে, দিচ্ছিলেন, জানতে ইচ্ছা হয়)—তাঁদের দর বাড়লে তার মধ্যে তবু একটা যুক্তির আভাস থাকে। কিন্তু প্রেস-মালিক-সমিতি এদিকে সদস্যদের সকলকে লেবর-কমিশনারের এই নিরীহ সুপারিশও গ্রহণ করাতে পারলেন না, ওদিকে বেতনবৃদ্ধির অজুহাতে সকল সদস্যের ক্ষেত্রেই বাড়িয়ে বসে আছেন। আগে কর্মীদের বেতনটা বাড়িয়ে পরে ছাপার দামটা বাড়ালেই সংগত হত না?

৩। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত চিঠিতে বুদ্ধদেববাবু বাংলাদেশে ছাপাখানার অব্যবস্থার কথা তুলেছেন। প্রসঙ্গটা অস্বস্তিজনক, অতএব ছাপাখানা-মালিক-সমিতির সম্পাদক এ বিষয়ে মৌনাবলম্বী। বিলেতি নিয়মেই যদি ছাপার হার ধার্য হয়ে থাকে তবে ছাপার কাজটা একটু পরিষ্কার হতে দোষ কি, প্রুফটা একটু সময়মত দিতে দোষ কি, আর তাতে ভুলের সংখ্যা একটু কম হতেই বা আপত্তি কি? যুদ্ধকালেও বিলেতি বইয়ের ছাপা যেরূপ শোভন ছিল কোনোকালেই বাংলা ছাপাখানা সে পর্যায়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। এদিকে লংম্যান, গ্রীন কোম্পানির শ্রীযুক্ত জ্যোতিষরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি যুদ্ধকালে প্রকাশন কার্যেই বিলাতে ছিলেন) স্টেটসম্যান পত্রে জানিয়েছেন যে যুদ্ধের সময় ছাপাখানার দর শতকরা ৬০৲ টাকার বেশি বাড়েনি; আর আমাদের এখানে বেড়েছে শতকরা ৬০০৲ টাকা।

৪। ছাপাখানা-মালিক-সমিতির সম্পাদকের স্টেটসম্যানে প্রকাশিত চিঠির একটি উক্তিতে মনে হয়, বুদ্ধদেববাবু যে লিখেছিলেন ছাপার এই নূতন দরকে "বলা যায় বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মনে হয় যেন বাংলা সাহিত্যকে ধ্বংস করাই তাঁদের লক্ষ্য"—একথা স্বীকার করে নিয়েই তিনি সে কথার স্বপক্ষেই যুক্তি দিয়েছেন।—তিনি বলেই দিয়েছেন যে, তিন হাজার কপির কম ছাপা হলে সে বই আর ছাপা পোষাবে না।—জিজ্ঞাসা করি কখানা বাংলা বই তিন হাজার ছাপা হয়, বা ছাপা হলে বিক্রি হয়? এর চেয়ে সোজাসুজি বলে দিলেই তো ভালো হত যে, তাঁরা বাংলা বই আর ছাপতে চান না, গবর্নমেণ্টের কাজই তাঁরা অতঃপর করবেন, বা তেলের লেবেল ছাপবেন। ছাপাখানা-মালিক-সমিতির সম্পাদক "established prestige"-এর লেখকদের কথা বলেছেন—যে সব লেখকদের প্রেস্টিজ এখনো established হয়নি তাঁদের প্রতি এ মৃত্যুদণ্ডের বিধান ঘোষণা করবার কি অধিকার তাঁর আছে সে কথা না তুলেই আর একটি প্রশ্ন করি—তিন হাজার কপি বই সত্বর বিক্রি হয়ে যাবে এই যদি প্রেস্টিজের নিরিখ হয় তবে বাংলাদেশে আজ ক'জন এরকম প্রেস্টিজবান্‌ লেখক আছেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে বাংলাদেশে একজন লেখক ছিলেন—আগেকার কথা তুলবই না, ছাপাখানা-মালিকের এই তুলাদণ্ডে ওজন করলে তাঁরও কি যথেষ্ট প্রেস্টিজ আজকের দিনেও হয়েছে? নোবেল প্রাইজের কল্যাণে তাঁর গীতাঞ্জলি, একখণ্ডে নির্বাচিত বহু কবিতার সমাহাররূপে সঞ্চয়িতা এবং পাঠ্যরূপে নির্বাচিত তাঁর কতকগুলি বই অনেক

বিক্রি হয় বটে, উপন্যাসগুলিরও হয়ত বিক্রি আছে, কিন্তু বিশ্বভারতী হিসাব দিল না, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বইয়ের সংস্করণ হতে কতদিন লাগছে, তাঁর কখানি নাটকের, দেশ-বিদেশে সুধীসমাজে যা উচ্চ সমাদর পেয়েছে, পরিমিত সংখ্যায় মুদ্রিত প্রথম সংস্করণই শেষ হয়নি? ছাপাখানা-মালিকের বিধানমতেই যদি সাহিত্যকে চলতে হয় তবে এ বইগুলিকে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

ছাপাখানা-মালিকদের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ, এখনো তাঁরা বিষয়টি ভেবে দেখুন; শুধু সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে নয়, নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেই। বাংলা বই প্রকাশের যে নব উদ্যম আজ চারদিকে দেখা যাচ্ছে অতিলুব্ধতার দ্বারা যদি তাকে তাঁরা নিশ্চিহ্ন করেন তবে ভবিষ্যতে কি তাঁরা তাঁদের আয়ের জন্য একমাত্র সরকারী কন্‌ট্রাক্টের উপরেই নির্ভর করবেন, না, কাগজের কারসাজিই চিরকাল চলবে; সে কৌশলও তো সকলের জানা নেই। লুব্ধ মালিকের হাতে স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী রাজহংসীর নিধনের গল্পটা পুরাতন, কিন্তু তার শিক্ষাটা চিরন্তন।

শ্রী শ্রীচরণ দাস

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পূরবী, দাম ৩া০।

রুচি ও প্রগতি—বিষ্ণু দে। ঈগল্ পাবলিশার্স ; দাম ১৸০।

বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার। জেনারেল প্রিণ্টার্স, দাম ৪৲।

'প্রোগ্রেসিভ্ লিটরেচর' বা প্রগতি সাহিত্য কি, এ প্রশ্ন এখনো ওঠে। সাহিত্য-রসিক এবং সাহিত্য-সন্ধানী বাঙালী অবশ্য জানেন, এ সাহিত্যে আজ বিতর্কের ও কল্পনার জিনিস নেই। বাঙলা কাব্যে, কথা-সাহিত্যে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে আজ তার নিদর্শন মেলে ; দৃষ্টির সত্য আজ স্বষ্টির স্বাক্ষরেও রূপায়িত। তবু শিক্ষিত বা রসিক বাঙালী অনেকেরই যে প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট নয়, তা-ও সত্য। তার কারণ অনুসন্ধান করলে অবশ্য যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করা যায় ; খানিকটা জ্ঞানও লাভ করা যায়। এঁরা এখনো অনেকে অস্পষ্টভাবে ধারণা করে বসে আছেন যে, প্রগতি সাহিত্য বুঝি সেই তৃতীয় দশকের 'অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের' "প্রগতি"-পত্রেরই ছায়ায় বর্ধিত এবং সঞ্জীবিত। কেউ বা বড় জোর জানেন যে, চতুর্থ দশকে ভারতবর্ষে ও বাঙলায় রাজনীতিক বামপন্থীদের উদ্যোগে যে 'প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘ' জন্মলাভ করে—প্রগতি সাহিত্য তাদেরই প্রচার-মূলক প্রয়াস—গণ-সাহিত্য ও গণ-বিপ্লবের মহড়া। এই শেষের ধারণাটি অবশ্য একেবারে অযথার্থ নয়।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙলা দেশের প্রথম যুগের প্রগতি-সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন,—তখনো 'প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘও' জন্মলাভ করেনি। 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থের মুখ-বন্ধে ডাঃ দত্ত সেই ইতিবৃত্ত বিবৃত করেছেন। তাঁর মত লোকদের সহযোগিতায় জন্মাল সেই সঙ্ঘ, অনেকটা নিস্তেজও হয়ে গেল সেই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রগতির যে প্রেরণায় ও প্রয়োজনে তাব জন্ম সমাজের নানা স্তরে তা আরও তীব্র, আরও ব্যাপক, আরও গভীর হয়ে উঠল। এল পৃথিবীজোড়া মহাযুদ্ধ, এল এদেশে মন্বন্তর, মহামারী—প্রগতির প্রেরণা তখন বাঙলা কাব্যে কথা-শিল্পে, নাট্যে, চিত্রে নৃত্যে-গানে—স্বষ্টির রূপলাভ করতে লাগল। অনেক অসার্থক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমে দেখা দিয়েছে প্রাণবান্ এক নতুন জীবনের প্রাথমিক এই প্রকাশ। যেখানে তা স্বষ্টি সেখানে সে স্বীকৃতি আদায় করেই ; কেউ তা দেয় সানন্দে, কেউ দেয় অনিচ্ছায়,—আবার কেউ দিতেও চায় না সেই অনিচ্ছার বশে। কারণ নতুন বলেই তা অনেক কায়েমি স্বার্থের নিকট অগ্রাহ্য, আর কায়েমি চিন্তা ও আদর্শের চোখে অসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, এ বিরোধিতাও প্রগতি-পন্থীদের মতে যেমন অবধারিত, তেমনি অবধারিত এর পরাজয়। এবং সে জন্যই প্রগতি সাহিত্যের একদিকে যেমন চাই স্বষ্টির স্বাক্ষর, আর দিকে প্রয়োজন প্রগতির বিচার ও বিশ্লেষণ, এবং সাহিত্যের মূল্য বিচার ও ব্যাখ্যান।

ডাঃ দত্তের 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থখানাকে সম্বর্ধনা জানাতে হয় প্রগতির বিচার ও

ব্যাখ্যানের জন্য। আড়াইশ' পাতার এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থখানাতে ডাঃ দত্তের নানা সময়কার ৮টি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সব কয়টি প্রবন্ধেরই বিষয় সাহিত্যে প্রগতি, যথা, 'প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা' 'সাহিত্য ও সমাজ', 'সাহিত্যে সমাজচিত্র,' 'হিন্দী সাহিত্যে প্রগতি', 'উর্দু সাহিত্যে প্রগতি', 'বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রগতি', 'সাহিত্যে প্রগতি' ও 'প্রলেটেরীয় সাহিত্যের স্বরূপ।' বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ডাঃ দত্ত সমাজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়েই প্রধানত সাহিত্যের বিচার করেছেন, ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রগতির বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বারবার পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। যেমন "কেবল কতকগুলি ভাব দ্বারাই সমাজ ও তার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। রূপ ও রস যুগে যুগে এবং জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইতিহাসে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানুযায়ী (Historical materialism) সমাজপটে যে প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আর যে আদর্শ সমাজকে আরও অগ্রগমনশীলতার দিকনির্দেশ করে তাহাকে প্রগতিশীল বলা হয়। প্রগতি আপেক্ষিক বস্তু। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা হইতে বুর্জোয়া সভ্যতা আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর বলিয়া এই সভ্যতাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। আবার যাহারা সমাজতন্ত্রবাদকে মানবের পক্ষে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন তাহারা প্রোলেটরীয় সভ্যতা ও সাহিত্যকে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন।" (পৃঃ ৬-৭) "সাহিত্যের লেখক তাহার আবেষ্টনীর বাহিরে গিয়া কিছু লেখেন না।" প্রগতির ও প্রগতি সাহিত্যের এই মূল সংজ্ঞা নির্দেশ করে ডাঃ দত্ত অগ্রসর হয়েছেন কয়েকটি প্রবন্ধে নানা ভাষার নানা যুগের সাহিত্য বিশ্লেষণে, তাঁর অধ্যয়নের এলেকা দেখে চমৎকৃত হতে হয়; অথচ তাঁর বক্তব্যে পাণ্ডিত্যে গুরুভার কোথাও নেই। ডাক্তার দত্তের ভাষা অবশ্য খুব প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু পাঠকের মনে কোথাও কোনো কুয়াসা রেখে তিনি যান না। সমালোচনা-সাহিত্যের পক্ষে এ গুণ বাঙলায় প্রায় দুর্লভ। সাধারণ বাঙলা পাঠকও ডাঃ দত্তের এই সাহিত্যক প্রবন্ধগুলি পাঠে অন্তত কয়েকটী বিষয়ে উপকৃত হবেন - প্রগতির মূল অর্থ জানবেন; সমাজ-সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন; ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, রুশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা স্তরের তথ্য ও তার বিচার পাবেন; হিন্দি ও উর্দু ভাষার সাহিত্যের যে বিশদ বিবরণ এ দিক থেকে পাবেন, তা প্রায় অন্য ভাষায়ও দুর্লভ; আর সর্বশেষে সমাজতাত্ত্বিক এই দৃষ্টিতে পাবেন বাঙলা সাহিত্যেরও বিচার—প্রাচীন ও বর্তমান বাঙলা সাহিত্যকে এই দৃষ্টিতে এমনভাবে বিচারই বা আর কে করেছেন?

অবশ্য আমার বলার উদ্দেশ্য একথা নয় যে, ডাক্তার দত্তের বিচার ও বিশ্লেষণ সবাই একবাক্যে মেনে নেবেন; কিংবা আমিই তা বিনা প্রশ্নে সর্বক্ষেত্রে মেনে নিতে পেরেছি। বাধ্য হয়েই ডাক্তার দত্ত অনেক ক্ষেত্রে শুধু দু'এক কথায় এক একটি গ্রন্থ বা লেখক সম্বন্ধে সরাসরি 'রায়' দিয়ে দিয়েছেন। আর একটু প্রমাণ উল্লেখ না করলে সে 'রায়' মানতে দু'এক ক্ষেত্রে বাধে, মনে হয়—তা বিশেষ ফরমূলা-সম্মত,—সে ফরমূলা সমাজতাত্ত্বিক ফরমূলা। মূলত তার সংজ্ঞা সত্য হলেও মনে হয় তিনি সামাজিক আবেষ্টনকেই প্রায় সর্বজিৎ করে তুলেছেন, সৃষ্টিশক্তিও যে অঘটন ও ঘটন পটিয়সী তা স্পষ্ট করে দেখান নি। এই মৌলিক সন্দেহই প্রশ্রয় পায় যখন তিনি দু'কথায় কোনো লেখার বা লেখককের বিচার সারেন।

একটি কথা প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইঃ—এমন প্রয়োজনীয় গ্রন্থে সূচী নেই, অধ্যায় বা প্রবন্ধের নাম নেই, গ্রন্থের পৃষ্ঠার শিরেও কোনো তার আভাষ নেই। এ জাতীয়

ইয়ার্কির অর্থ কি ? পৃষ্ঠাসংখ্যা অক্ষর দিয়ে লিখলে ও প্যারাগ্রাফ বিভাগে নতুন (মার্কিনি ?) কায়দা গ্রহণ করলেই কি প্রকাশন-কলার চূড়ান্ত হয়ে গেল ? আর যাই হোক্ মার্কিনি মুদ্রণকলার উদ্দেশ্য পাঠকের অসুবিধা উৎপাদন নয়।

যে প্রশ্ন 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থে ডাক্তার দত্ত উত্থাপনও করেন নি, সে-ই প্রশ্নেরই প্রধানত উত্তর আছে কবি বিষ্ণু দে'র 'রুচি ও প্রগতি' নামক গ্রন্থে। অবশ্য শুধু সে প্রশ্নের নয়, আরও অনেক প্রশ্নেরও। কারণ এ গ্রন্থখানাও বিষ্ণু দে'র বারোটি প্রবন্ধ ও পুস্তক-আলোচনা নিয়ে গ্রথিত (এবং এ গ্রন্থেরও সূচী নেই); দু-একটি প্রধান প্রবন্ধ 'পরিচয়েই' প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' এ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। ডাক্তার দত্ত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন; সাহিত্যিকদের সাহিত্য-বিচারের অবলম্বিত মাপকাঠি অনুরূপ। কবি বিষ্ণু দে তা বিশেষ করেই জানেন, তাতে বীতশ্রদ্ধও নন। কিন্তু তিনি জানেন যে, জীবনের দিকে না তাকালে সাহিত্যিকের মনের ব্যাপ্তি ও রূপান্তর হতে পারে না; আর "সাধারনের জীবনেই তো এ মানস-সরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়ত জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন-অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।" (পৃঃ ১-২) "সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেকনীকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্য ভেদের লক্ষ্য হয়ত অনেক সময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল, এই চৈতন্য জ্যাবদ্ধটান।" (পৃঃ ২) সেই জ্যাবদ্ধ ধনু থেকে কবি বিষ্ণু দে ক্ষিপ্র হস্তে শর সন্ধান করেছেন শিল্পি-মানসের এ সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের প্রতি, "আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বর নিক্রান্ত স্বয়ম্ভূ জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যার অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়।" কারণ, "দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের (লেখকদের) পরিণতির ক্রান্তি। Interpritation তাই change-এ সম্পূর্ণ।" (পৃঃ ৩) মার্কসীয় দর্শনের এই জীয়ন্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তিনি তারপর বাঙলা সাহিত্যের পুরাতন "দেবদেবী ভাঙাগড়া" ও নর-নারী সম্বন্ধের বিদগ্ধ চর্চা" থেকে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর শিল্প-জিজ্ঞাসা পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সূক্ষ্ম শিল্পিদৃষ্টি ছাড়াও যা এ প্রবন্ধে চমৎকৃত করে তা হচ্ছে এত অল্প পরিসরে এত গভীর ও ব্যাপক বিষয়ের আলোচনার শক্তি।

কিন্তু বিষ্ণুবাবুর এই শক্তির বিরুদ্ধেই পাঠক-সাধারণের অভিযোগ হবে বেশি। শুধু কাব্যে নয়, প্রত্যেক "সম্বোধনেই শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য", নিশ্চয়ই বিষ্ণুবাবু তা মানবেন। তাই, শ্রোতাদের এই অভিযোগেও তিনি একটু অবহিত হবেন। স্বীকার করতেই হবে—তাঁর প্রবন্ধ সাধারণের জন্য নয়। এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তাঁর আলোচ্য বিষয়ই শুধু যে সূক্ষ্ম ও গভীর তা নয়; তাঁর আলোচনা-রীতিও প্রায় সাঙ্কেতিক, প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ তা থেকে সযত্নে বর্জিত হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বল কবি-বাক্যের জ্যা-মুক্ত তীর সময়ে সময়ে তাই লক্ষ্য ভেদ করে না; তির্যক-গতিতে তা পাঠক-মানসের চক্রস্পর্শ করে-না-করেই ছিট্‌কে পড়ে। কিন্তু যেখানে তা লক্ষ্যভেদ করে সেখানে তা অমোঘ; কবি-বাক্যের

স্বাভাবিক নিয়মেই তা হয় অনিবার্য। এর প্রমাণ উপরের দু' একটি উদ্ধৃতির মধ্যেও রয়েছে। বারে বারে দুঃখ হয় এমন বিদগ্ধ মন ও বুদ্ধি, এমন রসবোধ ও রসিকতা এবং নিপুণ বাক্য-রচনা শিক্ষিত সাধারণের দাবিকে কেন স্বীকার করে না? তা যে ইচ্ছা করলেই স্বীকার করতে শ্রীযুত বিষ্ণু দে পারেন তার প্রমাণও রয়েছে 'রুচি ও প্রগতিতে'—'জন-সাধারণের রুচি', 'সোভিয়েট শিল্প ও সাহিত্য', এবং কয়েকটি গ্রন্থ-সমালোচনায় তা সাধারণ পাঠকও দেখতে পারেন।

'রুচি ও প্রগতি' সোয়া শ' পৃষ্ঠার গ্রন্থও নয়। তথাপি তার পরিচয় দেওয়া এ কারণেই প্রায় অসম্ভব যে, তাতে আলোচিত শিল্প-সমস্যা, বিশেষ করে টি-এস-এলিয়ট ও পিকাশোকে উপলক্ষ করে শিল্পীর সাধন-মার্গ সম্পর্কে বিষ্ণু বাবু যে বিচার ও সিদ্ধান্ত করেছেন, এবং প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় প্রবন্ধেই রুচি ও প্রগতির যে-সব মৌলিক প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন, তা আরো সংক্ষেপে উল্লেখ করা অসম্ভব; কিন্তু প্রত্যেকটিই শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ্য এবং পাঠের থেকেও অধিকতর আলোচনার দাবি রাখে।

সমাজে প্রগতিবাদ আছে, প্রতিক্রিয়ার বিবাদও থামেনি। তারই প্রমাণ "বাংলার নবযুগ"। জীবনে বা সাহিত্যে প্রগতির স্বরূপ যাঁরা জানতে চান বা মানতে রাজী, কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের ক্ষমা করতে পারেন না। কারণ তিনি শুধু প্রগতি-বিরোধী নন, তিনি প্রতিক্রিয়ারই প্রতিভূ। তাঁর চিন্তায় 'জীবনে কোথাও প্রগতির স্থান নেই।' এমন-কি স্বামী বিবেকানন্দের মত বিপ্লবী-প্রেরণার অমন জ্বলন্ত উৎস-ধারাকেও তিনি তাঁর নিজের এই গতি-বিমুখিতার সমর্থক হিসাবে উপস্থিত করতে ব্যগ্র। মোহিতলাল বিশ্বাস করেন—প্রগতি নেই; গতি যা আছে তা-ও আসলে অলীক। আছে শুধু চক্রাকারে পরিক্রমণ। প্রত্যেক জাতির "রক্তের" মধ্যেই তার বিশেষ "প্রবৃত্তি" নিহিত রয়েছে, আর সে "প্রবৃত্তিই" তাই তার "নিয়তিও"। বাঙলার ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিপিনচন্দ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ও গিরিজা রায়চৌধুরী যে আলোচনা করে গিয়েছেন, মোহিতলাল তাঁদেরই সে ধারাকে তাঁর নতুন আবিষ্কারের উচ্ছ্বাসে ও "ক্যুহ্বার কাণ্টের" উন্মাদনায় ফেনিয়ে তুলছেন নতুন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগকে তিনি শুধু বাঙালী বৈশিষ্ট্য নয়, বাঙালী রক্তের গুণ হিসাবে বিচার করতে বসেছেন। অবশ্য, প্রগতি বলে কিছু যখন নেই, আসলে সেই নবযুগের 'নবত্বটাও' তা হলে বিশেষ কিছু নয়—শুধু বাঙালীত্বই। আর সে বাঙালীত্বও এমন যে তাতে রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয়তা ও উপনিষদের ছোঁয়াচ প্রভৃতি লাগলেও তা প্রায় অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, "ব্লাড্-থিওরি" মার্কা এ মতবাদ কোনো সুস্থ মানুষ বেশিক্ষণ বা বেশি দূর পোষণ করতে পারেন না—মোহিতলালের প্রগতি-বিরোধিতায়ও তাই যুক্তিও নেই, সুস্থতাও নেই। একটু উপভোগ্য হাস্যকরতা আছে তা তাঁর ভূমিকায় নামোল্লেখ না-করা নেতাজী সম্পর্কিত উচ্ছ্বাসে ও উৎসর্গের "শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অচলপ্রতিমেষু" প্রতি নিবেদনে বাড়ে বই কমে না। কিন্তু কুণ্ঠাহীনভাবে তবু যা স্বীকার্য তা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে মোহিতলালের 'বাংলার নবযুগে'র এই আলোচনার মূল্য। এ আলোচনায় মৌলিকত্ব বেশি নেই, ঐতিহাসিক দৃষ্টি তো নেইই, সমাজনীতিক দৃষ্টির বা জ্ঞানের এবং রাজনীতিক চেতনা বা অনুভূতির চিহ্নও নেই; মন-গড়া মতবাদের দোষেও তা দুষ্ট। তবু এ আলোচনায় তাঁর অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ

ও মানসিকতা ও অনলস মতনিষ্ঠার পরিচয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এবং এ আলোচনার "মূল্য"ও এখানেই—প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে প্রগতি-শক্তিকে ব্যাখ্যান ও ব্যবহারের চেষ্টায়।

গোপাল হালদার

Folksongs of Chattisgarh : Verrier Elwin. Oxford, 15/-.
Gold Khan : Norman Cohn. Secker, 12/6.
Meet My People : Devendra Satyarthi. Sangam, Lahore, 7/8.
Snowballs of Garhwall : Ed. by D. N. Majumdar. Universal Publishers, 3/12.

ভেরিয়র এল্‌উইনের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব আজ বিশেষজ্ঞের জঙ্গল থেকে মানবজীবনের ব্যাপ্ত মাঠে-হাটে মুক্তি পেয়েছে। আমরা, যাদের মুখ্য উৎসাহ প্রত্যক্ষ মানুষে, তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমাদের মতো সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে নৃতত্ত্বের নানা কাল্পনিক জাতিবিচারের বা মাথার খুলির নানান্ চেহারার কুটালোচনার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন, তার সুখদুঃখ। বিশেষকরেই কৃতজ্ঞ বোধ করি এলউইন্ ও আর্চারের কাছে, কারণ তারা নিজেদের কাজে এবং "ম্যান ইন ইণ্ডিয়া" পত্রের মারফৎ ভারতীয় জীবনের একটা বিরাট দিকে আলোকপাত করেছেন। সংস্কৃতিগত সংগঠনের বা ছকের দিকে তাঁদের সার্থক ঝোঁক মূল্যবান, কারণ তা না হলে সমাজজীবনের ছক্‌ও দুর্বোধ্য থেকে যায়। এই দিক থেকেই প্রথমত আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতীয় হিসাবে, শরৎচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবেই।

তাছাড়া কবিতার দিক থেকেও বটে। কারণ কবিতারও নিজস্ব টেকনিকগত সমস্যা আছে—বিজ্ঞানের মতোই, যদিচ তার মূল্য গৌণ, এবং লোকসাহিত্য এ সমস্যা নির্দেশে আমাকে অন্তত সাহায্য করে। মুস্কিল হচ্ছে যে আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী। আর "ম্যান ইন্ ইণ্ডিয়া"-র বিষয় আমরা হলেও, দামের বহরটা সাহেব-শোভন। যাহোক্, আমার মনে আছে আমার উত্তেজনাটা যখন আর্চারের সৌজন্যে ছত্তিশগড়ী গানের প্রুফ্-কপি প্রথম দেখি। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ী বা আর্চারের উরাওঁ বা সাঁওতাল কবিতা যে নিছক আনন্দই দেয়, তাই নয়, আমাদেরই সাহিত্যিক প্রশ্নাবলী তোলে এবং কথঞ্চিৎ সমাধানও করে এবং সে সমাধানও প্রায় আমাদেরই।

তাই বইটি পেয়ে বন্ধুত্বেরই উজ্জীবন পেলুম। নতুন পেলুম এল্‌উইনের প্রচুর টীকাটিপ্পনীর অংশ এবং আর্চারের ভূমিকা। আর্চার তুলেছেন যে কোনো সাহিত্যভাবুক লেখকের পক্ষে আজ গুরুতর সেই প্রশ্নটি, যার জবাব যে কোনো প্রকৃত ও বিকাশমান সাহিত্যিককে পেতেই হবে: সামাজিক ঐক্য বা সমষ্টিবোধ কতোখানি এবং কিভাবে কবিতা বা সংলাপের পদ্ধতি ও ফলকে নির্দিষ্ট করে। যে কোনো শিল্পেই এ প্রশ্ন বিবেচ্য। চিত্রে বা ভাস্কর্যের ইতিহাসে দেখা যায় কিভাবে সামাজিক জীবনের একসূত্রে সংকেতিতমার্গের (Conventions) সীমার মধ্যেই নামহীন শিল্পসৃষ্টির লোকোত্তর মহিমা প্রকাশ পায়। লোকশিল্পের বাস্তববিরোধী নয়, বাস্তবপরিপক্ব পরোক্ষতা (abstract form) আসলে

তার লোকায়তিক মুক্তিই। তাই আজ মাতিস্, পিকাশোর চোখ যায় স্পেনের এব্রোক্ট্ লোকশিল্পে, মরক্কোয়, নিগ্রোদেশে, মধ্যযুগের নামহীন ফরাসী কাচ বা পুঁথিচিত্রে। যামিনী রায় তাঁর উগ্র সমাজচৈতন্তের প্রকাশ পান বাংলার অসামান্ত লোকশিল্পের নিদর্শনের সঙ্কেতেই তাঁর বলিষ্ঠ স্বকীয়তায় (The Art of Jamini Roy দ্রষ্টব্য।) সংগীতেও এই যে মুক্তির পথ তা বার্টক্, ও অলটন্, ব্রিটেনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত। সাহিত্যেও যে তাই, আরাগঁ-র ক্ষেত্রে তা দেখি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সোভিয়েট দেশে এই লোকশিল্পের চর্চা ব্যাপকভাবেই চলেছে এবং অচিরে যে এই স্রোত, বিপ্লবপূর্ব তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক ঝোঁকের জের-কে মার্জিত করবে, জ্যাক্ চেন্ সে কথা বলেছেন।

আর্চারের এই সমস্তানির্ণয়ে নানা কথার মধ্যে একটা দিক হচ্ছে ফরাসী প্রতীকী কবিদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ সেকেলে ইংলণ্ডের আধুনিক কবিদের। কবিতায় প্রতীক (symbol) অথবা প্রতিমা (image) সম্পূর্ণ সার্থকতা পায়, যখন পুরুষার্থ (values) বিষয়ে মোটামুটি খানিকটা সামাজিক মতৈক্য থাকে। এবং তা সম্ভব হয় সমাজ শ্রেণীবিভাগহীন কোনো একটা ছকে গ্রথিত থাকলে—খানিকটা যেমন হয় মধ্যযুগীয় hierarchical বা বৃত্তিজীবী সমাজে, আরো হয় আমাদের অনার্যপ্রতিবেশীপূর্বপুরুষদের সমাজের মতো ছকে বা সম্যক হয় সোভিয়েট দেশে। অবশ্য আর্চারের একথা সত্য যে সাম্যবাদের এখনও প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। সে কথা কেউ দাবীও করে না। কিন্তু ঐ সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের যে—শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় ও উর্বর—সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সে কথা সাম্প্রতিক রুশকবিতাবিচারে বাউরা-র মতো অসাম্যবাদীকেও মানতে হয়েছে। তাছাড়া, এই আন্কোরা কড়া মাটিতেই তো মায়াকফ্স্কির মতো কুশলী প্রতীকী প্রচার-ছড়া লিখেছেন, এবং পাস্টেরনাকেরও জীবনযাত্রা অচল হয় নি। সিমোনভের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর্চার আলোচনায় এলুয়ার ও আরাগঁ-র সাম্যবাদী বিবর্তন বাদ দিয়েছেন। লুমানিতে, আক্সিওঁ, লেৎর-ফ্রঁাসেস্ ইত্যাদির সাক্ষাৎ প্রচার কি করে যে বিলাতী ছুঁৎমার্গে সাহিত্যিকদের কাব্যবিলাস চরিতার্থ করে, সে রহস্ত তাই স্পষ্ট হল না। আসলে অবশ্য কবিতার দুই হাতই সমান চলে, কলিংউড্ সাহেব যেমন বলেছিলেন, এবং উঁচ্কপালে কবিতাও, তা সে আদিবাসী সমাজেই হোক্, সোভিয়েট সমাজেই হোক্। এবং দু হাত থেকে থেকে একতালেই চলতে পারে, যদি কবির বহুধা মানসে থাকে সমগ্রতার কমবেশি আভাস।

এল্উইন্ এ বইয়ে সারা জীবনটাই গ্রহণ করেছেন, তাঁর অনূদিত কবিতা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য ও পাদটীকায় গভীর জ্ঞান ও দুর্লভ সংবেদ্যতায় জীবনের একতাই প্রকাশ। তাই অপূর্ব স্নকুমার প্রেমের গানের সঙ্গে গর্ভাধানও স্থান পায়, চরম রোমান্টিক বেদনার সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক গান আর মাছমার্কা দারোগাবাবুকে নিয়ে ব্যঙ্গ :

দারোগা সাহেব
এ কী সুখবর ! বদলী হলেন
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম

দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা এক পয়সায়
বাজারে কিনত কাপড় ?

—বইটিতে এতো বেশি ভালো গান বা কবিতার প্রাচুর্য যে, দু একটি উদ্ধৃতি-অনুবাদ অর্থহীন। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে এসব কবিতার প্রতীক আমার কাছেই প্রতীক, তার গোষ্ঠীপ্রচলিত কৃতার্থ আমি জানিনা বলে, এলউইনের সাহায্যে তার ছত্তিশগড়ী মানে জানার পরে সেগুলি হয় শুধু অলঙ্কার বা রূপকী প্রতিমামাত্র। রূপক-প্রতিমা যেন বাজারে-কেনা প্রতীক, তৈরী মাল, অঙ্কের প্রতীকের বা চিহ্নের মতো। অথচ সার্থক প্রতিকী কবিতা প্রতীকী রূপ পায় সমগ্র কবিতার বা কবিতার স্তবকের মধ্যে দিয়েই, আস্তস্থ রূপায়ণেই। এ দুয়ের তফাৎ প্রায় মালার্মে, ভালেরি, রিল্‌কে-র সঙ্গে আর্চার উল্লিখিত ডিলান্ টমাসের তফাৎ। বা বৃহত্তর ভাবে বলা যায় যে এদের তফাৎ কোলরিজ-বর্ণিত সংকল্পনা ও বিকল্পনার বিভেদ। কিম্বা উপমা ও উৎক্ষেপের মধ্যে যে তফাৎ। ছত্তিশগড়ের এই সব চমৎকার গানগুলির অধিকাংশই তৈরী প্রতিমায় বাঁধা, তাই সংগীতে যে একই প্রতীক বা চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন রাগবিন্যাসে, বিন্যাসেরই মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট অর্থ পায়, সে অর্থের উদ্‌ভাসন এখানে দুর্লভ।

আদিম লোককাব্যে কেন এই তফাৎ বাস্তব, তার কারণ আপাতবোধ্য। খানিকটা এটা নির্ভর করে আত্মসচেতনতার পর্যায়ের উপরে, তার গভীরতা ও স্থিতিকালের, এবং তার শুদ্ধতার উপরেও। এইখানেই ইয়েট্‌স্ ও এলিয়টের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য। এলিয়টের অনেক কবিতায় অনেক জায়গায় মস্থিত প্রতিমাটি স্বকীয় সত্তা পায় তার reference value বা অভিধার্থের অপেক্ষা না রেখেই—যদিও অনেক সময়ে আবার দুটিধারা মিশ্র হয়ে যায়। সেইজন্তেই এলিয়টের মতো কবিতা লিখতে রাজতান্ত্রিক ধর্মতান্ত্রিক না হলেও চলে। কিন্তু ইয়েট্‌সের আলঙ্কারিক মানসের জন্তে তাঁর যোগ, ভূত ও আইরিশ্ রূপকথায় ভারাক্রান্ত প্রতীকগুলি চিত্তশুদ্ধি বা বিবিক্তির অভাবে যথেষ্ট পরোক্ষ নয়। এবং বলাই বাহুল্য আদিম সরল সমাজের লোক-সাহিত্যে এটা আশাই করা যায় না। লেনিন-রূপকথায় আর রুরিক-রূপকথায় বা সোনাখাঁর কাহিনীতে এই তফাৎ। কিন্তু ডক্টর্ এলউইনের অনুপম এ অনুবাদ অনেকগুলিতে অবশ্য অনেক প্রতীকেরই নিজস্ব কাব্যসত্তা আছে :

কি করে ভাঙলে সোনার কলসখানি
বলো তো কোথায় হারালে তোমার জলজলে যৌবন ?

বা ও রূপসী মেয়ে ফুল ফোটে রাতারাতি
আমরাই যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

বা হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

অন্তত আমার তাই মনে হল। হয়তো তার কারণ বাংলায় অনার্য ধারার প্রবলতাই

যার জন্যে আদিবাসীর প্রত্যক্ষধর্মী মানসের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিক মিল এতো গভীর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও। অবশ্য ভারতরক্ষক নৃতাত্ত্বিক-রা এখনও বাংলাকে .বাদই দেন। কিন্তু জীবনের নানাব্যাপারে বাঙালী এবং সাঁওতাল বা গণ্ডীর যে সব বিস্ময়কর মিল, তার ব্যাখ্যা এখানেই, বাহ্য প্রভাববিস্তার সন্ধানে নয়। তাই আমার মনে হয় যে এল্‌উইন্‌ ও আর্চার হিন্দুমহাজনব্যবসায়ী ও বাংলাকে কাকতালীয়ে এক না ভেবে (যে ভাবার পিছনে ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণের সমর্থন) যদি এ বিষয়ে আরেকটু মন দিতেন তাহলে আসামসীমান্তে মন্ত্রচালিত পার্বত্যস্থানের আন্দোলন জোর পেত না। (কিংডন-ওয়ার্ডের প্রবন্ধ, "Man In India" Administration Number)। অধিকন্তু অনেক সংস্কৃতি বা মানসমূলক এবং সাহিত্যিক.মার্গ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা পেতেন; যেমন পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুগান্তকারী বই "বাংলার ব্রতে"। নরনারীর দেহ সম্বন্ধে, মাতৃত্ব, খাওয়া এসবের প্রতি যে মনোভাব আদিবাসীদের, তাই কি আমরা পাই না বাংলার প্রাকৃত মনে ও জীবনে তথা মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীতে ? দেবর-ভাউজী সম্পর্কের কনভেনশন, এমন কি রসালু কাউরের সাহিত্যিক কনভেনশনেও সেই আত্মীয়তা প্রমাণিত। আর বটকিনের পরেও কি লোক-সাহিত্যাদি folk-lore ও culture শুধু আদিম অর্থনীতিতে নন্‌-রেগুলেটেড এরিয়াতেও খুঁজে বেড়াতে হবে ? তাতে হয়তো স্টালিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ মানার হাত থেকে আপাতত পালানো যায়, কিন্তু নিছক নৃতত্ত্বের দিকেও তাতে বাদ পড়ে অনেক কিছুই।

এ সমালোচনায় এলইউনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা কমেনা, যেমন কমে না এই বিজ্ঞানীর অসামান্য কবিপ্রতিভা।

একথা যথার্থই বলেছেন আর্চার তাঁর ভূমিকায় এবং তাঁর নিজেরও বিশেষ কবি-প্রতিভা। Gold Khan-এ আর্থার ওয়েলি তাই তাঁর মুখবন্ধে এ দুইজনকে মানপত্র দিয়েছেন। এবং বলেছেন, It is to their category that Norman Cohn belongs, with his power to make us feel that nothing interposes between the reader of these songs and the primordial splendour of Siberian demigods. দুটি দীর্ঘ কবিতা আছে আলটাই বা সোনা-খা জড়িত বিষয়ে। দীর্ঘ কবিতা, প্রচণ্ড তার আবেগ, ভিন্ন তার বিন্যাস ; চাকাস্‌ লোকসাহিত্য মোটেই সাঁওতাল বা গণ্ডী নয়। সাইবেরিয়ার নিসর্গ দৃশ্যে-এর পটভূমি। কিন্তু প্রায় এই অনুলিখিত কবিতার মতোই চমকপ্রদ এই চাকাস্‌দের সাম্প্রতিক ইতিহাস। সাইবেরিয়ার এই অঞ্চল আজ অদ্ভুত রকম কৃষিসমৃদ্ধ। তিনটি জাত নিয়ে এই চাকাস্‌ স্বায়ত্তশাসিত দেশ। ক-বছরে এই অশ্বারোহী যাযাবর জাত বৈজ্ঞানিক কৃষক হয়েছে, চালায় লেবরেটারি, ট্রাক্টর, কোঅপ্স, বর্ণমালা স্থির হয়েছে, পাঠশালা হয়েছে এবং লোকসংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এখন তারা শুধু নাকী সুরে টেনে টেনে গান করে না সোনা-খাঁর, লেখেও, এবং লেনিনের কথাও লেখে।

যেমন বলে বা গায় সত্যার্থীর দেশের লোকেরা, ভোজপুরী, আহির, অন্ধ্রদেশী, পাঠান, রাজপুত বা ব্রহ্মদেশী। এবং অনুবাদের হাতও সত্যার্থীর ভালো, যেমন আশ্চর্য তাঁর ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণু তাঁর ভ্রমণ এবং সতত তাঁর মৈত্রী। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এবং ফটোতে আমাদের দেশের চেহারা স্পষ্ট :

তুমি তো দেখেছ কতো দেবদেবী, ইরাবতী
তাঁরা কিবা কন্ ?
তাঁরা কি করেন কিছু আমাদের স্বাধীনতা তরে
তাঁরা কি দেবেন সত্য সুখ স্বচ্ছলতা, ইরাবতী বলো।—

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন বাংলায় এ কাজ করেন না, সুনীল জানার ক্যামেরা তো ভর্তি ?

ডক্টর মজুমদারের ভূমিকা ছাড়া গাড়োয়ালের "তুষার গোলা"য় বিশেষ কিছু নেই। ডাঃ মজুমদার ঠিকই বলেছেন যে "বাপ-মা" মার্কা শাসনে কোনো ভরসা নেই: "Rehabilitation which was considered enough in earlier times would not solve the problem of the Nagas or any other aboriginal tribe...A philosophy of segregation of tribal society has been advanced by some people which, if conceded, will perpetuate tribal discomforts, serfdom, and shameless exploitation of tribal life and labour."

এ বইয়ের অনুবাদ—এক আর্চারের সাঁওতাল কবিতা ছাড়া—আশাতীত রকম খারাপ।

বিষ্ণু দে

সংস্কৃতি-সংবাদ

সোভিয়েট ফিল্ম "রেইনবো"

সোভিয়েট ফিল্মকে ফিল্মজগতে শীর্ষস্থানে উন্নীত করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডনস্কয় অন্যতম। 'ম্যাক্সিম গোর্কী' ছবির (যার প্রথমখণ্ড এদেশে দেখান হয়েছে) স্রষ্টা হিসাবে তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত। 'রেইনবো'তে ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কার কাহিনী অবলম্বনে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের অমর প্রতিরোধকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কার কাহিনী নিয়ে রচনা করলেও ডনস্কয় যে সংবেদনশীলতা ও কল্পনার স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন, নিখুঁত আঙ্গিকের সহযোগে তা সৃষ্টি হিসাবে মূল বই-কে ম্লান করে দিয়েছে। মনে হয় বই-এ যা অস্থিমজ্জা মাত্র ছিল, তা যেন রক্তমাংসে সজ্জিত হয়ে নড়ে চড়ে কথা কয়ে উঠল। ভাসিলিয়েভ্স্কার কাহিনী সরল। অতিরিক্ত সরল। নিখুঁত দুভাগে কাহিনী ভাগ করা—প্রথম অংশ নাৎসি বর্বরতা ও সোভিয়েট প্রতিরোধ; দ্বিতীয় অংশ প্রতিরোধের জয়। পরিচালকের অসাধারণ প্রতিভাই এ বইকে সার্থক ফিল্ম-এ রূপান্তরিত করতে পেরেছে। হয়ত সেই কারণেই 'রেইনবো' সোভিয়েট ও সাম্যবাদী মহলের বাইরে অশ্রদ্ধা কুড়িয়েছে, কিন্তু ফিল্ম 'রেইনবো' সর্বত্রই আদৃত।

ভাসিলিয়েভ্স্কার কাহিনীর প্রধান দুর্বলতাকে পরিচালক যেভাবে অতিক্রম করেছেন তা ফিল্ম-এর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মূল কাহিনীতে পূর্বোল্লিখিত দুই অংশ অতি বিচ্ছিন্ন, এক অংশ থেকে আরেক অংশে গতি প্রকৃতপক্ষে খাপছাড়া, তত্ত্বমূলক। ডনস্কয়ও কিছু পরিমাণে ঠেকেন নি তা নয়। কিন্তু প্রথম সোভিয়েট বিমানের আগমনকে তিনি

এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে তাতে গল্পের আভ্যন্তরীণ লজিকের অভাব অনেকখানি কেটে গেছে। ফিল্ম-এ বিমানের আওয়াজ এসেছে একটা সুরের মতো, প্রায় দু' তিন মিনিট (ফিল্ম-এর পক্ষে অনেকখানি সময়) ধরে তার একটানা গুঞ্জন চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, আকাশে তার নানা ভঙ্গীতে বিচরণ। যেন কোন দূর দেশ থেকে পাখী এসে আশার সংগীত শুনিয়ে গেল। এর পরেই গল্পের হাওয়াবদল শুরু (এর সঙ্গে উপন্যাসের লেখা মিলিয়ে দেখুন—জেনারেল পাবলিশার্স ১৯৪৪ সংস্করণের ১৬৬-১৬৮ পৃঃ)।

ওলিয়েনার হত্যার দৃশ্যেও অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় আছে। হত্যার সমগ্র বীভৎস দৃশ্যের দ্বারা দর্শকের স্নায়বিক বিকার ঘটাবার চেষ্টা না করে পরিচালক গভীরতর কল্পনাশক্তির সাহায্যে বেদনার ভাবকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে দেখা যায় ওলিয়েনা জলের ধারে একটি বরফের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে এক নাৎসী সেনার সঙ্গীন উদ্যত। এরপরে 'কাট্' দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে বহু নীচে বরফ ঘেরা স্থির জলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কয়েকটি ঢেউ এসে তীরে লুটিয়ে পড়ল। ওলিয়েনার দেহকে দেখা গেল না, কিন্তু হত্যার ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

সোভিয়েট ফিল্মে শিশু অভিনেতার ব্যবহার চিরকালই প্রসিদ্ধ, কিন্তু 'রেইনবো'তে দুটি সিকোয়েন্স আছে যার তুলনা নেই—প্রথম মিশাকে কবর দেওয়ার দৃশ্য, দ্বিতীয় দুধ জোগাড়ের জন্য মিশাদের বাড়ীতে জার্মান সেনার আগমন।

বিশ্বাসঘাতক গাপ্‌লিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দৃশ্যটিও অতিনাটকীয়ভাবে পরিকল্পিত।

ফিল্মটির সংলাপ রুশভাষায়, সুতরাং বাঙালী দর্শকের কাছে সংলাপের কোন আবেদন নেই বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ফিল্ম-এর মর্মগ্রহণে কোন বাধা হয় না। এও পরিচালকের কৃতিত্বই সূচিত করে, কারণ প্রথমত ও প্রধানত ফিল্ম হচ্ছে দেখবার জিনিস, শোনবার জিনিস নয়; কেবলমাত্র ছবির রিয়ালিজম দেবার জন্য ও সাহায্য করবার জন্যই সংলাপের ব্যবহার। এটা ফিল্মজগতে সর্বজনস্বীকৃত মত (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংলাদেশের পরিচালকবর্গের কথা, যাঁরা গল্প দেখার পূর্বেই প্রশ্ন করেন "ডায়ালগ কই")।

কিন্তু একটি ত্রুটিকে ডনস্কয়ের মত পরিচালকও অতিক্রম করতে পারেননি। তার কারণ সে চেষ্টায় কাহিনীকেই অতিক্রম করা হতো। এই ত্রুটি হচ্ছে 'Horror' এর আধিক্য। ফিল্ম দেখতে দেখতে কেবলি মনে হয় (যেমন বই পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল) যে Horror ভিন্ন কি ট্র্যাজেডির প্রকাশ নেই? 'রেইনবো'র আরম্ভই Horror। প্রথম দিকে দেখি গর্ভবতী নারীর সমস্ত শীতবস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিদারুণ শীতের বরফের উপর দিয়ে সঙ্গীনের খোঁচায় দৌড় করানো হচ্ছে। এই স্তরের Horror এ আরম্ভ করার ফলে গ্রামবাসীর ওপর নির্যাতনের কাহিনী কোনো Climaxএ পৌছতে পারে না। নির্যাতনের পরবর্তী দৃশ্যগুলি দারুণতর হতে হতে কোনো এক শিখরে পৌছে, কোনো আভ্যন্তরীণ কারণে শেষ হল এবং বিজয়ের অধ্যায়কে সূচিত করল—এমন ভাব মনে আসে না। ফলে গল্প কোনো সুঠাম কাঠামোতে পৌছায় না, একই স্তরে গড়িয়ে যেতে থাকে। পরিবর্তন আসে হঠাৎ। দুদিন আগে কেন আসেনি, দুদিন পরে কেন এল না বোঝা যায় না। ফিল্ম-এর কাহিনীতে Climax এর অভাব বিশেষভাবে মারাত্মক। কারণ এই Climax কেবল ঘটনার Climax

নয়, দর্শকের অনুভূতিরও Climax হওয়া চাই। গল্পের এই দুর্বলতা 'রেইনবো' ফিল্মকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে। শেষ দৃশ্যের দীর্ঘ বক্তৃতা ফিল্ম মাধ্যমের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ফোটোগ্রাফির নানা কায়দা সত্ত্বেও এই খুঁত ঢাকা পড়েনি। দর্শকের চোখকে সর্বদাই কোনো না কোনো Interesting Point এ ব্যাপৃত রাখা চাই, পর্দার ওপর ছবি এমনভাবে চলতে থাকা চাই যে বক্তৃতা শোনার সময়টুকু যেন চোথ ও কান ঠিক পাশাপশি চলতে পারে, চোথকে একঘেয়ে দৃশ্যে ক্লান্ত হয়ে না পড়তে হয়, অথবা চোখের ক্রিয়াকে বন্ধ করে দিয়ে কেবল কানের ক্রিয়াকেই আশ্রয় না করতে হয়, ফিল্ম নির্মাণের পক্ষে এ একটি প্রথম, প্রধান ও সর্বজনস্বীকৃত কথা। অথচ 'রেইনবো'-এর কাহিনীর পক্ষে বক্তৃতাটির যথেষ্ট অর্থপূর্ণতা আছে, তাকে বাদ দিলে ফিল্ম-এর বক্তব্যের দিকে ঘাটতি পড়ে, অতএব পরিচালক নাচার।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

ক্যালকাটা গ্রুপের চিত্র প্রদর্শনী

যুদ্ধকালে প্রধান প্রধান শিল্প পরিষদের বাইরে প্রথম দেখা দেয় বাঙলার নতুন শিল্পীদের একটি কলিকাতা শিল্পগোষ্ঠী—"ক্যালকাটা গ্রুপ।" এঁদের প্রদর্শনীতে তখন আমরা শক্তিমান নতুন শিল্পীদেরও পরিচয় লাভ করি, তাঁরা তখনি কেউ সৃষ্টিতে সার্থক হতে চলেছেন, কেউ চলেছেন সৃষ্টির সন্ধানে সাগ্রহে। কিন্তু যে লক্ষণ তাঁদের সকলকার মধ্যেই তখন ছিল স্পষ্ট তা এই—তাঁরা মামুলিয়ানার চর্চা ছেড়েছেন, এই জীবন্ত কালের অভাবনীয় জটিলতা, রূপ ও রূপহীনতা তাঁদের প্রাণকে চঞ্চল করে তুলেছে, চেতনাকে তীব্র ও সমৃদ্ধ করছে, এবং সৃষ্টি শক্তিকে করেছে নতুন রীতিতে সৃষ্টি-চঞ্চল। তাই দেখা গেল—চারদিককার জীবনের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা, দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা এ সবকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে ব্যস্ত নন। শিল্পী হলেও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা স্বীকার করতে তাঁরা লজ্জিত হন না। এমন কি, বুঝে ফেলেছেন যে, জীবনকে ভালোবাস্‌লে হয়ত দেশের প্রত্যক্ষ মানুষকেও না ভালোবেসে পারা যায় না, আর প্রত্যক্ষ সমাজ জীবনকেও অস্বীকার করা যায় না। এই নতুন সত্য স্বীকার করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁরা পুরনো শিল্পপদ্ধতির অস্পষ্টতা ছেড়ে নতুন পদ্ধতিও সন্ধান করতে থাকেন। তখনকার দিনে গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি এ জাতীয় শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন প্রধানত এই ক্যালকাটা গ্রুপ্‌। অবশ্য এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই নতুন চেতনা ও চাঞ্চল্য এ গোষ্ঠীর বাইরেকার বহু বহু সার্থক শিল্পীর কীর্তিতেও তখনি শিল্পরূপ লাভ করছিল। বোঝা যাচ্ছিল—বাঙলার শিল্প ধারাই মোড় ঘুরছে।

যুদ্ধের পরেও বাঙলার শিল্পী জগতের সেই নতুন বোধ মোটেই নিবে যায় নি। শিল্পীর জীবনের চারদিকে যে পরিবর্তমান জীবন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে, শিল্পীর জীবনের উপর যা ভেঙে পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে, তার সম্বন্ধে উদাসীনতা আসলে শিল্পীর প্রাণ-হীনতারই নামান্তর, এ সত্য অনেক বাঙালী শিল্পীই বোঝেন, বিশেষ করে তা বোঝেন

ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা। কিন্তু গত এক বৎসর ধরে গৃহযুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় তাঁরা কোনো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এবার এই দুর্যোগের মধ্যেও (মে-জুন) যে তাঁরা এরূপ আয়োজন অবশেষে করতে পেরেছেন এ জন্য তাঁদের কর্মশক্তির প্রশংসা করতে হয়।

এবারকার শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলাম, দুর্দিনেও শিল্পীরা পরাজিত হন নি। রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা এখনো তাঁদের প্রেরণা জোগায়, বারোমাসী দুর্ভিক্ষের 'বারমাস্যা' তাঁরা রঙে-রেখায় তুলে ধরেন; চারিদিক্‌কার চলন্ত জীবন ও জগৎকে তাঁরা দেখেন, চেনেন, ভালোবাসেন, এবং তা'ই আঁকেন। এই অঙ্কনরীতিও বিশেষ একটা পদ্ধতিতে এসে থেমে থাকে নি—আড়ষ্টতা ছাড়াবার, শিল্পকে আরও স্বাধীন করবার, সবল করবার চেষ্টা প্রত্যেকটি শিল্পীর এই নতুন নতুন নিদর্শনে প্রত্যক্ষ। তাই পূর্ব পরিচিত শিল্পীদের এবারকার কাজ দেখেও চমকে উঠতে হয়। যেমন গোপাল ঘোষের রঙের উপর নতুন ঝোঁক, রথীন্দ্র মৈত্রের নতুন ছন্দ-সৃষ্টি, প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্যে নতুন গাম্ভীর্য দান, প্রভৃতি। এঁদের শিল্পশক্তির যেন এক একটি অজানিত অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। বিশেষ করে এবার চমকিত ও চমৎকৃত হতে হয়েছে এঁদেরই প্রয়াস দেখে। তা ছাড়া, অবনী সেনের কথাও মনে রাখবার মত, পরিতোষ সেনেরও নিদর্শন ছিল। প্রদোষ দাশগুপ্তের নিজস্বতাও আনন্দদায়ক।

দুটি বিষয় তবু লক্ষণীয়। প্রথমত, যে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ আজ দেশ বিভাগে পরিণত হল এই জাগ্রত শিল্পীরা তাকে শিল্পরূপ দিতে পারেন নি। গৃহযুদ্ধের ক্লেদ ও গ্লানি এতই কঠিন যে কোনো শিল্পই তাকে এখনো ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি, তাও মনে রাখা উচিত। দ্বিতীয় কথা এই—মামুলিয়ানা এড়াবার প্রয়াসে দু-একটি স্থলে সার্থক শিল্পীরাও মাত্রা লঙ্ঘন করছেন, এরূপ সন্দেহ হয়। তবু, তাঁরা এখনো এতটা সজীব যে, বিশ্বাস করি, এ ঝোঁক তাঁরা নিজে থেকেই কাটিয়ে উঠবেন। তাঁদের শিল্পদৃষ্টি ও প্রাণশক্তি তাঁদের এগিয়ে নিয়ে চলবে।

গোপাল হালদার

সম্পাদক

হিরণকুমার সান্যাল
গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং
৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৫৪

ফিরদোসী ঃ জীবনকথা

[ই. ই. বারৃতেল্-লিখিত পারস্যের মহাকবি ফিরদৌসীর এই জীবন কথা ও রচনাবলীর পরিচয় Oriental Institute of the Academy of Sciences, U.S.S.R., কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। "Scientific Popular Literature" নামক সিরিজ্-এ প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি মূল রুশ ভাষা হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন। এখানে উক্ত প্রবন্ধ হইতে ফিরদৌসীর জীবন কথার অংশটুকু প্রকাশ করা হইল। —সম্পাদক।]

ফিরদৌসীর জীবন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব অল্পই জানা যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল তাহাও আমরা ঠিক জানি না। ফিরদৌসী তাঁহার ছদ্ম-নাম। পারস্যদেশে অবস্থান কালে তিনি এই নামেই সাধারণত তাঁহার কবিতাবলী প্রকাশ করিতেন। এই নাম হয় কবি নিজেই লইয়াছিলেন অথবা তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা কেহ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই কথা সহজেই বুঝা যায় যে সেযুগে এইরূপ নাম সাধারণত কোন মহৎ বা কবিত্বপূর্ণ ভাবের সহিত জড়িত থাকিত, অথবা কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্যই দেওয়া হইয়া থাকিবে। এ ক্ষেত্রেও এই নামকরণ পূর্বোক্ত রীতির দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। 'ফিরদৌসী' কথাটির অর্থ হইতেছে 'স্বর্গোদ্যান'। কবিকে এই নাম দেওয়াতে তাঁহার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা এবং অফুরন্ত সৃজনীশক্তির ও সজীবতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য নামাংশ আবুল কাসিমও উক্ত নামের পোষকতা করে। এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে যেটুকু জানা যায় তাহাদের মধ্যে মিলের এত অভাব যে উহা হইতে সঠিক কিছু নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

খৃঃ ৯৩২ হইতে ৯৩৫-৩৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে ফিরদৌসীর জন্ম হয়। তখনো বোখারায় সাসানীয় সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন চলিতেছে, তবে উহার পতনের চিহ্ন ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছিল। ফিরদৌসীর পিতা একজন 'দিক্কান' (Dixkan) ছিলেন। এই কথা দ্বারা তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বুঝাইত। খোরাশানের অন্তর্বর্তী তুষ নামক স্থানে তাঁহার পিতার জমিদারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ভূসম্পত্তি ছিল যৎসামান্য এবং ইহা দ্বারা কোনপ্রকারে ভূস্বামীর খরচপত্র চলিত। সেযুগে প্রায় সব সময়েই জনসমূহ একস্থান হইতে অন্যত্র সদলে চলিয়া যাইত এবং সর্বদাই যুদ্ধও লাগিয়া থাকিত। এজন্য ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের অবস্থা অত্যন্ত

সঙ্কটপূর্ণ ছিল। যে কোন মুহূর্তে তাঁহাদের সর্বনাশ হইতে পারিত। ফিরদৌসী ঠিক কি অবস্থায় তাঁহার শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা আমরা সঠিক জানি না। তবে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে সাংসারিক অবস্থা যাহাই হোক না কেন সেযুগের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে দেখি তাঁহার পিতা ফিরদৌসীকে উত্তম শিক্ষাদানে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি আরবী ও পারসী ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করেন এবং প্রাক্‌মুসলমান ইরাণের সাহিত্য 'মধ্য-পারসী বা পেহ্লবী' সাহিত্যের ভাষার সঙ্গেও তাঁহার খুব সম্ভব পরিচয় ছিল। তাঁহার সমালোচনার ও ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি প্রাচীন ও সমসাময়িক মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত আরবী ও ফারসী পুস্তকাবলীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে সে যুগের সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন প্রতিনিধির নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করা যাইত না। কিন্তু ফিরদৌসী আরো বেশী শিক্ষিত ছিলেন। প্রাচীন পারস্যের গল্প, কিংবদন্তী ও জনপ্রবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ছিল। এ সকলের দিকে তাঁহার প্রাণ গভীরভাবে আকৃষ্ট হইত। সে যুগের আত্মার মধ্যেই যেন এরূপ একটা আকাঙ্খা ছিল। নানা কারণে প্রাচীন ইরাণের কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ প্রভৃতি সাসানীয়গণ পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন এবং পারস্য ভাষাকে রাজসভার ভাষা হিসাবে পুনঃপ্রচলন করিতে বদ্ধপর হন।

রাজবংশের এই দৃষ্টান্ত পারস্যের সব প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে অনুসৃত হইয়াছিল। কবিগণ এই সুযোগে স্ব স্ব সামন্ত নৃপতিদের সভায় ঐ সব বিষয়ের চর্চা করিয়া তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন স্মৃতিলিপি, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি খুঁজিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এ কথা সত্য যে কবিদের অনেকে প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা জানিতেন না ও সেজন্য মূলগ্রন্থের বা শিলালিপি প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কিন্তু এইকালে পূর্ববর্তী যুগের বহু লেখাই আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কবিগণ এই অনুবাদ ব্যবহার করিতে পারিতেন।

বোখারার সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ কবি রুদকী এইরূপে, 'কলিল ও দিমনা' (Kalila and Dimana) নামে একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ লেখেন। তাঁহার গ্রন্থের আখ্যানবস্তু তিনি প্রাক্‌মুসলমান পারস্য ও ভারতের কোন কোন পুস্তকের আরবী অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করেন। * সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এই কাব্যেব খুব সমাদর হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই গ্রন্থ পাই নাই। কেবল কয়েকছত্র রক্ষা পায়। কিন্তু এই সামান্য কয়েকছত্র হইতেই বুঝা যায় যে পুস্তকখানি প্রকৃতই প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য ছিল। রুদকীকে কেন্দ্র করিয়া একদল কবি এই সময়ে অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রাচীন গল্প প্রভৃতির ছন্দোবদ্ধ রূপ দিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এইসব কবিদের মধ্যে অনেকের আমরা শুধু নাম ও দু'এক ছত্র লেখা এক প্রাচীন অভিধানের পৃষ্ঠায় পাইয়াছি। এই অভিধানখানি দৈবক্রমে কালের অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। পরবর্তী যুগের দুর্যোগাবলী এবং নিষ্ঠুর আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে অতি অল্প সাহিত্যসম্পদই রক্ষা পাইয়াছে। এদিকে আবার পরবর্তী যুগে ফারসি পাঠকদিগের রুচির আমূল পরিবর্তন হয়। এমন কি, যে ভাষায় পূর্বের গ্রন্থাবলী লেখা হইয়াছিল সে-ভাষা পর্যন্ত 'সেকেলে' বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়। সাধারণের পক্ষে তখন ঐসব গ্রন্থ দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ঐসব পুস্তকের আর নূতন করিয়া

---

* মূলত উহা পঞ্চতন্ত্রের 'করটক-দমনক' কথা।—অনুবাদক।

হস্তলিখিত লিপিকরণ বন্ধ হয়। প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের স্যাঁৎসেতে ভূগর্ভস্থ কক্ষে রক্ষিত কিছু কিছু প্রাচীন পুস্তক পচিয়া যায়।

প্রতিভাবান তরুণ কবি রুদ্‌কীর পরে কবিদের মধ্যে প্রতিভাবান তরুণ কবি দকিকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি অতীত যুগের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং প্রাচীন কিংবদন্তী, গল্প প্রভৃতি প্রাণপণে সংগ্রহ করিতে লিপ্ত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ এত বেশী ছিল যে 'বসন্তের গীতি' নামে উৎসর্গীকৃত একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি বলেন যে প্রাক্‌মুসলমান পারস্যে যে জরথুস্ত্রীয়ধর্ম প্রচলিত ছিল উহাই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। ইয়োরোপের অনেক প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ এই কবিতার জন্য ইঁহাকে গোঁড়া মুসলমান না মনে করিয়া একজন জরথুস্ত্রের উপাসক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কারণ সাসানীয়দের সভায় জরথুস্ত্রের উপাসক কবির স্থান হওয়া দুরূহ। এতদ্ব্যতীত কবি অন্যত্র জরথুস্ত্রবাদকে বীণার মূর্চ্ছনা, পদ্মরাগের ন্যায় রক্তবর্ণ মদিরা ও মণিমাণিক্যভূষিত মুখমণ্ডল বলিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই যে তুলনা ইহার মধ্যে বিদ্রূপের চিহ্ন আছে। কারণ মুসলমানরা জানিতেন যে জরথুস্ত্র-মন্দিরের পুরোহিত, খ্রীষ্টীয় বিহারের পুরোহিতদের ন্যায় মদ্য প্রস্তুত করিতে নিপুণ ছিলেন।

প্রাচীন গৌরবময় যুগের প্রতি সুগভীর অনুরাগ থাকাতে দকিকী এক বিরাট পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা হইল প্রচলিত পারস্য ভাষার ছন্দে প্রাচীন ইরাণের সমুদয় কথা, কিংবদন্তী, গাথা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া এক বিরাট পুস্তক রচনা করা। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রিয় জরথুস্ত্রবাদ ও ইহার প্রচারক জরথুস্ত্র ও তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে গল্প অবলম্বন করিয়া তিনি একটি অধ্যায় লিখিয়া পুস্তক আরম্ভ করেন। কিন্তু এ পুস্তক তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। সর্বশুদ্ধ তিনি প্রায় ২০০০ ছত্র (১০০০ শ্লোক) লিখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি নিহত হন।

সে যুগের প্রায় সব সম্ভ্রান্তবংশধরের ন্যায় দকিকীরও চিন্তার গভীরতা ছিল না—তিনি লঘুচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। (পরবর্তী যুগেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই)। সন্ধ্যাবেলা হইতে তাঁহার পানোৎসব আরম্ভ হইত। ঐ উৎসবে একটা বড় জিনিস ছিল তরুণ তুর্কী ক্রীতদাস। সে যুগে এজন্য বোখারা ও সমরকন্দএর বাজারে তরুণ তুর্কী ক্রীতদাসদের খুব সমাদর ছিল ও উচ্চমূল্যে তাহাদের বিক্রয় হইত। সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ এই সমুদয় যুবককে ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাদের বহুমূল্য পোষাকে সাজাইত এবং তৎপরে ইহাদের লইয়া নানারূপ রঙ্গরহস্য করিত এবং ইহাদের সামান্যমাত্র খেয়ালবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিলে খুব আমোদ অনুভব করিত। সে যুগের প্রায় সব কবিই শতমুখে এ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। কখন কখন এই সব আমোদপ্রমোদ হইতে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিত। বিকৃতরুচি ভদ্রসন্তানদের এই সব প্রিয়পাত্র তুর্কী দাসযুবকগণ অনেক সময় অত্যাচারপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইত এবং ক্রোধের উদ্রেক হইলে স্বীয় প্রভুকেও আক্রমণ করিতে ইতস্তত করিত না। দকিকীর ব্যাপারেও এইরূপ হইয়াছিল। পানোন্মত্ত অবস্থায় ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া তাঁহার প্রিয তুর্কী ক্রীতদাস তাঁহাকে ছোরার আঘাতে নিহত করে (৯৭৫ খৃঃ অঃ)।

দকিকীর মৃত্যুতে মনে হইল যে একটি বিরাট পরিকল্পনা আর কার্যে পরিণত হইল না।

কারণ এরূপ দুরূহ কার্যের উপযুক্ত লোকের অভাব হইল। কিন্তু এই সংবাদ ফিরদৌসীর কর্ণগোচর হইল এবং যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী কবি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। দকিকীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ফিরদৌসী নিজের কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় পুস্তকাদি সংগ্রহ করিলেন এবং নিজের বাড়ীতে যে কাব্য পুস্তক তাঁহাকে অমর করিয়াছে সেই 'শাহ্-নামা' (রাজাদের জীবনী) প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি সম্বন্ধে পারস্যের কাব্যের ইতিহাসে অনেক গল্প ও কিংবদন্তী আছে। সেগুলি আজও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রচলিত। এ সমুদয় গল্প ও কিংবদন্তীর (আমরা পরে দেখিব) কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বরং এই রচনাগুলি এই অসাধারণ কবির প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু এই সকল গল্পের বহুল-প্রচার থাকাতে আমরা অল্প কিছু বলিয়া দেখাইব যে, উহাদের সত্য বলিয়া গণনা করা যায় না। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তীগুলির অনেকরূপ পাঠ আছে—একটি হইতে আর একটি কতকটা পৃথক। এই সমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা না করিয়া আমরা কেবল উহাদের কাঠামো লইয়া আলোচনা করিতে চাই।

প্রবাদ এই যে, গজনীর প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান মামুদ ফিরদৌসীকে শাহ্নামা লিখিতে আদেশ করেন। কবিকে বলা হয় যে তাঁহার কাব্যের প্রতি শ্লোকের জন্য তিনি একটি করিয়া দিনার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ—প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ফরাসী মুদ্রামানে ইহার মূল্য ১২ ফ্রাঁ) পাইবেন। কবি স্বদেশে ফিরিয়া কার্য আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কার্য করিয়া তিনি সুলতানের আজ্ঞা কার্যে পরিণত করেন এবং ষাট হাজার শ্লোকে রচিত কাব্যগ্রন্থ সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পূর্বপ্রতিশ্রুত পুরস্কারের আশা করিতে থাকেন। এদিকে পুস্তক-প্রাপ্তির পর সুলতান মামুদ স্থির করিলেন যে, পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী ধরা হইয়াছে। প্রতি ছত্রের বাবদ এক দিরহামই (রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ—মূল্য পূর্ববর্তী ফরাসী মুদ্রার এক ফ্রাঁ) যথেষ্ট। সুলতানের দূতগণ ঐ অর্থ লইয়া কবির দেশে উপস্থিত হন। কবি এই সময় স্নান সমাপন ও ঈশ্বর উপাসনা সমাপ্ত করিয়া সবে মাত্র এক পাত্র শীতল পানীয় আনিবার আদেশ দিয়াছেন—এই সময় দূতগণ ঐ অর্থ লইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। ফিরদৌসী একটি মুদ্রাধার খুলিয়া স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপ্য দেখিতে পান। সুলতানের প্রবঞ্চনা ও অসাধুতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পরম গাম্ভীর্যের সহিত তিনি ঐ অর্থ তিন ভাগ করেন—উহার এক ভাগ স্নানাগার-রক্ষককে দেন, দ্বিতীয় ভাগ তিনি সুলতানের দূতদের পুরস্কার দেন ও তৃতীয় ভাগ পানীয়ের মূল্য বাবদ দেন।

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন। এই কবিতায় তিনি ক্রীতদাস বংশ সমদ্ভূত বলিয়া সুলতানের নিন্দা করেন এবং বলেন যে সুলতানের ধমনীতে সত্যিকার রাজার রক্ত থাকিলে তিনি কবির অমর কাব্যের মূল্য বুঝিতে পারিতেন।

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও সরাসরি শত্রুতা ঘোষণা করা একই কথা। বৃদ্ধ ও দারিদ্র্যগ্রস্ত কবির পক্ষে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া জয়লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধিকন্তু সুলতানের অভ্যাস ছিল যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন তাহাদের হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা, হস্তীর পদের আঘাতে হতভাগ্যগণ একেবারে পিষ্ট হইয়া যাইত।

বৃদ্ধবয়সে ফিরদৌসী জন্মভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং পারস্যের যে সকল স্থানে ক্রুদ্ধ সুলতানের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে সে সব জায়গায় ঘুরিতে লাগিলেন। বহুবৎসর অতীত হইল। অপমানের কথা চাপা পড়িল। কবি জন্মভূমিতে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন ও সেখানে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে গজনীতে কোন এক ব্যাপার উপলক্ষে সুলতান মামুদের উজির তাঁহার সম্মুখে শাহ্‌নামা হইতে একটী শ্লোক আবৃত্তি করেন। সুলতান ঐ শ্লোকের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হন ও উহা কোন কবির রচনা জানিতে পারিয়া স্থির করেন যে এরূপ শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সুলতানের আদেশ অনুসারে বারোটি উষ্ট্রের এক বহর নীল বহন করিয়া গজনী হইতে কবির জন্মভূমি তুষ-এর দিকে যাত্রা করিল। ক্ষতিগ্রস্ত কবিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই উপহার পাঠান প্রয়োজন মনে হইয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে এই উষ্ট্রবহর এক তোরণদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল ঠিক সেই মুহূর্তে উহার বিপরীত নগরদ্বার দিয়া শ্রেষ্ঠ কবির মৃতদেহ লইয়া একটি ছোটরকমের বাহকদল কবরখানার দিকে চলিল, সুলতানের অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছিল। এখন আর পৃথিবীর কোন শক্তি কবির প্রতি সুলতান যে অপমান করিয়াছিলেন তাহা সংশোধন করিতে পারিবে না। উপহারগুলি কবির ভগ্নীকে দিতে চাওয়া হইলে তিনি গর্বভরে উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন "সুলতানের কোন জিনিসে আমার প্রয়োজন নাই।"

শাহ্‌নামা সম্বন্ধে কিংবদন্তীর ইহাই হইল মোট কাঠামো। পারসীয় লেখকগণ ইহারই নানারূপ অদল বদল করিয়া ও অন্য ঘটনাবলী যোগ দিয়া বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন।

ইয়োরোপের কবিসমাজে এই কিংবদন্তী বিশেষ কার্যকরী হয় এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়া কতিপয় পুস্তক রচিত হয়। এগুলির মধ্যে G. Geime-এর Ballad বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বহুদিন পর্যন্ত এই গল্পটাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ফিরদৌসী-জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে ফিরদৌসীর পারসীক জীবনীলেখকদের উপর আস্থা স্থাপন করা মোটেই সম্ভব নহে। কবি স্বয়ংই তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সাক্ষী। কবির বিপুল কাব্যগ্রন্থের অনেক জায়গায় তাঁহার জীবনীর বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে।

এখানে যেরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় সেরূপ স্থলে কবির তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত জীবনী লেখকদের বিশ্বাস না করিয়া কবিকে বিশ্বাস করাই সমীচীন।

কাব্যগ্রন্থখানিকে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহা খ্রীঃ ৯৯৯ শকের প্রারম্ভে সমাপ্ত হয়। সুতরাং ৯৬৪ খৃঃ হইতে ৯৬৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইহার রচনা আরম্ভ হয়। এই সময় (তারিখ) সুলতান মামুদের রাজত্বের অনেক আগে। তখনো পর্যন্ত সাসানীয়দের শাসন পূর্বের ঐ অঞ্চলগুলির উপর বিস্তৃত ছিল এবং সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে সবেমাত্র ভাঙনের প্রথম চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই সুলতান মামুদের আদেশ অনুসারে এই কাব্য লেখা হয়—এই প্রবাদের ভিত্তি নাই ও ইহার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের অন্যান্য অংশ ও মামুদকর্তৃক স্বর্ণের পরিবর্তে কবিকে রৌপ্যমুদ্রা দানের গল্পও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায়।

বাস্তবিকপক্ষে ঘটনাটি অন্তরূপ ছিল। কাব্যটিকে বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেই নিঃসংশয় হওয়া যায় যে উহার ঘটনাবলীর বৈচিত্র্য যতই হোক না কেন, সমগ্র কাব্য ব্যাপিয়া একটি বিশেষ ভাবধারা রহিয়াছে। এই ভাবধারার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাচীন ইরাণের পারস্যসিংহাসনের উপর নৈতিক ও ধর্মের দিক দিয়া সাসানীয়দের দাবীর যুক্তি সমর্থন।

কেবলমাত্র যাঁহারা ভগবানের আশীর্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা অর্থাৎ প্রাচীন ইরাণের রাজবংশধরগণ—যাঁহাদের মস্তকে দিব্যজ্যোতি আছে—তাঁহারাই পারস্যের প্রকৃত রাজা। এইরূপ একজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একই কথা। পরমেশ্বর বিদ্রোহীকে শাস্তি দেন। সুতরাং সমুদয় সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের মধ্যে একতাপ্রতিষ্ঠার ও তাঁহাদের ঈশ্বর নির্বাচিত প্রভুর প্রতি গভীর অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা থাকার প্রয়োজন। কাব্যগ্রন্থের একটা বড় অংশে ইরাণ ও তুরাণের যুদ্ধের ব্যাপার বর্ণনা দেওয়া আছে। এই যুদ্ধ হইল প্রকৃতপক্ষে পারসীয় সামন্ততন্ত্র ও তুরাণীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যে। এই যুদ্ধে পারসীকগণ যখনই একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে তুরাণীদের পরাজয় হইয়াছে কিন্তু পারস্যের সামন্ত ভূস্বামীদের নিজেদের মধ্যে কলহ ও দলাদলি হইয়া একতা ভাঙিয়া গেলেই তাঁহারা তুরাণী শত্রুদের ঠেকাইতে পারেন নাই এবং হীনভাবে নিহত হইয়াছেন।

এই সব হইতে বুঝিতে বিশেষ কিছু তীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রয়োজন হয় না যে এই কাব্যের মূলগত ঘটনাবলী এবং সাসানীয় রাজবংশের আবির্ভাবকালে পারস্যের রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে কী গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। মাঝে মাঝে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং মাঝে মাঝে অন্তর্বিপ্লবে দেশে সর্বনাশের সম্ভাবনা হইয়াছিল। সাসানীয়গণ পারস্যের প্রাচীন রাজবংশের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন—সুতরাং ফিরদৌসীর মত অনুসারে সিংহাসনের তাঁহারাই প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কবির কাব্য লেখার উদ্দেশ্য হইল পারস্যের সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সতর্ক করিয়া দেওয়া। কবি নিজেও ইঁহাদের একজন ছিলেন। কবি বলিলেন, 'সাসানীয়গণ তোমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রভু। তাঁহাদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখান ও নিজেদের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি না করা বিশেষ আবশ্যক। ইহা হইলেই উত্তর দিক হইতে তুর্কীদের যে আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না, তোমরাই জয়ী হইবে।'

এইরূপ পুস্তকের মধ্য দিয়া প্রচারকার্য সাসানীয়দের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিশেষ উপকারের হইত এবং তাঁহারাও নিশ্চয় কবিকে বিশেষ পুরস্কৃত করিতেন। কিন্তু কবি একেবারেই ধারণা করিতে পারেন নাই যে, এই পুস্তক লিখিতে তাঁহার এত দীর্ঘ সময় লাগিবে। পুস্তক যখন সমাপ্ত হইল তখন বোখারার ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়াছে এবং শেষ সাসানীয়গণ মধ্য-এশিয়ার প্রান্তরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে ফিরদৌসীর সাংসারিক অবস্থাও উত্তরোত্তর খারাপ হইয়া তাঁহাকে দারিদ্র্যের চরম সীমানায় ঠেলিয়া দিয়াছে।

অসহায়ভাবে নিজের গৃহে বসিয়া গ্রন্থরচনাতে ব্যাপৃত থাকার দরুন তিনি দেশের শাসকদের প্রশংসাসূচক কাব্যাদি লিখিয়াও সাময়িক কোন আয়ের চেষ্টা (পারসীয় কবিগণের এরূপ অভ্যাস ছিল) করেন নাই। এদিকে শেষ সাসানীয় রাজাদের দুর্যোগপূর্ণ শাসনকালে

ক্ষুদ্র জমিদারদের বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হয় ও অনেকের সর্বনাশ হয়। ফিরদৌসী স্বয়ং 'শাহনামা'র এক অধ্যায়ের শেষে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> 'কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে এলো। নিষ্প্রভ হলো চন্দ্র। তুষার পাত হতে লাগলো। পাহাড় নদী সব মিলিয়ে গেল, সব ছেয়ে রইলো ঘন অন্ধকার—এমন অন্ধকার যে কাকের পাখা পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘরে আমার কাঠ নাই, নুন নাই, যব নাই। সামনের ফসলকাটার সময় পর্যন্ত চালাতে পারি এমন কোন শস্য নাই। কেবল অন্ধকার, উৎপীড়ন, দুর্দিন। তুষারের নীচে পৃথিবী প্রস্তরকঠিন। সব কাজই যেন উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। কবে আসবে বন্ধুর সাহায্য?'

এইরূপ কবিতা হইতে অনেক ইয়োরোপীয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদের ধারণা যে ফিরদৌসী একটি আদরে-নষ্ট দুরন্ত বালক, তিনি জীবনে খুব বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন। আমার ধারণা ফিরদৌসীর এই যে করুণ অভিযোগ—এই অভিযোগে বৃদ্ধ কবির মোটেই বড় রকমের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের কথা নাই। তাঁহার এই কয়টি ছত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে না খাইয়া মরিবার ভয়। ঘরে যেখানে যব পর্যন্ত নাই সেখানে কী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা উঠিতে পারে? এটা মনে রাখিতে হইবে যে, সে যুগে দরিদ্রেরাই কেবল যবের রুটি খাইত। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল ছিল ও যাহারা পারিত গমের রুটি খাইত। কবির পুস্তকে অনেক স্থলেই এই অভিযোগ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন,

> 'হে উদীয়মান মহাকাশ! কেন তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দারিদ্র্যকূপে নিক্ষেপ করলে? যখন আমি যুবক ছিলাম তখন তুমি আমার এর চেয়ে বেশী যত্ন নিতে। আর আজ আমি স্থবির। আমাকে তুমি দুঃখ ও অপমানের দিকে ঠেলে দিলে।'

অন্যত্র কবি বলিতেছেন—

> 'আমার আয় ও ব্যয় সমান হলে আমি মনে করতাম, আমার প্রতি কালের ভাই-এর মত দরদ আছে। আচমকা এ বৎসর আকাশ থেকে নেমে এল ভীষণ শিলাবৃষ্টি—মৃত্যুর মত। মৃত্যুও এর চেয়ে আমার প্রতি বেশী নিষ্ঠুর হতে পারতো না। আমার সব আশা মিলিয়ে গেল, কোথায় গেল কাঠ, কোথায় গেল গম, কোথায় গেল মাংস জুটবার ভরসা? আকাশের দূত একা সব দিল শেষ করে।'

বৃদ্ধ কবির অভিযোগগুলি কী মর্মস্পর্শী। কবি ফসলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন—কোন রকমে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ সব আশা নির্মূল হইয়া গেল। কবি অভিযোগের মধ্যে বার বার কাঠের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। খোরাশান প্রান্তরভূমিতে শীতকালে কী ভীষণ ঠাণ্ডাপ্রবাহ মাঝে মাঝে নামিয়া আসে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাহা বোঝানো যায় না। তার উপর প্রাচীন পারসীকদের গৃহমধ্যে চুল্লী থাকিত না আর জানালায় কাঁচ ছিল না। কাজেই তুষারপাত আরম্ভ হইলেই স্থবির কবির মনে তাঁর জরাজীর্ণ দেহের উপর যে নিদারুণ দুর্ভোগ সহিতে হইবে তাহা ভাবিয়া ভীষণ ভয় হইত, তিনি ভয়ে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

সুতরাং অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল। 'শাহনামা' শেষ হইল—কিন্তু কবি বুঝিতে পারিলেন যে, যে আশা করিয়া তিনি এত দীর্ঘকাল দুঃখকষ্টের মধ্যেও কাজে ডুবিয়াছিলেন, তিনি যে আশা করিয়াছিলেন তাঁহার পরিশ্রমের যোগ্য মূল্য পাইবেন সে

আশা সুদূরপরাহত। বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইবার আশা ডুবিয়া গেল। এই সময় আর একটি বড় আঘাত কবি পাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন একমাত্র পুত্র হঠাৎ মারা গেল। কবির আর এমন কিছু রহিল না যাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন।

কবি তাঁহার পরিচিত জান্‌লাদিয়ানার ভূস্বামী অহ্‌মদ ইব্‌ন মুহম্মদের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার কথা অনুসারেই স্থির করিলেন যে একমাত্র সুলতান মামুদই তাঁহাকে তাঁহার পরিশ্রমের উপযোগী পারিশ্রমিক দিতে সমর্থ। সুতরাং তাঁহার নিকট আবেদন করা প্রয়োজন।

একথা সত্য যে তুষ-এর খুশিয়েন ইব্‌ন কুতিবা কবির পরিশ্রমের মূল্য বুঝিতেন এবং কবিকে মধ্যে মধ্যে কিছু উপহার দিতেন এবং তিনি তাঁহার সম্পত্তি নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও কবি যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

সুলতান মাহমুদ যে ফিরদৌসীর প্রিয় কাব্যের ক্রেতা হিসাবে অনুপযুক্ত লোক, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। সুলতান স্বীয় তরবারির জোরে সিংহাসন অধিকার করেন; ফিরদৌসী তাঁহার কাব্যে সিংহাসনের নৈতিক দাবীর যে কথা বলিয়াছেন তাহা সুলতানের পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু ফিরদৌসীর পক্ষে মামুদ ছাড়া, তখন অন্য কোন পথ ছিল না। অভাবের তাড়না বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সুতরাং শীঘ্র একটা কোন সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কবি (হয়ত নিজের মনের ভাব চাপিয়াই) তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে কয়েক ছত্র যোগ করিয়া সুলতান মামুদের ন্যায়বিচার ও উদারতার কথা প্রচার করিলেন এবং স্বীয় গ্রন্থ গজনীতে পাঠাইয়া দিলেন। রাজার উদারতা ও মুক্তহস্তে দানের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেকালে রাজসভার কবিগণ স্বীয় রাজাদের উদারচরিত্রের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম উদ্দেশ্য এইরূপ প্রশংসার ফলে দূরদূরান্তর হইতে আমীরের সভায় নানারূপ বিদ্বজ্জনের ও বীরপুরুষের সমাগম হইত বলিয়া রাজার গৌরব বাড়িত, এবং রাজারও কবি কর্তৃক এইরূপ উচ্চ প্রশংশিত হইবার পর কবিকে পুরস্কার দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিতে অন্তত চক্ষুলজ্জা হইত। সুতরাং কবির লাভ হইত।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে ফিরদৌসীর ভাগ্যে এরূপ ঘটিল না। সুলতান মামুদ স্বয়ং শাহ্‌নামা পড়িয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। যদি তিনি উহা পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উহার প্রকৃত আখ্যান বস্তু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন রাজনীতির দিক দিয়া ঐ পুস্তক তাঁহার কোন উপকারে ত আসিবেই না বরং অনিষ্টকারক হইবে। সুতরাং তিনি উহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। তিনি ফিরদৌসীকে কী পাঠাইয়াছিলেন জানা নাই। কিন্তু তিনি যাহাই পাঠাইয়া থাকুন না কেন, উহা এত সামান্য ছিল যে উহাতে কবির দারিদ্র্যমোচন হইল না।

এইভাবে কবির শেষ আশাও ধূলিসাৎ হইল। কবি মনে করিলেন যে সুলতান তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার সমস্ত জীবনের সাধনা বৃথা হইল। এতবড় যে কবি—যাঁহার সমকক্ষ পূর্বে কি পরে দেখা যায় নাই—এই

ব্যাপারে অতিশয় ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রতি কঠোর পীড়ন অনুভব করিলেন। ক্রমশ সমগ্র তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। কারণ ইহারাই তাঁহার অতিপ্রিয় প্রাচীন ইরাণকে আঘাত করিয়াছিল এবং কবি স্বয়ং ইহাদেরই একজনের নিকট হইতে মর্মান্তিক আঘাত খাইলেন। কবির চিত্ত কী ভীষণ অদম্য ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল উহা সহজেই অনুমেয়। একটা হঠাৎ-নবাব, তুচ্ছ বংশের লোক তাঁহাকে অপমান করিতে পারিল—তিনি স্বয়ং প্রাচীন ইরাণের আভিজাত বংশধর। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ফিরদৌসী আবার কলম ধরিলেন এবং 'শাহনামা'তে তিনি মামুদের গৌরবসূচক যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিবার জন্য বিদ্রূপাত্মক কয়েক ছত্র লিখিয়া যোগ করিয়া দিলেন—এই কয়েকটি ছত্র ব্যঙ্গ-কবিতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুলতানের নাম কলঙ্কলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখনও সুলতান মামুদের নামের সহিত কবির বিদ্রূপোক্তি জড়িত রহিয়াছে—কবির প্রতিহিংসা এখন শেষ হয় নাই।

কবির বিদ্রূপোক্তিটিও যে আমরা ঠিক অপরিবর্তিত আকারে পাইয়াছি—একথা সত্য করিয়া বলা কঠিন। ইহার কোন কোন অংশ—বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে শিয়াসুলভ সহানুভূতির উদ্রেক করে—বিশেষ সন্দেহজনক। কিন্তু কতকগুলি ছত্র খাঁটি বলিয়া বুঝা যায়। উহার মধ্যে ফিরদৌসীর প্রতিভার ও তাঁহার যুগের আভাষ পাওয়া যায়। সেগুলিকে কবির স্বহস্ত লিখিত বলিয়া না চিনিয়া উপায় নাই। যেমন কবির বিদ্রূপোক্তির শেষাংশ। এইখানে কবি বলিতেছেন :—

"জন্ম হিসাবে তিনি (সুলতান) রাজবংশের সন্তান নহেন। কোন রাজবংশের রক্ত তাঁহার শরীরে আছে একথা তিনি কখন বলেন নাই, তাঁহার পিতাও যদি রাজা হইতেন তাহা হইলে তিনি আমাকে স্বর্ণ মুকুট উপহার দিতেন। সুলতানের মাতা যদি অভিজাত বংশোদ্ভবা হইতেন তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যে আমার হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া যাইত। কিন্তু জন্মের দিক দিয়া সুলতানের কোন আভিজাত্য ছিল না এবং তিনি আভিজাত্য বুঝিতে পারিতেন না।

* * * *

"ক্রীতদাসের বংশধর—যদি তাহার পিতা রাজাও হয়—তাহা হইলেও অযোগ্য থাকিয়া যায়। বৃক্ষ নিজের অন্তর্নিহিত সার অনুসারেই তিক্ত হয়, তিক্ত বৃক্ষ স্বর্গোদ্যানে রোপন করিয়া স্বর্গীয় নদী হইতে জলসেক করিলে, ও উহার ফলকে স্বর্গীয় মধু দিয়া ধৌত করিলেও উহার গুণের পরিবর্তন হইবে না এবং উহার ফল তিক্তই হইবে। ধূপবিক্রেতার পাশ দিয়া গেলে তোমার কাপড়চোপড়ে ধূপের গন্ধ লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু যদি তুমি অঙ্গার বিক্রেতার সঙ্গ কর, তুমি কালিমা ছাড়া আর কিছু পাইবে না। দুর্জনের হেয় নীচতা, রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় কিছুতেই দূর করা যায় না। নীচ বংশোদ্ভবকে কখন বিশ্বাস করিবে না, কাফ্রিকে তুমি যতই ধোও না কেন তাহার রঙ্ শাদা হইবে না।

* * * *

"আমি এই যে অপ্রিয় কয়েক লাইন কবিতা লিখিতেছি—ইহার উদ্দেশ্য সুলতানকে শিক্ষা দেওয়া—এই ঘটনায় যেন তিনি পূর্বের চাইতে সতর্ক হন ও বৃদ্ধ মাননীয়

ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং অপর কোন কবি তাঁহার নিকট যশ ও অর্থের আশায় গেলে তাঁহাকে অপমানিত না করেন। কবিকে অপমান করিলে কবি ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়া শাস্তি দিতে পারে। আমার এই বিদ্রূপ-কবিতা মৃতদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত প্রচারিত থাকিবে। নিজের মাথা ধূলিতে লুটাইয়া মহান ঈশ্বরের সিংহাসনতলে আমি অভিযোগ করিতেছি—'হে ভগবান তাহার আত্মাকে অগ্নি দিয়া শোধন কর এবং তোমার এই অযোগ্য দাসানুদাসের প্রতিভার মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা দাও'।"

সে যুগের কোন কবিই সম্ভবত স্বীয় রাজার সম্বন্ধে এরূপ কবিতা লিখিবার জন্য কলম ধরিতেন না। যদি কাহারও এরূপ লিখিবার জন্য হাত চুলকাইত তাহা হইলে সুলতান মামুদের হস্তীগুলির কথা ভাবিয়াও থামিয়া যাইতেন। কবির লেখা এই ছত্রগুলি সুলতান মামুদের হাতে পড়িলে পৃথিবীর কোন শক্তিই কবিকে সুলতানের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে এ লেখা সুলতানের কাছে পৌঁছায় নাই। একটি গল্প আছে যে ফিরদৌসীর একজন শুভানুধ্যায়ী লোক বেশ কিছু অর্থ দিয়া কবির নিকট হইতে উহা ক্রয় করেন। কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃত ব্যাপার স্বতন্ত্ররূপ। সে যুগের রীতি অনুসারে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লেখা হইত তাঁহাকে উহা আবৃত্তি করিয়া শোনান হইত। সুলতান মামুদের সমক্ষে এই কবিতা আবৃত্তি করিবার মত কোন দুঃসাহসী লোক ছিল কি না সন্দেহ, কারণ সুলতানের প্রকৃতি লোকদের অজানা ছিল না।

যে ব্যাপারই ঘটিয়া থাকুক না কেন—কবির বিদ্রূপ-কবিতা সুলতান পাইয়া থাকুন আর নাই থাকুন—কবি গজনী হইতে কোন শুভ আশা করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি স্বীয় জন্মভূমি ছাড়িয়া আশ্রয়ের আশায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন স্থান খুঁজিতে লাগিলেন যেখানে গেলে অনাহারে মরিতে হইবে না। হিরাট ও উত্তর পারস্যের মধ্য দিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি বাগদাদে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে বাগ্‌দাদের সিংহাসনে বুইদএর বংশধর রাজত্ব করিতেছিলেন—এবং রাজ্যকে গজনীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

বৃদ্ধ কবি সেখানে বসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বিখ্যাত কাব্য লিখিলেন—এই পুস্তক প্রথমটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। কাব্যের নাম 'ইউসুফ ও জুলেখা' আখ্যানবস্তুটি বাইবেলের 'সুন্দর ইউসুফের গল্প' হইতে লওয়া হইয়াছে। মহম্মদ কোরাণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ইহা গোঁড়া মুসলমানদেরও গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল। এই পুস্তক সম্ভবত ১০১০ খৃঃ অব্দে লেখা হইয়াছিল। এই সময় কবির বয়স আশির নীচে ছিল। ক্লান্তি ও বার্ধক্যসুলভ জড়তা যে কবি অনুভব করিতেছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি এ পর্যন্ত যতটুকু সমাদর পাইয়াছিলেন, এই পুস্তক লিখিবার পর তাহা হইতে অনেক বেশী সমাদৃত হইলেন।

'ইউসুফ্ ও জুলেখা' কাব্যের মুখবন্ধের কয়েক লাইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অর্থপূর্ণ। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা ফিরদৌসীর দুর্ভাগ্যের কথা জানেন, তাঁহারা এই কয় ছত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন—জন্মভূমি হইতে দূরে গিয়াও তিনি জীবিকার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও আবার শেষ বারের মত কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন :

"বীর ফরীদুন-এর দিকে আর আমার মন যায় না। জোক্সাকার সিংহাসন তিনি অধিকার করেন, কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায়! কাইকোবাদের সাম্রাজ্য হইতে আমার মন চলিয়া গিয়াছে—কাইকোবাদের সিংহাসন পর্যন্ত এখন আর নাই। কাইখস্রু ও তাঁহার অফরাশিয়াব-এর সহিত যুদ্ধ—জানি না আমার ভাগ্যে মৃত্যুর পর শান্তি ভিন্ন আর কি আছে।"

ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ফিরদৌসী তাঁহার কাব্য 'শাহনামা'র জন্য পরিশ্রম করেন, এবং শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত তাঁহার প্রত্যেকটি বীরের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন। আর এখন তিনি সে সব প্রত্যাখ্যান করিলেন—তাঁহার জীবনে উহাদের প্রয়োজন নাই—তাঁহার একটা বিরাট ভুল হইয়াছিল :

"সত্যই অদৃষ্ট আমার বিরুদ্ধে—সেজন্য এই বিরাট কার্য তাহার পরিণতিতে সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না।"

এই কথাগুলির দ্বারা ফিরদৌসী কী বুঝাইতে চাহিতেছেন? বুঝাইতেছেন যে পুনরায় প্রাচীন ইরাণের গৌরবযুগ ফিরিয়া আসিবে মনে করা ভুল হইয়াছিল! "শুভকার্য সফল হইল না," "উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইল না," "ইতিহাসের রথচক্রের পুনরাবর্তন অসম্ভব হইল।"—এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় ফিরদৌসী যে উচ্চ আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, নিজের সামনে তাহাকে বলিদান দিতে কবি আর পারিলেন না—অন্ধ অদৃষ্টের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। মুখবন্ধের শেষ ছত্রগুলি হইতেও এরূপ তিক্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"আমি আর রাজাদের বিষয় বলিব না। অনেক হইয়াছে। রাজা ও রাজসভা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। শুধু শূন্য কথার মালা গাঁথিবার আমার প্রবৃত্তি নাই—অলস কথার বাঁধুনি দিয়া কোন কাজ করিব না। যুদ্ধবিরোধ, হত্যা প্রভৃতি লইয়া গল্প লিখিব না। প্রেমের পুঁথি থেকে মুখ ফিরাইয়া লইব। এই সব গল্প সবই মিথ্যা—সবই ধূলিসাৎ হইবে! এই যে সব বাছা বাছা বই—এরও ভিত্তি শুধু মিথ্যা ও কল্পনা।"

বাস্তবিকই রাজসভা সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ফিরদৌসীর ছিল। তিনি উহাতে আর কিছু কল্যাণকর দেখিতে পাইলেন না। পূর্বে তিনি যাহা পূজা করিতেন এখন তিনি মনের আবেগে তাহারই উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিলেন—যে সব জিনিষ তাঁহাকে প্রায় সমস্ত জীবন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলিকে 'মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত' বলিলেন। আমরা যদি ভাবিয়া দেখি যে কেন সমস্ত জীবনে তিনি তাঁহার গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বৃদ্ধ বয়সে এই সর্বহারা, দুঃখজীর্ণ কবির হৃদয়ে অন্ধকার না আসিয়া পারে না।

শুধু একটিমাত্র পথ খোলা ছিল—সে পথ মুসলমানের পক্ষে পরমেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন—তাঁহার ইচ্ছার নিকট নতি-স্বীকার এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা। এবার ফিরদৌসী সেই পথ ধরিলেন এবং স্বীয় কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে "ঈশ্বরের বিচিত্র এবং দুর্জ্ঞেয় নীতি"র উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত একটি গল্প বাছিয়া লইলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবি এখানেও নিজের প্রতি সততা অটুট রাখিলেন।

ফিরদৌসীর পরেও অনেক পারসী কবি ঐ গল্পে ভিত্তি করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন।

ইঁহাদের প্রায় সকলেই গল্পটির মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) আছে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন—ফলে গল্পটী অতীন্দ্রিয় প্রেম ও মিলনকে অবলম্বন করিয়া একটি মহাকাব্যে পরিণত হইল।

ফিরদৌসী পারসিক অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—সে যুগে তখনো তাঁহাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচলন হয় নাই। ইহা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার পূর্বে অদৃষ্টের আরও তীব্র ও নিষ্ঠুর কষাঘাতের প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী যুগে মঙ্গোলদের আক্রমণে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কিন্তু তৎপূর্বে নহে। ফিরদৌসী এখনো একেবারে ভাঙিয়া পড়েন নাই এবং তাঁহার এই কাব্যটির মধ্যেও প্রধান চরিত্রটি তাহার দোষগুণ আশা আকাঙ্ক্ষা রক্তমাংসের শরীর লইয়া অঙ্কিত হইয়াছিল এবং শাহনামার কতকগুলি বীরের চরিত্রের সহিত উহার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল—অবশ্য কবি ধর্মোন্মাদ পয়গম্বর পুরুষরূপে এই চরিত্রের উপর গূঢ় অস্পষ্টতার আবরণ টানিয়া দিয়াছেন। 'ইউসুফ ও জুলেখা'ই স্থবির কবির শেষ কাব্য। এই কাব্য গ্রন্থের কী পরিণতি হইয়াছিল তাহা আমরা একরূপ জানি না বলিলেই হয়। এ সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদই পাওয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকু নিশ্চিত যে কাব্য শেষ করিয়া কবি স্বীয় জন্মভূমি তুষ-এ ফিরিয়া যান। সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় কোন ব্যক্তি কবির উপর স্বর্ণবৃষ্টি (যাহা সুলতান মামুদের করা উচিত ছিল) না করিলেও, তাঁহার কাব্যখানিকে এরূপ মূল্যে কিনিয়া লন যে যে-অর্থের সাহায্যে কবির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইয়াছিল। প্রাচ্য দেশগুলিতে কবির এই কাব্যের সংবাদ একরূপ পৌছে নাই বলিলেই হয়। ইহার সম্বন্ধে আলোচনাও অতি অল্প হইয়াছিল। এই পুস্তকের কয়েকটি মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে—এই সব হইতে বুঝা যায় ইহার খুব প্রচলন হয় নাই—বা এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনাও উঠে নাই।

ঠিক এই নামে পারস্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবির একখানা কাব্য আছে। এই কবি পারস্যের সামন্ততান্ত্রিক ক্লাসিক সাহিত্যযুগের শেষে আবির্ভূত হন। আবদুর রহমান জামী কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত এই পুস্তক ক্রমশ ফিরদৌসীর 'ইউসুফ ও জুলেখার' স্থান দখল করিয়া বসে, ও লোকে ফিরদৌসীর পুস্তকটির কথা একেবারে বিস্মৃত হয়। কাব্যের উৎকর্ষের দিক দিয়া ফিরদৌসীর পুস্তকখানি জামী-র পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

মৃত্যুর পরেও ফিরদৌসী শান্তি পাইলেন না। স্বীয় জন্মভূমি তুষ-এ ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক তারিখ এখন জানা যায় নাই ও নির্ণয় করিবার কোন সুযোগও এখন হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর স্থানীয় মোল্লাগণ তাঁহার দেহ মুসলমানদের কারখানায় সমাহিত করিতে দিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলিলেন যে ফিরদৌসী সমস্ত জীবন ধরিয়া অপবিত্র পৌত্তলিকদের বিষয় গাহিয়া গিয়াছেন, এই সকল পৌত্তলিকের আত্মা নরকের আগুনে পুড়িতেছে। সুতরাং তাঁহার পুস্তক পাঠে পাপ হয় ও গোঁড়া মুসলমানদের উহা বর্জন করা প্রয়োজন। এমত অবস্থায় ফিরদৌসীকে তাঁহারা মুসলমানদের পবিত্র কবরখানায় সমাহিত হইতে দিতে পারেন না।

একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে এই ব্যাপারে তুর্ক অভিজাত

সম্প্রদায়ের গোপন হাত ছিল। তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রুর জনপ্রিয়তা চাহিতেন না এবং সর্বদা চেষ্টা করিতেন যাহাতে ফিরদৌসীর 'শাহনামা' জনসমাজে না চলে বা জনসাধারণ উহার অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি আগ্রহশীল না হয়। নচেৎ তাঁহাদের বিপদের সম্ভাবনা বর্তমান রহিল। এজন্ত কবির মৃত্যুর পরেও তাঁহার প্রতি সাধারণকে বিদ্রূপ করিবার ও সাধারণে যেন তাঁহার গ্রন্থকে 'পৌত্তলিক' বলিয়া বর্জন করে সেজন্ত যত্নশীল হওয়া বিচিত্র নহে।

ফিরদৌসীর একজন বন্ধু বুইদ্-এর শাসনকর্তা বক্সাউদ্দৌলার নিকট গিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলে তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন ও তাহার ফলে কবির নশ্বর দেহ সময়োচিত ক্রিয়া সহ মুসলমানদের কবরখানায় প্রোথিত হয়। হায় হতভাগ্য কবি! মৃত্যুর পরও দুর্ভাগ্য তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

ইহাই 'শাহনামা'র কবির জীবনচিত্র। অনেক ঐতিহাসিক গবেষক ঘটনার সামঞ্জস্য না দেখিয়া কবি সম্বন্ধে যে গল্পটি চলিয়া আসিতেছে (এই গল্প আমরা পূর্বে বলিয়াছি) উহা অনিচ্ছার সহিত বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জিনিসটা আরো ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন নাই—দেখিলে দেখিতেন কবির সত্যিকার জীবন।

কবি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে উহাতে কি দেখা যায়? এরূপ প্রশ্ন উঠিলে উহার সঠিক উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। একজন প্রতিভাবান্ শিল্পীকে একজন ধনবান ব্যক্তি একটি কাজ করিবার আদেশ দিলেন। শিল্পী সুনিপুণভাবে কার্যটি সমাধা করিলেন। কিন্তু সেই ধনবান ব্যক্তি কবিকে প্রবঞ্চিত করিলেন ও অঙ্গীকৃত অর্থ দিলেন না— সোনার পরিবর্তে রূপা দিলেন।

এই যে গল্প ইহা কোন পেশাদার সভাকবির রচনা হওয়া সম্ভব। মনে হয় তৎকালে কবিদের একটা সমবায় (Guild) ছিল। এবং এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য হইল যাঁহাদের আদেশে তাঁহারা কার্য করিতেন তাঁহাদের অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সতর্ক করিয়া দেওয়া— তাঁহাদের বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যে কবিদের সহিত ভদ্রতা ও উদারতার সহিত ব্যবহার করিবার প্রয়োজন—অন্তথায় কবি যদি অসন্তুষ্ট ও অপমানিত হন তাহা হইলে বিদ্রূপাত্মক কাব্য লিখিয়া কৃপণ ও অনুদার প্রভুর চরিত্র মসীলিপ্ত করিয়া প্রতিহিংসা লইতে পারেন।

ফিরদৌসীর বিদ্রূপ-উক্তিকে ভিত্তি করিয়াই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। কবিরা এরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যাহাই হোক বাস্তবিক যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সহিত কিংবদন্তীকে তুলনা করিলে (এখানে ফিরদৌসীর জীবনের সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত ঘটনা ও কথাগুলিকেই শুধু বিবেচনা করা হইতেছে) দেখা যায় যে বাস্তবই গল্প হইতে অনেক বেশী মর্মান্তিক। গল্পটা যত সুন্দরভাবেই প্রচারিত হইয়া থাকুক না কেন, শ্রেষ্ঠতা ও কাব্যের দিক দিয়া বাস্তবকে ছাড়াইতে পারে নাই।

কিংবদন্তী ফিরদৌসীর জীবনে তাঁহার ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থের বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আর বাস্তব সম্পূর্ণ অন্ত। বাস্তব ফিরদৌসীকে তাঁহার অভিজাত শ্রেণীর আদর্শবাদের একজন প্রচারক বলিয়া চিত্রিত করিতেছে—যে অতীত গৌরব ইরাণের ছিল তিনি আবার সেই যুগ ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, সেই যুগের স্বপ্ন দেখেন। 'শাহনামার' ধ্বংস বা প্রত্যাখ্যানের

অর্থই হইল কঠোর বাস্তবের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার আর্দশের ধ্বংস। কিংবদন্তীর ফিরদৌসীর ব্যথা অর্থদ্বারা দূর করা যায় কিন্তু সত্যিকার যে ফিরদৌসী—তাঁহার মনের ব্যথা শুধু বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়া পারস্যের প্রাচীন গৌরবের পুনরুত্থানেই সম্ভব। অপমানিত শিল্পীর পরিবর্তে আমাদিগকে পারস্যের প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধির বিরাট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হইতে হইতেছে। ইনি প্রাচীন আদর্শ ও সমাজশৃঙ্খলার পক্ষ হইয়া লড়িয়াছেন, ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে, বহুশতাব্দীর কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া দেখিতে গিয়া আমাদের মনে হইতে পারে ফিরদৌসী শুধু স্বপ্নবিলাসী ছিলেন ও তাঁহার রাজনীতিজ্ঞের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। কিন্তু দূরে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দর্শক হওয়া এক কথা আর ইতিহাসের দুর্বার গতির মুখে আত্মবলি দেওয়া আর এক কথা। ফিরদৌসীর ব্যক্তিগত জীবনের শোচনীয় কাহিনী জানা থাকিলেই তবে তাঁহার বিরাট কাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা সম্ভব।

এইরূপে পারসিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে, রাজনীতি লইয়া যে ফিরদৌসী ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল এবং তাঁহার আদর্শ চিরতরে ধ্বংস হইয়াছিল কিন্তু শিল্পী হিসাবে তাঁহার সফলতা হইয়াছিল অভূতপূর্ব। হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে তিনি শাহনামার শেষ শ্লোকটি লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিতা ঠিক প্রথম দিন যেরূপ ছিল এখনো সেইরূপই সজীব রহিয়াছে। কবি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থের মূল্য বুঝিতেন—কাব্যের শেষের দিকে তাঁহার গর্বসূচক বাণী মিথ্যা নহে—

> "যাঁহাদের বিদ্যা, বিবেচনা করিবার ক্ষমতা এবং বিশ্বাস আছে তাঁহাদের সকলেই আমার মৃত্যুর পর আমার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবেন। ভবিষ্যতের নিকট আমি মরি নাই কারণ আমি বাক্যের মধ্য দিয়া অমরতার বাণী ছড়াইয়া দিয়াছি।"

অন্য কোন কবির মুখে এরূপ বাক্য শুনাইত যেন অন্ধ আত্মম্ভরিতা। কিন্তু এখানে উহা ঠিক হইয়াছে। ইতিহাস ইহার সমর্থন করিতেছে। এবং আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী ও কবির দেশবাসীর সহিত সম্পর্কশূন্য লোকেরা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠন করিতে (হয়ত কবির সময়ের পারসিক অভিজাত সম্প্রদায়ে অস্থির অবশেষও এখন পাওয়া যায় না) তাঁহার অভিজ্ঞতাকে পুনরুপলব্ধি করিতে ও তাঁহার স্বরূপটি দেখিবার জন্য বিশেষ তৎপর হইয়াছি। হয়ত আমাদের মনোজগতের সৃষ্টি প্রকৃত কবির সজীবতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু কবিই ঠিক—তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোন গুপ্তশক্তির বলে, মানবতার শত্রু সর্বধ্বংসী কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, কালের উপর জয়ী হইয়া তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

ই. ই. বার্‌তেল্‌

অনুবাদঃ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

চতুর্দশপদী

(১)

করিনি সন্দেহ কভু মোর দৈন্যে তোমার করুণা
সত্য কি ছলনা কিংবা এ তোমার খেলা অপচয়,
অথবা মুহূর্তে কোন কালগ্রহে হবে কি পিশুনা
মিথ্যা অপবাদে মোর এ হৃদয়ে ঘটাবে প্রলয়।
ভাবিনি এ সব। শুধু নিই মেনে একান্তে তোমায় ;
তোমার বাঙ্‌ময় হাসি, নিরবতা, চঞ্চল চাহনি
হয়ত করে না কিছু নির্দেশ নির্জন এ সন্ধ্যায়,
তবু তারা মৃত্যুহীন সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের মণি।

নাই তাই ভয় হে প্রেয়সী, নাই প্রেমের বন্ধন,
নিবিড় বিশ্বাস ওগো এনে দিল এ কি স্বাধীনতা ;
স্মৃতি তাই নয় গুরুভার কিংবা ব্যর্থ রোমন্থন—
একটি গানের কলি বারবার আনে নানা কথা।
তোমাকে হারাতে পারি হারাবনা আমার কল্পনা—
জীবনে সে আসে কম, আসে যদি বিদায় দেবনা।

(২)

প্রেমের উন্মাদে যবে বিকৃত মস্তিষ্ক, কেন্দ্রচ্যুত
ভাবনার সবই যেন অনবস্থা, ঘোর মতিভ্রম
আনে শুধু মানসীর অসংলগ্ন অরূপ অদ্ভূত ;
সেখানে আশ্চর্য দেখি স্বতোৎপ্রেক্ষা ইন্দ্রিয় সঙ্কম—
নিগূঢ় অনেক তত্ত্ব, গূঢ়ৈষণা, গ্রন্থির বিপাক
উন্মোচন অতিসাধ্য ; প্রেয়সীর নানা নামে তাই
রূপ ও অরূপ মেলে, দেখি আর হয়েছি অবাক
জাগরণে সুপ্তি নামে, সুষুপ্তিতে জাগে বাসনাই।

দুইতীর, মধ্যখানে শূন্য কভু জমাট, নির্ভার,
মেঘ ও রৌদ্রের খেলা—সেখানে কে বাঁশরী বাজায় ?
নির্লিপ্ত হাওয়ার সাথী সেই সুর শুনেছি বাহার ;
দুটি তীর স্তব্ধ তবু। অনিশ্চিত এই মোহানায়
হে প্রেয়সী, দেখি কিবা দর্শকের তীব্র অনুভাবে,
একদা আরম্ভ যেথা আজ তার শেষ কোথা পাবে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোনো বিচ্ছিন্ন বন্ধুকে

দু-হাতে আমার ডিংনডানোর উচ্ছ্বাস,
অচলায়তন ভাঙবেই।
গুঁড়ো যদি হয় পুরানো মনের বিশ্বাস
ভয় নেই তাতে ভয় নেই।

ভয় নেই। এই দু-হাতে জীবন ছলকায়
পর্বত ভাঙা নির্ঝর,
ভরে দেবে এক সবুজের মহাবন্যায়
তোমার শূন্য প্রান্তর।

দু-হাতে আজকে ভাঙার গান কী দুর্বার,
তোমাকে সে ছিঁড়ে আনবেই।
পাষাণ কারার আশ্রিত ভীরু শঙ্কার
ক্ষুধিত আত্মা, ভয় নেই।

ধুলায় ধূসর দু-হাতে আমার উজ্জ্বল
রাজধানী এক উন্মুখ।
ধ্বংসের মাঝে ফুঁসে উঠে প্রাণচঞ্চল
নবনির্মাণ উৎসুক।

জনসমুদ্রে পাল তুলে দেবো সেইদিন,
নোঙর আজ বা ছিঁড়লই।
নিরুদ্দেশের যত স্বপ্নের সব ঋণ
দু-হাতে সেদিন শুধবই।

সুশীল জানা

কলকাতার বিকেল

বিকেলে আশ্চর্য আলো। সূর্য-দগ্ধ কালো-কালো দীর্ঘ-দীর্ঘ পথ
শহরের হৃৎপিণ্ড রক্তাক্ত নেশায় স্তব্ধ, মৃত্যুর শপথ।
মৃত্যু-ভয় ঊর্ণা জালে জীবনের চতুর্দিকে জটিল পাহারা
ট্যাক্সিতে অপ্সরা-ওড়া রাত-জাগা চৌরঙ্গির আজ কী চেহারা!

জানি আজ গানে মানে নেই
শঙ্কাতুর মন ভরে অচিরে পাবেই
পরিচিত মৃত্যুর আঘ্রাণ,
যৌবনের পান-পাত্র চূর্ণ খান-খান।

রুদ্ধশ্বাস জনতায় ঊর্ধ্বশ্বাস কর্দমাক্ত দেহ
স্থলে-জলে একাকার। কানে-কানে বলে গেল কেহ :
কুকুর-ভিক্ষুক ক্রমে বড়-বড় গাড়ি বারান্দায়
মৃত্যুকে ঘনাতে দেখি অনর্থক মত্ত ব্যর্থতায়।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্রোত

কোন গুণও নেই যার তার কোন বেগও নেই,
বেগের পাখা ঝাপ্‌টে মরে মনের পিঁজরায়,
জল ফুটছে জল ঘুরছে স্রোতের মহিমায়,
শিলাখানি আসন গেড়ে রয়েছে এক ঠাঁই।
সারা দেশের আসন জুড়ে নীলিমা-নীল শিব
ধ্যানতন্ময়, হিমের ভয়ে গোটায় প্রাণমন,
মরণ-নিঝুম জীবনে তাই নিদ্রা জাগরণ,
নিদ্রাঢালা নিথর জলে প্রবাহ নেই কি?

যুগে যুগেই শাসন জমজমাট এল পাঠান বর্গায়,
মুঘল ঘোড়ার খুরে খুরে, রাত না পোহাতেই
বণিক তোমার চরণ ধরি স্মরণ যেন রয়;
কোথায় যেন আঁধার ঠেলে প্রাণের কল্লোল।

আঁধারের কত গুহা ভেঙে ফেলে সমুদ্দুরে
কলরব তোলে গান,
ব্যাধিবিরোধের সংগ্রামে কুল ছাপায় সীমানা পেরোয়,
সেই তো মানুষ, সেই তো জীবনে নতুন সম্ভাবনা।

আকাশগঙ্গা দিনরাত কুলকুল,
মন দরিয়ায় চড়া পড়ল যে, ধান বুন্‌বে কে জাল ফেল্‌বে কে
মনের মতন যতনে বাঁধবে ঘর;
কেন বনের গহনে গৌতম যদি হৃদয় গহন খাঁখাঁ,
মুক্তি সাধনা মুক্তিকে বাদ দিয়ে
নির্বাণে গায় জীবনের নহবৎ?

সবার ওপরে মানুষ সত্য কই—ওগো বল না,
ও গো বল না চোখ যে জ্বলে গেল, দেহ ভেঙে গেল,
মনে ভরে গেল তবু আশা নিরাশার গানে,
দুঃখমোচনে দুঃখীজনের জিজ্ঞাসা : ও গো বলনা
সবার ওপরে মানুষ সত্য কই?

আবহমান কাল আমরা তুলেছি সোনালী ধান,
বুনেছি বীজ,
রাজদ্বারের ভ্রূকুটি ভয়েতে ভুলি নি,
শ্মশানে অন্নপ্রাশনের ভিড়ে প্রতিবেশীজনে মিলেছি,
বন্ধুজনের মিতালীতে মন ভরেছি।

মনপবনের নৌকা বেয়েছি, ঘাটে ঘাটে
কত সমুদ্রযাত্রা,
বাহুতে শক্তি পেয়েছি পৃথিবী ভালবেসে,
হেঁতালের লাঠি হাতে হাতে
রক্ষা করেছি বুক চেরা ধন, গাজনের গান সারারাত,
ধর্মরাজের ঢাকের বাদ্যি ডামাডোল।
বৈদান্তিক মহিমা শিবের চৌচির চুরমার,
বারবার হেসে ভেঙেছি,
বন্ধজলের বেদনার বুকে প্রাণের ঢল যে এনেছি।

এ মরণ কাঠি ছোঁয়াতে পারবে না
এ পাঁচিল তুলে থামাতে পারবে না
নতুন চেতনা ঘোষণার মাঝ পথে ;
কত শিব ভেসে গেল
ফেনিল প্রাণের দুকূল ছাপান স্রোতে।

অসীম রায়

মুক্তি

আমরা সকলে মিলে প্রাঙ্গনের ছাড়িয়ে সীমানা
ঘুম-ভিজে দুইচোখ মুছে ফেলে সবল দুহাতে
সহসা নিশির ডাকে বাইরে এলাম এতরাতে,
ছড়াতে চেয়েছি শুধু মুক্তিনীল প্রসারিত ডানা।
আমরা সকলে মিলে উচ্ছেদের নিয়ে পরোয়ানা,
শিশিরের শীতের নিষেধ পায়ে দলে পথ চলি,
প্রাণের গভীরে কাঁপে মুগ্ধমায়া শস্যের অঞ্জলি
শাণিত বর্শার মুখে সিংহদ্বারে দিতে যাই হানা।

সে এক কোকিল-ডাকা গ্রামের আঙিনা-ভরা ধানে
চোখের রৌদ্রের হাসি এমন আকুল করে ডাকে,
এমন আকুল করে ফিরে পাই সব প্রত্যাশাকে
সবুজ অঙ্কুর মেলে সে এক পৃথিবী জাগে প্রাণে।
আমরা বেঁধেছি সারি এবার সহস্র পদাতিক,
বর্শার ফলকে রোদ কুমারী কন্যার হাসি হাসে
উচ্ছেদের পরোয়ানা হাওয়ায় নিশান হয়ে ভাসে
নতুন লাঙল চাই মাটিতে স্বাক্ষর দিতে লিখে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

"বদ্ধ বিহঙ্গের দল হলো কি চঞ্চল—"

পিঞ্জরের মাঝে বদ্ধ বিহঙ্গের দল
হলো কি চঞ্চল,
উদয় আকাশে রজনীর অন্ধকার ভেদি
দেখা কি দিয়াছে আলো?
আজি কি হইবে দুর বন্ধনের যত দুঃখ
দুঃখের তিমির ঘন কালো?
দূরে আলো অন্ধকারে মেশা মলিন আকাশে
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের পাখার আওয়াজ ভেসে আসে—
"ওরে বন্দী বিহঙ্গের দল,
চঞ্চুঘাতে কেটে ফেল পায়ের শিকল,
পাখার ঝাপটে তোরা ভেঙে ফেল
পিঞ্জরের দ্বার
বিচারের কাল নাহি আর।"

দিকে দিকে অরণ্য কান্তারে বনে
ভূধরে সাগরে দূর গহীন গহনে
জনে জনে, মনে মনে, ভবনে ভবনে,
প্রচারিত হলো বাণী পবনে পবনে—
"ভেঙে ফেল পিঞ্জরের দ্বার
বিচারের কাল নাহি আর।"

গুন্ গুন্ শুরু হলো মৃদু গুঞ্জরণ,—ক্রমে কোলাহল
পিঞ্জরের মাঝে ওই বিহঙ্গের দল
নিষ্ফল
আক্রোশে আজও ফেলিবে কি শুধু অশ্রুজল?
অন্তরেতে জাগে নি বিপ্লব?
ভেসে আসে বারে বারে পাখার আওয়াজ—
"ওরে, দেরে মান, দেরে প্রাণ—দেরে তোর সব।"

"দ্বার ছাড়ো, দূর হও প্রহরীর দল!
আমরা বিহঙ্গদল স্বাধীন সবল,
ভেঙে ফেল পিঞ্জরের দ্বার।
বিচারের কাল নাহি আর।"
পিঞ্জরের মাঝে বদ্ধ বিহঙ্গের দল
হয়েছে চঞ্চল।

আশামুকুল দাস

ইঁট

সাধারণত এই সব গলির মুখে একটা মরচে ধরা মাথা-খাওয়া তেড়া-বেঁকা ডাস্টবিন বসান থাকেই। সেটাকে ঘিরে সারা গলির আবর্জনা সারাদিন ধরে ইতস্তত স্তূপীকৃত হয়ে প্রবেশ পথটাকে সঙ্কীর্ণতর করে রাখে। শহর পরিষ্কারের গাড়ীটা রোজ সকালে এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে—প্রথমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঞ্জাল গুলোকে একত্র করে ডাস্টবিনে ভরে; তারপর ডাস্টবিনটাকে কপি কলে টেনে ওপরে তোলে। গাড়ীর শব্দ পাওয়া থেকে ডাস্টবিন আশ্রয়ী একটা ঘেয়ো রুগ্ন কুকুর সেই যে বিলাপ করতে থাকে, যতক্ষণ না লাথি খেয়ে গাড়ীর ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়বে ততক্ষণ কিছুতে থামবে না। অবাঞ্ছিত আবর্জনার মত তাকে কিন্তু শহর পরিষ্কারের গাড়ীটা কোন দিন ভুল করে ধাপাব মাঠে নিয়ে গিয়ে ফেললে না—লাথি খেয়ে মাটিতে পড়েও কুকুরটা মরে না, কোন একসময় সামনের পা দুটো টেনে টেনে বুকে হেঁটে ঠিকই ডাস্টবিনে আশ্রয় নেয়। এক একদিন কারো পরিচ্ছন্ন স্বভাবের দরুণ ডাস্টবিনের মধ্যে আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হলে কুকুরটা পরিষ্কার স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে—হয়তো অধিকার-বোধে।

ডাস্টবিনটাকে ছাড়িয়ে গলির ভেতর দু'পা এগিয়ে একটা 'চাপা কল'—মুখ দিয়ে তার ঘোলা গঙ্গাজল অবিরত বার হয়ে হয়ে গলি পথটাকে পঙ্কিল করে রেখেছে। ওরি মধ্যে কখন সখন একটা রোঁয়া-ওঠা বেড়াল ছানা মরে ঢোল হয়ে থাকে, 'চাপা কলের' মুখ দিয়ে ঘোলা-জল অবিরাম নির্গত হয়ে গড়িয়ে এসে ঝাঁঝরি পথে 'সুইয়ার্সের' মধ্যে একটানা সুর করে পড়ছে। একটু রাতের দিকে এই বারিপাতের সুরের মূর্চ্ছনায় গলি-বাসীরা নদীতে জোয়ার ভাঁটার সংবাদ পায়।

সদর রাস্তা থেকে হঠাৎ গা-আড়াল-দেওয়া এই গলিটা একেবারে কাণা নয়—স্তিমিত কুঞ্চিত দৃষ্টি অপর প্রান্তের আলোর সন্ধান করছে যেন। যদি কোনদিন এই গলিতে আসেন তা হলে খেয়াল করে পা-ফেলে না-এগুলে কিছুদূর এসে খুঁটের চাবড়ায় আপনার জামা-কাপড় নষ্ট হবেই, গলিটা সুরুতে বাঁধান হয়েছিল : লাল ইঁট আর সিমেণ্টে কংক্রিট গাঁথুনী, সান-বাঁধান ঘাটের মত। এখন ঝাড়ুদারের ঝাঁটার আগায়, ইতর জনের লাথির তলায় (কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায়) গলির সান-বাঁধান বুকের হাড়-পাঁজরা ঠেলে ইঁটগুলো মাছের শুকনো মেরুদণ্ডের কাঁটার মত ঠেলে বেরিয়েছে—মাঝে মাঝে কোক্‌লা ইটের ফাঁকে নোঙ্‌রা জলে গলির সীমানায় থমকে দাঁড়ান আকাশটা সারাদিন উঁকি মারছে—ওপারের কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো দুলে দুলে তাতে আলোড়ন তুলছে।...মটর ট্রেনিং স্কুলের গাড়ী গুলোকে ঠেকাবার জন্যে গলিটার হাঁএর ওপর একটা লোহার বরগা গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই গলির বস্তিতে গত বিশ বছর ধরে নিবারণ বাস করছে। পোস্ট-অফিসের বিশ বছরের চাকরি নিবারণের—পিওন-গিরি : নিকেলের পুরু কাঁচের চশমা, পাঁশুটে রঙের

কোর্তা, সরুহুটো ঠাং—একটা ধনুষ্টঙ্কার রেখা ! বিটের ফিরতী পথে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের চাপে একফালি কুমড়ো, কনুই ঘেরা পুঁইশাকের মালা একগাছি—হাতের চেটোয় ধরা আধ পোয়া কুচো চিংড়ীর ঠোঙা থেকে রস গড়িয়ে কনুই বেয়ে টপে টপে ঝরছে—দুপুর রোদ্দুরে খেজুর গাছের নলির মুখ দিয়ে রস পড়ার মত। চিংড়ী মাছের ঠোঙা লুব্ধ একটা মাছি নাকের ডগায় আশ্রয় নিয়েচে। ডান হাত নেড়ে তাড়ালে রস ভেজা কনুইয়ে এসে বসে। অস্বস্তিতে বিরক্তিতে খিধেয় আর রাগে এক একবার নিবারণের ইচ্ছে হয় মাছের ঠোঙাটা রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—শক্ররা যত পারে খাক !

গলির মুখে ডাস্টবিনটা তখন রদ্দুরে পুড়ছে—ঘেয়ো কুকুরটা ডাস্টবিনের ত্রিভুজ ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে হাঁপাচ্ছে, তলপেটটা ধুক্‌পুক্ করছে—কৃষ্ণ চূড়ার ডালে বসা কাকটা ঠোঁট ফাঁক করে আছে, বোধ হয় দুপুর রদ্দুরে ডাকতে ডাকতে ওর গলা চিরে গেছে।...

গলিতে পা দিয়ে নিবারণ দেখলে, হাতের কুমড়োর ফালিটার প্রান্তদেশ বালি ঘা-এর মত বজ্‌গে উঠেচে। এতটুকু পথ আসতে কুমড়োর ফালিটা কি পচে গেল, না সে দেখে-শুনে পচা কুমড়ো কিনে আনল ? ছেঁড়া ঠোঙার ফাঁকে চিংড়ী মাছের ঘাড়-ভাঙা মাথাগুলোও রাঙা হয়ে উঠেছে। কপালে আজ অনেক দুঃখু আছে—পাঁচুর মা আজ আস্ত রাখবে না।

হঠাৎ নিবারণের ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে কুকুরটার ধুকপুকে পেট্‌টার ওপর উঠে দাঁড়ায়—পিলেটা ফেটে ছেত্‌রে যাক। অত কষ্ট করে বাঁচবার কি দরকার ? কিন্তু ঘেয়ো কুকুরের দাঁতের বিষে মানুষ পাগল হয়ে যায়—নিবারণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে ওঠে। নাকের ডগায় বসা মাছিটা তাড়িয়ে বলে, শালার কুকুরটা মরে না—নরকের জীব কোথাকার !

'চাপা-কলের' মুখটা শুকিয়ে গেছে—গেরিমাটির প্রলেপে আশ-পাশ চোয়াল-ভাঙা গালে চন্দন-চর্চিতের মত হয়ে আছে—রোদ্দুরের ঝাঁঝে পেতলের কলের মুখটায় কস্ ধরেছে। নিবারণের ছোট কপালটা হঠাৎ চিড়বিড় করে উঠলো—সরকারি পোষাকের আস্তিনটা দিয়ে ঘসে চুলকে নিলে। সারা দেহটা একবার চুলকে নিলে যেন ভাল হ'তো। গলির ডান দিকে একমাত্র পাকা ইমারতের দেওয়ালটা বড় মসৃণ— বস্তি আর পাকাবাড়ীর বাগানের মধ্যবর্তী এই গলি পথটার সীমানা নির্দেশ করে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাস্তরটার গায়ে কাঁচা গোবরের চাবড়া। পাকাবস্তীর সদর ঘরের ভেন্সান জানালাটার ফাঁক দিয়ে বিজলী পাখার ডানাটা নিবারণের চোখের ওপর কাঁপছে—নেশাখোরের মত নিবারণের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সামনে এগুতে এগুতে ডান হাতটা নাড়তে নাড়তে নিবারণ বললে, শালা !

বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে নিবারণের বুকটা হঠাৎ খালি হয়ে হু হু করে। বস্তিটা ছেড়ে সবাই চলে গেল নাকি—একেবারে সাড়া শব্দ নেই—বড়লোকের কথায় এত সহজে সব উচ্ছেদ হয়ে গেলি ! মর শালারা, এত করে বল্লুম, শুনলি না !

হঠাৎ বাঁশ-চেলা করবার মত শব্দ করে রামধনিয়ার মা রামধনিয়ার স্ত্রী লছমীকে গালাগাল করে উঠলো। একগোছা বাসন ফেলার আওয়াজ তুলে নিবারণের পাশের ঘরের ধোপাদের বেওয়া বৌটা ঝিমনো টিয়াটাকে আদর করলে, কেয়া, দানাপানি ছোঁতা নেই—এই ময়না ?

গেরস্তের হাঁড়ি-মারা কুকুরের মত গা ঘসে ঘসে টিনের দরজাটা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে মুচকি হেসে নিবারণ বললে, বনে গিয়ে এবার খুঁটে খাবে, ভাবনা কি !...

পাঁচুর মা খালি মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছিল—অঙ্গ শীতল করবার জন্যে— বাট্‌না-বাটা শিলের কোল থেকে নোড়া গড়িয়ে যাওয়ার মত। পাঁচুর মার যখন-তখন ভূমিশয্যা নেবার দরুণ মেঝের বহু জায়গায় সিমেণ্ট চটে গেছে। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, পাঁচুর মার পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে গিয়ে নিবারণ চমকে উঠেছে : মসৃণ মাংস হঠাৎ এত ধারাল কর্কশ হলো কি করে ? সিমেণ্টের চাপড়া নোনা শরীরে ধরে না।

নিবারণ জিগ্যেস করলে, পেঁচো কোথা ?

গায়ের কাপড় ঠিক করে পাঁচুর মা উঠে পড়ল—নিবারণের কথার জবাব দিলে না।

নিবারণ ফের জিগ্যেস করলে, পাঁচু কোথায় গেছে ?

পাঁচুর মা এবার ঝঙ্কার দিলে : যাবে আবার কোন চুলোয়—দেখগে কোথাও আড্ডা মারচেন !

তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন নিবারণ বাড়ী ফিরে পাঁচুর খোঁজ করে—তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন পাঁচুর মা ঐ একই ধরণের জবাব দেয়। ব্যস, এই পর্যন্ত ! তারপর ছেলে তার বাঁচলো কি মরলো, কি গোল্লায় গেল—নিবারণ তার খোঁজ রাখে না। পাঁচুর মা আজো তাই বুঝে উঠতে পারে না, পাঁচুর আড্ডার সন্ধান জানলে নিবারণের পিতৃকর্তব্যের কতখানি সমাধা হবে। পাঁচুর মার বিরক্ত লাগে নিবারণের এই একঘেয়ে কর্তব্য পালন আর তার এই একসুরে জবাব দেওয়া ! তবু কিন্তু ছেলেটা তাদেরই থাকে।

আজকে নিবারণ ছেলেব সম্বন্ধে যেন অনেকখানি সচেতন হয়ে উঠেছে—কেমন একটা মমত্ববোধ থেকে থেকে বুকের ভেতর ঘুলিয়ে উঠছে। চোখের আড়ালে, হেলায়-ফেলায় মানুষ আত্মজের জন্যে কেমনতর উদ্বেগাকুল বেদনায় অস্বস্তি বোধ করে নিবারণ : চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে তার শিক্ষা পেলে না, অন্ন পেলে না, ভাল সঙ্গ পেলে না—রাস্তা ঘাটে জন্মান নেড়িকুকুরের মত পরিচয়হীন, লাজুক। কেন ?

আজই অফিসের মনোজিৎ বাবু বলছিলেন : তোমাদের দারিদ্র্য তোমাদের স্নেহ-মায়া কর্তব্য-ভালবাসায় ঘুণ ধরিয়েছে। তোমরা খেতে দিতে পারনা বলে তোমাদের পুত্র পরিবার সমীহ করে না, ভালবাসে না, ভালবাসা প্রত্যাশা করে না। দিনের পর দিন বেঁচে থাকার বিড়ম্বনায় তোমরা সংসার কর—তাই মরলে তোমার পরিবার কাঁদে না। রুটিতে সেঁকো বিষ খেয়ে রাস্তায় কুকুরটা মরলে কুকুরীটা কি কাঁদে ?

কথাগুলো বড় ভাল বলেছিলেন অফিসেব মনোজিৎ বাবু। সত্যিই তো পাঁচু বা পাঁচুর মা তাকে ভাল বাসে না। সে-ও কই পাঁচুকে ভালবাসে না তো ! মরা-হাজা ঐ একমাত্র সন্তান তার—বাবা বলে কেউ যদি নিবারণকে সম্মান দেয় তো ঐ দেবে। ইচ্ছে করলেও ঐ পাকাবাড়ীর মালিকের মত নিবারণ তার পাঁচুকে আদর করতে পারে না—কাছে বসিয়ে দুটো ভাল কথা বলবার প্রবৃত্তি হয় না। বরং কেবল মনে হয়, ছুঁচোটা চোখের আড়াল থাকতে থাকতে একেবারে যদি অদৃশ্য হয়ে যায় তো আপদ বালাই দূর হয়—নিবারণের হাড়ে বাতাস লাগে, অন্তত একজনের ভরণ-পোষণের দুর্ভাবনা ঘোচে ! দিন দিন পাঁচুর ওপর মন তার বিষিয়ে উঠছে—ছেলেটাকে দেখ-মার ক'রতে ইচ্ছে করে।

মনোজিৎ বাবু বলছিলেন, তোমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হলে তোমার বলবার মত অন্তত তোমার সংসারটা থাকবে—ছেলে বৌ সবাইকে তুমি ভালবাসতে পারবে—তারাও তোমাকে

ভালবাসবে। ছন্নছাড়ার মত কেউ কাউকে এড়িয়ে চলবে না। তোমাদের গরীব রেখে সমাজের কত উন্নতি হচ্ছে, অথচ তিলে তিলে রক্ত দিয়ে এই সমাজকে তোমরাই বাঁচিয়ে রেখেছো—তোমাদের কোর্তার হাতে আঁটা আছে : Essential Public Service !

ছোট্ট বুকের পাঁজরাগুলো মনোজিতের কথায় ধাক্কায় ঢিলে-ঢিলা হ'য়ে যায়—সত্য উপলব্ধির মত হাত-পায়ের লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। আহা, পেঁচোটার ওপর বড় দুর্ব্যবহার করা হ'য়েছে !...

পঞ্চানন দোর গোড়ায় উঁকি মারছিল। পিতার অগোচরে পিতৃস্নেহের উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশা ক'রে এসেছে—রোজই এই রকম একটা অবসর খুঁজে আসে সে—নিবারণ তখন হয়তো তেল-চিটে মাদুরে দ্বিপ্রাহরিক আলস্য ত্যাগ ক'রছে। আজ পঞ্চানন সময়ের হিসেবে ভুল করে বসেছে।

পিতাপুত্রে দেখাদেখি হ'তে একটা বোবা অশ্বস্তি ফুটে ওঠে—পঞ্চানন হঠাৎ সরে যেতে পারে না—মাথাটা নীচু করে মনে মনে পিতৃশ্রাদ্ধ করে কিনা বলা যায় না।

নিবারণের স্তিমিত চোখে পুত্রস্নেহের দীপশিখা জ্বলে ওঠে—জড়িত কণ্ঠে ডাক দেয় : কাছে আয় !

পঞ্চানন ভয় পায় না—যদিও 'কাছে আসার' ফল কি হ'বে সে জানে। সামান্য কয়েক ঘা প্রহারের ভয়ে আজকের দিনের ক্ষিদের অন্নটা সে হারাতে রাজী নয়। পেটে খেলে পিঠে সইবে !

ধীর পদক্ষেপে পঞ্চানন এগিয়ে আসে—বাপের তুলনায় ছেলে স্বাস্থ্যবান, কাঠিন্যে কর্কশতায় রোদ-বৃষ্টি ঝড়-ঝাপ্‌টা খাওয়া মরচে-ধরা লোহ কীলকের মত। বাঁ-পায়ের হাঁটুর নীচে একটা ঘা তেল-চুপচুপে পেঁজা তুলোর প্রলেপে গলা গাওয়া ঘি-এর মত জ্বল জ্বল ক'রছে।

নিবারণের চোখ বাষ্পাকুল হ'য়ে ওঠে : রসীদ আলি দিনের চোট-খাওয়া সিংহ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর বিবর-প্রবিষ্ট, ভীত সন্ত্রস্ত। সে-দিনের রক্তাক্ত ইতিহাসের ধারা পাঁচুর মত ছেলেদের হাতে-পায়ের পোড়া ঘায়ে রস-সঞ্চার করে' রেখেছে—বারুদ-বিষাক্ত দুষ্টক্ষত শুকতে চায় না কিছুতে। গুলি খেয়ে বন্য জানোয়ারের মতো আপন ডেরায় এসে পাঁচু যখন কাতরাচ্ছিল, নিবারণ তার ওপর বেধড়ক্ প্রহার করেছিল : শালার ছেলে রাস্তায় পড়ে ম'রতে পারনি, এখানে এসেছো সোহাগ বাড়িয়ে বাপের সর্বনাশ ক'রতে।...সেদিন আহতের সংখ্যা গণনায় নিবারণের ছেলে হয়ত বাদ পড়েছিল ; কিন্তু কোলকাতার কোন গলির অখ্যাত বস্তির অখ্যাত বাপের অনাদৃত ছেলেটা ইতিহাস রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদীর গুলির আঘাত তার পায়ে যত না লেগেছিল, তার শতগুণ তার বাপের প্রহার বেজেছিল। নিজ কার্যকলাপের বিচার কিন্তু সে কাউকে ক'রতে দিতে রাজী ছিল না সে-দিন। যন্ত্রণায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোরে স্মৃতি বিস্মৃতির অবস্থায় পৌঁছে পাঁচু বলেছিল : শুয়ারকা বাচ্চা ! গালাগালটা যে সেদিন কাকে দিয়েছিল বোঝা যায়নি—নিবারণকে, না ভাড়াকরা সাম্রাজ্যবাদীর গুণ্ডাদের !

ক্ষীণবাহু প্রসারিত করে' নিবারণ ছেলেকে বক্ষপুটে টেনে নেয়। বুকের জির জিরে পাঁজরায় ছেলের মাথাটা ঘস্‌তে ঘস্‌তে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে—সে দিনের অনুতাপ কি আজ বাঁধ ভাঙলো !

মনোজিৎ বাবু বলছিলেন, অথচ বিপ্লব যখন আসবে তখন তোমাদের ছেলেরাই সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে—বেয়োনেট বারুদের সামনে বুক পেতে দেবে—যে ছেলেদের তোমরা ঘেন্না কর ; যাদের পেটে ধরার জন্যে মায়েরা ভগবানকে অভিসম্পাত দেয় দিনরাত !

একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে নিবারণ ধরা গলায় বললে, তোর ঘাটা কিছুতে সারছে না তো ! কি দিচ্ছিস ওতে ?

দেখ-মার খাওয়া কুকুরের মত পাঁচু বাপের মুখের ওপর পুরোপুরি চাইতে পারে না। একটু তফাতে থেকে এই মুহূর্তে নিবারণের উচ্ছ্বসিত পিতৃস্নেহের খাঁচটা লেজ নেড়ে পরখ করতে চায়। পাঁচুর মনে সন্দেহটা কিছুতে ঘুচতে চায় না। চোখ পিট্ পিট্ করে' আনুনাসিক স্বরে একটা উত্তর সে দেয়—সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঃ কুঁই-কাঁউ-কোঁ-ওঁ-ও !

পোড়া ঘাটা নিরীক্ষণ করে' নিবারণ বলে, ওতে সারবে না—চাঁদসীর ক'রতে হ'বে। সন্দেবেলায় আমার সঙ্গে যাস, নিয়ে যাব এক জায়গায়।

পাঁচুর মা এক ফাঁকে পিতাপুত্রের সস্নেহ মিলন দেখে ঠোঁট বেঁকায়—খুশিতে না, সন্দেহে, বলা যায় না। আজকে কোন দিকে সূর্য ওঠার দিশা পাঁচুর মা মনে মনে ঠিক করতে পারে না।

ওদের অফিসে যে স্ট্রাইক হবে এ খবর নিবারণ পাঁচুর মাকে এক সময় দিয়ে দেয়। একটা অত্যাশ্চর্য শক্তির শিহরণ অনুভব করে নিবারণ ঃ যতবার খবরটা যত জনকে জানান যায়, ততই যেন আনন্দ-উত্তেজনা !

কথাগুলো স্পষ্ট হয় না ঃ এবার দেখাবো মজাটা, চালাকি বেরিয়ে যাবে সব, হুঁ হুঁ !

হঠাৎ আক্রমণের মত মনে হয় কথাগুলো। নিবারণের স্ত্রীও মনে মনে পাল্টা খসড়া তৈরী করে।

নিবারণ বলে চলে, এতদিন কিছু বলিনি, মুখ বুজে সব সহ্য করেছি, এবার দেখাব মজা—ভাল চাও তো পথে এস বাপধনরা।

এর কি জবাব দেবে পাঁচুর মা ঠিক ক'রতে পারে না। হঠাৎ পাঁচুর বাবার এ আবার কেমন ধারা কথাবার্তা। পাঁচুর মা খোসা-ওঠা নৈনিতাল আলুর মত হাতের পায়ের চামড়া ওঠাতে থাকে।

নিবারণ ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ঃ জানিস্ তোর ছেলেটা যে অমন ধারা বয়ে গেল, লেখাপড়া কিছু শিখলে না, ভাল খেতে পেলে না, ভাল ব্যাভার পেলে না, কার জন্যে ? ঐ শালার চাকরির জন্যে। বেটারা নিজেরা মোটাসোটা মাইনে খাবে, আমাদের বেলায় যত বায়নাক্কা ! কেন, ভিক্ষে ? চালাকি ভেঙে দেব এবার !

নিবারণের দম আটকে যাবার মত হয়—নির্বিরোধ অল্পভাষী লোকটা যদি চোখের ওপর তপ্তখোলায় ধান ফুটে খই হবার মত হয়ে যায় তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

—হুঁ হুঁ এবার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব দেখে নিস্। মাথা ভারি করে' হাত-পা ছিনে হ'লে চলা যায় না। আমরা সব এক কাট্টা হ'য়ে গেছি, লোক সব বিগড়ে দেব।

বিস্ময়ে সন্দেহে নিবারণের দিকে চেয়ে চেয়ে পাঁচুর মা ভাবে, কেঁচোদের যদি ফণা হয় কখনো...ভিজে মাটির উপর পিঁপড়ের কামড় খেয়ে একদিন একটা কেঁচো কি লাফানই না লাফিয়ে ছিল, কি বীভৎস যন্ত্রণাদায়ক সে-নাচ ! শেষে বেচারী একটা চড়াই পাখীর পেটে গেল !

পাঁচুর মা শুধু জিগ্যেস ক'রলে, রামধনিয়াদের মত ধর্মঘট ?

তাদের সংগ্রামটা এত সহজে রূপ পরিগ্রহ ক'রবে এ নিবারণের মনঃপূত নয়—তারা যা করবে তার অব্যক্ত, অনন্তকল্পিত, বিরাট রূপের প্রকাশটা যেমন নিবারণের কাছে আচ্ছন্নকরা, তেমনি পাঁচুর মার কাছে থাকবে, তবেই না!

থতমত খেয়ে নিবারণ জবাব দেয় : হ্যাঁ, ধর্মঘট তো—তাতে কি, রামধনিয়া বলে কি মানুষ নয় ? পাঁচুর মা জবাব দিতে পারে না, কি কথায় কি কথা ? কে-মানুষ কে-মানুষ-না সে-বিচার করবার কি তার ক্ষমতা আছে! তবে রামধনিয়ার বৌটার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। মনে হয়, ওর স্বামী যদি ধর্মঘট না করতো তা'হলে বৌটার অত খোয়ার হ'তো না। যারা খেতে পায় না তারা কি মানুষ ? পাঁচুর মা বস্তীর কাউকেই মানুষ বলে মনে করে না। আর নিবারণের সংসার তো চলেই না।

বাঁখারির মত শরীরে লাঠির মত শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। পরিণত পরিবেশে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন গণ্যমান্য কেউ চোখে আঙুল দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে যাচ্ছে, অপরিবর্তনীয় বেশবাসে লোকটাই কেবল দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। গলির মোড় থেকে পাকাবাড়ীটার রোয়াক পর্যন্ত আসতে নিবারণের অনেকটা সময় লাগে—আত্মোপলব্ধির সমস্ত অনুভূতি পদদ্বয়ের গতিতে এবং শারীরিক প্রক্রিয়ায় অভিব্যক্ত হয়। নিবারণ জানে, ঐ রকে বসে বসে যে-ক'জন লোক আড্ডা দিচ্ছে তারা পোষ্ট-অফিসের ধর্মঘটের কথাই বলাবলি ক'রছে—এখনো নিবারণদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে ফষ্টিনষ্টি ক'রছে। নিকেলের চশমায় ওদের মনটা হুবহু প্রতিফলিত হয়।

অনেকটা অবজ্ঞাভরে নিবারণ ওদের পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করে। দরকার কি ওদের সঙ্গে বাজে তর্ক করে।

পাকাবাড়ীর মালিক রাধিকাবাবু পাকড়ে ধরেন : কি নিবারণ, অফিসের খবর কী ? তা হ'লে সত্যিই তোমরা ষ্ট্রাইক করবে!

আগ্রহ না দেখিয়ে নিবারণ জবাব দেয় : দেখা যাক্, কদ্দুর কি হয়—এখনো কথাবার্তা চলবে মিটমাটের।

একজন ফোড়ন দেয় : যদ্দিন চলে তদ্দিন ভাল—কথা ফুরলে নটে গাছও মুড়বে—মাঝখান থেকে এই বেচারাগুলোই মারা পড়বে। কি বল নিবারণ ?

শক্তিশালী চশমার কাঁচে প্রতিফলিত রবিরশ্মির দাহিকা শক্তি আছে—নিবারণের চশমার কাঁচে আগুন ঠিকরোয়, নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় : বাঁচলুমই বা কবে যে মারা পড়বো—তবু তো মেরে মরবো—মরে বাঁচবো!

জন-সভায় বক্তৃতার মত কথাগুলো ফস্ ফস্ করে উঠলো। রকের ভদ্রলোকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। নিবারণ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়। বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে নিবারণ খিঁচিয়ে ওঠে : বসে বসে সব ফুটানি মারবে, মারা পড়বে! যেন তোরা শালারাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিস্ ? গর্মেণ্ট বলে ভয় ধরে গেছে—যত সব দালাল কোথাকার!...

নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিবারণ আশ্চর্য রকমে সজাগ হ'য়ে ওঠে : তারা আজ সারা শহরের বিস্ময়! পথ চলতে চলতে কতদিন নিবারণের হাতের মুঠো দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—দাঁতে দাঁত ঘসে শক্তি শানিয়ে নিয়েছে। এক এক সময় নিবারণ নিজের মনে

হাসে: এখন শালারা তোয়াক্কা করবে!—কি বোকাটাই না ছিল নিবারণরা এতদিন, উঠতে বসতে কেবল দাঁত খিঁচুনিই খেয়ে এসেছে। হঠাৎ নিবারণের চোখের ওপর একটা ছবি ভেসে ওঠে—বছর পাঁচ-ছয় আগে বিট সেরে ফেরবার পথে দুপুর রোদ্দুরে পিচের রাস্তার ওপর মাল-বোঝাই একটা গাড়ীর মোষ হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, চাবুক হাতে গাড়োয়ান নেমে পড়ে গুঁতো মেরে ঠেলে-ঠুলে মোষটাকে যখন কিছুতেই ওঠাতে পারলে না, তখন এলপাথাড়ি চাবুক হাঁকরাতে লাগলো। ক্লান্ত মোষটার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে চাবুকের সপাং সপাং শব্দ, ঝাঁ ঝাঁ রোদের শব্দ হ'তে লাগল,—মুখের সফেন গাঁজলায় গাড়োয়ানের গলদঘর্মে গলাপিচের গন্ধে রদ্দুর গলে গলে পড়তে লাগল। নিবারণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেদনা-অনুভূতির আগুন ছুটতে লাগল। অতো মার খেয়েও মোষটার চোখদুটো থেকে আগুন ঠিকরোয়নি, নিবারণের স্পষ্ট মনে পড়ছে—বোবা প্রতিবাদে রক্তাক্ত চোখদুটো কেবল সজল করুণ হয়ে উঠেছিল। অতবড় সিংওলা জানোয়ারের কি সহিষ্ণুতা—মার খাবে তবু বন্ধ হবে না!

রোদের ঝাঁঝে নিবারণের চোখদুটো কাঁপ্‌ছিল থর থর করে। পর্দায় ছায়া-ছবি কাঁপার মত। কুড়ি বছরের ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে শেষ হয়ে যায়।

নতুন জীবনের অনাস্বাদিত পুলক সে উপলব্ধি করতে পারে—ভোর বেলায় দেখা দিগন্ত রেখার মত, সহজে পার হ'য়ে পৌছন যায় সে-সীমা রেখায়। প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নিবারণ থেকে থেকে শিউরে ওঠে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের হোমানল দুনিয়ায় কোন অন্যায়ই কি রাখবে না, কোন অশান্তি, কোন অবিচার!...

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই প্রতিষ্ঠা যেন তাদের ঘুণধরা জীবনের নতুন অবলম্বন। আশ্চর্য রকমের ঐকান্তিকতার সুর বেজে উঠেছে সবার মধ্যে—প্রতিদিনের সংঘবদ্ধ মিলন, সংকল্প গ্রহণ, জীবন-মরণ পণ কি মাদকতাপূর্ণ! মনোজিৎ বাবুর কথা শুনতে শুনতে হাড়ে ঝিম্ ধরে যায়। নিবারণ চোখ বুজে দেখতে পায়: বিগত কুড়ি বছর ধরে চন্দ্র সূর্য ওঠার মত একটি লোক ঝড়বৃষ্টিরোদ মাথায় করে গলি পথে বড় রাস্তার মোড়ে উদয় হয়েছে—কোন বিস্ময় কোন প্রশ্ন জাগাতে পারেনি কোন পথচারীর মনে—পথের ধারে খোঁটায় টাঙানো গোয়ালার গরুর মত। পাঁচুর মার প্রত্যেকটি সন্তানের অকালমৃত্যুর কারণ নিবারণ এখন বুঝতে পাবে—নিজের স্বাস্থ্যহানির কারণও। যুদ্ধের মাঝে সংসার-যাত্রার দুর্ভাবনায় দিশেহারা হয়ে নিবারণ ভগবানকে দিনরাত ডেকেছে: যুদ্ধটা থামিয়ে দাও, হে ভগবান; পৃথিবীতে শান্তি আন, আর না! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যদি পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় তো ভাল হয়—জ্বলুক আগুন দাউ দাউ করে, অনেক পাপ এখনো লুকিয়ে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে!

ইদানীং পাঁচুর মায়ের সঙ্গ নিবারণের বড় অস্বস্তিকর লাগে। সংসারের খুঁটি-নাটি অভাবগুলোকে নিবারণের চোখের ওপর তুলে ধরতে অষ্টপ্রহর চেষ্টা করছে সে—ছেঁড়া কাপড় ঘুরিয়ে পরার মত গৃহিণীপনা পাঁচুর মা ভুলে গেছে। সংসারে যে জিনিষটা নেই, সে তো চিরকাল ধরেই নেই। কিন্তু তার জন্যে এতদিন পরে পাঁচুর মার ক্ষোভ উথলে উঠেছে কেন—উঠতে বসতে নিবারণকে দুষছে! এক এক সময় নিবারণের মনে হয় পাঁচুর

মা তাকে সংকল্পচ্যুত করবার জন্যেই এমনি ধাবা করছে—ঘরের মেয়েমানুষটা শেষটা দালাল সেজে গেল!

সময় সময় নিবারণ ক্ষেপে ওঠে: অভাব, অভাব তার হয়েছে কি—কোন শালার অভাব নেই শুনি? তুই না পারিস সংসার করতে, চলে যা—

পাঁচুর মা জবাব দেয়: যা বললেই যাব! পরিবারকে পিতিপালন ক'রতে পারে না, আবার ফুটানী আছে! আমি বলে তাই জুতো-নাতি খেয়ে পড়ে আছি, অন্য মেয়েছেলে হলে কবে মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে চলে যেত!

নিবারণ নিজেকে সামলে নেয়—আর একটু হলে কেলেঙ্কারী একটা করে ফেলেছিল আর কি! মুখে বললে, বড়লোকের বউ হলেই পারতিস্।

কি মনে করে পাঁচুর মা চুপ করে যায়। নিবারণ ভাবে, দুঃখ কষ্টে পাঁচুর মার চেহারার বাঁধুনীটা কিন্তু বেশ আঁট-সাঁট গোল-গাল আছে!

ঝড়ো বাতাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওড়ার মত সারা শহরে ডাক বিভাগের ধর্মঘটের নির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়ল। নিবারণ ভেবে পায় না, এত প্রাচীরপত্র ছড়াল কারা। এ যুদ্ধের সে-ও একজন যোদ্ধা, তার কি করণীয় কোন কাজ নেই—তাকে কই ডাকা হলো না তো! মনে মনে নিবারণ মনোজিৎ বাবুর ওপর অভিমান করে। ঘুণাক্ষরে নিবারণকে জানালেন না সমর-আয়োজনের কথা! শহরের গায়ে ছেকাঁ দেওয়ার মত লাল ইস্তাহার জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। এক একটা অক্ষর বজ্রমুষ্টির মত বিস্মিত শহরবাসীর চোখের ওপর দুলছে। নিবারণের ইচ্ছে করে আজ সারারাত শহরময় হেঁটে বেড়ায—নিজের কানে শোনে শহরবাসী তাদের শক্তি নিয়ে কি বলাবলি করছে আজ!

বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার মত নিবারণ অনেক রাত্রি পর্যন্ত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াল। বিশ বছরের বাঁধা চাক্‌রিটা যে ছুটে যেতে পারে, একবারও মনে পড়লো না সে কথা, নেশা-করার মত ঘোর লাগে মনে। গত কুড়ি বছরের নিবারণকে নিবারণ যেন নতুন করে আবিষ্কার করে। মনে মনে এমন একটা শক্তির উপলব্ধি আসে যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে টেনে ছিঁড়ে থেতলে ফেলা যায়, অদ্ভুত শক্তি ছাড়া পাবার জন্যে গুমরে গুমরে উঠছে। থমকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত মুঠো করে নিবারণ আত্মশক্তির চেহারাটা দেখতে যায়: হঠাৎ চোখের সামনে কাঁচের গ্লাসে বিড়ির ধোঁয়া আট্‌কান একটা ছবি ভেসে ওঠে—রুদ্ধ ধোঁয়ার আক্রোশে স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসটা কেমন মলিন হ'য়ে গেল, সে অনেকদিন আগের কথা—কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে নিবারণ গ্লাসের মুখ খুলে দিয়েছিল, কে বলতে পারে গ্লাসটা হঠাৎ ফেটে গিয়ে অনর্থ বাধাবে না!

গ্যাস-পোস্টের আলোয় গলির মুখের আবর্জনাস্তূপ অদ্ভুত দেখাচ্ছে—এ্যাল্‌বামে ধরে রাখবার মত আলোকচিত্র, মহোময়। রুগ্ন কুকুরটা মুখ গুঁজে আবর্জনার সঙ্গে মিশে আছে, 'চাপা কলটার' মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে জল বেরুচ্ছে।

গলির ভেতর পা দিয়ে চোখতুলে সামনে এগুতে নিবারণ দেখলে, পাঁচু রাধিকাবাবুর বাড়ীর দেওয়ালে পোস্টার আঁট্‌ছে। পায়ের শব্দ পেতে সুট করে সরে গেল। নিবারণ

দাঁড়িয়ে পড়ল : ধর্মঘটী ডাক-পিওনের রুটীর লড়ায়ে দেশবাসীর সাহায্য চাই—শোষণের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামকে জয়ী করুন।

পুরোন ধোঁয়াটে খবরের কাগজের অস্পষ্ট কালো অক্ষরের হিজি-বিজির ওপর খাড়া দাগের লাল কালির আঁচড়—বুক চিরে রক্ত দেওয়ার মত। চেয়ে চেয়ে নিবারণের চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। . পাঁচুর জন্যে গর্ব অনুভব না-করে পারে না নিবারণ—ছেলেটা আচ্ছা তৈরী হচ্ছে, যতটা বখে গেছে ভাবা যায়, তা নয় তা হ'লে—লেখা-পড়া-শিখে-মানুষ না-হবার চেষ্টার জন্যে পাঁচুর ওপর নিবারণের আর কোন ক্ষোভ থাকে না। মানুষ হবার পথ যেন অন্য—নিবারণ ভাবে ছেলে তার বড় হ'বেই, সে আজ হোক, কাল হোক। নিবারণ প্রাণ ভরে ছেলেকে আশীর্বাদ করে—একেবারে বরদানের মত ঢালা আশীর্বাদ !...:

সারা শহরের চাঞ্চল্য নিবারণের গলিতে ঢেউ তোলে। সারাদিন অগণিত পায়ের উদ্ধত চলা-ফেরার বিরাম নেই—ফিস্ ফিস্ গুজ্ গুজ্ লেগেই আছে—পাঁচুর সাঙ্গ-পাঙ্গ সব। বাপের হয়ে ছেলেরা লড়ছে। সারা দিনরাত্রি কি যে ওরা করে বেড়ায় নিবারণ বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু ঘরের ভেতরটা বড় গুমোট করে থাকে সবসময়—পাঁচুর মাকে নিয়ে মুস্কিল বাধে যখন-তখন, ছেলের জন্যে আজকাল তার উদ্বেগটা অতিমাত্রায় বেড়েছে, বাপের জন্যে ছেলেটা আজ কাল বাড়িয়েছে—ছেলেটার পরকাল ঝর্ ঝরে হয়ে গেল ! তার পর খুঁটিনাটি অভাব নিয়ে অভিযোগ চলে উঠতে বস্তে।...

হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ে ভোর হওয়ার মত নিবারণের চালা ঘরে শহরের চোলাই করা সূর্যের আলো প্রবেশ করে। আড়মুড়ে নিবারণের ঘুম ভাঙে—হঠাৎ মনটা বড় খারাপ হ'য়ে যায়। চার হাত পাঁচ হাত ঘরে পা-মুড়ে হাত-মুড়ে শুয়ে হাই তুলে জেগে নিবারণের নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। প্রভাত-সূর্য এমন ম্লানরূপে দেখা দেয় কেন রোজ ? ছেঁড়া চিন্তার সূত্র জোড়া লাগে : ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, হাতে পয়সা নেই। মনেও জোর নেই—নিবারণ সংগ্রাম চালাবে কি করে—সব যেন মিথ্যে মনে হয়।

পাঁচুর মায়ের সামনে পড়বার আগেই নিবারণ বেরিয়ে পড়ে। আজ যে-কোন উপায়ে রেশন-এর টাকা সংগ্রহ করতে হবে, চুরি-ডাকাতি যে করেই হোক। মেয়েমানুষের নাক নাড়া রোজ সহ্য করা যায় না। তা ছাড়া খেয়ে বাঁচতে হবে।

সারাদিন নিবারণ অর্থ সংগ্রহের নামে ধর্মঘটের ঘাঁটিগুলো দেখে বেড়াতে লাগল। আশ্চর্য অবিচলিত সৈনিক সব—মেয়েরাও যোগ দিয়েছে—মাছি প্রবেশের পথ নেই, এমনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছে।

দু'একবার মনোজিৎ বাবুর সঙ্গে দেখা হলো নিবারণের—আশ্চর্য লোক—ফিস্ ফিস্ করে কি যে বলে যায় বোঝবার জো নেই—আর এমনি ব্যস্ত যে কথা কইবার ফুরসুৎ নেই। এক সময় ক্ষিদের কথাটা মনে হতে নিবারণের বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়—চাল-ডাল-আটা, পাঁচুর মা ! আচ্ছা, আজ পাঁচু ছোঁড়াকে তো কই কোথাও দেখছি না !

অনেকবার নিবারণের মনে হয়েছিল, মনোজিৎ বাবুকে বলে রেশন নেবার টাকার কথা—যা হোক কিছু ধার অন্তত। পরমুহূর্তে আবার কেমন যেন বাধাবাধা ঠেকল। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা তোলা উচিত নয়।

হাঁটতে হাঁটতে নিবারণ জি-পি-ও-র সামনে এল। মানুষে গাড়ীতে ঠাসাঠাসিতে জায়গাটা

মেলার মত মুখর হয়ে আছে। হঠাৎ পানা পুকুরে ঢিল পড়ার মত জনতা এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। নিবারণ তখন ডালহৌসি স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। কেউ বললে, গুলি চলেছে, কেউ বললে লাঠি পড়েছে, কেউ বললে ধর্মঘটিরা নিজেরাই বাধিয়ে তুলেছে: খুর দিয়ে কার নাকি গলা দু ফাঁক করে দিয়েছে—কেউ বললে, একজন ঢুকতে চেষ্টা করছিল, বাধা দিয়েছিল বলে মেয়ে ভলান্টিয়ারের হাত কামড়ে দিয়েছে।

সামনে এগুবার জন্যে নিবারণকে বিশেষ ধস্তাধস্তি করতে হলো না। এক সময় পিছ থেকে ঠেলা খেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হ'লো—ঠিক মনে করতে পারে না। পা দুটো তার মাটি ছুঁয়ে ছিল কি না। জি-পি-ও-টা হুড় মুড় করে নিবারণের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়লো, বা পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল—অভুক্ত উদর গুলিয়ে উঠে গা-বমি করতে লাগল—কান-মাথা চেপে ধরে নিবারণ রাস্তার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

জি-পি-ও-র সিঁড়ির ওপর কুকুর-ঠেঙানো হ'য়ে পাঁচুগোপাল পড়ে আছে—মাথা ফাটা রক্তে সিঁড়ির ধাপ ভিজে গেছে। হয়তো এখনো বেঁচে আছে ছেলেটা, তল পেটটা ধুক্ পুক্ করছে—জীবাত্মা খাবি খাচ্ছে উদরে।

নিবারণ উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে ছেলের ধরাশায়ী দেহটা কোলে তুলে নিতে যায়। জনতা বাধা দেয়। নিবারণ কত বোঝাতে চেষ্টা করে, ছেলে তার, সে-ই ছেলের বাপ শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস—তোমরা আমায় ছেড়ে দাও দয়া করে—শেষ বারের মত ছেলেটাকে আদর করে নিই, অনেক অনাদর করেছি ছেলেটাকে! প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নিবারণ সব থেকে হৃদয়হীন জায়গায় হৃদয় গলিয়ে দেয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঐ একটী মাত্র মুমূর্ষুকে ঘিরে অনেকগুলো মুমূর্ষু প্রাণ জেগে উঠেছে—আক্রোশে উদ্বেল হয়ে উঠেছে জনসমুদ্র। ছেলে নিবারণের সত্যি, কিন্তু তার মৃত্যুর জন্যে দুঃখবোধ আজ শুধু নিবারণের একার নয়, সকলের। রক্তবীজরা জন্মাবার জন্যে কল কল খল খল করছে।

নিবারণ পাঁচুগোপালের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। গলির মোড়টায় এসে থেমে গেল আর যেন পা উঠছে না—কোন মুখে পাঁচুর মাকে খবরটা সে দেবে? কার জন্যে তার ছেলে আজ প্রাণ দিলে, কার জন্যে বাঁ পায়ে গুলি খেয়েছিল—একি শুধু তার বাবার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যে? গলির ভিতরটা বড় থম্ থম্ করছে যেন—মনে হল এই মাত্র তাকে যেন একটা বস্তার মধ্যে পুরে বেধড়ক প্রহার করে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে—বুক-চাপা দীর্ঘশ্বাসে বুকের পাঁজরাগুলো বড় ঢিলে করে দিয়েছে। হঠাৎ চলমান কোন গাড়ী মাঝরাস্তায় ভেঙে পড়লো যেন। ঠক্ ঠক্ করে নিবারণের পা কাঁপছে। কেন তাদের পাঁচু মরতে গেল? এর উত্তর সে পাঁচুর মাকে কি বলে দেবে! নিবারণ যদি ধর্মঘট না করতো তা হলে কি আজকের দিনে পাঁচুর কপালে মৃত্যু ঠেকাতে পারতো? হঠাৎ নিজেকে বড় ছোট আর অপরাধী বলে মনে হয় নিবারণের।

গলির মুখে আবর্জনায় আকণ্ঠ ডাস্টবিনটার ওপর ঘেয়ো কুকুরটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দাঁত ঠুকে ঠুকে মাছির আক্রমণ ঠেকাচ্ছে—রুগ্ন ঘেয়ো দেহের বিষাক্ত জীবাৎসা খদস্তে শানিয়ে উঠ্ছে—এদিকে সারা দেহে মাছি ছেঁকে ধরেছে। কুকুরটার ব্যর্থ আক্রোশের বহর দেখে শোকাতুর নিবারণ স্থির থাকতে পারে না। হাতের কাছে আধলা ইঁট তুলে নিয়ে

ছুঁড়ে দেয়ঃ কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে বিলাপ করতে থাকে। চকিতে নিবারণের মনে হয়, ছেলেটা মরবার সময় অমনধারা নাকে কেঁদেছিল কি, না সিংহের বাচ্চার মত গর্জন করেছিল?

পাঁচুর মা অনেক আগেই খবর পেয়েছিল। নিবারণ যতটা ভয় করেছিল তার কিছুই প্রত্যক্ষ করলে না চালচলনে। বরং নিজের বিহ্বলতার জন্যে নিবারণ লজ্জিত হয়ে পড়লো। পাঁচুর মা কাঁদছে না কেন? শোকে ভোঁতা মেরে গেল নাকি পাঁচুর মা! বিচিত্র মেয়ে মানুষ বটে!

পাঁচুর মা কেবল জিগ্যেস করলে, রেশনের কি ব্যবস্থা হল আজ?

নিবারণ মাথা চুলকে বললে, না, কোথাও কিছু মিলল না। মাঝখান থেকে ছেলেটাই মারা গেল।

পাঁচুর মা কোন সাড়া শব্দ করলে না। নিবারণ ভেবে পায় না মায়ের প্রাণ এত কঠিন হয় কি করে?

দেশমান্য বরেণ্য নেতাদের প্রত্যক্ষ অনুরোধে এবং পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে পোস্টাল ধর্মঘট ভেঙে গেল। খবরের কাগজের যে-স্তম্ভে সমগ্র ধর্মঘটকে সফল করতে পাঁচুগোপাল দাসের আত্মবলির অমর কাহিনী ছাপা হয়েছিল, সেই স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে দেশ-নেতাদের স্বস্তিবাণীসহ ধর্মঘটের ব্যর্থতা ঘোষণা করা হল—কালো অক্ষরের চাপে পাঁচুগোপালের রক্ত-লেখা কাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সকল ধর্মঘটীই কাজে যোগ দিতে লাগল।

নিবারণ ভোর থেকে প্রস্তুত হলঃ নিকেলের চশমা, পাঁশুটে রঙ-এর কোর্তা, সরু দুটো ঠ্যাং—ধনুষ্টঙ্কার একটি রেখা! কর্তব্য, পুত্রশোক, জীবন সংগ্রাম, নানা চিন্তা মনে পাক খেয়ে উঠছিল। আজকের মত নিবারণের পাঁচুকে কিন্তু আর কোন দিন এত আপনার মনে হয়নি—'রসিদ আলি দিনে' আহত ছেলেটাকে সে নির্দয়ের মত প্রহার করেছিল—আজ অনবরত সেই কথা মনে পড়ে পুত্রশোকটাকে উদ্বেল করে তুলছে—নিজেকে নিবারণের এত অপরাধী আর কোন দিন মনে হয়নি! ছেলেটা মরে তার মায়ের শোধ নিয়ে গেছে।

তবু নিবারণকে আজ কাজে বেরুতে হল। টিনের দরজা ঠেলে বাইরে বেরুবার পথে পাঁচুর মা এসে বাধা দিল। চোখের চাহনীটা বরফ-দেওয়া মাছের মত করে জিগ্যেস করলে, কোথা বেরুচ্ছ এত সকালে আজ?

নিবারণ পাশ কাটাতে কাটাতে বললে, কাজে যাচ্ছি!

পাঁচুর মা কথাটা বুঝতে পারে না—অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, কাজ?

নিবারণ জবাব দেয় না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। মনে হয় মেয়ে মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

নিবারণ গলি পথে চলতে শুরু করে। ভাবে, ছেলে তার মরলো কিন্তু সরকারবাহাদুর কাজটা রাখলে, এইটেই তো আজ তার লাভ। এত সহজ কথাটা পাঁচুর মা বুঝতে পারে না কেন?

পেছন থেকে পাঁচুর মা বললে, যে-কাজের জন্যে খাবারের বদলে গুলি খাও, সে-কাজ নাই বা করলে ?

নিবারণ এগিয়ে যায়। কিছুদূর এসে আপনা হতে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে—পুত্র হত্যার প্রতিশোধ অদম্য হয়, হৎপিণ্ড ছিঁড়ে পড়তে চায়। সত্যিই তো অমন চাকরির মুখে লাথি মারা উচিত! পাঁচু কি মাগনা মরেছে, তাদের ছেলে বলে কি কোন দাম নেই ? না কক্ষনো সে আজ কাজে যাবে না লেজ গুটিয়ে। তার পাঁচু ফেলনা নয়।

কি মনে করে হাতের কাছে একটা আধ্‌লা ইঁট তুলে নিয়ে চোখ-কান বুজিয়ে সামনে ছুঁড়ে দেয়—

নিবারণ স্থির দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করে, উৎক্ষিপ্ত আধ্‌লা ইঁটটা কোথায় গিয়ে পড়ে!

প্রভাত দেবসরকার

বঙ্গভঙ্গ ও বাংলার ঐক্য

বঙ্গভঙ্গ আজ আর শুধু জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়, বঙ্গভঙ্গ আজ ইতিহাসের সিদ্ধ ঘটনার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাংলাকে বিভক্ত করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে অসংখ্য নির্বিবাদী হিন্দুও হঠাৎ মুখর ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। যাঁরা বলেন যে বাংলার অধিকাংশ হিন্দু বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিল তাঁরা ভুল বলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এমন দিন ছিল যখন বাংলার হিন্দু বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কল্পনায়ও আনতে পারেনি; এমন দিন হয়ত আসবে যখন বাংলার হিন্দু-মুসলমান আবার ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে; কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের বেতার-ভাষণের ঠিক আগে বাঙালী-হিন্দুর অধিকাংশ যে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ দেখি না। অথচ একথাও সত্য যে বঙ্গভঙ্গ সরকারীভাবে প্রচারিত হওয়ার পর বাঙালী হিন্দু উৎফুল্ল হয়নি। একমাত্র হিন্দুমহাসভার গোঁড়া সমর্থকদের ভিতরই যথার্থ উদ্দীপনা দেখা গেছে। হিন্দুমহাসভার আওতার বাইরে যে-অসংখ্য হিন্দু সাময়িকভাবে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাদের অনেকেই বিষণ্ণ মনে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বিষণ্ণতার কারণও আছে। বাংলার হিন্দু আজও বাংলাকে ভালবাসে।

বাংলার হিন্দুর সাধারণ গর্বের বিষয় ছিল প্রধানত তার বাঙালীত্ব, তার হিন্দুত্ব নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ততায় তার হিন্দুত্ব ক্রুদ্ধ সংহতির ঔদ্ধত্য নিয়ে জেগে উঠেছে—সাময়িকভাবে বাঙালীত্বের অর্থ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে; মনে হয়েছে যে সংস্কৃতির দিক দিয়ে, চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়ে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর দুস্তর দূরত্ব; মনে হয়েছে হিন্দু বাংলার ও মুসলমান বাংলার এক মন, এক প্রাণ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন সৃষ্টি করবার যথেষ্ট ভিত্তি নেই। এই উদ্ধত হিন্দুয়ানীর পাশাপাশি ছিল উদ্ধত মুসলমানীভাব। উদ্ধত মুসলমানী যাদের ধর্ম তারা দাঙ্গার বহুদিন আগে থেকেই প্রচার করেছে যে বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতি পৃথক, তারা প্রচার করেছে যে

প্রচলিত বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা, মুসলমানের বাংলা তৈরী করা তাদের ব্রত হয়েছে, তারা রবীন্দ্রনাথকে বাংলার কবি হিসাবে গ্রহণ করেনি, তাঁকে হিন্দু কবি আখ্যা দিয়ে নিজেদের নিজেরা বঞ্চিত করেছে। উদ্ধত হিন্দুয়ানী যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি, তখন হিন্দুবাংলা ও মুস্‌লিম বাংলা পৃথক—এ-মতবাদ বাঙালী হিন্দু ঘৃণার চোখে দেখেছে। হিন্দুযানী মাথা চাড়া দেওয়ার সাথে সাথে বিভেদের মতবাদ বহু হিন্দু উৎসাহের সাথে করেছে ও প্রচার করেছে।

উদ্ধত হিন্দুয়ানী যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনেক মুসলমান ও হিন্দুব ভিতর উদ্ধত বাঙ্গালীত্বও নিজের সত্তা বজায় রাখবার জন্য হঠাৎ যেন শেষ চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠল। রব উঠল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার। স্বাধীনতার অর্থ এখানে স্বাতন্ত্র্য—ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্রতা। বাঙালী এক জাতি—ভারতবর্ষ থেকে সে পৃথক—ভারতবর্ষের জবরদস্ত শাসন থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, স্বতন্ত্র হতে হবে—বিভক্ত বাংলা দুর্বল হবে, শক্তিশালী ভারতবর্ষের পদানত হবে—এই রব প্রচারিত হল আবুল হাশেমের মুখে, সুরাবর্দী-শরৎচন্দ্রের মুখে।

সাধারণ বাঙালী-হিন্দুর মনে হিন্দুয়ানী ও বাঙ্গালীত্ব দুয়ের বাণীই পৌচেছে; কোনটাকেই সে সর্বান্তঃকরণে অস্বীকার করতে পারেনি। তবু সাময়িকভাবে হিন্দুয়ানীর বাণীই প্রবল হয়েছে। বাঙালীত্বের দাবীকে সে অগ্রাহ্য করেছে—কিন্তু সে-অগ্রহণের ভিতর বিজয়ীর অহঙ্কাব ছিল না, নিরুপায়ের হতাশা ছিল। তাই বিষণ্ণতা। তাই মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অধিকাংশ হিন্দু সেই বিষণ্ণতার সাথেই গ্রহণ করেছে যে-বিষণ্ণতা কিরণশঙ্করের বিবৃতিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রশ্ন পেয়েছি আমরা দু'টি। প্রথম প্রশ্ন, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর কি পার্থক্যই বড়, না, তাদের ঐক্যই প্রধান? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাংলার সাথে ভারতবর্ষের স্বার্থের সংঘাতই বড়, না তার ঐক্যের বন্ধনই প্রধান? প্রশ্ন দু'টি আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব!

কিন্তু আলোচনার আগে একটি গোড়ার কথা মনে রাখতে হবে। সকল সমাজেই বিভেদ এবং ঐক্য একই সাথে থাকে। প্রত্যেক মানুষের সাথে প্রত্যেক মানুষের অনিবার্য বিভেদ আছে। অথচ কোন মানুষই কোন মানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়; সকল মানুষের সাথেই সকল মানুষের ভাবেব চিন্তার স্বার্থের অনিবার্য ঐক্য আছে। মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে-অনৈক্য তা-সত্ত্বেও, তাকে অস্বীকার না করেও, বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে, ঐক্যবদ্ধ জীবন গড়েও উঠেছে। কাজেই আসল প্রশ্ন এ-নয় যে, হিন্দু-মুসলমান বা বাঙালী-ভারতবাসী পৃথক না এক; প্রশ্ন এই যে, পার্থক্য আর ঐক্য যখন একই সাথে আছে তখন বিচাব করে দেখতে হবে যে কার মূল্য বেশী, কাকে আমরা প্রাধান্য দেব, পরিপুষ্ট করব—ঐক্যকে না পার্থক্যকে।

প্রথম প্রশ্ন নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আরম্ভ করা যাক। আমরা অনেকে গর্ব করি যে বাংলার ছ'কোটি হিন্দু-মুসলমান ভাই বোন একভাষা এবং এক সংস্কৃতির বন্ধনে জাতীয় অখণ্ডতা অর্জন করেছে। পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রভাবে বাংলাদেশের মুসলমান

সমাজের একাংশে রব উঠেছে যে ঐক্যবদ্ধ বাংলার ধারণা অলীক। বাংলায় দুই প্রাণ, দুই জাতি—এবং এই দুই জাতির দুই ভাষা, হিন্দু বাংলা ও মুসলমান বাংলা। কোন্ যুক্তিতে বাংলাভাষার ঐক্যকে অস্বীকার করা যায় ভেবে পাই না। এ-কথা স্বীকার্য যে বাঙালী মুসলমান উর্দু-শব্দ বেশী ব্যবহার করে। এই ধরনের তারতম্যের জন্য যদি ভাষার ঐক্যকে অস্বীকার করা সঙ্গত হয় তা হলে বাংলাভাষা মাত্র দুই নয়, বহু। বাংলার জেলায় জেলায় কথ্য ভাষার প্রচুর তারতম্য আছে। লিখিত বাংলাতেও বহু স্তর ভেদ আছে—অত্যন্ত সাধু এবং সংস্কৃত-বহুল বাংলা থেকে গ্রাম্য-কথ্য এবং বহু-বিদেশী শব্দ-পুষ্ট নানা ধরনের বাংলাই লিখিত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এই বিভিন্নতা সত্বেও বাঙালীর দৃষ্টিতে বাংলা ভাষা এক; তার জটিল বহুত্ব নিয়েই সে স্বপ্রতিষ্ঠ এবং বিহারী আসামী প্রভৃতি ভাষা থেকে পৃথক। বাংলায় উর্দু শব্দের আমদানী নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে, আক্ষেপ এবং মনোমালিন্য হয়েছে। কোন সূত্রের সাহায্যে এ-তর্কের কার্যকরী মীমাংসা করা কঠিন। এ-তর্কের সমাধান হতে পারে শুধু দরদের ভিত্তিতে এবং ভাষার প্রয়োজনের ভিত্তিতে। বাংলাভাষার যিনি দরদী সাধক তিনি যেখানেই অনুভব করবেন যে কোন উর্দু বা অন্য কোন বিদেশী শব্দের প্রবর্তন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সেখানেই সেই বিদেশী শব্দ প্রচলিত করবার তাঁর অবিসংবাদী দাবী আছে। বাংলা ভাষাকে যাঁরাই ভালবাসার চক্ষে দেখেছেন তাঁরাই এই সহজ সত্যটি অনুভব করেছেন। তর্ক উঠতে পারে যে কোন একটি শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে কি না এ-বিচার রুচির বিচার। রুচির বিচার সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সেই রুচিই গ্রাহ্য যে-রুচি তার মূল বিস্তার করেছে বাংলাভাষার দীর্ঘ ঐতিহ্যের মৃত্তিকায়।

বাঙালী মুসলমানের একাংশ নাকি এই ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে অসম্মত। তাদের মতে বৈষ্ণব সাহিত্য একান্ত হিন্দু আবেগে পরিপুষ্ট; লড়াই দুরন্ত মুসলমানী মেজাজের সাথে তার কোন আত্মার যোগ নেই। এই মতের ভেতর দিয়ে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, সত্য প্রকাশিত হয়নি। বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য হিন্দুমুসলমানের যুগ্ম সৃষ্টি এবং যুগ্ম সম্পদ। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বাংলাভাষার ঐতিহ্যকে যে অবিশ্রান্ত মমতার চোখে দেখেন তার তুলনা নেই। তিনি কথাপ্রসঙ্গে গোলাম কুদ্দুসকে বলেছিলেন, 'কয়জন জানে অন্ততপক্ষে চল্লিশ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবি আছে? না জেনে-শুনে জোর করে আলাদা কিছু দাঁড় করাতে গেলেই তো আর হয় না।' গোলাম কুদ্দুসের ভাষাতেই মন্তব্য করতে হয়, 'এই রকমের কিছু লোকই বোধ হয় সামাজিক বিকাশের পথে ধ্রুব নক্ষত্রের কাজ করে—এঁদের নিরভিমান স্বার্থশূন্য সাধনা দেখেই আমরা নানা প্রকার অপমৃত্যু এবং দুর্যোগের মধ্যেও দিগ্‌নির্ণয় করতে পারি।' এই ধ্রুব নক্ষত্রেরা যে দিকের সন্ধান দেন সে-দিক বাংলাভাষার, বাংলা সংস্কৃতির, বাঙালী জাতির অখণ্ডতার দিক। বাংলার লোকসাহিত্যে, পল্লী গীতিকায়, বাউল ও ভাটিয়ালী গানে এই অখণ্ডতার প্রকাশই সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে এ কথাই হয়ত বলা যায় যে বাংলার গণ-সাহিত্যের যে-ক্ষেত্রেই বহুর আশা আকাঙ্খা সহজ প্রকাশ লাভ করেছে সেখানেই বাঙালী হিসাবে বাংলার হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা গেছে। যে-সাহিত্য এদেশে যুগ যুগ ধরে নীরবে সঞ্চিত হয়েছে এবং বাঙালীর মর্মবাণীকে স্বচ্ছন্দে বহন করে চলেছে সে-সাহিত্যের আলোচনা যতই বাড়বে বাংলার হিন্দুমুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐক্য হয়ত ততোই

সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই ঐক্যের ধারা ও ভঙ্গীকে আবিষ্কার করা এবং তাকে আরও পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া আমাদের সাহিত্যিকদের একটি কর্তব্য। এই ঐক্যকে অস্বীকার করা এবং আঘাত দিয়ে তাকে ভাঙতে চেষ্টা করা দেশের অমঙ্গলের পথ।

যে সংস্কৃতি আমাদের মানস-জীবনে রস সিঞ্চন করেছে সেই সংস্কৃতির সৃষ্টিকে যেমন বাঙালী হিন্দুমুসলমান একত্বের সন্ধান পেয়েছে, তেমনই যে দ্রব্যসম্ভার আমাদের বাস্তব জীবনকে পুষ্ট করছে সেই দ্রব্যসম্ভারের সৃষ্টিতেও এ-দেশের হিন্দুমুসলমান ঐক্যের বন্ধন অর্জন করেছে। এই বন্ধনকে অস্বীকার করে বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি নেই; এই বন্ধনের স্বীকৃতিতেই তার মুক্তি। এ কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত বাংলাদেশ সহযোগিতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনের প্রতিটি সূত্রের পৃথক এবং বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ-প্রবন্ধে নেই। মুসলিম বঙ্গের কোন্ কোন্ দ্রব্য হিন্দুবঙ্গের বাজারে গ্রাহকের প্রতীক্ষা রাখে তার বিস্তৃত তালিকা দাখিল করবার প্রয়োজনও নেই। কয়েকটি বড় বড় তথ্য স্মরণ করলেই বাংলার অর্থনৈতিক ঐক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত বাংলাদেশে যে-চাল উৎপন্ন হয় তার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী মুসলিম বঙ্গের মাঠের ফসল। হিন্দু ও মুসলিম বঙ্গের ভিতর আজ যদি অসহযোগ আরম্ভ হয় তা হলে হিন্দুর বাংলা উপবাসীর আর্তনাদে করুণ হয়ে উঠবে। এ-দিকে মুসলিম বঙ্গের চাষী কাঁচা টাকার অভাব মেটায় পাটের পরিবর্তে, আর এই পাটের চাহিদা আসে পশ্চিম বঙ্গের মিলের তরফ থেকে। হিন্দুবঙ্গের মিলের সাথে মুসলিম বঙ্গের পাটের চাষীর সহযোগিতা বন্ধ হলে মিল ও চাষী দুয়েরই অবস্থা সঙ্গীণ হবে। আবার কৃষিজ সম্পদে যেমন মুসলিম বাংলা সমৃদ্ধ, খনিজ সম্পদে তেমনই হিন্দু বাংলা সমৃদ্ধ। মুসলিম বঙ্গের নূতন শিল্প হিন্দু বঙ্গের খনিজ সম্পদের আশ্রয় পেলে উপকৃত হবে। হিন্দু ও মুসলিম বঙ্গের এই যে পরস্পর নির্ভরতা, এর মূল্য সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেকে অস্বীকার করেছেন। হিন্দু নেতারা বলেছেন যে, হিন্দু বাংলার ধানের সমস্যা সাময়িক—পশ্চিমবঙ্গের লালমাটির মাঠ তাঁরা সবুজ প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন খাল কেটে—'দামোদর পরিকল্পনার' বিরাট সম্ভাবনা তাঁদের বিচ্ছেদ বুদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে। মুসলমান নেতারা বলেছেন যে পাটের চাষীর সমস্যা সাময়িক—পূর্ববঙ্গে তাঁরা পাটের শিল্প গড়ে তুলবেন—মুসলিমবঙ্গের পাট মুসলিমবঙ্গেই ক্রয় বিক্রয় হবে। দামোদর পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হতে বহুদিন—ততদিনে হিন্দু বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠবে। সাম্প্রদায়িকবুদ্ধি-দুষ্ট নেতারা বলতে পারেন, উঠুক না হাহাকার, তবুও এই অশেষ দুঃখের ভিতর দিয়ে আমরা মুসলমানের উপর নির্ভরতার দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাব। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতাকে দুর্যোগ মনে করেন না তাঁরা অবশ্য এই অশেষ দুঃখকে অর্থহীন নিগ্রহই বলবেন। মুসলিম বঙ্গে সমৃদ্ধ পাটের শিল্প গড়ে তুলবার যথেষ্ট উপকরণের অভাবে হয়ত মরিয়া হয়ে মার্কিন মূলধনের উপর মুসলিম নেতাদের নির্ভর করতে হবে। তবু হয়ত তাঁদের কেউ বলবেন, আসুক না মার্কিন বন্ধন, তবুত হিন্দু প্রভুত্বের আশঙ্কা কাটল। এ ধরণের চিন্তাকে শুভবুদ্ধি বলা যায় না, সাম্প্রদায়িক দুষ্টবুদ্ধিই বলতে হয়। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিভক্ত বাংলা দুর্বল হতে বাধ্য। চিন্তাশীল হিন্দুরা অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে পাকিস্তানী মুসলিম বঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল হবে এবং বিদেশী মূলধনের জবরদস্তি তাকে বিপর্যস্ত করবে; কিন্তু হিন্দু বাংলাও

যে দুর্বল হবে এ-সত্যটি সহজে তাঁদের মনে স্থান পায় না। এদিকে চিন্তাশীল মুসলমানেরা অতি সহজেই বুঝতে পাবেন যে হিন্দুবাংলা দুর্বল হবে এবং মারোয়াড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব তাকে অনেকাংশেই স্বীকার করে নিতে হবে; কিন্তু পাকিস্তানী বিভাগেব ফলে মুসলিম বাংলাও যে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হবে এ-চিন্তাটিকে তারা আমল দিতে নারাজ। মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধি যে স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার চাপে কোথাও তীক্ষ্ণ ও কোথাও পঙ্গু হয়ে যায় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা এখানে পাচ্ছি। সংযতবুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করলে এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে বঙ্গ-বিচ্ছেদের পথ বাঙ্গালীর জয়যাত্রার পথ নয়—তার পরাভবের পথ—হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত পরাভবের পথ।

খণ্ডিত বাংলায় দুর্ব্বল হিন্দুবঙ্গ মারোয়াড়ী মূলধনের পদানত হতে পারে, এ-বিপদের কথা আমরা বলেছি। এ-বিপদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভুল; এর প্রতিকার যে বাংলার ঐক্যের পথে, ঐক্যের সাহায্যে শক্তিসঞ্চয়ের পথে, একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিপদকে অস্বীকার করা যেমন ভুল, অতিরঞ্জনের দ্বারা একে বিকৃত গুরুত্ব দেওয়া তেমনই অসঙ্গত। প্রত্যেক সত্যই মাত্রা দ্বারা, যতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এই মাত্রা অতিক্রান্ত হলে সত্য জাতি-ভ্রষ্ট হয়ে মিথ্যায় পরিণত হয়। বাংলা ও ভারতের সম্পর্কের বিচারে প্রভুত্বের বিপদকেই যাঁরা একমাত্র বা প্রধান সত্যেব মর্যাদা দান করেছেন তাঁরা মাত্রাজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের যে-প্রস্তাব উঠেছে সে প্রস্তাবের মূলে আছে এই মাত্রাতিরিক্ত ভয়ের শাসন। বাংলার সাথে ভারতের কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত আছে একথা সত্য; কিন্তু আরও বড় সত্য এই যে বাংলার সাথে ভারতের স্বার্থের নিবিড় সংযোগ আছে। এই সংযোগের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এ-প্রবন্ধে একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু এই সংযোগের গুরুত্ব, এবং বাংলায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের বিপদ, সাধারণভাবে কয়েকটি তথ্যের সাহায্যে সূচিত করা কঠিন নয়। প্রথমেই বলে নেওয়া যেতে পারে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হলেই বাংলাদেশ ভারতীয় মূলধনের প্রভুত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে, এ-ধারণা ভিত্তিহীন। কোন দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হ'লেই পরাক্রমশালী অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে মুক্তি পায় না। তাছাড়া স্বাধীন বাংলারাষ্ট্র গঠিত হ'লেই যে-বিপদ আজ বড় হয়ে দেখা দেবে সে হল মার্কিন পুঁজিবাদীর প্রভুত্বের বিপদ। সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বাংলার গুরুত্ব এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই বাংলাকে কুক্ষিগত রাখবার সুবিধা পেলে আমেরিকার উৎফুল্ল হবার কারণ আছে। মার্কিন আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবাব মত যথেষ্ট শক্তি আজকের দিনে পৃথিবীতে খুব কম দেশেরই আছে—ঐক্যবদ্ধ সংহত ভারতের সে-শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের সে-শক্তি থাকবে এ-আশা করা যায় না। ভারতীয় পুঁজিবাদীদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে মার্কিণ আধিপত্যের দুয়াব খুলে দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নয। আরও নানা কথা এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করবার আছে। স্বাধীন বাংলার নিজস্ব দেশরক্ষার আয়োজন করতে হবে। অ্যাটম্ বোমার যুগে দেশরক্ষার টেঁকসই আয়োজন করা ছেলে খেলা নয়—বাংলাদেশের একার চেষ্টায় যথেষ্ট আয়োজন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আব যদি দেশবক্ষাব চেষ্টাতেই বাংলাদেশকে কাবু হতে হয়—গরীবেব ক্ষুধার অন্নে বিষাক্ত বোমা তৈরী করতে হয়—তাহলে দেশের সাধারণ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে দুর্দশার

অবধি থাকে না। শুধু দেশরক্ষার চাপেই স্বাধীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ক্লিষ্ট হবে তা নয়, ভারতের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হলে সাধারণভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে দুর্দশা দেখা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতার অবস্থা ভেবে দেখা যাক। বন্দর হিসাবে কলকাতার আশ্রয়ক্ষেত্র শুধু বাংলা দেশ নয়—বাংলার দুদিকে বহু প্রদেশকে আশ্রয় করে কলকাতার সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে এ সমস্ত প্রদেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে-যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেই কলকাতা তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। আজ যদি বাংলা দেশে ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কলকাতা বিহার-যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বহু প্রদেশেরই আশ্রয় হারাবে—কারণ ভারতীয় রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে এ সমস্ত প্রদেশ কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের বন্দরের উপর নির্ভরশীল হওয়া অযৌক্তিক মনে করবে। কাজেই বাংলার স্বাতন্ত্র্যের সাথে সাথে কলকাতার সমৃদ্ধির দিনও শেষ হয়ে আসবে। ভারতের সাথে বাংলার অর্থনৈতিক সংযোগের গুরুত্ব আরও নানাভাবে দেখান চলে—কিন্তু উদাহরণ হিসাবে এই কয়েকটিই হয়ত যথেষ্ট।

বাংলার ঐক্যের পথ এবং ভারতের সাথে বাংলার মিলনের পথ—দুইই মঙ্গলের পথ। এ-কথা স্বীকার করেও অনেকে বঙ্গ-ভঙ্গ এবং ভারত বিচ্ছেদকে সমর্থন করেছেন। যাঁরা বলেছেন যে বিচ্ছেদের দুঃখভোগের ভিতর দিয়েই ঐক্যের প্রয়োজন বাঙ্গালীর মনে, বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে গাঁথা হয়ে যাবে। হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতারা বলেছেন যে মুস্‌লিম বঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনের দায়েই আবার ভারতীয় রাষ্ট্রে ফিরে আসবে। হিন্দু মহাসভার যুক্তিতে কিন্তু দুর্বলতা আছে। হিন্দুমহাসভার নেতারা বলেছেন যে, পাকিস্তান হোক্ বা না হোক্, বঙ্গভঙ্গ চাই। অর্থাৎ মুস্‌লিমবঙ্গ ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করবার ইচ্ছা জানালেও বঙ্গভঙ্গের দাবী হিন্দুমহাসভা প্রত্যাহার করবে না। এর সরল অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মুস্‌লিম-বঙ্গ যদি কখনও হিন্দুবঙ্গের সাথে ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করে তবুও যতদিন হিন্দুমহাসভার আধিপত্য থাকবে ততদিন ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করবার জন্য সে বিশেষ উৎসাহিত হবে না—কারণ প্রবেশ করলেও বাংলার ঐক্য সাধিত হবে না। এ দিক্ থেকে হিন্দুমহাসভার মত ও পথের ভ্রান্তি সহজেই চোখে পড়ে। এ-কথা অন্তত সরল ভাবে প্রচার করবার প্রয়োজন আছে যে মুস্‌লিম বঙ্গের সাথে মিলিত হতে হিন্দুবঙ্গ উদ্‌গ্রীব, এবং মুস্‌লিম বঙ্গ যদি যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিতে সম্মত হয় তা হ'লে বাংলার ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার পথে কোন বাধাই স্বীকার করা হবে না। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মুস্‌লিম বঙ্গ একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই আবার হিন্দুবঙ্গের ও ভারতীয় রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হবে, তাঁদের যুক্তির একটি বিপদও আছে। এ-যুক্তির ভিত্তিতে হিন্দু-নেতারা হয়ত ভাবতে পারেন যে, মুস্‌লিম-বঙ্গকে যতই নানাভাবে উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত করা যাবে ততই তার 'শিক্ষা' হবে এবং পুনর্মিলনের ইচ্ছা তার প্রবল হবে। এ-মত শুধু ভুল নয়, বিপজ্জনক। এ মত প্রচারিত হলে মুস্‌লিম বাংলা হিন্দু বাংলাকে শত্রু হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হবে। ফলে হিন্দু বাংলা ও মুস্‌লিম বাংলার মাঝে বিরোধই পাকা হবে—মিলনের আশা পরাহত হবে।

যাঁরা বাংলা ও ভারতকে ভাল বাসেন তাদের সাধনা হবে সহযোগিতা-সুন্দর মিলনের সাধনা। তাঁরা বিশ্বাস করবেন সেই কথা যে-কথা দেশপ্রেমিক মুসলমান শিল্পীরা তাঁদের

বিবৃতিতে গভীর দরদের ভাষায় প্রচার করছেন—"সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ আজ যত দানবিক আকারেই দেখা দিক না কেন, সেটা সাময়িক; কারণ দেশের মাটিতে, সর্বসাধারণের সুখে দুঃখে, চাষী ও মজুরদের প্রাণধারণের কঠিন সংগ্রামে, শিল্পী ও সাহিত্যিকের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে—কোথাও তার শিকড় নেই।" তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিভেদের রাজনীতি—হিংসা ও আত্মহত্যার রাজনীতি; হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত বাংলার রাজনীতি—মহান সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের রাজনীতি, স্পন্দিত নবজীবনের রাজনীতি।

সেই নবজীবনকে আহ্বান জানিয়ে যাঁরা কর্মক্ষেত্রে আসবেন তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। যে শক্তি আজ বাংলাকে বিভক্ত করছে সে শক্তি বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগে শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির ভিতর দিয়ে বিভেদকে দৃঢ়তর করবার প্রচেষ্টা চালাবে। ধর্মের ক্ষেত্রে "শুদ্ধ প্রাচীনত্বের" প্রতি মোহবিস্তার করা হবে এই অন্ধ-শক্তির কাজ। প্রচার করা হবে যে যেসকল আচার ও প্রথা হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে তারাই হ'ল ধর্মের প্রাণবস্তু। নবজীবনের ধর্ম যাঁরা রচনা করবেন তাঁরা মানুষকে ডেকে বলবেন যে, প্রেমের ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যা কিছু আমাদের উন্নত করে তাই আমাদের ধর্ম; প্রেমের ভিতর দিয়ে সুন্দর এবং জ্ঞানের ভিতর দিয়ে সত্যের সন্ধানকে যা-কিছু বাধা দেয় তাই অধর্ম। তাঁরা প্রচার করবেন যে, আচারের ক্ষেত্রে মানুষের একমাত্র সার্থক প্রশ্ন হল—এই আচার বা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে আমার জ্ঞানের পথ বা মিলনের পথ কি উন্মুক্ত হচ্ছে? যদি না হয় তবে এ-আচার ধর্ম-বিরুদ্ধ। তাঁরা বলবেন যে যে-আচার মানুষের সাথে মানুষের প্রাণের ঐক্য, কর্মের সহযোগিতা বা সমাজের মিলনকে বাধা দেয় অবজ্ঞার সাথে সে-আচার বর্জন করেই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি দান করে। ধর্মের ক্ষেত্রে এঁদের পূর্বগামী হবেন চৈতন্য ও রামমোহন; চৈতন্য—যিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিকে ঐক্য দানের চেষ্টা করেছেন প্রেমের পথে, আর রামমোহন—যাঁর মিলনের সাধনা ছিল জ্ঞানের পথে। নূতন মানবিক ধর্ম শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সন্ধান করবে সহজ সুন্দর প্রকাশ। এই নূতন শিল্পের ভিত্তি হবে মানবিকতায়, জাতিগত অহমিকায় নয়। বাংলার চাষী ও মজুরের, বাংলার মধ্যবিত্তের জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামের সাথে এই নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কারণ বাংলার চাষী-মজুর ও মধ্য-বিত্তের আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রেরণা যতখানি প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোন আন্দো-লনেই ততখানি পায় নি। সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আরও এই কারণে যে,যে-সাম্প্রদায়িকতাকে ধ্বংস করে নূতন মানবিক ধর্ম ও সংস্কৃতি এগিয়ে যাবার পথ রচনা করবে সেই সাম্প্রদায়িকতা যে সমাজব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হচ্ছে সেই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবার আগ্রহ আমাদের চাষী-মজুর আন্দোলনের শিরায় শিরায়। আমরা দেখেছি যে বাংলা-সংস্কৃতির যে সুস্পষ্ট ঐক্য—যে ঐক্যকে ধারণ করে আছে সাহিত্য ও শিল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ধনোৎপাদন প্রথার নিবিড় সাহচর্য—সেই ঐক্যকে পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রভাবে এ-দেশের বহু মুসলমান অস্বীকার করেছে। এই অস্বীকৃতি-বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি কোন হঠাৎ অধঃপতনের ফল নয়; এ-অস্বীকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ দৈনন্দিন জীবনে স্বার্থের সংঘাত। বাংলাদেশের মুসলমান কৃষকের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন পদে পদে দারিদ্র্যের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেছে, হিন্দু জমিদার তখন স্বার্থের মোহে দরিদ্রের সমস্ত দুঃখকে ব্যঙ্গ করে অবিচল শোষণের নীতি চালিয়ে গেছে।

পাকিস্তানী আন্দোলনের বিভেদের মন্ত্র তাই সহজেই কৃষকের প্রাণে স্থান পেয়েছে। মুসলমান কৃষকের দুঃসহ জীবনের যে বাস্তব অভিযোগ সিদ্ধির পথ খুঁজে না পেয়ে অন্ধ আক্রোশের বশে অবচেতন মনে বহুদিন মাথা খুঁড়ে মরেছে, সেই বাস্তব অভিযোগই আজ সচেতন মনে নির্মম হিন্দু-বিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করেছে পাকিস্তানী প্রচারের প্রভাবে। বাংলার মুসলমান কৃষকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে-সত্য প্রকাশিত হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক বিশ্লেষণেও অনেকটা অনুরূপ সত্যেরই সন্ধান মেলে। বিদ্বেষের মূলে স্বার্থের সংঘাত থাকাটাই স্বাভাবিক। যে-সমাজব্যবস্থায় স্বার্থের সংঘাত তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌছোবে, সেই সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রেখে বিদ্বেষের সমাপ্তির পথ নেই। তাই বিভেদ-বুদ্ধিহীন মানবিক সংস্কৃতি সৃষ্টি যাঁদের ব্রত, বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নূতন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিও তাঁদের অনিবার্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। নূতন সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনকে স্বীকার করতে গিয়ে নূতন সংস্কৃতির প্রয়োজনকে অবহেলা করলে বা অপ্রাধান্য দিলে কিন্তু ভুল করা হবে। একথা স্বীকার করা সঙ্গত যে, বিভেদ বুদ্ধি এবং বিভেদের মতবাদ একবার জাগ্রত হলে যে কারণ থেকে তার উৎপত্তি সে-কারণ নিরপেক্ষ ভাবেই ক্রিয়া করবার শক্তি সে আহরণ করে। তাই বিভেদ বুদ্ধিকে এবং যে-মতবাদের ভিতর দিয়ে তার প্রকাশ, সেই মতবাদকে বিনষ্ট করবার জন্য আমাদের বুদ্ধি ও মতের ক্ষেত্রে সরাসরিভাবেই ঐক্যের বাণী প্রচার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এ-ধারণা ভিত্তিহীন যে এমন কোন সমাজ ব্যবস্থা বা ধনোৎপাদন প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব যে ব্যবস্থা বা প্রথায় বিরোধী স্বার্থের সংঘাতের কোন ক্ষেত্র বা অবকাশই থাকবে না। সামাজিক সম্পদের পরিমাণ যত দিন সীমাবদ্ধ থাকবে ততদিন যে-কোন সমাজব্যবস্থাতেই বিভিন্ন গোষ্ঠির ভিতর সম্পদের বণ্টন নিয়ে সংঘাতের প্ররোচনাও থাকবে। প্রবল বিভেদবুদ্ধিসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠির ভিতর স্বার্থের সংঘাত তাই যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই হয়ত অনিবার্য। তবু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় সৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্থক। সার্থক শুধু এই কারণেই নয় যে এমন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব যে-সমাজ-ব্যবস্থায় সহযোগিতার সুযোগ থাকবে বর্তমান সমাজব্যবস্থার চাইতে অনেক বেশী, সার্থক এ-জন্যও যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের কাজের ভিতর দিয়েই নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির পথ সুগম হবে, নূতন ঐক্যের প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যাবে এবং বিভেদ বুদ্ধিকে দমন করবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। আজকের এই বিভেদের দিনেও চাষী-মজুর আন্দোলনে উদ্দীপ্ত ঐক্যবোধ অন্তত সাময়িক ভাবেও বিভেদ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশিত হচ্ছে। সাময়িক উদ্দীপনাময় এই ঐক্যবোধকে সজ্ঞান ভাবে চালিত করতে হবে সহযোগিতার শাশ্বত ভিত্তি নির্মাণের কাজে। শিল্পের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সাময়িক আবেগকে সেই স্থায়ীরূপ দেওয়া সম্ভব যে-রূপে সে বর্তমানের সত্যকে ভবিষ্যতের সত্যে রূপান্তরিত করে এবং মুহূর্তের আবেগকে দীর্ঘকালের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলার চাষী-মজুর ও মধ্যবিত্তের আন্দোলনে যে ঐক্যের প্রেরণা তাকে অস্থায়ী অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকে উদ্ধৃত করে সংস্কৃতির স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা আমাদের সজ্ঞান সাধনা হওয়া প্রয়োজন। এ-সাধনায় নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বাংলার শিল্পীদের।

সত্যকাম দত্ত

জীয়ন্ত

(পুনরাবৃত্তি)

বিকালে বড় কুয়াতলায় পালাগানের আসরে আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় হল পাকার, যাকে শুধু সে মনে রাখে নি, জীবনে পরে খুঁজেওছিল। একদিনের আলাপে চিরদিনের তরে মনে দাগ কেটে রাখার মত মোটেই অসাধারণ নয় চেহারা বা কথাবার্তা। তবে ঠিক এরকম মানুষ পাকা আগে আর ত্মাখে নি। চরিত্রের স্পষ্ট প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য আর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ছাড়াও একটা মানুষ যে মনের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিতে পারে চলতি আলাপে মনের মত করে অজানা অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে, তখন এটা পাকার জানা ছিল না। পরে জেনেছিল, বড় হয়ে। শ্যামল জানা ততদিনে মারা গেছে।

শরীরটা ভেঙে গেছে, দেখেই টের পাওয়া যায়। চাবাড়ে চেহারার রোগা খাটো মানুষটা পাশে এসে বসলেও পাকার নজর পড়ত না, কথা যদি সে না বলত নিজে থেকে।

এ অঞ্চলে কেষ্টপালা জনপ্রিয়। কীর্তন জিয়াগান কথকতায় মেশাল দেওয়া শ্রীকৃষ্ণেরই লীলামৃত, তবে রাধাও নেই, কাঁদুনিও নেই। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধে পার্থসারথির কাণ্ডকারখানা নিয়ে কাহিনী, গীতার অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা পর্যন্ত সহজবোধ্য লাগসই এবং স্বস্তিকর গ্রাম্য দর্শনে পরিণত করা হয়েছে কেষ্টপালায়।

আমি মারি আমি রাখি
আমি দুখী আমি সুখী
আমিই নিমিত্ত সখি—

বিষাদিত অর্জুনকে নয়, উত্তরার গর্ভপাতে শোকাতুরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলা। তা হোক, আসল কথাগুলি এক, বরং চাষাভূষোর ভাষায় বলে মাথার চেয়ে মর্মস্পর্শী। কেষ্টপালা যাত্রা নয়, কোন চরিত্রই সেজেগুজে আসরে নামে না, খালি গায়ে কোমড়ে উড়ানি বেঁধে একজন প্রধান গায়ক আর তার দুজন সহকারী কথায় গানে পুরাণকে রূপ দিচ্ছে, তবু শুনতে শুনতে একটি চাষী বৌ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উত্তরার সর্বনাশে। কে বলবে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না শাউড়ী দ্রৌপদী ছেলের বৌ উত্তরাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে অসহ শোকের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। চাষী বৌটির নাকে নোলক, চোখে সুর্মা, কণ্ঠা ঢাকা আটো তেরঙা পিরাণ। আর অমন যে তার তীব্র সহানুভূতি উত্তরার জন্য তা জুড়িয়ে এল জীবন মরণের বড় মানের কথা শুনতে শুনতে, দেখা গেল গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মসগুল হয়ে সে শুনছে সৃষ্টির রহস্যের ব্যাখ্যা!

এসব ভাল লাগে না?

পাকা সংশয় ভরে বলে, মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো—

ও মেয়েমানুষের কাছে বলে তোমার আপত্তি! কিন্তু এ-তো সে ফিলজফি নয়, অন্নবিদ্যা

নিয়ে মুখ্যুকে তাক লাগানো। ওটা আমরা করে থাকি, আমাদের ভদ্রঘরে মেয়েমানুষরা মুখ্যু, আমরা বিদ্বান, আমরা ওটা পারি। এখানে ব্যাপার কি জানো, এসব চাষাভুষো পুরুষগুলোও সমান মুখ্যু !...

এই কথাই যেন শুনতে চাইছিল পাকা ! মুখ ঘুরিয়ে সটান মুখোমুখি হল সে।

অর্জুন মহাপণ্ডিত, ভগবান আবার এমন পণ্ডিত যে বেদব্যাসও তার কাছে মুখ্যু। অর্জুনের তো কথাই নেই। অর্জুনের কাছে স্বয়ং ভগবান যে ফিলজফি আওড়ালেন সেটা শুধু আমরা একচেটিয়া করে রাখব ? এসব মুখ্যু চাষাভুষো মেয়েপুরুষ একটু স্বাদ গন্ধ পাবে না ? আমরা তো দেব না, ওরা তাই নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো নয়, মুখ্যুদের চাহিদা মেটানো...

একথাও যেন শুনতে চেয়েছিল পাকা !

...ফিলজফি দরকার বেঁচে থাকার জন্য। যার যেমন সমাজে বাস সে তেমন ফিলজফি গড়ে নেয়।

পাকা কথা কয় না। একজনের কাছে এত কথা শুনে কথা না কওয়াটা তার স্বভাব নয়।

...এদের ফিলজফি অদৃষ্ট। মেয়েরা যত ছেলে বিয়োয় অর্ধেকের বেশী মরে যায় আঁতুড়ে নয় তো বড় হয়ে। আকাশের দিকে চেয়ে পুরুষরা জমি চষে, বৃষ্টি না হলে মরবে, বেশী বৃষ্টি হলে মরবে। এবার দেখছো তো অবস্থাটা? বন্যা ঘায়েল করে দিয়ে গেছে। শুধু এবছর নয় আর বছরও। বন্যার ধাক্কা সামলে ভাল ফসল ফলাতে একটা বছর বরবাদ যায়।

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পাকা নিজে মুখ না খুলে একজনের কথা শুনে যায়, এই ধরণের কথা ! এটা তার খেয়াল হয়েছিল পরে, শহরে ফিরবার পর, এক অবসর-মুহূর্তে।

শ্যামল জানার খড়ের বাড়ী। দুটি ভিটের ঘর বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে, একটি ভিটের দু'খানা ঘর সে সারিয়ে নিয়েছে, মোটামুটিভাবে। জীবনযাত্রা তার সহজ অনাড়ম্বর। একা থাকে, নিকট আপনজন বলতে এক ভাই, যে আজ দশবার বছর চাকরী নিয়ে বর্মায় প্রবাসী। মাঝখানে একবার মাত্র দেশে এসেছিল ছুটি নিয়ে, কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে ছিল। পিসী সম্পর্কে পাড়ার এক প্রৌঢ়া বিধবা রেঁধে দিয়ে যায়, নিজেও খায়। শ্যামলের চেয়ে তার নিজের নিরামিষ রান্নাই বোধ হয় বেশী পদের আর বেশী মুখরোচক হয়। শ্যামলের মধ্যাহ্নের ভোজন হল শুধু জলে সিদ্ধ করা কুচি করে কাটা একটু তরকারী, ছটাক খানেক ছোট মাছ, দু'তিন চামচ ঘরে পাতা দই আর একেবারে জাউ করে ফোটানো আধমুঠি পুরনো চালের ভাত। রাত্রের ভোজন দুধ আর খই। সন্ধ্যার আগেই পিসীমা ভাগে। এই জেল খাটা খুনের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর একদণ্ড থাকতে তার ভরসা হয় না।

বেঁচে থাকার জন্যই তার এই বিলাসিতা ! বঙ্গ-ভঙ্গ যুগের বোমারু দলের বিপ্লবী, বছর কয়েক আগে সরকার সদয় হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে—জীবন্মৃত অবস্থায়।

হ্যারিকেনের আলোয় তার পাঁশুটে ঠোঁটের হাসিও যেন ঈষৎ রঙীন মনে হয়: ওরা হিসেব করেছিল, বড় জোর দু'মাস ! ডাক্তার বাজী রেখে বলতে পারত, দু'তিন মাসের বেশী শ্যামল জানা পৃথিবীতে টিকতে পারে না, দু'মাস যদি টেকে তো সেটা হবে জগতের আরেকটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার ! নইলে কখনো ছাড়ে ?

দেশ জুড়ে আবার যখন নতুন করে সুরু হয়েছে সেই সময়? ও ইংরেজদের হৃদয় নেই, ওরা ড্যামকেয়ার করে সেন্টিমেন্ট। ওদের মত হিংস্র নেই, ধীর শান্ত হিসেবী হিংস্র ওদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিলাম, তের বছর ধরে আমায় ভেঙে চুরমার করেছে বলেই ওদের প্রতিহিংসা মিটেছে ভাবো! তাই ছেড়েছে আমায়? শ্যামল হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে, যেন সত্যই প্রশ্ন করছে, জবাব চায়!—দু'চার মাসে মরবই না জানলে কখনো ছাড়ত না। মরাই যখন নিশ্চয়, বাইরে এসে মরি। উদারতাও দেখানো হবে, বিনা যত্নে বিনা চিকিৎসায় মরলে দেশেরও একটা কলঙ্ক হবে।

পাকা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, শ্যামল যেন তার কথা বলছে। রাজনীতি সে বোঝে না, সম্প্রতি হৃদয় তার পুড়তে আরম্ভ করেছে ইংরেজ বিদ্বেষে শুধু এই জন্ত যে হাজার হাজার মাইল দূরের ছোট একটা দ্বীপের কয়েকটা লোক তার এতবড় দেশের কোটি কোটি মানুষকে শাসন করছে, দু'একদিন নয়, দেড়শো-দু'শো বছর ধরে। স্কুলে ইতিহাস পড়ায়, কিন্তু ইতিহাসের এক কথা মানেও সে বোঝে না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল থেকে, যতকিছু ঘটে এসেছে সব তার কাছে উদ্ভট অবিশ্বাস্য মনে হয়! জাহাজে করে একমাস দেড়মাসের পথ যে ছোট্ট দেশ, সেদেশ থেকে এসে, সারা দেশটা তারা দখল করল! একদিন কয়েক ঘণ্টায় যাদের সামান্ত কয়েকজনকে লোপাট করা যেত, খবর পৌঁছে আবার জাহাজে করে যাদের সাহায্য আনতে সময় লাগত দু'চার মাস, তারা খেলার ছলে পদানত করল দেশটা! তার মানেই আমরা ছিলাম বুনো অসভ্য, গরু ছাগলের মত, ইংরেজরা ছিল সভ্য বুদ্ধিমান মানুষ। যাই বলি আর যাই করি এ ছাড়া অন্য মানে হয় না। দু'একটা রাখাল যেমন গরুছাগলের পাল চরায়, দু'একজন ইংরেজ তেমনি আমাদের চরাচ্ছে।—

শ্যামল বলে যায়, তবে আমার মনে কিন্তু একটা খটকা আছে ভাই। আমি যেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম, তার তিন চারদিন পরে একটা ছোকরা ইংরেজ ডাক্তার আমায় আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করল। তার রিপোর্টের পরেই আমায় ছেড়ে দিয়েছে। আমার মনে হয়—

আপনার ছাই মনে হয়! সে ব্যাটা নিশ্চয় দেখেছিল আপনি দু'চার মাসের বেশী বাঁচবেন না—

উহুঁ, শ্যামল মাথা নাড়ে, সে ব্যাটা ইংরেজ হলে কি হবে, ডাক্তারির ড-ও বোঝে না। আমি মরব কি বাঁচব বুঝবার মত বিদ্যা তার ছিল না ভাই। একবার স্টেথস্কোপটা কানে লাগিয়ে আমার বুকটা দেখল, দু'চার মিনিটের ব্যাপার, বাস্ আর ডাক্তারিই করল না। আধঘণ্টা ধরে শুধু আলাপ করল, এদেশে এসেছে কত আশা আর পরিকল্পনা নিয়ে। এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সে বিপ্লব আনবে, বিনা চিকিৎসায় একজনকে মরতে দেবেনা, সারা দেশে হাসপাতাল গড়বে—

বাইরে তখন রাত্রি বেড়েছে, স্তব্ধতা সেটা জানান দিচ্ছে। কেষ্টপালার আসর বোধ হয় শেষ হল, ঢোলক করতালের আওয়াজ আর ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে মিশে শব্দালু জাগ্রত চেতনার মত ভেসে আসছে না।

—তাই মনে হয়, শ্যামল জানা বলে, হৃদয় বোধ হয় আছে, এসব উদ্দীপনাও ফাঁকি নয়। তবে ওতে আসল কথাটা কাটান যায় না। আমাদের পায়ের নীচে রাখা ওদের জন্ম-অধিকার,

এদেশটা ওদের ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি, এ বিশ্বাস ঠিক আছে। একেবারে আন্তরিক বিশ্বাস। না ভাই, ওদের আত্মবিশ্বাসে ফাঁকি নেই। শুধু বজ্জাতি দিয়ে কি পারত? ন্যাখো, বড় বড় ডাকাত পর্যন্ত বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হয়, কিন্তু তারা বজ্জাত হয় না, ফাঁকি দেয় না।

মাটির দেওয়ালে কুলুঙ্গি আছে, তাক বসে না। কাঁঠাল কাঠের বড় একটা জল-চৌকীতে কয়েকটি খাতা আর দোয়াত কলম।

—রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়? ঠিক কি যে হয়েছে—ব্যাপারটা জানি না। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবের অনেক খবর পাই। ওখানকার বইটই পাওয়া যায় না। ওরা যে ফিলোজফিটা নিয়েছে তাই কিছু কিছু পড়ছি। বেশীক্ষণ পড়তে পারিনা, চোখ কট কট করে, মাথা ঘোরে। শরীরে কিছু আর রাখে নি। আগে একটানা এক পাতাও পড়তে পারতাম না, পাতার মাঝামাঝি ঝাপ্‌সা হয়ে আসত সব, কপালের এখানটা দপ দপ করত। আজ-কাল তিনচার পাতা পড়তে পারি।—

পড়েন কেন? এত কষ্ট হয়—

না পড়ে বাঁচতে পারে মানুষ?

পাকা একটানা আট দশ ঘণ্টা পড়তে পারে। পরীক্ষার দু'তিন সপ্তাহ আগে থেকে সে একরকম দিবারাত্রি পড়ে, দৈনিক ষোল সতের ঘণ্টার কম নয়। একটু শুধু রোগা হয়ে যায়, নিজের সারা বছরের স্বাভাবিক জীবনটা মনে হয় স্বপ্নের মত। তাছাড়া, মাঝে মাঝে বিকেলে শুরু করে ভোর তিনটে চারটে পর্যন্ত পড়ে মোটা নভেল শেষ করেছে। বই পড়া সখের ব্যাপার, খেয়াল—বড়জোর পরীক্ষা পাশের জন্য দরকার। এখন মনে হয়, বই পড়াও যেন বেঁচে থাকার লড়ায়ের অঙ্গ। এ লোকটা জীবনের অধিকাংশ দিয়ে দেশের জন্য লড়াই করেছে, বই না পড়ে বাঁচা যায় না। মরণের দিন গোনা-গাঁথা হয়ে গিয়েছিল এই মানুষটার কয়েক বছর আগে, চূর্ণ দেহটার খাওয়াপরা চলাফেরা, হয়তো বা ওঠাবসাও, কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে সে আসন্ন মৃত্যুকে অন্তত কয়েক বছরের জন্য ঠেকিয়ে রেখেছে, কি দরকার তার লেখাপড়াব, আধপৃষ্ঠা পড়তে যখন জগৎ ঝাপসা হয়ে আসে মৃত্যুর মত? কিন্তু না, শ্যামল জানার দেহ-মন স্পষ্ট ঘোষণা করছে বই পড়তে পারার সংগ্রামটাও একসঙ্গে না চালালে সে মরে যেত!

কোটি কোটি লোক পড়তেও জানে না, অক্ষর চেনে না। তাদের কেউ কেউ আশী নব্বই বছর বাঁচে তো!

পড়তে জানেনা? কে বলল তোমাকে পড়তে জানে না? একজন পুঁথি পড়ে, রামায়ণ পড়ে, হাজার হাজার লোক শোনে। ওই হাজার লোক কি পড়ছে না পুঁথি, রামায়ণ? নিজের চোখ দিয়ে না পড়ুক, আরেকজনের চোখ দিয়ে তো পড়ছে! যেমন ধরো, রাতে আমি ভাল চোখে দেখি না। তোমায় একটা বই দিয়ে বললাম, পড়ে পড়ে শোনাও তো ভাই। তুমি পড়ে শোনালে। বইটা কি শুধু তুমিই পড়লে, আমি পড়লাম না?

পাকা শুধু মাথা নেড়ে দেয় বুড়োর মত, কথা কয় না, আরও শুনবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে। শ্রান্তিতে এদিকে মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে পড়েছে শ্যামলজানা। তার চোখের সামনে দোল খাচ্ছে লণ্ঠনের আলো আর কিশোর ছেলেটির মুখ। হাতের তালু পায়ের তলু

জ্বলে যাচ্ছে লঙ্কাবাটার জ্বালার মত দুর্বলতার ঝাঁঝে। দপ দপ করছে বুক। তবু সে কথা বলে। কাজের কথা, বলা দরকার।

একদিন বিপ্লবের কাজ করেছি, আজ শক্তি নেই। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েও জানার কাজ তো করতে পারি। জগতে কোথায় বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে, কেন হয়েছে, কি ভাবে হয়েছে।

পাকা নির্বাক।

—যেখানে চেষ্টা হয়েছে, যেখানে সফল হয়েছে—সব আমাদের তন্ন তন্ন করে জানা দরকার। কালীনাথ যাই বলুক, তোমাদের এখন থেকে ত অল্পে অল্পে জানবার বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। জগতে একটা নিয়ম আছে ভাই, নানা দেশে সে নিয়মটা নানারকম ঠেকে, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে গেলে—

শ্যামল জানা কাশতে শুরু করে। আরও অনেক কথা সে হয়তো বলতো, কিন্তু কাশিটা তার আয়ত্ত নয়। পাকা বসে থাকে পাথরের মূর্তির মত, পিসী এসে শ্যামলকে ধরে শুইয়ে দেয়। বিড় বিড় করে বকে পিসী। অনেক সে পাপ করেছিল, তাই তার এত যন্ত্রণা। দুধ খাইয়ে সাঁঝে সাঁঝে বাড়ী ফিরবে, তা নয় রাত ভোর করতে হবে তাকে। পুলিশ যদি আসে হঠাৎ ছেড়ে কথা কি কইবে তাকে?

সকালে সহরে ফেরার পথে পাঁচুর কাছে শ্যামলের সম্পর্কে অনেক কথা শোনে পাকা। ছাগল তাড়াতে পাঁচু ঘন ঘন সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়। বন ভেদ করা পথ, যে বনে বাঘ থাকে। পথ-ঘেঁষা এই বনের অংশ পার হয়ে হয়তো সিকি-মাইল আধ-মাইল ফাঁকা প্রান্তর, দূরে বন যেখানে ঘিরে আছে চোখে। এই ফাঁকটুকুতে পর্যন্ত মানুষ মাথা গুঁজেছে, জমি চষছে, গরু-ছাগল পুষছে, কুঁড়ে বেঁধে বসবাস করছে সপরিবারে। প্রতি বছর অনেক গরু-ছাগল বাঘের পেটে যায়, মানুষও যায় দু' একজন, তবু ভোরবেলা এই পথে ঘণ্টা বাজিয়ে ছাগলের পাল ভেদ করে সাইকেল চালাতে হয় স্থানে স্থানে, গরুর পাল দেখে নামতে হয় সাইকেল থেকে। ফাঁকায় ছড়ানো গ্রামে গরু ছাগল ছড়িয়ে থাকে, যার যার তার তার। নিবিড় হিংস্র বনের বুকের মাঝখানে স্বল্প পরিসর ফাঁকায় কয়েকটা গ্রামের গরু ছাগলকে একত্র দল বেঁধে রাখতে হয়। নয় তো হারিয়ে যায়, বাঘে খায়।

পাঁচ

চামারদের বস্তিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল অকস্মাৎ। ঘটনাচক্রের কি বিচিত্র গতি। একদিন নদীর ধারে অব্যবহার্য পড়ো জমিতে চামড়ার কারখানা বসায়, জঙ্গলে আমবাগানে চামারদের বস্তি পোড়ায় খুশী হয়ে সীতাপুরের রাজপরিবার ভেবেছিল যে ভগবান সত্যই দয়ালু, শূন্য থেকে এমনি ভাবে কিছু পাইয়ে দেন টানাটানির রাজভাণ্ডারে! ভীমশ্রী-তিলকের বড় দরকার ছিল কিছু টাকার, স্থায়ী রোগের মতই ছিল তার এই দরকারটা, মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে উঠত। চামড়ার কোম্পানীর কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে ভীমশ্রী-তিলক ঝাড়া দেড় ঘণ্টা গৃহ দেবতার পূজা করেছিল। তখন কে কল্পনা করতে পেরেছিল, লিটন ময়দানের দিকে গড়ে উঠবে শহরের ফ্যাশনেবল কোয়ার্টার, বেড়ে উঠে ছড়িয়ে

পড়তে চাইবে, এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্ত রকম বেড়ে যাবে জমির চাহিদা আর দাম এবং এমন অভিশাপ হয়ে উঠবে ওই মরা নদীর পোড়ো তীরের চামড়ার কারখানার অস্তিত্ব! দখিনা একটু পশ্চিম ঘেঁষা হলেই এদিকে দুর্গন্ধ যায়, যেদিকে বাড়বার জন্য উন্মত হয়ে আছে ফ্যাশনেবল এলাকা। শুধু এই কারখানাটার জন্য এদিকে ছড়াতে পারবে না নতুন শহর, শত শত বিঘা জমি চড়া দামে বিক্রী হতে পারবে না, নগদ টাকা আসবে না রাজকোষে! বাবা শালার বুদ্ধি ছিল না মোটে!—জয়শ্রীতিলক্। সেই এখন রাজা সীতাপুর এষ্টেটের।

কোম্পানীর নিরানব্বই বছরের লিজ্!

মোটে একশ' বিঘার লিজ্।

এবং চামড়ার কারখানা খুলবার, চালাবার, বাড়াবার স্পষ্ট ঢালাও অধিকার সমেত লিজ্। এই একশ' বিঘার আধ মাইলের মধ্যে কোনদিন যে কখনো জমির চাহিদা হবে তা'ও কল্পনাতীত ছিল এক যুগ অর্থাৎ বারো বছর আগেও। অমন কত অজস্র জমি, ঢাল, লালমাটির পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি শত শত বছর পড়ে আছে।

একশ' বিঘা নয় বরবাদ গেছে জলের দামে। কারখানার গন্ধে আয়ত্ত হাজার বারশ' বিঘা যে স্বপ্নের দামে বিক্রী হবার সম্ভাবনা নিয়েও বিক্রী হচ্ছে না, হবার আশাও নেই, এ জ্বালা কি সয়?

কারখানার মালিক কানপুরের মহম্মদালি আবদুরী ঈষৎ ভুঁড়িযুক্ত রোগা লম্বা পাকা ব্যবসায়ী, ব্যাপারের গতি চেনে। জানে যে তাকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হবেই কারখানা, কারণ নতুন যে শহর গড়ে উঠছে তার পিছনে বেশ জোরালো সরকারী সমর্থন আছে, বাড়ী যা হচ্ছে তার প্রায় অর্ধেক বড় বড় সরকারী চাকরের এবং সরকারের খাতিরের নেতাদের। শেষ পর্যন্ত লিটন টাউনের বিস্তার কোনমতেই ঠেকানো যাবে না। মহম্মদালি আবদুরী তাই জানিয়েছে ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনায় হিসাবমত যথোচিত মূল্য পেলে এবং কারখানা সরিয়ে নেবার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে উদারভাবে ন্যায্য দাবী ত্যাগ করতে রাজী আছে।

সুবিধা পেয়েছে, সে ছাড়বে কেন! এ অন্যায় শুধু যে অসহ্য ঠেকে জয়শ্রীতিলকের তা নয়, বড় বড় সরকারী অফিসার ও নেতাদের পর্যন্ত রাগ হয়। আইন যাদের তারাই যে মালিক আইনের—সেটা খানিক জেনেও অতটা স্পষ্ট করে জানত না মহম্মদালি আবদুরী।

তিনমাসের চেষ্টায় তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলিকে শিকারে নিয়ে যেতে পারল জয়শ্রী-তিলক—অর্থাৎ তার এস্টেটী কারবার যারা চালায় তারা। এত সময় লাগল এই জন্য যে আগে থেকে কার্লটনের মন ভিজিয়ে কাজ আদায়ের যথোচিত চেষ্টা হয় নি। অতটা ধরতেই পারে নি কার্লটনকে কেউ। চুপচাপ থাকে, আড়ালে থাকে, নিজে সোজাসুজি ঘা মারার বদলে নলিনীকে দিয়ে বা দেশী কোন অফিসারকে দিয়ে আঘাত হানে,—গোড়ায় সত্যই অতটা বুঝে উঠতে পারে নি সকলে! নিজের ক্ষমতা নিজের হাতে খাটানোর সুখ যে কেউ কর্তব্যের খাতিরে বাদ দিতে পারে—এটা ক্ষমতা খাটাবার সুখের মত্ততায় খেয়াল হয় নি কারো।

মন্ত্রী নয়, উকিল ব্যারিষ্টার নয়, ডবল এম, এ সেক্রেটারী নয়, এটা প্রথম খেয়াল করল জয়শ্রীতিলকের ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক ইন্দ্র ভট্টাচার্য। গৃহশিক্ষক হিসাবে ঢুকে ইন্দ্র

নিজেকে স্থাপিত করেছে, ছ' সাত বছর তার কোন আইনসঙ্গত স্বীকৃত বা ঘোষিত পদ নেই; তবু সে পিছনে থেকে প্রত্যেক পদস্থ লোকের কাজ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করে। লোকে, নিন্দুক লোকে, এক অদ্ভুত কাহিনী বলে, কুৎসিৎ কাহিনী। জীমশ্রীতিলক লাথি মেরে দূর করে দিয়েছিল ইন্দ্র ভট্‌চাজকে। অল্পবয়সী অত্যন্ত সুন্দরী একটি বোন ছিল ইন্দ্রের, এখনো আছে। ইতিমধ্যে বিয়েও তার হয়েছে ঘটা করে, কিন্তু স্বামীর খোঁজ কেউ রাখে না। জয়শ্রীতিলক কোনদিন ইন্দ্রকে ত্যাগ করে নি, বাপ মরা মাত্র সগৌরবে ফিরিয়ে এনেছে।

ইন্দ্র বলল কার্ল টন ব্যাটাকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না! দেখা গেল তার কথাই ঠিক।

শিকারে এসে হার্টলি দু'দুটো বাঘ মারল! একটা আসল বড় বাঘের ছোট বাচ্চা, আরেকটা সম্ভ প্রসবা স্ত্রীজাতীয় চিতাবাঘ, প্রায় পৌণে চার ফিট। এসময় মারতে হলে এরকম বাঘই মারতে হয়।

কার্ল টন মারল দুটো হরিণ। এসময় পাকা শিকারীর পক্ষেও এই খানিক রক্ষিত খানিক অরক্ষিত, খানিক আসল খানিক নকল, জঙ্গলে হরিণ শিকার করা বাঘ হাতী কুমীর শিকার করার চেয়ে বাহাদুরীর কাজ। কার্ল টনের জন্যই পোষা কয়েকটা হরিণ হরিণী মাসখানেক আগে বনে ছেড়ে দিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাত প্রায় আড়াইটের সময় খুবই ধীর শান্তভাবে কার্ল টন চামড়ার কারখানা সম্পর্কে ইন্দ্রকে ব্যবস্থার কথা বলেছিল, না বলে পারে নি, যতই হোক, সেও তো মানুষ!

এদিক থেকে খানিকটা চাপ দিতে হবে।

কি রকম চাপ?

এই কারখানাতে ফাইট হল, ফায়ার টায়ার লেগে গেল, দুচারটা মার্ডার জখম হল, লাইক দিস। ঠিক আছে।

ইউ আর গ্রেট!

কারখানায় আগুন দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইন্দ্র। তার লোকরা সেটা পেরে উঠল না। তাই বস্তিতে আগুন দিল তারা।

দুটো জ্যান্ত মানুষ আর কিছু চুরি করা চামড়া পুড়ে উৎকট গন্ধ ছড়াল অগ্নিকাণ্ড। শহরে গুজব রটল কাজটা মহম্মদালির। কারণটা মালিক-শ্রমিক বিরোধ নয়, মহম্মদালি ওদের মুসলমান করার চেষ্টা করছিল, ওরা রাজী না হওয়ার আক্রোশে বস্তিতে আগুন দিয়েছে!

যোগাযোগটাই বা কি আশ্চর্য! সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখল শহরবাসী—কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে, সাংঘাতিক দাঙ্গা। মসজিদের সামনে বাজনার ব্যাপার নিয়ে শুরু।

প্রায় চমকের মতই মোচড় খেয়ে সাম্প্রদায়িক আশঙ্কার শিরাটি টন টন করে উঠল শহরের মনে। কোথাও কিছু নেই, আচমকা। এবং অর্থহীন না হলেও উদ্ভট!

ভৈরব যেন ওৎ পেতে ছিল, সখেদে ঘোষণা করল, আমার অস্পৃশ্য হরিজন হিন্দু ভাইগণ—

নিজে তদন্তে এল কার্ল টন। মহম্মদালিকে জানাল যে ব্যাপার খারাপ দাঁড়িয়েছে, আরও গুরুতর দাঁড়ানোর সম্ভাবনা। কারখানার হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তার

জবরদস্তির বিরুদ্ধে আগেও বেসরকারীভাবে নালিশ এসেছে গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে। রাজা জয়শ্রীতিলক স্বয়ং এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন।

মহম্মদালি বলল, তুমি জানো মিঃ কার্লটন—

জানে বৈকি কার্লটন, মহম্মদালি নিজেই তো তাকে জানিয়েছিল! রেভাঃ ষ্টিফেনকে তার কারখানার লোকের কাছে যখন ঘেঁষতে দেবেনা বলেছিল, তখন জানিয়েছিল শুধু পাদরী নয়, কোন মৌলভী মোল্লাকেও তার কারখানা বা বস্তির এলাকায় ঢুকতে দেবে না। কাজে সে কি করেছে কে জানে!

মহম্মদালি বোকা নয়, সেও তো মানুষ ভাঙিয়ে পয়সা করেছে, পয়সা করার আশা রাখে। সে টের পায় তাকে সরতে হবে কারখানা গুটিয়ে শহরের সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণের খাতিরে এবং আপোষে মীমাংসা করতে হবে মূল্যাদি ক্ষতিপূরণের ব্যাপার। কিন্তু এ প্যাঁচ কেন? একখানা চিঠিতে শহর-সম্প্রসারণের প্ল্যানের কথা উল্লেখ করে তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতার আবেদন জানালেই সে ব্যাপার আঁচ করে কারখানা সরাবার আয়োজন করত, সে ক্ষেত্রে এত খাপছাড়া কাণ্ড ফাঁদা কেন? হিন্দুপ্রধান জেলা, শহরে কিছু মুসলমান আছে, বেশীর ভাগ যেমন গরীব তেমনি মূর্খ—একটু যারা ভাল অবস্থায় আছে গুনতি দু'দশজন, তারাও এই গরীব মূর্খ কটার ঘাড় ভেঙে চালায়, অন্য কোন বিত্ত প্রায় নেই। এটা খুব গরম জেলা। নেতারা হরতাল করবার অনুরোধ জানালে লোকেরা সারাদিন সভা করে, শোভাযাত্রা করে, বিলাতী কাপড়ের স্তূপ পোড়ায়, কোর্ট আদালতে আগুন দিতে চায়। চাষারা কথায় কথায় খাজনা বন্ধ করে। কিন্তু এ প্যাঁচের মানে কি? কার্লটন কিছু বাগাতে চায়, মোটা কিছু? ওর মেমটা কলকাতায় থাকে, ভীষণ খরচে। ঘর সামলাতে না পেরে নগদ মোটারকম কিছু দরকার হয়েছে কার্লটনের? কথাটা জোর পায় না মহম্মদালির মনে। ছোকরা ডেভিসের সম্পর্কে এটা ভাবা চলত, সে আচমকা বদলি হয়ে গেছে, ছোকরা হার্টলি এসেছে তার জায়গায়, ব্যক্তিগত অস্থায়ী লাভের হিসাব এদের একজনের কাছেও বড় কথা নয়, এরা স্বদেশপ্রেমিক খাঁটি ইংরেজ, এতো সম্ভব নয় যে মোটা ঘুষের খাতিরে হাজার হাজার মাইল দূরের ইংলণ্ডের স্বার্থ এরা কেউ ছোট করবে! এমনি যত দাও তত নেবে, ফলমূল হাঁস মুর্গী বোতল। বোঝাপড়া করে ঘুষ তো নেবে না সোজাসুজি!

তবু একবার চেষ্টা করে মহম্মদালি, জগতে অসম্ভব কি?—মিঃ কার্লটন, তোমার পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাতে নাকি হাঙ্গামা হচ্ছে? কোন ব্যাঙ্ক বল তো, তোমার চেক ভাঙাতে হাঙ্গামা করে? এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না, আমরা বিজনেসম্যান, আমরা বুঝি! বলতো কালকেই টাকাটা ক্যাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ও চেক আমি ঠিক করে নেব।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে কার্লটন বলে, কিসের চেক?

সুতরাং মহম্মদালি বুঝেই উঠতে পারল না কার্লটনের চালটা কি।

সেদিন মঙ্গলবার। পরের রবিবার একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন প্রায় একমাস আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল শহরে, একজন ভারতবিখ্যাত হরিজন নেতা, সামঞ্জস্যপন্থী ত্রিপুরারি হাড়ি, গান্ধীজির আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। এ জেলায় হরিজনেরা সংখ্যায় ভারি।

বাংলায় কেন, ভারতেরও কোন জেলায় এত হরিজন নেই। চামার বাগদী নমশুদ্রে জেলাটা ঠাসা।

তা, সম্মেলনটা হতে পারল না। হিন্দু-মুসলমানের হানাহানির ভয়ে পাঁচজনের একত্র হওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে রইল, পাঁচ সাতহাজার হরিজনের একত্র হওয়ার কথাই ওঠে না। তারা অবশ্য মানুষ নয়, জন নয়, নিছক হরিজন।

ক্রমশ

মানিক বন্দোপাধ্যায়

আইন ও সমাজ

আইন কি, আইনের বৈশিষ্ট্য কি এবিষয়ে বর্তমান যুগে অনেক বড় বড় আইনজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগে আইন জিনিষটি আমাদের এত সুপরিচিত, আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে আইনের সংস্পর্শ এত বেশী যে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই—আইনের এই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ বর্তমান সমাজের সৃষ্টি। আইন বলতে আমাদের মনে হয় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি যা আমাদের সরকার তৈরী করেছেন এবং যা অমান্য করলে শাস্তি পেতে হবে। জীবনের সম্পূর্ণ কর্মক্ষেত্র আইনের আয়ত্তাধীন। কালের অগ্রগতির সঙ্গে আইনের প্রসারও বেড়ে যাচ্ছে। এই আইন যে কে তৈরী করবে, শাসন-যন্ত্রের কোন বিশেষ অংশ এই কার্যে নিযুক্ত থাকবে, সেটাও আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। মোট কথা বর্তমান সমাজে আইনের অস্তিত্ব, প্রসারতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিশেষ নেই।

কিন্তু এই যে স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা, এটা বর্তমান যুগের আইন সমষ্টির মধ্যেই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যতই অতীতের সমাজ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা যায়, ততই দেখা যায় যে স্পষ্টতা অস্পষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ আইনসমষ্টির স্থলে নানা প্রকারের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্মের অনুশাসনের আবির্ভাব হচ্ছে। এক দিকে আইন, অপর দিকে সামাজিক আচার ও অনুশাসন—এদের ভিতর যে পার্থক্য আমরা এখন দেখতে পাই, যতই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় ততই এই পার্থক্য মিলিয়ে যেতে থাকে। প্রাচীন সমাজে আইনের রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল; ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এর রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। আইনের এইরূপ পরিবর্তন বিভিন্ন যুগে সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। আইনের রূপ ও সারমর্ম বদলানোর ইতিহাস মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র; সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা যদি আইনের রূপ ও সারমর্মকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আইন হচ্ছে সমাজকে সংগঠিত রাখবার একটি প্রধান উপায়। আইন বিশেষ ভাবে সমাজেরই সৃষ্টি, সমাজ ব্যতীত আইনের ধারণা করা যায় না। সমাজে নানাবিধ লোকের বাস; এই সব লোকের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত আকাঙ্খা অভিপ্রায় প্রভৃতি আছে। প্রত্যেকেই যদি নিজের অভিপ্রায় অনুসারে চলতে চায় তবে সমাজে সংঘর্ষের সৃষ্টি

হয়, কারণ একের অভিপ্রায় অন্তের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল হতে পারে। সুতরাং সমাজের গাঁথুনি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেককেই কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত অভিপ্রায় খর্ব করে চলতে হয়। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে তখন কতকগুলি নিয়মের উদ্ভব হয় এবং সেই নিয়ম যারা মানবে না তারা সমাজের শত্রু বলে পরিগণিত হয়। সমাজের প্রয়োজনে উদ্ভূত এই সকল নিয়মাবলীর ক্রমবিকাশের ও পরিবর্তনের পরিণতি হচ্ছে বর্তমানের সুনির্দিষ্ট আইন সমষ্টি।

অতি প্রাচীনকালে কুল বা গোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে সুসংগঠিত রাখবার জন্ত নিশ্চয়ই কতকগুলি নিয়মের উদ্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে সুপ্রাচীন কালে সমাজ বন্ধন দৃঢ় রাখবার জন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয় এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যও ঐতিহাসিকগণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত আমাদের মনে রাখা দরকার যে বর্তমান যুগে সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফলে মানুষ নিজের জীবন যতখানি নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম, অতি প্রাচীন যুগে ততখানি সম্ভব ছিল না। সজ্ঞান ভাবে উন্নতি বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা সমধিক উন্নত সমাজের বৈশিষ্ট্য। অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদে, কতকটা স্বতস্ফূর্ত ভাবেই প্রাচীন সমাজের আচার-ব্যবহার, অনুশাসন ও ধর্ম প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এবং সেই কারণেই স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা তাদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। একই দেশে একই সমাজে নানা প্রকার আচার-ব্যবহার ও অনুশাসন প্রচলিত থাকে। এক গোষ্ঠির লোক এক শ্রেণীর আচার ও অনুশাসন মানে, অন্ত গোষ্ঠির নিয়ম কানুন হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সব নিয়মকানুন নির্দিষ্ট ভাষায় লেখা থাকে না, মুখে মুখে বংশ-পরম্পরায় প্রচারিত হয়। দ্বিতীয়ত আচার ও অনুশাসন প্রচলিত করবার জন্ত কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই, পুরাতন নিয়ম বদলানোর জন্তও কোন নির্দিষ্ট প্রথা নেই। আচার গঠন ও আচার পরিবর্তন আপনা আপনিই চলতে থাকে, সমাজের প্রয়োজন অনুসারে। তৃতীয়ত সমাজজীবনকে ধর্ম অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে এবং ধর্মের অনুশাসন সমাজ জীবনকে গ্রথিত রাখে। প্রাচীন সমাজের এই সব বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান কালের আইনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু রূপে যদিও পার্থক্য এত বেশী, তবুও একটি বড় সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই—সেটি হচ্ছে ক্রিয়ার সাদৃশ্য। উভয়েরই উদ্দেশ্য সমাজ বন্ধনকে দৃঢ় রাখা।

প্রাচীন সমাজে ধর্মের প্রভাবের ফলে ক্রমশ পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে অন্তান্ত শ্রেণীর ওপর একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিপত্য শুরু হয়। সামন্ততন্ত্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে এই শ্রেণী-আধিপত্য সামাজিক জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। সামাজিক সংগঠন শ্রেণী-আধিপত্যের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়। এই সময় থেকে সামাজিক সংগঠনের যে গ্রন্থি সেই আইন-কানুনের রূপ ও ধর্ম ছুইএরই পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কৃষিকার্যের ওপর সামন্তপ্রথার অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। অথচ জমি মুষ্টিমেয় জমিদারের কবলে, কৃষকশ্রেণী জমির মালিক নয়। এই অবস্থায় জমি, জমিদার ও কৃষক—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করার জন্তে নতুন আইনের উদ্ভব হয়। বলা বাহুল্য, জমিদারশ্রেণীই এই আইন প্রণয়ন করে এবং তাদের স্বার্থই পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়। কৃষককে জমির সঙ্গে যুক্ত করে রাখা এই আইনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের যুগে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে

আইনের প্রণয়ন ও পরিবর্তন অনেকাংশেই সম্ভব হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রের প্রকারভেদ আছে, এবং কোন দেশেই সামন্ততন্ত্র আগেকার সমাজের পুরোহিত ও ধর্মের প্রভাব হতে মুক্ত নয়। সুতরাং আইনের মর্মের পরিবর্তন হলেও রূপের পরিবর্তন খুব হয় নি। লিখিত আইন কিছু হতে থাকে, কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য। সাধারণত কোন দার্শনিক বা ধর্মনেতা সমাজের প্রয়োজনকে ভাষায় রূপ দেন কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করে বা মুখে প্রচার করে। যেমন কনফুশিয়স তাঁর বইএর ভিতর দিয়ে চীনা সমাজের নিয়ম-কানুন অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট করেছিলেন। ভারতবর্ষে বৈদিক অনুশাসনও মনুসংহিতার স্থানও প্রায় একই রকমের।

পূর্বেই বলেছি যে বিধিব্যবস্থা, আইন-কানুন প্রভৃতির উদ্ভব হয় সামাজিক প্রয়োজন সাধনের জন্য। সমাজের প্রয়োজন কখনও এক থাকে না; প্রয়োজনের পরিবর্তন অনুসারে আইনের রূপ ও বিষয়বস্তু উভয়েরই পরিবর্তন হয়। তাছাড়া সমাজের প্রয়োজন কথাটা একটু ব্যাপক। সমাজে নানা শ্রেণীর লোক থাকে এবং শ্রেণীগত বৈষম্য অনুসারে প্রয়োজনেরও বৈষম্য হয়। সকল শ্রেণীর সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে এমন কোন আইনসমষ্টি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজে যে শ্রেণীর প্রভাব বেশী, আচার ব্যবহার ও আইন-কানুনের মধ্যে সেই শ্রেণীর প্রয়োজন পূরণেরই চেষ্টা দেখা যায়। এই সহজ সত্যটি মনে রাখলে রোম সাম্রাজ্যে যে আইনের বিকাশ হয়েছিল তার কারণ সহজেই বোধগম্য হয়। রোম সাম্রাজ্যে আইনের উন্নতি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তথ্য। মধ্যযুগে ও বর্তমান যুগেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আইন-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে রোমক আইনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। রোমে আইনের এত উন্নতি হওয়ার কারণ এই যে, সেখানের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই কৃষিপ্রধান সমাজে যে আইন অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে, বাণিজ্য-প্রধান সমাজে সেই আইন চলতে পারে না। কৃষিপ্রধান সমাজে সম্পত্তি প্রধানত জমি ও জমির ফসল; তাই জমি সংক্রান্ত আইনই সেই সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। বাণিজ্যপ্রধান সমাজে সম্পত্তির প্রকারভেদ অনেক বেশী এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপও অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্যবসা বানিজ্য প্রধানতঃ অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে; সম্পত্তির বেচাকেনা ও অন্যান্য উপায়ে হস্তান্তর প্রভৃতি নানা বিষয়ে আইনের প্রয়োজন হয়। রোমের আইনব্যবস্থায় আমরা এসব বিষয়ের প্রাধান্যই দেখতে পাই। সমাজে যে শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রাধান্য, তাদের প্রয়োজন অনুসারেই যে আইন রচিত হয় তার প্রমাণ রোমের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। দাসত্বপ্রথা ও অর্দ্ধ-দাসত্ব প্রথা (serfdom) রোমের আইনে স্বীকৃত হয়েছিল। আবার ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও যে রোমে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি সাধিত হয়নি তার প্রমাণও রোমের আইন ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। রোমের আইনে ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল; পরিবারের বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল এবং পরিবারের কর্তার খুব বেশী ক্ষমতা ছিল। বর্তমানে যে ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত, প্রাচীনকালে রোমে এমন ক্ষমতাই পরিবারের কর্তার আয়ত্তে ছিল। এই ক্ষমতার একটি বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, যদিও কালক্রমে এই ক্ষমতা খর্ব করা হয়। পারিবারিক বন্ধন যে সমাজে দৃঢ় সে সমাজের অর্থনীতি বেশীদূর এগোতে পারে না, কারণ সে সমাজে জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা নেই।

মধ্যযুগে ইউরোপে, সামন্ত-প্রথার আমলে আইনকানুন কি ধরণের ছিল সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েক কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রাচীন টিউটনিক জাতিসমূহের আচার ব্যবহার ও আইনকানুন সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন। টিউটনিকরা ছিল যোদ্ধার জাতি ; অর্থনৈতিক উন্নতি তাদের হয়নি ; তবে আইন সম্বন্ধে তাদের একটি ধারণা ছিল এই-যে, আইন সমাজের সৃষ্টি। ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের সৃষ্টি নয়। এমন কি তাদের দলপতি বা রাজাও ইচ্ছামত আইন তৈরী করতে পারে না। এই মনোভাব অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি ; রাজশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমাজ বা জাতি থেকে রাজার হাতে এসে পড়েছে। তবে টিউটনিক জাতির এই মনোভাবের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গণতন্ত্রের বীজ এতে উপ্ত ছিল বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগে কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত এই মতবাদের পুনঃপ্রচলন করেছেন ; তাঁরা বলেন যে আইন কখনও কয়েকজন লোকের কৃত্রিম সৃষ্টি হতে পারে না; আইন হবে সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সত্তার অভিব্যক্তি ; ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে জাতির প্রয়োজন অনুসারে আইন স্বতস্ফূর্ত ভাবেই গড়ে উঠবে। বলা বাহুল্য এই মতবাদ বাস্তব জীবনে অচল ; পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজের প্রয়োজন মেটাতে হলে সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আবশুক।

ইউরোপে সামন্তপ্রথার অবলুপ্তি ও পুঁজিবাদের প্রসারের ফলে সমাজের কাঠামো ভিন্ন রূপ ধারণ করে ; বস্ত্রবিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়। তার ফলে পুরাতন আইন নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নতুন প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়ে পড়ে, এবং আইনের সংস্কার সাধন করা দরকার হয়, এবং রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধি পায়। সামন্ত-প্রথার আমলের আইন থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইন কি করে বিকশিত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহারণ হচ্ছে সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের আমলে আইনের সংস্কার। পুরাতন যুগের বিধিনিষেধ ভেঙে গিয়েছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করা, দ্রব্য চলাচলের অবাধ সুযোগ দেওয়া, চুক্তির মর্যাদা স্বীকার করা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর চার্চের বাধা তুলে দেওয়া এসব অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম যখন অবস্থা, তখন সংগ্রামী বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পথ খুলে দিলেন আইনের সংস্কার করে, নতুন যুগোপযোগী আইনের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডেও মধ্যযুগের আইন-কানুনের সংস্কার আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। জাপানে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আইন করে সামন্ত-প্রথা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত করা হয়। এবং নতুন আইনের প্রবর্তন করা হয়। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইন ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত এই আইন অত্যন্ত স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, ব্যাপক। আইনের স্পষ্টতা ও ব্যাপকতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কারণ প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আইন আছে বলেই সে আইন স্পষ্ট হতে পারে, অনেক বিষয় জড়িয়ে এক সঙ্গে আইন করলে তাতে অস্পষ্টতা এসে পড়ে। আজকাল আইন পরিবর্তন করা অনেকটা সহজ ; প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের জন্য সংগঠনের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের দুটি স্পষ্ট ভাগ করা হয়েছে। একদিকে রয়েছে ব্যক্তি ও সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণ আইন, আর একদিকে রয়েছে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আইন। ব্যক্তি ও সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ; শাসনতন্ত্র

সম্পর্কে যে আইন, তা রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুয়ের ভিতর যে পার্থক্য তা আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন সমাজে এটা ছিল না। রোমে যে আইনের এত উন্নতি হয়েছিল তাতেও এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে ছিল না, সাম্রাজ্য সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই পরিগণিত হত। এই পার্থক্য রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমধিক উন্নতির পরিচায়ক। তৃতীয়ত, বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইনে অর্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন শ্রেণীর আধিপত্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার না করে সমভাবে আইন প্রয়োগ করার অর্থ, অর্থবলে যে বলীয়ান তারই পরোক্ষ সুবিধা করা। অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে ন্যায়ের আদর্শ কখনও কার্যকরী হতে পারে না।

উপরে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের সমাজে আইনের রূপ কেমন ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং আইন কি ভাবে সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে রূপ পরিবর্তন করে তাও বলা হয়েছে। সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্মের অনুশাসন প্রভৃতিকে আমরা এখন আইন বলে মানি না, যদিও সমাজের বন্ধন হিসাবে এদের মূল্য এখনও আছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এযুগে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে; আইন এখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সমাজের নয়। প্রাচীন কালে সমাজ ও রাষ্ট্রে এই বিচ্ছেদ ছিল না, তাই সমাজের আচার ব্যবহার, নিয়ম কানুনই আইনের মর্যাদা পেত। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে আইনের যে শুধু রূপের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, সারবস্তুর পরিবর্তনও যথেষ্ট হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথাই ধরা যাক্। এক সময়ে যখন দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল তখন মানুষও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমানাভুক্ত ছিল; মধ্যযুগে ইউরোপে সার্ফগণও অনেক পরিমাণে সম্পত্তির মধ্যেই পরিগণিত হত। বর্তমান রাষ্ট্রে মানুষের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ পেয়েছে। তবে মানুষের শ্রমের উপর সম্পত্তি-বোধ বেড়েছে। মানুষকে এখন আর দাস হিসাবে আবদ্ধ করা হয় না, কিন্তু অল্প মূল্যের বিনিময়ে তার শ্রমশক্তি কিনে নেওয়া হয় এবং সেই শ্রমজাত দ্রব্যের উপর ধনীর ঐশ্বর্য সৃষ্ট হয়। আবার জমির কথা ধরা যাক্। সামন্ত-প্রথার আমলে জমির মালিকের যে সব অধিকার ছিল বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জমির মালিকের অধিকার তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। সামন্ত-প্রথায় একই জমির মালিকানা স্বত্ব অনেকের উপর ছড়ানো ছিল; প্রথমে রাজার অধিকার, তারপর কোন বড় সামন্তের অধিকার, তারপর হয়ত কোন সাধারণ প্রজার চাষ করার অধিকার; সকলেই জমি থেকে কিছু প্রতিদান পেত। প্রজা সামন্তকে জমির ফসল দিত, সামন্ত রাজাকে সামরিক সাহায্য করত। একখণ্ড জমির সঙ্গে কতকগুলি অধিকার ও দায়িত্ব সংযুক্ত ছিল; এই সংযোগ ছিন্ন হয়েছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। এখন জমির খাজনা দিয়ে তাকে যে কোন উৎপাদন কার্যে লাগান যেতে পারে। জমি হস্তান্তর করা এখন সহজ; একজনের জমি অতিক্রম করে অন্যের জমিতে দ্রব্য পাঠাতে হলে সামন্ত-প্রথার আমলে শুল্ক দিতে হত, এখন তা দিতে হয় না। জমির দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীলোকদের কথা যদি ধরি, তবেও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে আইনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও রোমে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না; গ্রীক্ সভ্যতার চরমোৎকর্ষের দিনেও গ্রীসে স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। বর্তমান যুগে অগ্রসর দেশ সমূহে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা

স্বীকৃত হয়েছে। এই স্বীকার কোন বদান্যতা বা মহানুভবতার ফল নয়, অগ্রসর রাষ্ট্রের উৎপাদন প্রণালী অব্যাহত রাখার প্রয়োজনের ফল, বর্তমানের যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীতে যথেষ্ট শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়; স্ত্রীলোকরা উৎপাদনে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; তার ফলে তাদের জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়। ক্রমশ স্ত্রীলোকরা সমাজে নিজেদের স্থান সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অন্যান্য স্বাধীনতাও অর্জন করে।

আইনের স্বরূপ ও সামাজিক উপকারিতা সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক আলোচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্রে নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি হচ্ছে এবং আইনের ভিতর দিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের অনেক গলদ দূর করা হয়েছে। আইনের ভিতর দিয়ে কোন বড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব কিনা—এ নিয়ে দুরকমের মতবাদ গড়ে উঠেছে। একদল বলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আইন পরিবর্তন করে ক্রমে ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব। সমস্ত জাতিকে যদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝান যায় তবে তাদের প্রতিনিধিরা জাতির দাবী উপেক্ষা করতে পারবে না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই মতবাদের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু বিপ্লবপন্থী একদল বলেন যে আইন করে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। যদি এমন কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় যাতে শ্রেণীপ্রভুত্ব বিপন্ন হবে তবে প্রভুশ্রেণী কিছুতেই সে আইন কার্যকরী হতে দেবে না, ইতিহাস এই মতবাদকেই সমর্থন করে। বিপ্লব ছাড়া সত্যিকার পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। শুধু আইন পরিবর্তন করাই বড় কথা নয়, সেই আইন কার্যকরী করা চাই। আইন কার্যকরী করতে হলে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের কতকগুলি প্রয়োজন সাধনের জন্য তৈরী হয়েছে। নতুন সমাজের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা এর আছে কি? যুগে যুগে শুধু যে আইনই বদল হয় তা নয়, আইনকে যে কার্যকরী করবে সেই রাষ্ট্রও তো বদলে যায়; পুরাতন যন্ত্রে নতুন কাজ চলবে কি করে? সুতরাং বর্তমান যুগেও নতুন সমাজের উপযোগী আইন করলেই চলবে না, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও ভেঙে নতুন প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে। সমস্যা শুধু আইনগত সমস্যা নয়, সমস্ত রাষ্ট্রজীবনের সমস্যা। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লবের পর নতুন রাষ্ট্র ও নতুন আইন রচনা একসঙ্গে চলেছে, আর দুয়েরই পেছনে প্রেরণা দিয়েছে বিপ্লবী গণশক্তি।

আইনের উপকারিতা সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যে কতখানি বদলেছে তার আলোচনা করলে সামাজিক জীবনের সঙ্গে আইনের নিবিড় সম্পর্ক আরও পরিষ্কার হবে। রুশো ও তাঁর সমসাময়িক দার্শনিকগণ মনে করতেন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার আগে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করত প্রকৃতির নিয়মের অধীনে; প্রকৃতির নিয়ম যে কি সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট ছিল। প্রকৃতির আইনে নানাপ্রকার অসুবিধা থাকাতে মানুষ রাষ্ট্রগঠন করে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারণা প্রচারিত হল-যে আইন একটা বিঘ্নবিশেষ, স্বাধীনতা এতে খর্ব হয়, তবে সামাজিক জীবনকে সংঘর্ষ থেকে বাঁচাতে হলে আইনের কিছু প্রয়োজন আছে। আইন

যত কম থাকে ততই ভাল। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব দূর করা ও শান্তিরক্ষা করাই আইনের কর্তব্য। জীবনের অন্যান্য বিভাগে আইনের প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। অর্থ নৈতিক কর্মধারাকে আইনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত রাখবার জন্তই এই রকম মতবাদ গড়ে উঠেছিল। এখন আবার আইনের গণ্ডী প্রসারিত করার চেষ্টা চলেছে। কারণ দেখা গিয়েছে-যে আইনকে ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রাখলে রাষ্ট্রে অনেক গলদ প্রবেশ করে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন জীবনের সকল দিকে প্রসারিত তখন আইনের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। এমনকি আজকাল একথাও আমরা শুনে থাকি-যে আইন না থাকলে স্বাধীনতাও থাকে না, স্বাধীনতাকে আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলে তবে তা স্থায়ী হবে। অবশ্য আইন সমাজের মঙ্গলের জন্য হওয়া চাই। নাৎসী-জার্মানীতে আইনের বহুবিস্তৃত নাগপাশ সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে, কারণ সে আইনের পেছনে ছিল কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষমতা এবং স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়। আইনের ব্যাপক প্রসার মঙ্গলকারী হতে পারে শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাবে, দার্শনিক নৈরাষ্ট্রবাদী যাঁরা তাঁরাও বলেছিলেন যে রাষ্ট্রহীন অবস্থাতেই প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব। যখন রাষ্ট্র থাকবে না তখন অবশ্য আইনও থাকবেনা। কিন্তু তেমন অবস্থা আসতে পারে তখনই যখন মানুষের অবস্থা আরও উন্নত হবে, যখন উৎপাদন ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হবে না, যখন উৎপাদনের সামগ্রী সমাজের সম্পত্তি হবে, যখন মানুষের সামাজিক বোধ এতখানি উন্নত হবে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে না। সামাজিক সংহতির জন্য মানুষের উপর বলপ্রয়োগের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ; রাষ্ট্র লোপ পাবে তখনই যখন বলপ্রয়োগ ব্যতীত সংহতি রক্ষা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতের সেই রাষ্ট্রহীন, আইনহীন সমাজে মানুষের শক্তি সংহতি রক্ষার প্রচেষ্টা থেকে মুক্তি পেয়ে নব নব মানসিক সম্পদ রচনা করে চলবে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

চিহ্ন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। তিন টাকা।

প্রকৃত সৃজনীশক্তির সঙ্গে নতুন সমাজ চেতনার সংযোগ হলে তার ফল কি বিস্ময়কর হতে পারে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে মানিক বাবুর এই সম্প্রতি-প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি।

মার্ক্সের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছেন জাতির জীবনে কখন কখন ঘটনাস্রোত এত মন্থর গতিতে বয়ে চলে যে, একদিনকে মনে হয় কুড়ি বছরের মত লম্বা, আবার কখন কখন ইতিহাসের চাকা এত দ্রুতগতিতে ঘোরে যে মাত্র একটি দিনকে মনে হয় যেন কুড়ি বছরের ঘন নির্যাস। এই রকম দুটি দিন এসেছিলো আমাদেরই জীবনে এই কলকাতা শহরে কিছু দিন আগে—যখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নিরস্ত্র ছাত্রের দল সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর লাঠি ও গুলিকে উপেক্ষা করে শীতের সমস্ত রাত রাজপথ কামড়ে পড়ে থেকে ড্যালহাউসি-স্কোয়ারে যাবার মরণজয়ী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। তারা কিন্তু একা ছিল না সেদিন। অগণিত হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক, কর্মচারী, নাগরিক, পথচারী, পুরুষ, নারী, যুবক, বৃদ্ধ, বালক তাদের সঙ্গে ও পেছনে ছিল। গোটা শহরটা যেন হঠাৎ আপনা থেকেই বোমার মত ফেটে পড়েছিলো সেদিন অত্যাচারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণায়। এই ঘটনা অবলম্বনে 'চিহ্ন' রচিত।

আমরা অনেকেই এই ঐতিহাসিক দুটি দিনকে দেখেছি, গভীরভাবে নাড়াও খেয়েছি। অনেক সাহিত্যিকও যে না দেখেছেন তা নয়—নাড়া খেয়েছেন কিনা জানি না! কিন্তু এটা সত্য যে তাঁরা অনেকেই এর ইতিহাস লিখতে পারলেন না।

এর কারণ কি? কারণ এই-যে, যাঁদের দেশ বা সমাজ সম্বন্ধে চেতনা আছে তাঁদের সৃষ্টি-প্রতিভা নেই, আর যাঁদের সৃষ্টির প্রতিভা আছে তাঁদের সাধারণত দেশ সম্বন্ধে হয় চেতনা নেই, নয় যে চেতনা আছে সে চেতনা বাস্তব নয়। মাণিকবাবুর কথায় বলা চলে, 'পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে! কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটছে চোখের সামনে, দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে—নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়।' কিন্তু যেমন হেমন্তের তেমনি একশ্রেণীর সাহিত্যিকদের এ সব চোখে পড়ে না। নিজেদের পুরাতন ধারণা, পুরাতন বিশ্বাসের স্তবেই তাঁরা ধরে রেখে দিয়েছেন দেশকে—চোখ-কান বুজে, ভাবেন তাঁদের মন এগোয় নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তাঁদেরই খাতিরে।' আর বেশীর ভাগ সাহিত্যিকই তো এই 'শাশ্বত সত্যে' বিশ্বাস করেন যে মানুষ বদলায় না।

সুতরাং কি করে তাঁরা নতুনকে চিনতে পারবেন? চোখের সামনে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে দেখে কি করে তার গুরুত্ব ও অর্থ বুঝতে পারবেন? ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁদের কাছে তুচ্ছ আর অতি তুচ্ছ ঘটনা তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক। দেশের অধিকাংশ লোকের মরণ-বাঁচন সমস্যা তাঁদের কাছে সমস্যাই নয়, আর একটি মাত্র নর বা নারীর একান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সমস্যা যেন গোটা মানুষ জাতটার জীবন-মরণ সমস্যা। বড় বড় রাজা, জমিদার, পুঁজিপতি বা মহাপুরুষ দেশ বা ধর্মের নামে যা কিছু করেন তা হল ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ তাঁদের ধারণা এঁরাই হলেন ইতিহাসের নায়ক ও নির্মাতা। কিন্তু আগের দিনের সম্বন্ধে এ ধারণা খানিকটা সত্য হলেও আজ যে মোটে সত্য নয়—আজ যে ইতিহাসের নায়ক ও স্রষ্টা দেশের সাধারণ লোক—শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র এরাই যে দেশ—এদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই যে দেশেরই স্বাধীনতার জন্য লড়াই সে চেতনা এঁদের হয়নি।

এ চেতনা কিন্তু মাণিকবাবুর পরিপূর্ণ মাত্রায় হয়েছে। তিনি গভীর ভাবে বুঝেছেন যে এরাই আজ আমাদের দেশের ইতিহাসের চাকা ঘোরাচ্ছে, বর্তমানকে বদলাচ্ছে ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলছে। এই উপন্যাসের নায়ক হিসাবে তাই আমরা পাই শ্রমিক ও ছাত্রদের। কারুর নাম আছে, কেউ বা অনামী, কিন্তু সাহসে স্থৈর্যে চরিত্রের দৃঢ়তায় তারা সকলেই সমান। কারুর পরাজয়ের মনোবৃত্তি নেই, দুর্বলতা নেই, চিত্তের দোদুল্যমান ভাব নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এগুলোই, কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তারা অবস্থার দাস নয়, কলের পুতুল নয়। কি অসম্ভব পরিবর্তন মাণিকবাবুর নিজের দৃষ্টি ও চিন্তার মধ্যে! তিনিই না একদিন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' লিখে ছিলেন? সেদিন সাধারণ মানুষগুলো ছিল তাঁর কাছে পুতুলের মত, কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নাড়াতো, চালাতো। পল্লীগ্রামের গরীব ভদ্রলোকদের মধ্যে বা আধা-ভদ্র আধা-চাষীদের মধ্যে সত্যই তিনি সেদিন সে 'মানুষ' দেখেন নি যাকে পরে দেখতে পেয়েছেন কলকাতার রাস্তায়, ফুটপাতে, বস্তিতে। সেদিন তাই লিখেছিলেন 'ইতিকথা'—আজ লিখলেন 'ইতিহাস'; সেদিন অবস্থার দাস পুতুলের, আজ অবস্থা-জয়ী মানুষের।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তার পরিবর্তনের গোড়ায় আর একটা গভীরতর পরিবর্তন লক্ষ্য করবার আছে—সেটা হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় পরিবর্তন। এতদিন তিনি বহুকে দেখেছেন, সমষ্টিকে দেখেন নি, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন, যুক্ত ভাবে দেখেন নি। তার ফল হয়েছে এই-যে, ব্যক্তি ও সমাজকে তিনি পরস্পরের বাহ্যিক ও বিরোধী শক্তি হিসাবেই দেখে এসেছেন। হয় একদিকে অসীম শক্তিশালী অথচ হৃদয়হীন সমাজ দুর্বল নিরীহ মানুষগুলোকে নিজের পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারছে যেমন 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' আর নয় অন্য দিকে একজন মানুষ অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির মতই এক অমানুষিক শক্তিতে পরিণত হয়ে সমাজের উর্দ্ধে উঠেছে—যেমন 'পদ্মা নদীর মাঝি'। কিন্তু আজ তাঁর এক ও সমগ্র সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বুঝেছেন জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, দুঃখ, পরিতাপ, দুর্বলতা স্বার্থপরতা, নীচতা ও পশুত্বের মূল কারণ। তাই যুক্ত হতে হবে সবার সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে। এই একত্ববোধ

তাঁর মধ্যে কত গভীর ও ব্যাপক হয়েছে তার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায় 'চিহ্নের' পাতায় পাতায়। আর এই বোধ নিজেকে প্রকাশ করেছে এই কয় রকমে :

(১) এই উপন্যাসের নায়ক কোন ব্যক্তি নয়—জনসমষ্টি। এই দিক থেকে এই বইখানি আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। এক সোভিয়েট নভেলেই এর তুলনা মেলে।

(২) কতকগুলি ব্যক্তিগত চরিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু তারা সকলেই গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ—যেমন হেমন্ত, অক্ষয়। ছাত্র, শ্রমিকদের মত তারা ঘটনাকে বদলাচ্ছেনা, ঘটনাই তাদের বদলাচ্ছে। তার কারণ, তারা সকলেই জনগণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্ম-কেন্দ্রিক। সীতা ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তার ও ঘটনার প্রভাবে পড়ে ভাল ছেলে হেমন্ত যে শুধু পড়াশোনা করাটাকেই ছাত্রজীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে ভাবত ও সভাসমিতি, রাজনীতি, ছাত্র-আন্দোলন থেকে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে চলত, সেও শেষ পর্যন্ত না বদলে পারলো না। মাতাল অক্ষয় যে রোজ মদ খেয়ে বাড়ী ফেরে, সেও অন্তত একটা রাতের জন্য মদ খেল না ও ভবিষ্যতে খাবে না বলে সঙ্কল্প করলো, কারণ 'ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।' অবশ্য দারিদ্র্যের মধ্যেও মাধুর্য শান্তভাব ও হাসির কারণও এই-যে সে বুঝছে যে সে একা কষ্ট পাচ্ছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক তারই মত বা তার চেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছে।

(৩) সকলের সঙ্গে একতার বোধ শ্রমিকদের মধ্যে এত প্রবল ও ব্যাপক যে তাদের ব্যক্তিগত জীবন যেন কিছু নেই—কর্মে ও চিন্তায় তারা দেশের ও দশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। দেশের চিন্তা তাদের চিন্তা, দশের সমস্যা তাদের সমস্যা। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এসে। শ্রমিক ওসমান ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে কারখানায় কাজ করবার সময় আপশোষ করে। তার, 'অহরহ, মনে হয়েছে ট্রামের কাজ থাকলে আজ নিজেকে ওদেরই একজন ভাবতে পারতো, চব্বিশ ঘণ্টা আপনা থেকে অনুভব করতো হাতে হাত মেলান হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে।'

মা অনুরূপা চেয়েছেন যে ছেলে হেমন্ত সকলের থেকে আলাদা হয়ে লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি পেয়ে মাত্র তাদের কটিকে নিয়ে একটি সুখের নীড় রচনা করবে, আর গুলিতে আহত রসুলের মা আমিনার 'মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মত—অন্য কোন পথ তাদের নেই।...কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে।'

(৪) মাণিকবাবুর মন স্বভাবতই বস্তুনিষ্ঠ—তার পরিচয় পেয়েছি তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ও 'পদ্মা নদীর মাঝি' দুয়েতেই। কিন্তু এই স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠা জনগণের সঙ্গে একাত্মতায় কতখানি বাস্তববোধে পরিণত হতে পারে তার সন্ধান মেলে 'চিহ্নে'। তাঁর আগেকার বস্তুনিষ্ঠা ছিল Naturalism (natural realism) আর 'চিহ্নে' যে বস্তুনিষ্ঠা পাই তা হচ্ছে realism (social realism)। Naturalism ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার মত কাজ করে—বাদবিচার করে না, যা কিছু আছে তাকেই গ্রহণ করে—নজরটা তার কিন্তু থাকে অন্ধকার, খারাপ দিকগুলোর দিকে বেশী করে। তাই যতকিছু অপাংক্তেয়, বর্জনীয়

সাহিত্যে তাদের বড় স্থান দেয়। Realism হচ্ছে ছবি আঁকার মত, তা বাছবিচার করে, কাটছাঁট করে, অসুস্থকে করে বর্জন, সুস্থকে দেয় প্রাধান্য। Naturalism নিরাশাবাদী, Realism আশাবাদী, Naturalism নেতিবাচক, সে সমালোচনা করে, প্রতিবাদ করে। Realism ইতিবাচক—সে গড়ে তোলে। এই বাস্তববোধ পরিস্ফুট 'চিহ্নের' ছত্রে ছত্রে। শ্রমিকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে এতখানি নির্ভুল জ্ঞান তাদের সঙ্গে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছাড়া সম্ভব নয়। অন্য যে দু-চারজন ঔপন্যাসিক শ্রমিক-জীবন এঁকেছেন, তাঁরা তাদের দেখেছেন কল্পনাপ্রবণ 'ভদ্র' চোখ দিয়ে। মাণিকবাবু শ্রমিকদের দেখেছেন শ্রমিকদেরই চোখ দিয়ে। তেমনি ছাত্রসঙ্ঘের কোন নেতা বা কর্মী এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনতে পারবেন না যে তিনি ছাত্র আন্দোলনের স্বরূপ বা কর্মপদ্ধতিকে বিকৃত করে দেখিয়েছেন। পনের ষোল বছরের রসুল বলছে, 'আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক।... আমরা যেই মারামারি করতে যাব, ব্যাস, আমরা আর দেশের সবাই থাকবো না, শুধু আমরা হয়ে যাবো।' পুনশ্চ 'ছাত্রদের শৃঙ্খলা ও শান্ত চালচলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, সংযম হারিয়ে তাদের খেপে উঠবার সম্ভাবনা নেই।...ক্রোধে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে।' ছাত্র-শ্রমিক-আন্দোলন যে, 'গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথার সমন্বয়'—একথা সাহিত্যিকদের মধ্যে মাণিকবাবু ছাড়া আর কেউ বুঝেছেন বলে মনে হয় না।

(৫) স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও ঐক্যবোধ লেখকের টেক্‌নিককে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। লেখক নিজেই বলেছেন বইখানা নতুন টেক্‌নিকে লেখা। সে হচ্ছে এই, যে একদিনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ঘটনা ঘটছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, গ্রীক নাটকের স্থান কাল ও ক্রিয়ার ঐক্যের অনুরূপ। একটিমাত্র ঘটনা ঘটছে কলকাতার বাইরে মধুখালি গাঁয়ে এক কৃষক পরিবারে। কিন্তু এ ঘটনার স্রোতও বয়ে এল কলকাতায়। সেইজন্য কোন আনুষঙ্গিক ঘটনারই চরম পরিণতি বা শেষ বলে কিছু নেই। এইখানেই অন্যান্য উপন্যাস থেকে এই উপন্যাসের তফাৎ—যার জন্যে লেখক বলেছেন, 'একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই।' একটার পর একটা লোক বা ঘটনা আসছে, কিছুকাল ধরে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন আলাদা আলাদা জলবিন্দু বা স্থির চিত্র মিলিয়ে যায় একটি প্রবাহে বা চলচ্চিত্রে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মনের ওপর যে ছাপ থেকে যায় সেটা হচ্ছে একটা দ্রুত গতিবেগের। রসুল, অমৃত মজুমদার, অক্ষয়, সুধা, সীতা, মাধু, অমর, ওসমান, যাদব, গণেশের মা, রাণী, হেমন্ত, অনুরূপা, অনন্ত, আমিনা, এদের শেষ পর্যন্ত কি হ'ল—এ প্রশ্নের জবাব নেই। শুধু একটি প্রশ্ন—যা গল্পের গোড়াতেই গণেশ বার বার করেছিল—'এরা কি এগিয়ে যাবে না?'—তারই উত্তর পাওয়া যায় শেষ পাতায় অজয়ের মুখে—'আমরা এগিয়েছি, ঠেকাতে পারে নি। আমরা এগিয়েছি।' এই এগিয়ে যাওয়াটাই হ'ল এ গল্পের প্রাণ ও অঙ্গ দুই-ই। দেশের 'প্রগতি' প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের অন্তরে। আর তাঁর অন্তরের প্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

তবে কি 'শিল্পী' মাণিকবাবুর মৃত্যু ঘটেছে 'প্রচারক' মাণিকবাবুর মধ্যে? এ সিদ্ধান্ত করবার কোন উপায়ই তিনি রাখেন নি। গোপাল হালদারের ভাষায় তিনি 'প্রচার' করেন নি—করেছেন 'প্রকাশ'। তিনি স্বভাবশিল্পী—জন্মগত ঔপন্যাসিক।

বর্তমান উপন্যাস-জগতে তাঁর সমকক্ষ কেউ আছেন কিনা এ প্রশ্ন যদি আগে কারু মনে জেগে না থাকে, তো অনেকের মনে জাগবে 'চিহ্ন' পড়বার পরে। কি অসাধারণ তাঁর শিল্প-দক্ষতা। তাঁর কলমে যেন জাদু আছে। কি সহজ সরল অথচ সতেজ তাঁর ভাষা। পণ্ডিতী নয়, গেঁয়ো মেয়েলী ভাষা, যেন দেশের মাটির মধ্যে তার শিকড় আছে, আর মাটির সজীব রসধারায় সে পুষ্ট। বাক্য বাহুল্য-বর্জিত। শব্দের মিতব্যয়িতা অসাধারণ অথচ কি জটিল ভাবই না প্রকাশ পেয়েছে এই অল্পকথার মধ্যে দিয়ে। শুধু ভাব নয়, রূপও। যেখানে অন্য বড় লেখকদেরও পাতার পর পাতা লাগে সেখানে মাত্র দুচারটি আঁচড়ে একটা জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে তাঁর হাতে—প্রমাণ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মাধু'। পট এত ছোট্ট ও তুলি এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় প্রত্যেক চিত্রটি যেন একটি পারস্য বা মুঘল 'মিনিএচার ছবি', কিম্বা দামী পাথরের ওপর জহুরির নক্সা কাজ।

উপমাগুলিও কি চমৎকার লাগসই। বাধা পাওয়া ছাত্রের দল 'লাইন ক্লীয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মত শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেকে থেকে ফুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়।' অক্ষয়ের, 'ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নীচে নেমে ঘুরে ঘুরে।' তাঁর সংলাপ পড়তে পড়তে বার বার শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের পরে এত স্বাভাবিক, সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ সংলাপ আর কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না; এমন কি লেখকের নিজের পূর্ববর্তী উপন্যাস দুখানিতেও না। আর কি সূক্ষ্ম আর প্রখর তাঁর দৃষ্টি—যত ছোটই হোক না কেন, কোন জিনিষই তাঁর নজর এড়াতে পারে না। তাই মুসলমান ছাত্র-শ্রমিকদের কথাবার্তার মধ্যে আমরা থেকে থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পাই—'খোদাকসম্,' 'মালুম', 'সাদী', 'লহমা', 'খপ্‌সুরত' ইত্যাদি উর্দু শব্দ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর চোখে পড়ে সার্জেণ্টদের নিখুঁত ছাঁটের দামী পোষাক আর ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলোর তালে তালে পা ফেলার সাথে সাথে তাদের মাসেলগুলিতে নেচে নেচে ঢেউএর খেলা।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়কর তাঁর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—মদ খাবে কি খাবে না এই নিয়ে অক্ষয়ের নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর তিনটি সংলাপ—অমৃত মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস অরুণা মজুমদারের মধ্যে, হেমন্ত ও তার মা অনুরূপার মধ্যে এবং অনুরূপা ও সীতার মধ্যে। শেষের সংলাপটি তো একটি masterpiece—পড়তে পড়তে বার বার করে শরৎচন্দ্র কিম্বা ডস্টএভস্কিকে মনে পড়ে।

কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা যার মধ্যে দিয়ে চরম বিকাশ লাভ করেছে, সে হচ্ছে মধুখালি গাঁয়ের কৃষক যাদবের সপরিবারে গাঁ ছেড়ে পলায়ন ও কলকাতায় পৌঁছে রোজগারে ছেলে গণেশের সন্ধানের কাহিনী, যে গণেশ আগেই পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। কি ছোট্ট আর কি মর্মস্পর্শী এই গল্প! যদি এটিকে বাকি উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার উপায় থাকতো, তাহলে যে জগতের শ্রেষ্ঠ গল্প ভাণ্ডারে এটি স্থান পাবার যোগ্য হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণের কি অপরিসীম দরদ অথচ সংযম দিয়ে এই সরল দরিদ্র কৃষক পরিবারের প্রত্যেককে শিল্পী এঁকেছেন। যাদব, যাদবের স্ত্রী, মেয়ে রাণী—এরা সবাই যেন লেখকের কত যুগের চেনা মানুষ—শুধু চেনা নয়, যেন পরম আত্মীয়। শুধু এইখানে এসে খট্‌কা লাগে তাঁর সহানুভূতি কার সঙ্গে বেশী—চাষী না মজুর? মনে হয়

শহরে বাস করলেও শহর তাঁর বাসভূমি হয়ে ওঠেনি এখনও। এখনও তাঁর পিছন-টান রয়েছে পল্লীর দিকে। এবং সহরের লোকদের চেয়ে যে তিনি পাড়াগাঁয়ের সরল, দরিদ্র, নির্যাতিত লোকদের বেশী জানেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কাহিনীর শেষটি এত করুণ যে গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা হতে পারে।

আর একটি চরিত্র এই উপন্যাসের অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে, সে হচ্ছে ব্যাঙ্কের কেরাণী মাতাল অক্ষয়। তার অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা এত শক্তিশালী যে মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয়। নিছক আর্টের দিক থেকে ও স্বতন্ত্র গল্প হিসাবে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে এ চরিত্রের বিশেষ কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং যে নতুন জগতের সন্ধান এই উপন্যাসে লেখক দিয়েছেন, তার সঙ্গে মোটেই খাপ্ খায় না এই লোকটা। অক্ষয় হোল সেই পুরনো জগতের লোক, যে জগৎ অতীতের গর্ভে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আরও একটি লোক আছে এই পুরনো জগতের, সে হচ্ছে 'বিদ্যুৎ-লিমিটেড্'-এর এন. দাশগুপ্ত। অক্ষয় শুধু দুর্বল, মাতাল আর দাশগুপ্ত হচ্ছে সমাজের শত্রু—ঘৃণ্য চোরাকারবারি। অন্য দশটা জিনিষের সঙ্গে সে মদ ও মেয়ে মানুষের দেহেরও চোরাকারবার করে থাকে। তবু যতই অধঃপতিত সে হোক, গতযুদ্ধে দুর্নীতির সুযোগে যারা রাতারাতি বড়লোক হয়েছে তাদের মুখোস খোলার দিক থেকে সে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়, যেমন নয়, পুরাণো ধরণের নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী বাক্‌সর্বস্ব অমৃত মজুমদার। আর গল্পের দিক দিয়েও দাশগুপ্তের একটা স্থান উপন্যাসে আছে। অক্ষয়ের তাও নেই। অথচ সে এই উপন্যাসে অনেক পাতা জুড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, দাশগুপ্ত বা অমৃত মজুমদার কেউ সহানুভূতি উদ্রেক করে না। কিন্তু অক্ষয় এতখানি দরদ দিয়ে আঁকা যে সে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চায়। এই থেকে বোঝা যায় যে পুরাতন জগৎ বিলীয়মান হলেও, লেখকের মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। আগেকার Naturalisn মরতে বসলেও, এখনও একেবারে মরে নি—তার রেশ তাঁর অন্তরে এখনও একটু আধটু রয়েছে। তাঁর অন্তর্বিপ্লব বহুদূর অগ্রসর হলেও এখনও সমাপ্ত হয় নি—আশাকরি সে সমাপ্তি বেশী দূরে নয়।

—দুটি অবিস্মরণীয় দিনের ঘটনা এক অসাধারণ সংবেদনশীল শিল্পীমনের ওপরে যে গভীর দাগ রেখে গেছে "চিহ্ন" হলো তারই চিহ্ন। "চিহ্ন" একাধারে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ও ভবিষ্যতের সঙ্কেত-চিহ্ন।

—"চিহ্ন" কলকাতার রাজপথের ইতিহাসের রক্তাক্ত পদচিহ্ন।

রাধারমণ মিত্র

Studies in Indo-British Economy Hundred Years Ago.

By N. C. Sinha. A. Mukherjee & Co, Calcutta. Rs 5/-

ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের ইতিহাস ভারতের প্রাচীন অর্থনীতির বনিয়াদ ধ্বংসের ইতিহাস—শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় শাসনের ইতিহাস নয়, আজ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের যুগে এই কথা স্মরণীয়। ইংরেজ শাসক এবং শোষকের অজ্ঞাতসারে ভারতের প্রাচীন আর্থিক জীবনের

ধ্বংসের ভিতর দিয়াই ঊনিশ শতকের শেষ পাদ হইতে নূতন অর্থনীতির বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু শাসনের ও শোষণের দায়ে সে বনিয়াদও পাকা হইতে পারে না। ইংরেজ অধিকারে আসার আগে ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশীর পদানত হইয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈদেশিক আক্রমণ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কিছুতেই ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোকে ভাঙিতে পারে নাই। সাধারণ জীবনযাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। এইজন্য তাহাদের শাসন তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লোপের সঙ্গেই সহজভাবে শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ-শাসন সমাজ-ব্যবস্থার গোটা কাঠামোটাকেই ভাঙিয়া ফেলে, অথচ তার বদলে নূতন অর্থনৈতিক নূতন সমাজব্যবস্থা[১] গড়িয়া তুলিবার কোন সচেতন প্রয়াস ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে দেখা যায় নাই।

ইংরেজ-শাসনের প্রথম পর্যায়ে ভারত-শাসনের অব্যাহত অধিকার লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্ব লাভ করার ফলে একমাত্র এই কোম্পানীর অংশীদার এবং কর্মচারীরাই ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের মালিকানা ভোগ করে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষ হইতে লুণ্ঠিত অর্থের দৌলতেই আধুনিক ইংলণ্ডের গোড়াপত্তন হয়। ডাঃ কানিংহাম বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব কেবল হঠাৎ অনেক গুলি আবিষ্কারকের অবির্ভাবের ফলেই সম্ভব হয় নাই। আবিষ্কারকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানোর মত যথেষ্ট মূলধন এই সময়ে ইংলণ্ডে সঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়াই সম্ভব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই মূলধনের অধিকাংশই ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার হইতে গিয়াছিল।

শিল্প-বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বাজার হিসাবে ব্যবহার করার কোন প্রচেষ্টা ইংলণ্ডের তরফ হইতে দেখা যায় নাই। এবং ইংলণ্ডে এমন কিছু পণ্যও উৎপন্ন হইত না ভারতবর্ষের বাজারে যাহার যথেষ্ট চাহিদা হইতে পারে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পরে অবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। ইংলণ্ডে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়, এবং এই বাড়তি মাল চালানোর জন্য প্রয়োজন বাড়ে বাজারের। সেদিক হইতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথচ ইংলণ্ডের শিল্পমালিকদের ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের কোন অধিকার ছিল না। সনদের বলে সে অধিকার ছিল একমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ইংলণ্ডের শিল্পমালিকরা তাই ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারে ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে এবং ভারতবর্ষে সমস্ত ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ শোষণের অধিকার দাবী করিতে থাকে। আর বৃটিশ শিল্প-স্বার্থের নূতন তাগিদে সমগ্র পৃথিবীতে তুলাজাত দ্রব্য সরবরাহকারী ভারতবর্ষকে তুলাজাত পণ্য আমদানিকারী দেশে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর মানে এই যে, একদিকে ভারতবর্ষের শিল্প জীবনকে ভাঙিতে হইবে এবং আর একদিকে ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ধ্বংস করিতে হইবে। এই দুইএর জন্যই প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের সাহায্য। এইচ্. এইচ্. উইলসন বলিয়াছেন যে, ১৮১৩ সালেও বেশ মুনাফা রাখিয়া ভারতবর্ষের তুলা এবং রেশমের জিনিস ইংলণ্ডে তৈরী জিনিসের শতকরা ৫০।৬০ ভাগ কম দামে ইংলণ্ডের বাজারেই বিক্রি করা চলিত। তাই ইংলণ্ডে এই সব শিল্প রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে আমদানী মালের উপর প্রচুর আমদানী-শুল্ক বসান ছাড়া উপায়

ছিল না। আমদানী-শুল্ক না বসাইলে গোড়াতেই ভারতীয় পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল সমূহকে ফেল পড়িতে হইত। ষ্টিম এঞ্জিন বা কোন নূতন যন্ত্রপাতি কিছুতেই তাহাদের রক্ষা করিতে পারিত না। ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের উপরই বিপ্লবোত্তর বৃটিশ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কায়েমী স্বার্থ ধ্বংস করাও এই কারণে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের একটা বড় প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়। একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত করেন সনাতনী অর্থনীতির জন্মদাতা এ্যাডাম স্মিথ। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত 'ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশন্‌স্‌' পুস্তকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যনীতিকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন। ১৭৮২-৮৩ সালে হাউস অব কমন্‌স্‌এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বত্ব পরিবর্তন করার দাবী উপস্থিত করা হয়। ১৭৮৩ সালে ফক্‌স্‌ কোর্ট অব ডিরেক্টর ও কোর্ট অব প্রোপাইটার বাতিল করিয়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত একটি বোর্ড তৈরির সুপারিশ করেন। পিটের ভারতশাসন সম্পর্কিত আইনে নীতি হিসাবে ইহা মানিয়া লওয়া হয় এবং কর্ণওয়ালিশকে ভারতবর্ষে বৃটিশ ধনিকদের পথ পরিষ্কারের জন্য পাঠান হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর বিচারের একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি আঘাত করা। ফরাসী বিপ্লব সাময়িক ভাবে এই ঝগড়াকে চাপা দিলেও ১৮১৩ সালে শেষ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার আংশিক নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত বাণিজ্যিক-অধিকার লোপ হইয়া যায়। ভারতবর্ষ এখন হইতে ইংলণ্ডের সকল ব্যবসায়ীর একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা সাধারণভাবে ভারতবর্ষে আবার বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। এইবার হইতে বৃটিশ বুর্জোয়াদের ভারত শোষণের নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে "স্বাধীন ভারত আইনে" কি সেই ভারত শোষণ শেষ হইল, না সেই শোষণেরই নূতনতর পর্যায় শুরু হইল, ইহাই হইবে এই স্বাধীনতার একমাত্র মাপকাঠি!

১৮১৩ এবং বিশেষ করিয়া ১৮৩৩-এর সনদ ভারতবর্ষে বৃটিশ ধনতান্ত্রিক শোষণের ইতিহাসে তবু একটি বিশেষ ঘটনা। অনেক প্রামাণিক দলিল পত্রের সাহায্যে শ্রীযুত নির্মলকুমার সিংহ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ১৮৩৩-এর সনদ ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্পকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও পরিষ্কার দেখাইয়াছেন। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ এর আইনের ফলে বৃটিশ পণ্যে ক্রমে ভারতবর্ষের বাজার ভরিয়া উঠিতে থাকে। ১৮১৪ হইতে '৩৫ এর মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ দশলক্ষ গজ হইতে পাঁচ কোটি দশ লক্ষ গজ বাড়িয়া যায়। এবং একই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ সাড়ে বার লক্ষ টুকরা হইতে কমিয়া তিন লক্ষে নামিয়া আসে এবং ১৮৪৪ সালে ৬৩ হাজারে দাঁড়ায়। এই সময় বিলাতী কারখানার কাঁচা মালের চাহিদা মিটানোর জন্য ভারতবর্ষে বৃটিশ মূলধনে নীল, তুলা, চা ও কাফির চাষ যথেষ্ট বাড়িয়া উঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বর্ষের নিজস্ব শিল্প-জীবনে অবনতি আরম্ভ হয়। বৃটিশ বাণিজ্যের সাফল্য হইতে যদিও ভারতবর্ষে নূতন কায়দায় নিজস্ব শিল্প বিস্তারের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু তা না হইয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে ভারতের শিল্পজীবন ক্রমে অবনতির পথে চলে।

দারিদ্র্য ভারতীয়দের শিল্প বিস্তারের প্রধান বাধা হিসাবে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত সিংহ দেখাইয়াছেন মূলধনের অভাব ভারতবর্ষে ছিল না। বার্ক-এর মতে বাংলা দেশের জগৎ শেঠদের হাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সমান তহবিল ছিল। ভারতবর্ষে জগৎ শেঠ, অর্জুনজী নাথজী প্রভৃতি ধনকুবেররা রথস্চাইলড্ বা ফাগারদের মত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে দেশীয় ধনিকরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতের প্রাচীন শিল্প ইংরেজের অত্যাচারে লোপ পাইতে থাকে এবং ভারতীয় ধনকুবেররাও ক্রমে শিল্পে অর্থ নিয়োগের ক্ষেত্র হারাইয়া ফেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের উপরও তাঁহাদের প্রভাব কমিতে থাকে। এদিকে ইংরেজ সরকারের কৃপায় এক নূতন বড়লোক শ্রেণীর আমদানী হয়। ইঁহারা হইতেছেন ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভ—জমিদার। একদিকে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়, অন্যদিকে জমিদারীই শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান হিসাবে গণ্য হইতে থাকে। ইউরোপে বণিকরাই ক্রমে শিল্পপতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু এদেশে, বিশেষত বাঙলায়, যে কেহ ব্যবসা করিয়া বেশী টাকা জমাইয়াছে সেই টাকা দিয়া জমিদার হইয়া বসিয়াছে, শিল্প বিস্তারের দিকে মন দেয় নাই। ফলে যাহারা এদেশে বৃটিশ ধনবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত তাহারা বৃটিশেরই পদাশ্রিত দাসানুদাসে পরিণত হইয়াছে। তাই জমিদার রামমোহন রায় ভারতে বৃটিশ অর্থনীতির প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের আরও একটি প্রভাবশালী অংশ ইংরেজ সরকারের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে। তাহারা হইতেছে বৃটিশ প্রভাবিত শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজ। জাতীয় অর্থনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন এই সমাজের মুখ্য কাম্য হইয়া উঠে—কিছু ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া সরকারের অধীনে ভাল চাকরী জোগাড় করা। "তাই একশ বছর আগে আমরা ভারতবর্ষে এমন একটি অভিজাত সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাদের নির্ভর করিতে হইত জমিদারীর উপর, যারা কথা বলিত বেন্থাম এবং বার্কের ভাষায় এবং সরকারী আমলাতন্ত্রে বড় চাকরী লাভ করা ছিল যাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য।" বৃটিশ শিল্প ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অভিজাত ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া ফেলিবার জন্যে আমদানী করা হয় ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থা, এবং বৃটিশ শিল্পের প্রভাবে গড়িয়া ওঠা ভারতবর্ষের নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হিসাবেই দেখা দেয়। অবশ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ দুই একজনের ভিতর বৃটিশ-শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়াস একটু আধটু দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহা ছিল প্রায়ই ব্যতিক্রম। আর ক্রমেই তাহা নিরুৎসাহ হইয়া যায়।

বৃটিশ শিল্প বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফল ভারতবর্ষের মজুর-চাষীকেই ভোগ করিতে হয়। বিদেশী প্রতিযোগিতায় প্রথম বলি পড়ে দেশীয় তাঁত-শিল্প। এই শিল্পেই এদেশের শ্রমজীবির সব চাইতে বেশী লোক নিযুক্ত ছিল। বাষ্পচালিত জাহাজ আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তৈরির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি গ্রামের মুচি কামার প্রভৃতিরও কাজ কমিয়া যায়। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা না হওয়াতে এই সব বেকার শ্রমিকদের জমির উপরই নির্ভরশীল হইতে হয়। আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন নূতন ভূমিসংক্রান্ত আইন চাষীদেরও যথেষ্ট সংখ্যায় বাস্তু ছাড়া করিয়া ফেলে। ফলে দেখা যায় "দলে দলে ক্ষুধার্ত লোক বাঁচার মত মজুরী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অথচ তাও পাইতেছে না।"

এদেরই শোষণকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ইংরেজদের চা-বাগান, কাফির চাষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে এই অন্নহীন ভারতীয় 'কুলি' লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ। ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় এই সময় ভারতীয় শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মুনাফা-দায়ক যন্ত্র হইয়া উঠে। ১৮৩৩ সালে ক্রীতদাস-প্রথা বন্ধ হইয়া যায়। ফলে সমগ্র গ্রীষ্ম-মণ্ডলের ধনরাশি মজুরের অভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকারচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়। বুভুক্ষু, বেকার, ভারতীয় মজুররা এই সময় আন্তর্জাতিক ধনবাদের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে দেখা দেয়। এই 'কুলিদের' রক্তে বড় বড় উপনিবেশ এখন শ্রীসম্পদের দেশ হইয়াছে। অথচ আজ ইহাদেরই বিরুদ্ধে স্মাট্‌স্ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নেতাদের আস্ফালনের সীমা নাই।

একশ বছর আগের ভারতবর্ষের ইতিহাস একটানা ধ্বংসের ইতিহাস। গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় সভ্যতা এক আঘাতে ইংরেজ সরকার সমূলে ধ্বংস করে। কৃষি ও শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ। শিল্পকে ধ্বংস করাব ফলে কৃষির উপর প্রবল চাপ পড়ে এবং সামাজিক সংহতি সব দিক দিয়াই ভাঙিয়া যায়।

১৮৩৩-এর সনদে ভারত-শোষণ এবং ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন ধ্বংসের যে নূতন পবিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, শ্রীযুত সিংহের এই পুস্তিকাখানি তাহারই বাস্তব ব্যাখ্যা। মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রয়াস প্রশংসনীয়। গতানুগতিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী কায়দাতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস এতদিন লেখা হইতেছিল। কিছুকাল যাবত অবশ্য দেশপ্রেমিক ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অর্থনীতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে বোধহয় ইহাই প্রথম। আমরা তাই শ্রীযুক্ত সিংহের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। অর্থনৈতিক দৃষ্টি লইয়া ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন এবং শোষণের স্বরূপটাই খুলিয়া ধরিবে না, ভারতবর্ষের ধনিক, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের অবস্থার বিবর্তন সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোকপাত করিবে এবং আজ আমাদের জাতীয় জীবনের নানারকম কূট সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য

রুশো—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পূর্বাশা লিমিটেড। মূল্য, এক টাকা দুই আনা।

সি. এফ. ক্যারিট বলেছেন, যুক্তির জোরে বক্তব্য বোধগম্য হয়— এ ধারণা যে ভুল, রুশো পড়লে সেটা বোঝা যায়। বাস্তবিক, দার্শনিক হিসাবে রুশোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে যদিও তাঁর সব সমালোচক একমত, তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে রুশো নিয়ে কোন বিতর্কের অবতারণা হয়নি; গ্রন্থকার রুশোর দর্শন লিপিবদ্ধ করেছেন রুশোরই প্রত্যয় এবং দার্শনিক ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তবে রুশোর বক্তব্য বোঝা যায়। গ্রন্থকার এদিকটায়

বিশেষ নজর দেননি। অতএব এই বইএ রুশোর দর্শন বেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হলেও, এর অনেকাংশ সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে। গ্রন্থকার বলেছেন, 'রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মতবাদ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার এই ইচ্ছাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি এবং ইহার হাতেই রুশো দিয়াছেন রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।' গ্রন্থকার 'সাধারণ ইচ্ছার' কোন বিশ্লেষণ করেন নি। অথচ 'সাধারণ ইচ্ছার' ভিত্তিতে কোন শাসন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। কারণ রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' সকলের সমবেত ইচ্ছা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা নয়; কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাই সাধারণ ইচ্ছার প্রতীক হতে পারে, আবার কারও ইচ্ছাতেই সাধারণ ইচ্ছা প্রতিফলিত নাও হতে পারে। অতএব এ জিনিস ধরাছোঁয়া যায় না, কিংবা শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, 'সাধারণ ইচ্ছা' সমাজের সকলের কল্যাণে নীতি নির্দিষ্ট করে। কিন্তু এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। রুশো এটা অস্বীকার করেননি; তিনি বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে 'সাধারণ ইচ্ছার' প্রকাশ হয় না। তদুপরি সাধারণ ইচ্ছার ছোট-বড় আছে—যথা, শহর অপেক্ষা জেলা, জেলা অপেক্ষা রাষ্ট্র, রাষ্ট্র অপেক্ষা বিশ্ব-সমাজের সাধারণ ইচ্ছা যথাক্রমে বড়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের দার্শনিক সমর্থন রুশোকে দিতে হয়েছে। এখানেই রুশো সামাজিক চুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রন্থকার বলেছেন, 'রুশো সামাজিক চুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য।' কিন্তু চুক্তির দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের প্রভুত্ব সমর্থন করা এক কথা, আর সাধারণ ইচ্ছার নৈতিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা স্বতন্ত্র কথা।

আসল কথা, এসব প্রত্যয়ের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে রুশোর মৌলিকত্ব কিম্বা মহত্ব আমরা ধরতে পারি না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশোর বহু পূর্বে গুয়ারবার্টন তাঁর দর্শনে একটা সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছার উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক আরও অনেকে ঐ ধরণের কথা বলেছিলেন, যদিও রুশোর লেখাতেই প্রথম 'সাধারণ ইচ্ছা' একেবারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'সামাজিক চুক্তি তো বহু পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক দর্শনে স্থান পেয়েছিল। হব্‌স্ এবং লক্ তাঁদের দর্শনে 'সামাজিক চুক্তিকে' বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। রুশোর প্রধান বইএর নামই হচ্ছে The Social Contract; কিন্তু একটা সত্যিকারের চুক্তি বস্তুত হব্‌স্, লক্ কিম্বা রুশো কারও দর্শনেরই অঙ্গ নয়। হব্‌স্ এবং লকের মতন, রুশো নতুন কথা বলতে গিয়েও মামুলি প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন।

আসল কথা, রুশো তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশে। সে সময় ফ্রান্সের নৃপতি কিংবা জেনেভার অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সরাসরি লেখনী চালনা করা সম্ভবপর ছিল না। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রুশোকে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করতে হয়েছে। তার জন্যেই তাঁর লেখা অতটা নির্বিকল্প এবং অস্পষ্ট। এ সত্ত্বেও রুশোকে বিস্তর লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ রুশোর বাণী জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল, এবং শাসকবর্গকে বিচলিত করেছিল। রুশো লিখেছিলেন, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়'; কিন্তু তিনি যে বলতে চেয়েছিলেন, মানুষ স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে জন্মায়, সে কথা তাঁর দেশবাসীর বুঝতে কষ্ট হয়নি। মামুলি প্রত্যয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী যুক্তির মাধ্যমে রুশো বস্তুত সেই সমাজেরই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন—যে সমাজে মানুষকে

স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হবে। রুশো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু এ সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের স্বাধীনতা-বিরোধী নয়, কারণ এ সার্বভৌমত্ব জনসাধারণেরই। রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞায় পাওয়া যায় সমসাময়িক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং স্বাধীন জীবনের অনুপ্রেরণা। তাই ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবেই রুশোর প্রধান পরিচয়।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। সে জন্যেই অনুযোগ করা চলে যে আরও সহজভাবে রুশোর দর্শন লিপিবদ্ধ করলে বর্তমানের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে বাঙালী পাঠকের কাছে 'রুশো' আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো।

পরিমলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃতি-সংবাদ

কবি নজরুল

গত ২৬শে মে কবি নজরুল ইসলামের উনপঞ্চাশতম জন্মতিথি অতিবাহিত হয়েছে। বিপ্লবী বাংলার চারণকবি, পরাধীন দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা কবি নজরুলের জন্মবার্ষিকী নিতান্ত মামুলীভাবে দু এক জায়গায় উদ্‌যাপিত হয়েছে, এ লজ্জা মর্মান্তিক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে বৈপ্লবিক গণচেতনায় ও স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় আবেগে সমস্ত বাঙালী জাতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তা প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে নজরুলের কণ্ঠে। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তিনি, যুদ্ধ শেষে বিদেশ-প্রত্যাগত সৈনিক-কবি সামরিক বৃত্তি ছেড়ে কলম ধরলেন, তাঁর কবিতায়, গানে আত্মহারা হয়ে নেচে উঠল ক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত জাতি। সাম্যবাদকে পরিপূর্ণভাবে জীবন-দর্শন হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে তর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাম্যবাদের জয় ঘোষণায় তাঁর প্রায় বহু কবিতা ও গান মুখর; সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তাঁর সক্রিয় সহানুভূতিতে পরিপুষ্ট; দুনিয়া জোড়া শ্রমিক ঐক্যে তা বিশ্বাসী। ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে যে সাধারণ ধর্মঘট হয়, তাতে ধর্মঘটীদের অভিনন্দন জানিয়ে নজরুল 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি রচনা করেন। ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের একেবারে প্রথম-সূচনায় তাঁকে বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রভৃতির সহকর্মী হিসাবে দেখা যায়। এই সময় লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসাবে নজরুলের পরিচালনায় 'লাঙ্গল' কাগজ বের হয়। ১৯২২ সালে 'আগমনী' কবিতা লিখে নজরুল রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেন। যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে আমাদের জাতীয় জীবন আজ সর্বনাশের সম্মুখীন, সেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে প্রতিহত করার পণ নিয়েছিলেন তিনি, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের সংকল্প

গ্রহণ করেছিলেন; তাই ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়েও দীপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছেন,

'যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া
সেই লাঠি কাল প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুঁড়া।'

স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপিত অগ্নিযুগের জন-গণ-মনকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করেছেন তিনি তাঁর কবিতায়, গানে, সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা ও জাতীয়তাবাদ, এইজন্য তাঁর কাছে ঋণী। এ ছাড়া নজরুলের হাতে বাংলা ভাষা যে পরিপুষ্টি লাভ করে, এমন কি বলা যেতে পারে, বাংলার কাব্যধারা যে নতুন পথ গ্রহণ করে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বিশেষ ভাষা ও নতুন নতুন শব্দের প্রয়োগে বাংলা কাব্যের ধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তা দীর্ঘ দিন অব্যাহত থাকলেও কবি বিহারীলালের লিরিককাব্য সে ধারার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কবি বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে লিরিকের ভাষারই প্রাধান্য। কিন্তু নজরুলের হাতে এই লিরিক কাব্যের ধারা নতুন রূপ নেয়, নতুন নতুন ভাষার প্রয়োগ, গঠনভঙ্গী ও ব্যঞ্জনায় নজরুল-কাব্য বাংলা কাব্যের ধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আনে; জাতির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতা ও অসাম্যের তীব্র গ্লানি এবং দুর্জয় তেজস্বিতা প্রকাশের জন্য বাংলা কাব্যের লিরিকধর্মী ভাষাকে বীরত্বব্যঞ্জক ভাবের বাহন হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষা থেকে নতুন নতুন উপযোগী শব্দ চয়ন করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

একটা সম্পূর্ণ যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিপ্লবী সাহিত্যের সৃষ্টিতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন নজরুল; সর্বস্ব পণ করে সে আন্দোলন ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কিন্তু নীলকণ্ঠের মত রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্যের তীব্র হলাহল নিঃশেষে পান করেছেন তিনি। কবি নজরুল আজ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত; সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয়ে শয্যাশায়ী কবির অবস্থা আজ মর্মান্তিক। পক্ষাঘাতগ্রস্থা স্ত্রী, প্রকাণ্ড পরিবারের ব্যয়ভার, বিরাট ঋণের বোঝা, বাসস্থান থেকে বাড়ীওয়ালার উচ্ছেদী পরোয়ানা, এর ওপর আবার বাংলা সরকারের নামমাত্র ভাতাও অজ্ঞাতকরণে স্থগিত—মর্মান্তিক হলেও বিপ্লবী বাংলার চারণ-কবির ভাগ্যে এই আজ একমাত্র বাস্তব। এই হতভাগ্য দেশে বিরাট প্রতিভাদের অদৃষ্টের এই মর্মান্তিকতা বুঝি বা স্বাভাবিক। বাংলার স্বাধীনতাকামী ও সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের কাছে আমাদের দাবী, জনসাধারণের মুমূর্ষু কবিকে, বাংলার নজরুলকে, এই শোচনীয় দুর্দশা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করুন। আমাদের আশা ও বিশ্বাস, পরম আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই মুহূর্তে এ দাবী তাঁরা গ্রহণ করবেন।

নীহার দাশগুপ্ত

হিন্দী কবি 'নিরালা'

হিন্দী কবি 'নিরালা' বর্তমান হিন্দী সাহিত্যে অগ্রগণ্য কবি। নিরালা সূর্যকান্ত ত্রিপাঠির ছদ্মনাম। তাঁর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ হিন্দী লেখকদের অভিনন্দন শুদ্ধ 'নয়া সাহিত্য'র নিরালা-অংক বিশেষ নামে প্রকাশিত হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন

থেকে শুরু করে ছোট বড় অনেক সুপরিচিত হিন্দী সাহিত্যিক 'নয়া সাহিত্যে'র উক্ত বিশেষ সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন।

নিরালার জন্ম যুক্ত-প্রদেশে কৃষকের ঘরে। সেখান থেকে এসে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যোগ দেন। কিন্তু কিষাণ-জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয়নি।

১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ হিন্দী সাহিত্যে এক নতুন জাগরণের জোয়ার আনে। তার আগে হিন্দী কবিতা দরবারী ও রীতিকালীন অলঙ্কার শাস্ত্রের কড়াকড়ি নিয়মে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। গতানুগতিকতাকে অনুসরণ, কবিতার বিষয়বস্তুর চেয়ে বাইরের রূপের উপর জোর দেওয়া, ইত্যাদি ছিল তার বিশেষত্ব। অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে সামন্তযুগের প্রভাব পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিদ্রোহ কবিতার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলো। অলঙ্কার শাস্ত্রের কড়াকড়ি অস্বীকার করে, গতানুগতিকতার অনুসরণ বাদ দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবী প্রতিফলিত হল মুক্তছন্দে, ইংরেজী ও বাংলা গীতিকাব্যের নতুন নতুন ছন্দরূপ হিন্দীর ক্ষেত্রে আমদানী করে। কিন্তু সে বিদ্রোহ শুধু কবিতার বাইরের রূপের অদলবদল করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নতুন জীবন গড়ার আগ্রহ, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, পুরাতন সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রূপায়িত হয়ে উঠতে লাগলো। সেদিন যে কয়েকজন হিন্দী কবি এই নতুন ধারার স্রষ্টা ছিলেন, নিরালা তাদের অন্যতম।

নিরালার ওপরে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মারফত বৈষ্ণব কবিদের ও অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর মধ্যে গভীর মানব-প্রেম জাগিয়ে তোলে। বিবেকানন্দের প্রভাব প্রতিফলিত হয় অদ্বৈতবাদে। হিন্দী সাহিত্য তখন নবজাগরণের চাঞ্চল্যে অধীর, এবং নতুনের সন্ধানে অজানা পথে চলার রোম্যান্টিক ব্যগ্রতায় আকুল। নিরালার মানব প্রেম সেই যুগেও তাঁকে শুধু মাত্র মধ্যবিত্তের জগতে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরও নীচে টেনে নিয়ে গেছে কিষাণের জীবনের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিতে।

এর পরের যুগ, অর্থাৎ ১৯৩০—৩১-এর দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পরবর্তী কাল, হিন্দী সাহিত্যে ছায়াবাদ তথা পলায়ন-বাদের যুগ। পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটের জটিলতা, কঠিন সমস্যা, ইত্যাদি মধ্যবিত্তের সামনে ভবিষ্যৎ নিরাশাময় করে তুলেছে। তার প্রকাশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়েছে বাস্তব বিমুখিতা ও ছায়ালোকে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা। নিরালার ওপরেও সাময়িক ভাবে এই পরাজিতের মনোভাব প্রবল হতে দেখা যায়। তাঁর এই সময়ের কবিতায় অদ্বৈতবাদী চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু নিরালার সঙ্গে কিষাণ জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কোন দিনই ছিন্ন হয়নি। কলকাতায় বসেও বাড়ীতে পীড়িতা কন্যার চিকিৎসার জন্য বাসনপত্র বিক্রী করার উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতে হয়েছে। তাই অল্পদিনের মধ্যেই ছায়াবাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কিষাণ জীবনের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য বিপ্লব-বীরের আবাহন নিজ কণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলেছেন। সে বিপ্লব-বীর অবশ্য কিষাণের জীবনের শরিক নয়। সে আসবে কৃষকশ্রেণীর বাইরে থেকে উদ্ধারকর্তা রূপে।

কৃষক নিজে শ্রেণীসচেতন ও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে নিজের ভবিষ্যত রচনার দিকে এগিয়ে যাবে—সে কল্পনা অবশ্য নিরালা পরবর্তী সময়েও করতে পারেননি—তাঁর চিন্তা ততদূর

অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু তাঁর কয়েক বৎসর আগের কবিতা ও গল্পে যে পথের অস্পষ্ট আভাষ দিয়েছেন তাব অবশ্যম্ভাবী পবিণতি হল কৃষকের শ্রেণীসচেতন সংগঠিত লড়াই। এ-যুগে নিরালা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অজ্ঞাত অখ্যাত সাধারণ কৃষকের বিক্ষোভকে রূপ দিয়েছেন, নায়ক করেছেন তাদেরই—গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক, কুল্লীভাটের জীবনচরিত রচনা করেছেন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে।

'নিরালা অংক'-তে একটি কবিতার নাম হ'ল "নিরালাজীর প্রতি, মহ্‌গু, ঝীগু প্রভৃতির অভিনন্দন"। মহ্‌গু, ঝীগু হ'ল তাঁর আঁকা সাধারণ কৃষকের কয়েকটি এমনি চরিত্র, যারা নিজেদের দৈন্য আর অপমানকে অসহায় ভাবে মেনে নেয়নি।

আজ কৃষকের সংগঠিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বহু মহ্‌গু ও ঝীগু বেরিয়ে এসেছে। তারা শুধু নিজেরাই বিদ্রোহী নয়, নিজ শ্রেণীর লড়াইতে তারা নেতৃত্ব করছে। নিরালাজীর কবিতার স্তর ছাড়িয়ে তারা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে সত্য। কিন্তু তারা ভুলতে পারে না, যে সেই অগ্রগতির পথে নিরালাজীর অবদান অনেকখানি সম্বল আর প্রেরণা জুগিয়েছে।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

গোপাল ঘোষের চিত্রপ্রদর্শনী

কিছুদিন আগে শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা এক চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কলকাতায় হয়ে গেছে।

বাংলার নতুন শিল্পীদের মধ্যে অতিসম্প্রতি যাঁরা প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোপাল ঘোষ অন্যতম। তাঁর এই প্রতিষ্ঠা শুধু শিল্পরচনার বিশিষ্টতাতেই সীমাবদ্ধ নয়; সমসাময়িক বাংলা শিল্পকলা যে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে, সেই চেতনারই অত্যন্ত বলিষ্ঠ অঙ্গীকার তাঁর রচনাকে এতখানি প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অল্প কিছুকাল আগে থেকে আমাদের চিত্রকলায় যে নতুন আদর্শের সন্ধান বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তারই সুস্থ ও সম্ভাবনাময় পরিণতির একটা ধারণা হল গোপাল ঘোষের এই একক চিত্রপ্রদর্শনীটি দেখে।

গোপাল ঘোষের ব্রাশ্-ড্রয়িং-এর সঙ্গে আমরা অনেকেই বিশেষভাবে পরিচিত। অতি অল্প রেখার ব্যবহারে আর তুলির পরিমিত টানে তিনি এই স্কেচ্‌গুলিতে আশ্চর্য কাব্যগুণ আরোপ করে থাকেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর অনেকগুলি ব্রাশ্-স্কেচ্ ছিল, যেগুলোকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে। তাঁর শিল্পরচনার প্রথম অধ্যায়ে তিনি ছিলেন প্রধানত রেখাচিত্রকর এবং তখন তাঁর ছবিতে অলংকরণ-সম্পদ একটু যেন বেশী পরিমাণে থেকে গিয়েছিল; তাঁর সেই ডিজাইন-ধর্মী ছবিগুলিতে রেখার চমৎকার সাবলীল গতি আর লিরিক্যাল আবেদন দর্শককে মুগ্ধ করেছে। এবারকার ছবির মেলায় এই স্কেচ্‌গুলিতে দেখা গেল, তাঁর রচনায় আগেকার সেই সমস্তগুণই আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংযম-গুণের সমন্বয়ে তাঁর সৃষ্টিতে এমন একটি সৌন্দর্যের গভীরতা এসেছে যার মাধুর্য দর্শকের মনকে স্পর্শ না করে পারে না। এই ব্রাশ্-স্কেচ্‌গুলিতে তার চিত্র-পরিকল্পনা আরও

সুচিন্তিত, তুলির ব্যবহার আরও পূর্বনির্দিষ্ট এবং রেখার টান আরও সংযত হয়েছে, কিন্তু ছন্দবাহুল্য একেবারে নেই বললেই চলে। বিশেষত কয়েকটি স্কেচে খাঁটি ঐতিহ্য-অনুসারী ক্যালিগ্রাফির সূক্ষ্ম সুষমা এবং রেখার চারুতা সম্পূর্ণ বজায় আছে—অথচ ভারতীয় ক্যালিগ্রাফির সেই অলংকার-সমারোহ এবং ছন্দবাহুল্য বর্জিত হওয়ায় গোপাল ঘোষের রচনারীতি সত্যিকার আধুনিক হয়ে উঠেছে।

এই প্রদর্শনীর অন্যান্য রঙীন ছবিগুলির—বিশেষত দৃশ্যচিত্রগুলির—কম্পোজিসনের সৌকর্য, অভিনব দৃষ্টিকোণ ও পরিপ্রেক্ষিতের সংস্থানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেক ছবির মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে দুটি ছবি : একটিতে চাঁদ-ওঠা উন্মুক্ত আকাশের নীচে সোনালী ফসলে ভরা খামারের কাজে ব্যস্ত তিনটি মেয়ে ("Gold of Soil & Crescent Moon"—৬২ নং); আর একটিতে আকাশ-ছোঁওয়া দিগন্তের পটভূমিতে খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে বসে একটি সাঁওতালী মেয়ে ("Is She Poet ?"—৭৫ নং)। সমতল পটের সংস্থানে এই ছবি দুটির কাঠামোর বিন্যাসে, 'স্পেস্'-এর পরিবেশনে এবং রঙের রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতায় দর্শকের চোখ বহুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে থাকে। আয়তনের ব্যাপ্তিকে অল্প পরিসরে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই লক্ষ্য করা গেল। কোন কোন ছবিতে এই আয়তনিক অনুপাতে স্বভাব ও শিল্পবিষয়ের মধ্যে ঐক্য সন্ধানে শিল্পীর কৃতিত্ব বিস্ময়কর। বিষয়বস্তু এবং তার অত্যন্ত অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টিতে শিল্পীমনের আবেগটুকু এই দুটি ছবিতে অপূর্ব রূপ পেয়েছে।

দৃশ্যচিত্রগুলি ছাড়া, সাধারণভাবে অন্য ছবিগুলিতে রঙের ব্যবহার কিন্তু দর্শকের মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। প্রথমোক্ত ছবিগুলিতে ব্যঞ্জনাগুণই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ছবি অপেক্ষাকৃত রূপক-প্রধান। সেইজন্যেই বোধহয় অতিরিক্ত স্বপ্রধান রঙের উচ্ছ্বাসে, হঠাৎ অতি উজ্জ্বল রঙের বিরোধ সৃষ্টিতে এবং প্রতিপূরক রং ও 'টোন' একেবারেই বর্জন করায় দর্শকের চোখ একটু আধটু বাধা পায়। রূপক ছবিতে 'ফর্ম্'-এর রূপান্তরটাই (Orientation) মুখ্য এবং রঙটা গৌণ—যদিও বলা বাহুল্য-যে, এই দুইই পরস্পরের প্রতিপূরক। এখানে এর ব্যতিক্রমটা একটু যেন বেশী রকম চেষ্টাকৃত বলে মনে হয়। ৬১ নং ("Dance") ছবিটিতে গতির অভাব এবং অন্য কয়েকটি "অ্যাবস্ট্র্যাক্শন্"-এ অবকাশের অভাব দেখে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মত সাধারণ দর্শক রঙের সংগতি খুঁজে না পেয়ে অসুবিধায় পড়বে। ৭১ নং ছবিতে চন্দ্রাহতা মেয়েটির ("Moon being so close") ভঙ্গীরচনায় যে কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, অত্যন্ত চড়া বিপরীত রঙের ব্যবহারে সেটাকে কেন শিল্পী এভাবে ক্ষুণ্ণ হতে দিলেন ?—এই ধরণের কতকগুলি ছবিতে রঙের ব্যবহার একটু বেশী রকম অভিনব—এবং সেই অভিনবত্বের পেছনে আপাতত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করে ওঠা গেল না।

সমসাময়িক বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে ক্ষমতাবান, গোপাল ঘোষ তাঁদেরই একজন—সুতরাং তাঁর শিল্পকর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন আছে। আশা করি যোগ্যতর শিল্পসমালোচকরা সে কর্তব্য পালন করবেন।

রবীন্দ্র মজুমদার

বিয়োগ-পঞ্জী : হরেন ঘোষ

ইম্‌প্রেসারিও হরেন ঘোষের ভয়াবহ হত্যায় প্রত্যেক সুস্থচিত্ত মানুষই নিদারুণ মর্মাহত হবেন। এরূপ বীভৎসতায় মানুষ হিসাবেই লজ্জা ও গ্লানিবোধ করতে হয়—সমাজে এত অমানুষিকতা জমে আছে, প্রশ্রয় পাচ্ছে!

হরেন বাবু আমাদের অনেকেরই ছিলেন প্রিয় সুহৃদ। তাঁর সুবিশাল পরিচিত-মহলে এমন কেউ নাই যিনি হরেন বাবুর সজ্জনতা, স্বাভাবিক মাধুর্য ও সানন্দ সামাজিকতায় মুগ্ধ না হতেন। এইরূপ অকৃত্রিম সুহৃদের বিয়োগে হরেনবাবুর আত্মীয় পরিজনের মতই তাঁরা শোকে মুহ্যমান হয়েছেন।

এ ছাড়া, বাঙলা দেশের শিল্প-উৎসবের জগতে হরেন বাবুর বিয়োগে অপূরণীয় ক্ষতি হল। ইম্‌প্রেসারিও হিসাবে বাঙালী কেন, ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম ও প্রধান ছিলেন। উদয়শঙ্করের নাম ও কীর্তির সঙ্গে তাঁরই উদ্যোগ আয়োজনে বাঙালী সাধারণ ও ভারতবাসী প্রথমটায় পরিচিত হন। তারপর থেকে হরেনবাবুর চেষ্টায় বাঙলা দেশে আমরা দক্ষিণের ও দেশীয় রাজ্যের বহু শিল্পীর ও শিল্পরীতির পরিচয় লাভ করি। তাঁর সন্ধান-ক্ষেত্র ও উদ্যোগ-ক্ষেত্র প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী ছিল। এ কাজে যে কতটা শিল্পজ্ঞান, উদ্যোগ, ও কতটা বুদ্ধির কৌশল থাকা দরকার তা সহজেই আমরা বুঝতে পারি। কারণ, শিল্পীরা সাধারণতই খেয়ালী প্রকৃতির ও অভিমানী ; তাঁদের মতিগতি অনেক সময় অনিশ্চিত। এ দেশের শিল্পীদের আবার নানাকারণে এসব দিকে ত্রুটি জমে। হরেনবাবুর এদিককার অভিজ্ঞতা তিনি 'পরিচয়ের' জন্য লিখতে একবার উদ্যোগীও হয়েছিলেন, সে জন্যেও তাঁর কথা আমরা ব্যথিত অন্তরে স্মরণ করছি।

এ ছাড়াও আমাদের অনেকেরই মনে পড়ছে, বাঙলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রতি হরেনবাবুর অকৃত্রিম দরদ। গণনাট্য সংঘের প্রথম নাট্যাদি অভিনয়ের সময় হরেনবাবু তাঁর পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অভিনয়টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। নতুন শিল্পী-মণ্ডলীর পক্ষে এমন বন্ধুর সহৃদয়তা যে কতদূর উৎসাহ সঞ্চার করত, অভিনয়েও সাফল্যদান করত, তা তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে আছে। বেদনার সঙ্গে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরাও বহু শিল্পরসিকের সঙ্গে তাই স্মরণ করবেন হরেনবাবুর স্মৃতি।

গোপাল হালদার

পত্রিকা প্রসঙ্গ

ছাপার দাম বাড়ছে, কাগজ বাজারে দুষ্প্রাপ্য, বিজ্ঞাপনদাতারা বিপাকগ্রস্ত—বাঙলা সাময়িক পত্রের তাই দুর্দিনই এসেছে। এরই মধ্যে তবু সরকারী কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশ শিথিল হওয়াতে বাঙলা দেশে নতুন সাময়িক পত্র আবির্ভূত হচ্ছে, এবং সাময়িক পর্যায়ের বার্ষিকীরও ফলন একেবারে বন্ধ হয় নি। বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আজ অব্যাহত নেই। তাই এই নতুন নতুন পত্রিকার আবির্ভাবে আরও বিস্মিত হতে হয়। সর্বক্ষেত্রে পরিচালকদের যোগ্যতার প্রশংসা না করা যাক, সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। আর এ সাহস—এমনকি দুঃসাহসও—সমর্থনযোগ্য।

এ সব নবজাতদের মধ্যে এমন দু'চারখানি পত্রিকা আছে, যা কোন না কোন কারণে এই স্বল্প জীবনেও বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। অবশ্য এমন পত্রিকাও আছে যার বৈশিষ্ট্য এখনো অপরিস্ফুট, কিন্তু রচনাসম্ভারে যা কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। প্রথম জাতের পত্রিকার মধ্যে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মুখপত্রের' দৃষ্টিভঙ্গী ও বাগ্‌ভঙ্গী নিজস্ব ও উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত আভিজাত্যের প্রয়াস এ পত্রিকার নেই, না দামে, না ভক্তিবিহ্বলতায়। লঘুহস্তের শরসন্ধানে কৃতিত্ব আছে, কিন্তু ও ব্যাপারে পূর্বসূরীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। পত্রিকার আয়ুর এবং লেখকের চেতনার প্রসার আরও বেশি প্রয়োজন।

দ্বিতীয় জাতের পত্র সুবিদিত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'বর্তমান'। শ' দেড়েক পৃষ্ঠার মোটা এই পত্রিকাখণ্ডের মধ্য দিয়ে সরোজবাবু বাঙলা সর্বগ্রাসী মাসিকপত্রের মামুলী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন বৈশাখ থেকে। এ জাতীয় পত্রের বত্রিশ ব্যঞ্জন এখানেও যথারীতি আহরিত হয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের পুরনো চিঠির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর লেখকদের অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধকারদের প্রায় প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ; আধুনিক পাঠকের দাবী মত জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, স্বদেশী পল্লীর বিবরণ, নানা সাময়িক ঘটনার সম্পাদকীয় বিচার, ইত্যাদি। 'বর্তমান' অতীতের জের-টানা ভাগ্যবান মাসিক পত্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই বৈশিষ্ট্যহীন হতে তা কতকাংশে বাধ্য। তবে তার লেখ-ভাণ্ডার ভারী। আর, এ কি কম কৃতিত্বের কথা যে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় পর্যন্ত এ পত্রিকার জন্য কলম ধরেছেন 'বাংলার লীগ্ শাসনের ক'বছর'-এর কথা বলতে। স্মরণ থাকতে পারে যে, সে ক'বছরে আজকের কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার কোনো কোনো গোঁড়া নেতা সেই নামজাদা বা নাম-কাটা লীগ্‌ওয়ালাদের সঙ্গে বাঙলা শাসনের গৌরব সমভাবে অর্জন করেছেন—অবশ্য কিরণবাবু ছিলেন নিষ্ক্রিয় অপোজিশ্যানেই। ব্যাঙ্ক জগতেও বিড়লা-ইস্পাহানির মুনাফা-মৈত্রী নষ্ট হয় না, পলিটিক্সের জগতেও বিড়লা-ইস্পাহানি নীতি ঠিক চলে—পত্রিকার জগতেই কি চলে না?

সাময়িক পত্রিকার জগতে কিন্তু 'মেঘনা' একটু ব্যতিক্রম। 'মেঘনা' সম্ভবত বার্ষিকী

কিংবা অর্ধবার্ষিকী—বারমেসে নয়; এবং আশাকরি, ওষধিও নয়। এ জাতীয় বার্ষিকী বাঙলায় গত দু'এক বৎসরে বেশি বেশি জন্মলাভ করেছে কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের চাপে—এবং তার ফাঁকে। একটা প্রয়োজনীয় দাবীই তাঁরা বাঙালী পাঠকের মিটিয়েছেন—নতুন লেখা ও নতুন ধরণের লেখাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংকলন ক্ষেত্রে স্থান করে দিয়ে। সে হিসাবে 'মেঘনা' এসেছে বিলম্বে। কিন্তু তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা তেমনি চিত্তাকর্ষক, আর তার চিত্র ও ছাপায় যে শ্রী ও স্বচ্ছতা আছে তা তেমনি নয়নাকর্ষক। হিট্‌লারী জার্মানীর বিরুদ্ধে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রখানি অনেক কারণে বেশি আলোচিত হবে:—এই হিট্‌লারবাদ বিরোধী সুভাষ চন্দ্রই কি সত্য, না হিটলার-সহযোগী ব্রিটিশ-বিরোধী সুভাষচন্দ্র সত্য, না দুইই সত্য অবস্থান্তরে, দেশপ্রীতির দাবীতে মতাদর্শমুক্ত দুঃসাহসিকতার (adventure) তাড়নায়? এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই আলোচনাযোগ্য। এ পত্রখানি সেদিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাবে। এ ছাড়াও, এতগুলি প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার গল্প ও কবিতা, আর এতগুলি সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা একসঙ্গে অধিকাংশ 'বার্ষিকী'তে দুর্লভ। অধিকাংশ লম্বোদর 'শারদীয়া সংখ্যায়'ও তা পাওয়া যায় না। বরং আয়তন ও রূপসজ্জায় সে সব শারদীয় সংখ্যা মহিষাসুরকে মনে করিয়ে দেয়, দেবীকে নয়। 'মেঘনা'র শ্রী আছে, আসুরিক অভিমান নেই—এবং নানাদিক বিচার করলে মনে হয়, বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের স্রোত মোটামুটি এর প্রশস্ত, গভীর খাতে যথার্থরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। সার্থক লেখার প্রতিনিধি স্থানীয় সংকলনের জন্য কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তৃপ্তি লাভ করতে পারেন;—এবং অর্থলাভই বা করবেন না কেন—এমন দু'শ পৃষ্ঠার চমৎকার গ্রন্থের দাম যখন মাত্র তিন টাকা?

সাময়িক পত্রিকার বাজারের উপর নির্ভর না করেও কোনো কোনো সাময়িক পত্র চলে।—ব্যক্তি বিশেষের বা মতবাদ বিশেষের মুখপত্রের কথা বলছি না। প্রতিষ্ঠান সমূহের মুখপত্রের কথাই বলছি—যেমন, "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মুখপাত্র বেরোয় তা 'বিমাতৃভাষাতেই' কথা বলে, এবং যে-কথা বলে তা ওভাষা যাঁরা জানেন, তাঁরাও অনেক সময়ে শুনেও শোনেন না। আগামী দিনে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র মাতৃভাষাতেই রচিত হবে—'রাষ্ট্রভাষার' আবার মুখাপেক্ষী হবে না। আনন্দের সঙ্গে মানতে হবে—এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম হয়ত পথ প্রদর্শন করলেন। তার ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র ১৩৫২-৫৩ সনের "বার্ষিকীর" মত কোনো পত্রিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের' প্রকাশিত "ইউনিটি—এ্যান্ এন্‌থোলজি" এখনো দো-আঁশলা পত্রিকা। তা হাতে নিয়ে এবং পড়ে মনে হয়—এ শুধু বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়, বোধহয় ছাত্র ও অধ্যাপক-উপদেশক মণ্ডলীর যত্ন-বঞ্চিত, স্নেহ-বঞ্চিতও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের ছাত্র-পত্রিকাগুলি আমাদের দেশে দেহেপ্রাণে ক্ষীণ। বিদেশের অনেক লেখক তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকার মধ্য দিয়েই নিজেদের আবিষ্কার করেছেন, এবং নিজেদের সাহিত্যিক জীবনের বনিয়াদ পত্তন করেছেন, এরূপ কথা আমরা পড়ি বটে। কিন্তু আমাদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলিও যে ভাবী-লেখকের শিক্ষাশালা হতে পারে,—হওয়াই উচিত,—একথা আমরা ভাবতেও পারি না। এক কালে

বাঙলা 'শান্তিনিকেতন' পত্রে সেখানকার ছাত্ররা তাঁদের কর্ম ও চিন্তার ছাপ আঁকতে চেষ্টা করতেন। 'প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগেজিনের' পাতায় (সাধারণত ইংরেজিতে) এদেশের বিকাশোন্মুখ কৃতী সন্তানদের মননশক্তিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। কিন্তু সৃষ্টি ও সাহিত্যিক রচনার জন্য ছাত্র বা অধ্যাপকের কারও নিকটেই কলেজ ম্যাগাজিনকে আসর বলে মনে হয় নি। কলেজ ম্যাগাজিনে থাকে প্রাণহীন শুষ্কভাষায় কলেজের ছাত্রদের (প্রায় প্রাণহীন) 'এ্যাকটিভিটিস্'-এর 'রিপোর্ট'। ছাত্ররা লেখক হতে চাইলে লিখতেন বাইরের মাসিক পত্রে।

একটু চেষ্টা করে আজ এ অবস্থা ফেরানো যায় না কি? বলা বাহুল্য, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা বাঙলায় চালাবার দিন অনেক আগেই এসেছে—ইংরাজী বা রাষ্ট্র ভাষায় তার বার্ষিকী প্রকাশ করাই এখন যথেষ্ট হতে পারে। অবশ্য এ কথা সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মুখপত্র বাঙলায় চললেও বাঙলা বনিয়াদী মাসিক পত্রের অনুকারী বা প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না, হতে পারে না। কারণ কলেজী পত্রিকায় একটা 'পড়ুয়া' ছাপ থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য তা সত্বেও দেশের সংস্কৃতি-জগতের চিন্তা-ভাবনার একটা ছাপও তাতে পড়বে। আর তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের (বা কলেজের) পত্রিকায় নূতন চেতনার আভাসও পাওয়া দরকার তার নূতন ছাত্র ও মননশীল অধ্যাপকদের মারফতে। একই কালে তাই এরূপ পত্রিকায় এ্যাকাডেমিক বা চতুষ্পাঠীগত পাঠবৃত্তির সঙ্গে বাইরের প্রচলিত সংস্কৃতি ও ভাবীদিনের সংস্কৃতি-প্রয়াসের পরিচয় লাভ করাও সম্ভব হতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিটি' পত্রিকা হাতে নিয়ে এই দুঃখই বেশি হয়—এ যেন কারও আপনার নয়; কোনো বিশিষ্ট চরিত্র বা রূপ এর নেই, কোনো মর্যাদাও এ দাবী করে না। আরও দুঃখ হয় এ জন্য যে, এর লেখকদের মধ্যে গুণের অভাব নেই, ইংরাজি ভাষার মারফতেও এই ছাত্রদেরই শিক্ষা-বিষয়ক, মুদ্রাবিষয়ক বা ইতিহাসবিষয়ক লেখা তাঁদের স্বচ্ছ চিন্তার প্রমাণ যথেষ্ট বহন করছে, তবু সে সব প্রবন্ধেও যেন অকারণ আলোচনা-সংক্ষেপের এবং লেখা সম্বন্ধেই উপেক্ষার চিহ্ন রয়েছে। দু'একটি ছাড়া বেশিরভাগ বাঙলা লেখাতেই আছে অকৃতিত্বের প্রমাণ, এক আধটি সে হিসাবে হাস্যকর। কিছুতেই মানতে পারব না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই পরিচয়-পত্র—না আছে তাতে এ্যাকাডেমিক্ গুরুত্ব, না সাধারণ সংস্কৃতির ছাপ, না কোনো ভাবী সৃষ্টি ও চেতনার আভাস। যেটুকু তা আছে, আছে দু'একটি ইংরেজি প্রবন্ধে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গেলে কলিকাতার যে কোনো একটি কলেজের থেকেও ছাত্রসংখ্যায় ছোট। সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি তাকে দুর্বল করেছে অনেক দিন থেকে, এবং দুর্বল করেছে কলকাতার থেকেও বেশি। তারই মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলবার মত এক অবকাশ পেয়ে ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা যে মুখপত্র প্রকাশ করেছেন তা শুধু আগাগোড়া বাঙলায় নয়, তার আগাগোড়া আছে এই প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যের ছাপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাঙ্কেতিক নাটক ও মোহিতলালের (তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপকও) কবিতা নিয়ে ছাত্র-অধ্যাপক-সুলভ আলোচনা আছে, আমাদের সাধারণ সাহিত্যালোচনার প্রভাব তাতে প্রকট। অবশ্য, ছাত্র-সুলভ কাঁচা লেখা, কাঁচা গল্পও আছে; বোঝা যায় পড়ুয়ার উৎসাহ ও উদ্যম এখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। বৈদেশিক

সাহিত্য ও গল্পের চমৎকার অনুবাদ রয়েছে,—বুঝ্‌তে পারি পাঠ্য বইএর বা এ্যাকাডমিক সীমা ছাড়িয়ে মন এগিয়ে যাচ্ছে, বিদ্যালয়ে বসেই ছাত্র বিশ্বের পরিচয়ও নিতে চায়। আর গল্পে, কবিতায় প্রবন্ধে ছাত্র ও অধ্যাপকদের পর্যন্ত কারো কারো লেখায় রয়েছে আগামীকালের আভাস, বিস্ময়কর এক সত্য-জিজ্ঞাসা। বিস্ময়কর শুধু তা লেখার গুণে নয়। বিস্ময়কর এসব লেখার সংখ্যাও। এই সোয়া'শ পাতার 'বার্ষিকী'র বহু লেখাই এই ঐকান্তিক প্রেরণায় ও কলা-কুশলতায় বিশিষ্ট। অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন সাহেবের 'আধুনিক মুসলিম সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটি প্রত্যেক মুসলমান ও হিন্দুকে সম্ভব হলে পড়ে দেখতে বলছি। হিন্দুরা বুঝবেন—বাঙলার মুসলমান কী ভাবে বাঙলা সাহিত্যে পথ করছে,—কত অভাব বাধা ছেদন করে। মুসলমানরা বুঝবেন—বাঙলার মুসলমান সাহিত্যের আসল প্রয়োজন কী, সৃষ্টিকর্মে কেন সে ব্যাহত। আর যে কোনো পাঠক দেখবেন এ প্রবন্ধে লেখকের মনস্বিতা—আন্তরিক সাহিত্য-প্রেম, স্থির বিচারবুদ্ধি এবং প্রাঞ্জল স্বচ্ছ সুন্দর ভাষা। মনে রাখা দরকার, বাঙালী মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যকর্মে, অগ্রসর না হলে হিন্দুর কাছ থেকেও শ্রদ্ধা পাবেন না। নিজের মনেও পাবেন না আত্মবিশ্বাস। সমস্ত বাঙলার পক্ষে তা এক বড় দুর্বিপাক।

কিন্তু লেখা ও বক্তব্যের এই গুণ শুধু ঢাকার অধ্যাপক সাহেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইটিই আরও বিস্ময়কর। সর্দার ফজ্‌লুল্‌ করিম বোধ হয় ছাত্রজীবন সমাপ্ত করছেন। 'বার্ষিকীর' সম্পাদক নরুল ইসলাম চৌধুরী, এ. কে. নাজমুল করিম কিংবা মুনীর চৌধুরী আর কবি নুরুদ্দীন ও সানাউল হক সম্ভবত এখনো ছাত্রই। কিন্তু সর্দার ফজলুল করিমের "সাহিত্যে সমস্যাটা কি ?" প্রবন্ধে অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে অনুরূপ বিচারবুদ্ধির, পরিচ্ছন্ন পদ্ধতির এবং স্বচ্ছ প্রকাশ শক্তির। মুনীর চৌধুরীর সাহসের অন্ত নেই। গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর যে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, গল্পের আলাপ রচনায় 'আঞ্চলিক' (নোয়াখালি) ভাষা-প্রয়োগেও তাঁর তেমনি দৃঢ়তা। বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চল আজ বাঙলা সাহিত্যে তার জবানবন্দী দিচ্ছে। আজ আর বাঙলা সাহিত্য শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ নয়।

আশা ও আনন্দের সঙ্গে দেখছি—শুধু পশ্চিমবঙ্গেও বাঙলার দিগন্ত শেষ হয় নি। শুধু হিন্দুর হাতেই বাঙলা সাহিত্য প্রসারের ভারও নেই। এসব নতুন লেখকদের অধিকাংশই মুসলমান, এবং পূর্ববাঙলার মুসলমান, আর এঁদেরই লেখায় এঁদেরই স্বাক্ষরে প্রধানত এই 'বার্ষিকী' লাভ করেছে সেই অপূর্ব বস্তু যা চোখে পড়বেই,—এর সরল চরিত্রগুণ। ভাঙা বাঙলায় অনেকখানি সাহস দরকার হবে হিন্দু মুসলমান যুবকলেখকদের এই চরিত্রগুণ, এই বিচার-নিষ্ঠা বজায় রাখতে, সৃষ্টির সেই সিংহদ্বার রাখতে খোলা। ঢাকার এই বার্ষিকী আমাদের তবু আশায় ভরে তুলেছে—এঁদের আমরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছি। লিখুন, লিখুন, লিখুন—create, create & create. দুই বাঙলা আপনাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আপনাকে এক করে সৃষ্টি করতে পাববে তা হলেই।

গোপাল হালদার

সম্পাদক
হিরণকুমার সান্যাল
গোপাল হালদার
প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং
৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।